স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৩৭৬/৭

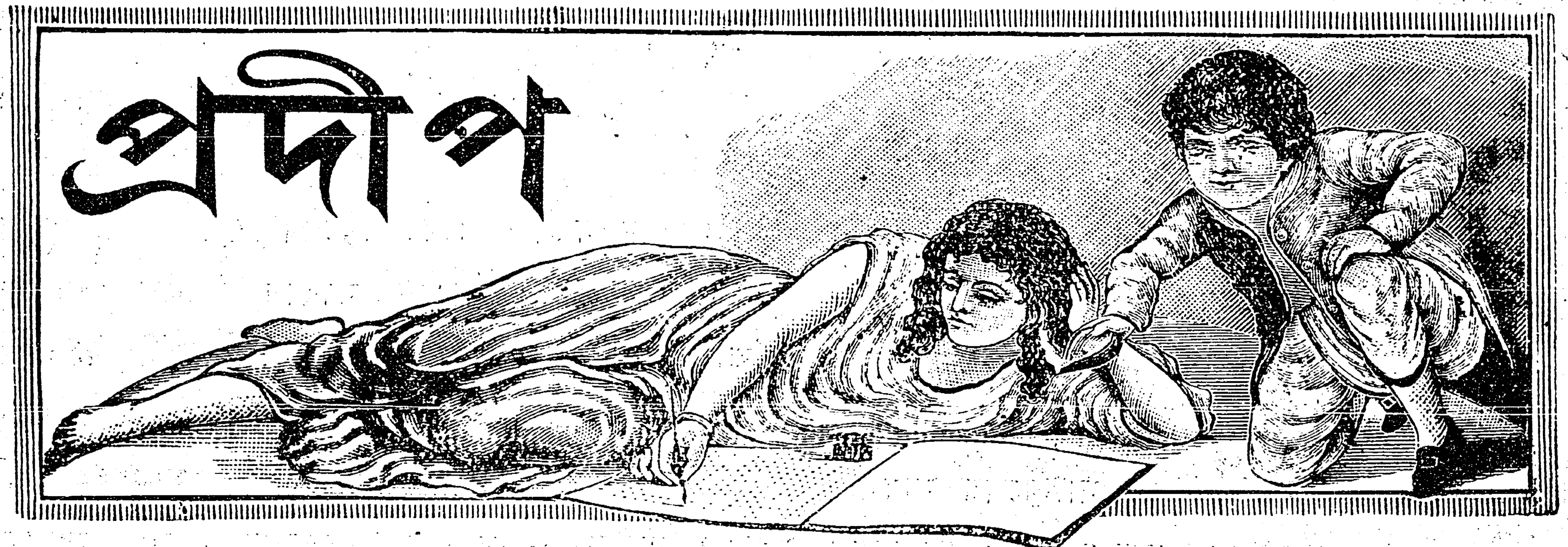

৭ম ভাগ। বৈশাখ, ১৩১১। ১ম সংখ্যা।

নব বর্ষে

ক্ষীণ প্রদীপের আলো জ্বালি অন্ধকারে
একেলা বসিয়া আছি প্রতীক্ষায় যার
সে কেন আসে না, বর্ষ আসে বারে বারে ?
শুধু জাগরণে কাল কাটে গো আমার !
পবন-কম্পিত শিখা ক্ষুদ্র হস্তে ঢাকি
চেয়ে আছি পথ পানে আকুল নয়নে।
এস হে বাঞ্ছিত এস ! প্রেমভরে ডাকি
নিত্য আমি ; তুমি কি তা শোন না শ্রবণে ?
ওগো দীপ্তি ! ওগো মোর জীবন-সম্বল !
এস গো হৃদয় করি আলোকে উজ্জ্বল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

গীতার ত্রিতত্ত্ব।

আধুনিক শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস আমাদের মনোবিজ্ঞান নাই। মনোবিজ্ঞান লইয়া হিন্দুগণ বড় একটা মাথা ঘামায় নাই। মনোবিজ্ঞানের যে সকল কথা আমাদের আধুনিক ভাষায় ভাসিয়া আসিতেছে, তাহাদের আমদানি প্রধানতঃ পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান হইতে ঘটিতেছে। শিক্ষিতগণের মধ্যে যাঁহারা কিছু সূক্ষ্মদর্শী, জাতীয় শাস্ত্র বিজ্ঞানে কিছু আস্থাবান ও ব্যুৎপন্ন, তাঁহাদের ধারণা যে হিন্দুর অধ্যাত্ম্য দর্শন (Ontology) কিছু আছে কিন্তু মনোবিজ্ঞান (Psychology) আদৌ নাই। এ বিশ্বাস ও ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। আমাদের গভীর গবেষণাপূর্ণ দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিলে অতি সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, হিন্দুর অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়ই অমোঘ যুক্তি ও কঠোর চিন্তার ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। মনোবিজ্ঞানে হিন্দুর কৃতকার্য্যতার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ—পাতঞ্জল দর্শন ও গৌতম দর্শন। হিন্দু যে কতদূর সূক্ষ্মতার সহিত মানবের মানসিক তত্ত্ব অনুশীলন ও আলোচনা করিতে সুসমর্থ, মহর্ষি গৌতম পাতঞ্জল প্রমুখ প্রতিভাশালী পুরুষগণ তাহা অতি বিষদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের বিচার-

ব্যাখ্যান সম্বন্ধে, শঙ্কর প্রভৃতি মনস্বিগণ, অতুল কীর্ত্তি-স্তম্ভ মানবতত্ত্বের বিশাল বিজ্ঞান চক্ষে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। আর উভয়কে—অধ্যাত্ম দর্শন ও মনোবিজ্ঞান—এই উভয়কে সম্মিলিত করিয়া, মানব-তত্ত্বের যে অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম সন্ধান, আর্য্য প্রতিভা নির্দ্ধারণ করিয়াছে, তাহার তুলনা জগতের আর কোন স্থানে কোন কালে দেখিতে পাওয়া যায় না—যাইবেও না।

যে ত্রিতত্ত্বের উপর মানবের মানবত্ব সংস্থাপিত, যে ত্রিতত্ত্ব ধরিয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকশিত, যে ত্রিতত্ত্বের সমজ্ঞান অনুশীলনে, সম্যক অনুষ্ঠানে মানবত্বের সাধনায় মহাসিদ্ধি সংলব্ধ হয়, তাহাই সেই সূক্ষ্ম সন্ধানের মহা ফল। অধ্যাত্ম দর্শনের সহিত মনোবিজ্ঞান মিলিত হইয়া, জীবন কাণ্ডের যে গভীর জটিল রহস্য উদ্ভেদ করিয়াছে—জীবের গন্তব্য পথ প্রশস্ত পরিষ্কৃত করিয়া বিশদরূপে দেখাইয়া দিয়াছে—সেই মহাফল স্বরূপ ত্রিতত্ত্বের ব্যাখ্যান বিবৃতির এক মাত্র প্রসূতি আর্য্যপ্রতিভা। আর সেই প্রখর প্রতিভা পূর্ণাঙ্গে প্রকটিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়। অতি জটিল গভীর রহস্যপূর্ণ মানবত্বের ত্রিতত্ত্ব-বীজ বিশাল বৃক্ষে বিকশিত কেবল গীতাক্ষেত্রে।

মানব তিন উপাদানে গঠিত। তিন ভাব লইয়া মানব-আত্মা সৃষ্ট। ত্রিতত্ত্বকে ধরিয়া মনুষ্যত্ব হৃষ্টপুষ্ট। আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান অবিসম্বাদিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে যে বেদনা (Feeling) বাসনা (Willing) ও জ্ঞান (Knowing) মানব মনের এই তিন ভাব। এই তিন উপাদানে মানবের মন সংস্থিত। ক্যাণ্ট, হেগেল, ফিডো আদি জর্ম্মাণ দার্শনিকগণ হইতে হ্যামিল্টন, মিল, বেইন আদি ইংরাজ মনোবিজ্ঞানবিৎগণ পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে মানব-মানসকে উক্ত তিন ভাবে বিভক্ত করিয়া নিজ নিজ দার্শনিক অট্টালিকার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী ফরাসী মনস্বী কোমৎ, ঐ তিন ভাবকে, মানবতত্ত্বের মৌলিক উপাদান ধরিয়া, তাঁহার প্রত্যক্ষবাদের কর্ম্মময় প্রেম ধর্ম্মের (Religion of humanity) প্রচার করিয়াছেন। আধুনিক সমুদয় প্রধান প্রতীচ্য দর্শন, উক্ত ত্রিতত্ত্বকে মানব মনের মূল উপাদান বলিয়া মানিয়া লইয়া, আপন আপন সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আধুনিক সভ্য শিক্ষিত সমুন্নত জগৎ, জীবন কাণ্ডের যে ত্রিতত্ত্বের আভাস ইঙ্গিৎ ধরিয়া, মনুষ্যত্বের অনুশীলন সম্প্রসারণ উদ্দেশে ধাবমান, তাহার দেদীপ্যমান আদি প্রকাশ হিন্দু দর্শনে—আর তাহার পূর্ণাঙ্গে প্রথম প্রকটন শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

গীতার গভীর বার্ত্তা বিশেষ সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিলে, অতি বিশদভাবে তাহার উদ্দেশ্য বুঝা যায়। বুঝা যায় যে, মানবের মনুষ্যত্ব প্রকাশক বৃত্তি কয়টীর মর্ম্ম কথা বুঝা, তাহাদের অনুশীলন শিক্ষাই গীতার উদ্দেশ্য। বুঝা যায় যে, সেই শিক্ষা দীক্ষা দিয়া মানবের মলিনত্ব পশুত্ব দূরীকরণ—মানবকে দেবত্বের দিকে পরিচালন—গীতার চরম উদ্দেশ্য। আর বুঝা যায়, এক মহা মর্ম্ম-কথা এই যে, জগতের মধ্যে কেবল এক গীতার মধ্যেই মানবতত্ত্বের মানব ধর্ম্মের মানব কর্ম্মের আদি মধ্য অন্ত সকল সূক্ষ্ম কাণ্ডই তন্ন তন্নরূপে ব্যাখ্যাত বিবৃত বিশ্লেষিত। মানবের ত্রিতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিলে, এ সিদ্ধান্তের সারবত্তা সহজে বুঝা যায়।

আজি কালি অনুশীলন (Culture) বলিয়া শিক্ষিত সমাজে একটা শুভ সংবাদ সঞ্চারিত হইয়াছে। মানবের যে সকল উচ্চ বৃত্তি আছে—মানবমন যে সমুদয় সমুন্নত শক্তিতে বিভূষিত—তাহাদের যথোপযুক্ত সংপুষ্টি সংবর্দ্ধন, অনুশীলনবাদের উদ্দেশ্য। এই শুভ সংবাদ, বহু যুগ পূর্ব্বে গীতাকার, কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এখন একটু বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে বহু বর্ষ পূর্ব্বে গীতায় যাহা প্রচারিত হইয়াছে, এখনকার দর্শন বিজ্ঞান তাহারই আভাষ ঈঙ্গিৎ ধরিয়া, মানবকে উন্নতির পথে উঠাইতে চেষ্টা করিতেছে। আধুনিক দর্শন বলে যে, মানব মনের প্রধান তিন ভাব—বেদনা (Feeling) বাসনা (Willing) ও জ্ঞান (Knowing)। এই তিন ভাবের সংযত সামঞ্জস্য অনুশীলন দ্বারা, মানবের মানবত্ব অভিব্যক্ত ও সংপুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই ভাবত্রয়ের সারভূত সূক্ষ্ম সূত্র কি—কোন উপাদান অবলম্বন করিয়া অনুশীলন অনুষ্ঠান করিতে হয়—সে সম্বন্ধে আধুনিক দর্শন বিশেষ কথা কিছু বলিতে পারে না, সত্য সিদ্ধান্ত কিছু বুঝাইতে পারে না। গীতা

যে বিশেষ কথা বলিয়াছেন—যে সত্যসিদ্ধান্ত বুঝাইয়াছেন (গীতা বুঝাইয়াছেন যে মানবের সার উপাদান আত্মা) আত্মার সার উপাদান—বেদনা বাসনা জ্ঞান। বেদনার সারতত্ত্ব প্রেম ভক্তি—বাসনার সারতত্ত্ব কর্ম্ম—আর জ্ঞানের সারতত্ত্ব অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। এই তিন তত্ত্ব—এই তিন উপাদান অবলম্বন করিয়া মূল মানবত্বের অনুশীলন করিতে হয়। গীতা তাই মানবের উন্নতি উদ্ধার-কল্পে ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই তিন তত্ত্বের মর্ম্ম কথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন—তাহাদের সার সূক্ষ্ম সন্ধান তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়াছেন। এই তিন তত্ত্বের যোগসাধনই প্রকৃত অনুশীলন—সেই অনুশীলনেই মানবের মহত্ত্ব মানবত্ব পূর্ণ প্রকারে পরিণত ও প্রকটিত। মানবের মহাধর্ম্ম এই তিন তত্ত্বে সংস্থিত। সেই মহা ধর্ম্মের সাধনায় এই ত্রিতত্ত্বের অনুশীলন অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ ঘটিয়া থাকে। ইহাই গীতার প্রচারিত মহাধর্ম্ম—এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যানই গীতার মূল মর্ম্ম। এই মহা ধর্ম্মের সাধনে এই মূল মর্ম্মের বিজ্ঞানে মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি পরিণতি অভিব্যক্তি।

শ্রীরাখালদাস ভট্টাচার্য্য।

কুরুক্ষেত্র।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

“প্রকরণ রত্নাকর” নামক সুপ্রাচীন জৈণ শাস্ত্রে কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত আছে “কুরুনাই চুলাসী সহসা। ছ হ চ চ অ ব ণ তরনাই উ। পাই বেগাইম। দো দো মহানি উ। ছন্নু দাস সহসা উ পট্টয়ম্।” জৈণ শাস্ত্র কুরুক্ষেত্রকে “পতিত পাবন” লিখিয়া গিয়াছেন। (লঘুক্ষেত্র খণ্ড, চতুর্থ অংশ দেখুন।) তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কুরুক্ষেত্রের মহিমা বর্ণিত আছে; আচার্য্য মূর কুরুক্ষেত্রকে হিন্দুর মহাগৌরবের স্থল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। (Muir's Sanskrit Texts, Part IV. PP. 109—111) আচার্য্য য়োয়েবর বলেন, এই মহাক্ষেত্র অতি পুরাতন ও পবিত্র। জেনেরল কনিংহাম সাহেবের মতে, চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ংসা এই ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং মহাভারতের স্থানে স্থানে কুরুক্ষেত্র “সামন্ত পঞ্চক” নামেও অভিহিত হইয়াছে। সাহেব বলেন—

General Cunningham, in his *Archæological Survey Report*, Vol. II. PP. 212-223, mentions the land of Kooroo in the following strain “All the country immediately around Thaneshwar, between Saraswatee and Drisadwatee rivers, is known by the name of Koorooksetra, that is the land or field of Kooroo. * * * The district (Chakra) of Koorooksetra is also called *Dharmaksetra* or the Holy Land, which is evidently the original of Hewen Thsang's *le champ du bonheur* and “Samantapanchak” of Mahabharata.

সাহেবের মতে দৃশদ্বতী ও সরস্বতী এই দুইটি নদী প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের দুই দিকের সীমা। মোগল কুলতিলক আকবর সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী আবল্ ফজল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “আইন আকবরী” গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের পরিমাণ ৪৮ ক্রোশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যাহা হউক, কুরুরাজার যজ্ঞক্ষেত্র “কুরুক্ষেত্র” নামক মহাতীর্থ বাস্তবিক ঐতিহাসিক লীলার ও আধ্যাত্মিক লীলার অন্যতম প্রধান স্থান। সুবিখ্যাত পৃথিরাজ কুরুক্ষেত্রে ভবলীলা সম্বরণ করেন এবং সম্রাট বাবর পাঠানদিগকে পরাজয় করিয়া এই স্থানেই মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন। এই কুরুক্ষেত্রে সম্রাট আকবর তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়ক্রমে হিমুকে এক প্রবল যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং ১৬৯৩ শকে এই স্থানেই হিন্দু স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বশেষ সমর সংঘটিত হইয়াছিল। বেদব্যাস, পরশুরাম, গয়াসুর, ভীম, ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এস্থলে বহুদিবস ব্যাপিয়া বাস করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমসাময়িক হ্রদ এখনও বদরী বৃক্ষাবলী পরিবেষ্টিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য্য গ্রহণ কালে কুরুক্ষেত্র দর্শনের ফল সম্বন্ধে রাশি রাশি শ্লোক সংস্কৃত সাহিত্যে পাঠ করা যায়। ফলতঃ এই ক্ষেত্রকে হিন্দুজাতি এতই পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন যে, প্রতিমাসে ভারতের নানা স্থান হইতে দলে দলে বহুসংখ্যক নরনারী এখানে আগমন করিয়া থাকে এবং নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াও মনে মনে যথেষ্ট শান্তি ও প্রফুল্লতা উপভোগ করে।

ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে দেখিতে পাই, ১৭৬১ অব্দে কাবুলের নরপতি আমেদসা বহুসংখ্যক আফগান সেনা লইয়া কুরুক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র বীরদিগকে অক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রদিগের দুই শত কামান এবং ৫ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইবে ইহা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই বিধিবদ্ধ ছিল বলিয়া, আফগানসেনার হাতে মহারাষ্ট্রীয়গণ অল্প সময় মধ্যে নিহত হইয়াছিল; বোধ হয় একশত লোকের অধিক মহারাষ্ট্রীয় প্রাণ লইয়া পলাইতে পারে নাই। হিন্দুর উপরে মুসলমান আফগানেরা যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

পঞ্জাবের ইতিহাসে লিখিত আছে, আফগানেরা যখন স্বদেশ হইতে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইয়াছিল, তখন তাহাদের মাতা, মাসী, স্ত্রী, ভগ্নী, পিতা, খুল্লতাত প্রভৃতি কহিয়া দিয়াছিল "তোমরা যত কাফের বধ করিবে তত সংখ্যক পুত্রের তোমরা পিতা হইবে। তোমরা তোমাদের নিজের স্বর্গকামনার জন্য কাফের বধ করিও এবং আমাদের কল্যাণের জন্যও অন্ততঃ আমাদের প্রত্যেকের নামে এক একশত কাফেরকে কতল্ (বধ) করিতে ভুলিও না।"

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যবনেরা যে অধার্ম্মিক ও রাক্ষস জনোচিত ব্যবহার করিয়াছিল তাহার তুলনায় আজিকালিকার অন্যায় যুদ্ধ বা অধর্ম্ম যুদ্ধ নগণ্য মাত্র। মুসলমানেরা কুরুক্ষেত্র নগরকে বহুবার ধ্বংস করিয়াছে; অসংখ্য রমণীকে অকারণে বিধবা এবং পুত্রহীনা করিয়াছে, এবং হিন্দু পুরুষের ধর্ম্ম, স্ত্রীলোকের সতীত্ব, মন্দিরের মর্য্যাদা, নগরের ভস্মাবশেষ এ সকলের দিকে অণুমাত্রও ভাবিয়া দেখে নাই। যুদ্ধাবশেষে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি পেশোয়া বাহাদুরের একমাত্র পুত্র জীবিত ছিল, মুসলমানেরা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ঐ মস্তকে প্রচুর লবণ মাখিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ কাবুলে লইয়া গিয়াছিল। সম্রাট আলেকজান্দর (সেকেন্দর বাদসাহ) এবং তৈমুর লঙ্গ কুরুক্ষেত্রের মাঠ দিয়া ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী কর্ণালের প্রান্তরে ইন্দোরের (হোলকার) মহারাজা ইংরাজের সঙ্গে সর্ব্ব প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অদূরস্থিত পানিপথ নগরে এক জন আয়র্লণ্ডবাসী দস্যু কিছুকাল এমন দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, কয়েক বৎসরের জন্য এই আইরীশ ডাকাত এখানে রাজা বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল।

Paniput was also remarkable as having been quite recently the capital of an Irish Raja, the famous George Thomas (*vide* Charles Macfarlane's History of British India, 1862 Page 320,) an adventurer from Tipperary and a deserter from English fleet, who had made himself master and sovereign of the whole of the Hurriannah, or "the green country," a beautiful district, extending to the verge of the sandy desert of Ajmere. (*Vide* B. T. Fraser's Life of *Lietenant Colonel Skinner* and Captain W. Franclin's [Calcutta, 1803] *Military Memoirs of Mr. George Thomas* and Bishop Heber's 'Indian Journal')

সুপ্রসিদ্ধ লর্ড লেক্ সাহেব কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"On my left, there now appeared Sandhills in endless succession, like the waves of the ocean, desolate and dreary to an immense extense; while to the front and right of these wastes, the eye was deceived by all the illusions of the mirage. Major Thorn, the historian who accompanied us and who himself suffered what he described, says that 'these optical deceptions exhibited to us the representations of specious lakes and rivers, with trees and other subjects, in such a lively manner as almost to cheat the sense of persons familiarly acquainted with the phenomenon; while they who were oppressed by excessive heat and parched with thirst cheered themselves with the hope of being soon refreshed with water from the friendly tank or cooling stream, of which they thought they had so clear a prospect. Often were we thus agitated between expectancy and disappointment, flattering our imaginations with a speedy indulgence; when, just as the delightful vision appeared on the point of being realised, like the cup of Tantalus, the whole vanished, and left us

nothing to rest upon but ærid plains of glitttering and burning sands.

বিখ্যাত লেখক থরনূটন্ সাহেবের মতে, বর্ত্তমান থানেশ্বর গ্রাম, সমগ্র কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল। তিনি বলেন শান্তনুর পিতা কুরু মহারাজা থানেশ্বরে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই ক্ষেত্রে তিনি মহাযজ্ঞের সমাধা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা কুরুক্ষেত্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাহেবের মতে সমগ্র কুরুক্ষেত্রে ৩৬০টি তীর্থ ভূমি আছে। Imperial Gazetteer of India, Vol. V) থানেশ্বরের মাঠে এখনও দশ লক্ষ লোক দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে এবং ফিলোরের মাঠে সাত লক্ষ তীর্থযাত্রী অনায়াসে উপবেশন করিতে সমর্থ হয়। সমুদয় কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রশান্ত প্রান্তরে পঞ্চাশ লক্ষ লোক দণ্ডায়মান, উপবেশন, শয়ন ও পাকক্রিয়া করিতে পারে।

কুরুক্ষেত্রের সুবিশাল প্রান্তরে আর একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য আছে, এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই; বোধ হয় পৃথিবীর কোনও স্থানে কেহ কখনও এপ্রকার অদ্ভুত দৃশ্য দেখে নাই। কুরুক্ষেত্র গ্রাম হইতে প্রায় একাদশ ক্রোশ দূরে এক প্রাচীন ও প্রশস্ত হ্রদ আছে, ইহার নাম "মীনা তলাও" ইংরাজিতে ইহাকে ফিস্ লেক্ বলা হইয়া থাকে। এই ফিস্ লেকে (Fish Lake) মৎস্য থাকে না এবং বাস্তবিক ইহাতে মৎস্য নাই, ইহার জলে মাছ ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সেই মৎস্য মরিয়া যায়। ইংরাজেরা চল্লিশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অদ্য পর্য্যন্ত কেহ ইহাতে মৎস্য দেখে নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রতি-বৎসর একদিন মাত্র একটি বৃহদাকার মৎস্যকে এই হ্রদের জলের উপরে ভাসিতে অথবা খেলা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে দিন মীন রাশি সম্পূর্ণভাবে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে সেই দিনকে পঞ্জাব প্রদেশে "মীনরোজ" বলা হইয়া থাকে। বৎসরের কোন্ দিনে মীনরাশি সূর্য্যে প্রবেশ করিবেন, পণ্ডিতগণ তিন মাস পূর্ব্ব হইতে তাহা গণনা করিয়া দেন কখনও বা তিন বৎসরের গণনা একত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ দিন দলে দলে অসংখ্যাসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা স্থান হইতে পুষ্প, চন্দন, মিষ্টান্ন, দধি, দুগ্ধ, নারিকেল, বেল, শর্করা প্রভৃতি উপাদান লইয়া ঐ পুকুরের ঘাটে উপস্থিত হয় এবং মৎস্য দর্শন করিবা মাত্র তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করে। ইহাকে "মচ্ছি-পূজা" (Fish worship) কহে। মহাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ দিন নিশ্চয়ই ঐ পুকুরে একটা বড় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য দিনে কোনও মৎস্যই দেখা যায় না। এরূপ হ্রদ ও এরূপ মাছের পূজা অতীব কৌতুককর বটে। মৎস্য ও মৎস্যধারী ধীবর, পৃথিবীর ইতিহাসে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে নানা কারণে প্রসিদ্ধ। ধীবর বা জেলে এই নাম, এক্ষণে এদেশে অধমত্ব ব্যঞ্জক শব্দ বলিয়া পরিগণিত হয়, কৃষিকার্য্যকারী হালিক কৈবর্ত্ত এই জন্য মৎস্যধারী জালিক কৈবর্ত্তকে (জেলেকে) অনার্য্য, শূদ্র, অধম প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে দেখা যায় "মৎস্যধারী অপেক্ষা মৎস্য-বিক্রেতা শতগুণ অধিক অপরাধী, এবং মৎস্যখাদক এতদুভয়াপেক্ষা সহস্র গুণে আরও পাপী।" যাহা হউক, মৎস্যের পূজা নূতন নহে। পৃথিবীর অনেক দেশে মীন পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এরূপ ভাবের হ্রদ, এরূপ ভাবের জল এবং এরূপ অদ্ভুত মৎস্য আর কোনও দেশে নাই, ইহা নিশ্চয়।

যে সকল কারণে কুরুক্ষেত্র হিন্দুর নিকটে পবিত্র তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণটিকে অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, কুরুক্ষেত্রেই প্রাচীন আর্য্যের সর্ব্বপ্রথম আগমন এবং এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। গীতাতত্ত্বের উন্মেষণে সেই ধর্ম্মের পূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়াছে সুতরাং হিন্দুর সম্মুখে কুরুক্ষেত্রের প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা, তৃণ, পর্য্যন্ত আদরের জিনিষ। কুরুক্ষেত্রের মাঠে প্রাচীন হিন্দুপুরুষগণ যে গভীর গবেষণা, অধ্যাত্ম জ্ঞান, মানসিক উর্ব্বরতা, শারীরিক তেজ, শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে পঞ্জাব প্রদেশে তাহার অণুমাত্রও আছে কিনা সন্দেহ।

সেই শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, গেল ক্রমে ক্রমে।
আর্য্যের সন্তান দেখ, অগৌরবে ভ্রমে॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

REPAIRED DOCUMENT.

৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।*

সিন্ধুবাহিনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থিত কলিকাতা মহানগরীর অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ বরাহনগরে ১২৪৬ সালের ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার (ইংরাজি ৮ই মে, ১৮৩৯ অব্দ) ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন।

শম্ভুচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস শান্তিপুর। কোন্ সময়ে যে তাঁহারা শান্তিপুর আসিয়া বসতি করেন তাহা জানিবার উপায় নাই। শম্ভুচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বংশে সরস্বতীর কৃপা বহুল পরিমাণেই ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাগ্‌দেবীর পাদ-পদ্মে ভক্তি-ভরে পুষ্পাঞ্জলি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগকে কখনও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। কায়মনোবাক্যে সরস্বতীর পূজা করাই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রধান কর্ম্ম ছিল। অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া কখনই তাঁহারা বিদ্যাদেবীর পূজা করিতে বিরত হয়েন নাই। যে জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য শম্ভুচন্দ্র আজীবন অবিকৃতচিত্তে যত্নবান ছিলেন তাহা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিলে অত্যুক্তি হয় না।

আদিশুর কর্ত্তৃক আহূত ভট্টনারায়ণ প্রমুখ যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ কাণ্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালা দেশে যজ্ঞ সম্পাদানার্থ আগমন করিয়াছিলেন শ্রীহর্ষ তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। এই ভরদ্বাজ গোত্রাপত্য শ্রীহর্ষ নৈষধ কাব্যের রচয়িতা কিনা তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে এক জন অসাধারণ পণ্ডিত এবং বিদ্যানুরাগী ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিতে কেহই সাহসী হইবেন না। এই শ্রীহর্ষ রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপুরুষ। আদিপুরুষ হইতে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ গোপীনাথ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালার এক জন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। পুত্রকলত্রাদি বহু পরিবারের ভরণ পোষণাদির ব্যয়ভার বহন করিয়াও তিনি শান্তিপুরে একটি চতুষ্পাঠী * স্থাপন করেন এবং বহুসংখ্যক অবৈতনিক ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতেন। প্রায় ষোল বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া তিনি এক ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্রদিগের জন্য স্বতন্ত্র টোল বা চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়। কৃতবিদ্য আত্মীয়েরা এই বৃহৎ ভদ্রাসনে ২৪ টি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বিদ্যাদান করিতেন। এই ক্ষুদ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ন্যায় দর্শন স্মৃতি কাব্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইত এবং ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হইত। প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক ছাত্র বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে বিদ্যার্থী হইয়া শান্তিপুরে আগমন করিতেন এবং গুরুসেবার বিনিময়ে অমূল্য জ্ঞানলাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই সকল ছাত্রের ভরণপোষণাদির ব্যয় ভার সার্ব্বভৌমকেই বহন করিতে হইত।

যে স্থান হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার জন্য সার্ব্বভৌম উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন। বারানস্যাদি তীর্থস্থান দেখিয়া তিনি পরিশেষে কাণ্যকুব্জ ধামে উপস্থিত হন। তখন ভারত মুসলমান সম্রাটদিগের করতলগত। পারসী এবং উর্দ্দু তখনকার রাজভাষা। এই দুই ভাষা আয়ত্ত করিতে না পারিলে স্বকার্য্য সিদ্ধির পথে অনেক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় তিনি ঐ ভাষা আয়ত্তীকৃত করিবার জন্য কাণ্যকুব্জে এক মৌলবির শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অল্প সময় মধ্যে তাঁহার পারসী এবং উর্দ্দু ভাষায় অধিকার জন্মিয়াছিল। রাজভাষায় স্বেচ্ছানুরূপ কথোপকথন করিবার সামর্থ্য জন্মাইলে তিনি কাণ্যকুব্জ পরিত্যাগ করতঃ মুসলমান রাজধানী দিল্লীনগরে গমন করেন। স্বকীয় বিদ্যার প্রভাবে ও নৈসর্গিক গুণগ্রামে এবং উর্দ্দুতে কথোপকথনের ক্ষমতাহেতু তিনি অনতি-বিলম্বে দিল্লীসম্রাটের এবং অমাত্য ও প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের মুখে উর্দ্দু ভাষা শুনিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হন এবং সার্ব্বভৌম সম্রাট সমীপে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে সম্রাট সমীপে লইয়া যান।

* এই প্রবন্ধে যে সকল পত্রাদি সন্নিবেশিত করিয়াছি তাহা পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় আরও অনেক অপ্রকাশিত পত্রাদি প্রকাশিত হইবে।

* এই চতুষ্পাঠীর দৃশ্য অদ্যাপি শান্তিপুরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শান্তিপুরের লোকেরা এখন ইহাকে সার্ব্বভৌমের চাঁদ্‌নী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

মুসলমান সম্রাটগণ, সকলে না হউন অনেকেই, সংস্কৃত অভিজ্ঞ পুরুষগণকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং আপনা-দিগের দরবারে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের সহিত কথোপ-কথন করিতেন। রাজ্যশাসন কিরূপ হইতেছে, রাজ-কর্ম্মচারীরা প্রজাবর্গের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাদি করিতেন। সার্ব্বভৌম একে পণ্ডিত, তাহাতে পারসী এবং উর্দ্দু ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান আছে শুনিয়া সম্রাট অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন এবং তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে রাজ্যসংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সার্ব্বভৌম এতই সুন্দররূপে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন যে, সম্রাট তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ অনেক আয়মা জমি এবং চৌবারী এবং পাটাইগাছি নামক দুইখানি গ্রাম নিষ্কর পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে উপভোগ করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন। পাটাইগাছি এখন বর্দ্ধমান কালেক্টরির অধীন। ইহায় কালেক্টরিনম্বর ১২৯৬ এবং বার্ষিক খাজানা ১১২॥/১৫। এই গ্রাম প্রায় ২৭৪ বিঘা ভূমিতে পরিব্যাপ্ত। ইহাব্যতীত শান্তিপুরের অধীন বৈঁচা নামক গ্রাম তিনি নিষ্করে ভোগ করেন।

দিল্লী হইতে প্রাত্যাগমনের অল্পদিন মধ্যেই সার্ব্বভৌম মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার চারিপুত্র, মহাদেব তর্কপঞ্চানন, রামভদ্র সিদ্ধান্ত, গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়-বাগীশ, শিবরাম সিদ্ধবাচস্পতি। পৈতৃক বিষয়বিভাগের সময় জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম চৌবারী এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পাটাইগাছি গ্রাম প্রাপ্ত হন। পিতার ন্যায় যশস্বী না হইলেও সার্ব্বভৌমের পুত্রগণ পিতার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। মহাদেব তর্কপঞ্চাননের পঞ্চপুত্র,—রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার, রামরাম, জয়দেব এবং মনোহর। রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের পঞ্চপুত্র,—হরিনাথ, কৃষ্ণদাস, রামকিশোর, ব্রজকিশোর এবং আনন্দরাম তর্কালঙ্কার। কনিষ্ঠ আনন্দরাম তর্কালাঙ্কার চাঁদপুরে বিবাহ করেন এবং শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া চাঁদপুরে বাস করেন। তীর্থস্থান পর্য্যটন করিবার জন্য সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। প্রায় ১২ বৎসর অতীত হইলে তাঁহার চারিপুত্র—রামলোচন, নবকুমার, রামচন্দ্র এবং ভবানিশঙ্কর কুশে পিতৃদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ করেন। শম্ভুচন্দ্রের পিতামহ নবকুমার মুখোপাধ্যায় ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্তির সময় জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে পারস্য ভাষা এবং আইন শিক্ষা করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে অনেক ভূম্যধিকারী ক্ষতিগ্রস্থ হন। সেই সময় নবকুমার শান্তিপুর হইতে পৈতৃক সম্পতি রক্ষার জন্য কলিকাতায় আসেন। অধিক কাল কলিকাতায় বাস করায় তিনি গঙ্গার পরপারস্থিত শিবপুরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। নবকুমারের শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার পিত্রালয় বরাহনগরে অনেক সময় বাস করিতেন, সেই হেতু নবকুমারকেও বরাহনগরে পত্নী সহিত থাকিতে হয়। নবকুমারের মামাশ্বশুর বরাহনগরে ডাচ কোম্পানির অধীনে এক বড় চাকরী করিতেন। তাঁহার সাহায্যে নবকুমার তখনকার কলিকাতার পুলিস আদালতের ধনাধ্যক্ষের পদ পান। এবং পরে সুপ্রিমকোর্টের দেওয়ান রামজয় মুখোপাধ্যায়ের খাজাঞ্চি হন। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে যখন বরাহনগর ডাচ্ কোম্পানির নিকট হইতে ইংলিশ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্রয় করেন তখন নবকুমার বরাহনগরবাসীদিগের জন্য বহুল পরিশ্রম করিয়া প্রজাস্বত্বের অনেক সুবিধা করেন। এই বৎসরের শেষে নবকুমার ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নবকুমারের দুই সংসার, প্রথম পত্নীর গর্ভে গেবিন্দচন্দ্র এবং শেষ পত্নীর গর্ভে মথুরানাথ নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শম্ভূচন্দ্রের পিতা মথুরা নাথ * অতি শৈশবে পিতৃহীন হন। বিধবা মাতার যত্নে মথুরানাথ সামান্য বিদ্যালাভ করেন। মথুরানাথ হুগলি জেলার অন্তর্গত তারাআঁটপুর নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহার গর্ভের একমাত্র সন্তান শম্ভুচন্দ্র। মথুরানাথের শ্বশুর চিৎপুরে বিলাতি পণ্য দ্রব্যের ব্যবসা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাহা দেখিয়া তিনিও এইরূপ কার্য্য করতঃ স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতে মনস্থ করেন। রাধাবাজারে † মথুরা

* সাধারণে তাঁহাকে মথুরমোহন বলিয়া ডাকিত।
† ৬২ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীটে এই দোকান অবস্থিত ছিল।

নাথ শশুরের ন্যায় এক দোকান স্থাপিত করেন। পৈতৃক সম্পত্তির আয় ভিন্ন মথুরানাথ এই কারবার হইতে বিলক্ষণ লাভ পাইতেন, বরাহনগরে তাঁহাকে ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া লোকে জানিত।

নিজে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারায় মথুরানাথের মনে বিশেষ একটি আক্ষেপের কারণ ছিল। সেই কারণ পুত্র শম্ভুচন্দ্রের জন্মগ্রহণের সময় হইতে তাঁহাকে বিশেষরূপে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে বলবতী হয়। কয়েক খানি বাঙ্গালা পুস্তকের পাঠ সমাধা করিলে মথুরানাথ পুত্রকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এবং অমরকোষ অভিধান পড়ান। এবং তাঁহার বাটির নিকটস্থ এক পণ্ডিতকে* পুত্রের ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন। খৃঃ ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ পর্য্যন্ত শম্ভুচন্দ্র সংস্কৃত শিক্ষা করেন। খৃঃ ১৮৪৮ অব্দের প্রারম্ভে একদিন তিনি খেলা করিতে বরাহনগরস্থ ফ্রিচার্চ্চ মিসন বিদ্যালয়ে গমন করেন। বাল্যকালে শম্ভুচন্দ্র খেলায় অত্যন্ত পটু ছিলেন। তাঁহার খেলার সাথীরা তাঁহাকে মিসন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে অনুরোধ করিলে পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে তিনি বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কিয়ৎ কাল পরে শম্ভুচন্দ্রের মাতা এবিষয় জানিতে পারেন, কিন্তু বিরক্ত না হইয়া বরং যাহাতে শম্ভুচন্দ্র ওই বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষা করিতে তাঁহার পিতার নিকট কোন প্রকার বাধা না পান তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিতা হন। পুত্রকে ম্লেচ্ছভাষায় সুপণ্ডিত করিবার ইচ্ছা মথুরানাথের আদৌ ছিল না, কিন্তু যখন দেখিলেন যে ঘটনাচক্র তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবার পথে প্রতিবন্ধক তখন তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত একমত হইয়া শম্ভুচন্দ্রকে ইংরাজি ভাষা শিখিতে আদেশ করেন। কয়েক মাস মিসন বিদ্যালয়ে শম্ভুচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষা করেন। ১৮৪৮ খৃঃঅব্দের নভেম্বর মাসে মিসন বিদ্যালয়ের চারিটি ব্রাহ্মণ ছাত্র খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অন্যান্য সকল বালক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে এবং বিদ্যালয়টি ছাত্রাভাবে বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই কয়েক দিনের জন্য শম্ভুচন্দ্রকে বাটিতে বসিয়া ইংরাজি শিক্ষা করিতে হয়। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ৺ গৌরদাস বসাক শম্ভুচন্দ্রের বাটির নিকটে একটি ইংরাজি শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে শম্ভুচন্দ্র এক বৎসর বিদ্যালাভ করেন। তৎপর গরাণহাটাস্থিত ৺গৌরমোহন আঢ্যের* প্রতিষ্ঠিত ওরিয়ান্টাল সেমিনারিতে ১৮৫০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভ হইতে বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। প্রতিদিবস মথুরানাথ পুত্রকে বিদ্যালয়ে রাখিয়া রাধাবাজারে তাঁহার ব্যবসাস্থলে যাইতেন। এই বিদ্যালয়ে শম্ভুচন্দ্র ৺ কৃষ্ণদাস পালের সমপাঠি ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে পর পিতার না আসা পর্য্যন্ত কখন কখন শম্ভুচন্দ্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে বসিয়া পুস্তক পড়িতেন, কখন বা অন্যান্য বালকের সহিত সাহিত্য বিষয়ক চর্চ্চা লইয়া নিযুক্ত থাকিতেন। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর বালকেরা একটি ডিবেটিং ক্লাব স্থাপনা করিয়া তথায় সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতাদি করিত;শম্ভুচন্দ্র সময়ে সময়ে উক্ত সভায় যাইয়া বক্তৃতাদি শ্রবণ করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর বালক বলিয়া শম্ভুচন্দ্র উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগের সহিত সহজে মিশিতে পারিতেন না, কিন্তু ইহাতে তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিরূপে উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগের ন্যায় সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং তর্কবিতর্ক করিতে পারিবেন সেই জন্য শম্ভুচন্দ্র সদাসর্ব্বদা চেষ্টান্বিত থাকিতেন। উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগের কথাবার্ত্তা সমুদয় তিনি অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। গোপনে উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগের ন্যায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহার শিক্ষকের নিকট দেখাইয়া লইতেন।

ওরিয়ান্টাল সেমিনারিতে শম্ভুচন্দ্র দুই বৎসর মাত্র বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে যখন হিন্দু

---

* বাল্যকালে শম্ভুচন্দ্র অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তজ্জন্য গুরু মহাশয়ের নিকট মধ্যে মধ্যে ভৎর্সিত এবং প্রহারিত হইতেন। এক দিন গুরু মহাশয়ের কলিকার ভিতর তিনি মরিচের বীচি ক্ষেপণ করেন। বৃদ্ধ তামাক খাইয়া অত্যন্ত কাসিতে থাকে এবং শেষে দম আটকাইয়া পঞ্চত্ব পাইবার উপক্রম হয়। শম্ভুচন্দ্র এইরূপ করিয়াছেন জানিয়া গুরুমহাশয় তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য এক দিন পিপীলিকাপূর্ণ জালার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

* ১৮৪২ খৃঃ গৌরমোহন আঢ্য গঙ্গায় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

মেট্রপলিটন কলেজ কলিকাতায় স্থাপিত হয় তখন শম্ভুচন্দ্র এইখানে আসিয়া ভর্ত্তি হন।

হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজ আমাদের দেশীয়দিগের অর্থে এবং উদ্যমে উচ্চশিক্ষা বিতরণ করিবার জন্য প্রথম স্থাপিত হয়। ইতিপূর্ব্বে হিন্দুকলেজেই দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পুত্রগণের শিক্ষা হইত কিন্তু ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে এক অভিনব ঘটনা হেতু হিন্দুকলেজের সহিত দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে সম্বন্ধ রহিত হইবার উপক্রম হয়। উক্ত বৎসরের প্রারম্ভে হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কলিকাতার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বারনারী হীরাবাই এর এক জারজ সন্তানকে হিন্দুকলেজের ছাত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইহাতে কলিকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বিশেষ চটিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে উক্ত বালককে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কলেজকর্ত্তৃপক্ষ এই অনুরোধ রক্ষা না করায় কলিকাতার তদানীন্তন ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এক সভা আহুত করিয়া এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া ভদ্রলোকদিগের পুত্রগণের যাহাতে বিদ্যালাভ হয় তজ্জন্য মনস্থ করেন। মতিলাল শীলের জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালাল শীল, আশু ঘোষ দেব (ছাতুবাবু), রাজেন্দ্রনাথ দত্ত,* রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল (ভুকৈলাস) বাবু হরিমোহন সেন, কৃষ্ণকিশোর মল্লিক, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় † প্রভৃতি এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ ৩রা মে সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সার জেমস্ কলভিলের সমক্ষে এই বিদ্যালয় বড়বাজার সিঁদুরেপটির বাবু কৃষ্ণকিশোর মল্লিকের বাটিতে ‡ প্রথম খোলা হয়। বাবু মতিলাল শীল ইতিপূর্ব্বে যে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহাও এই হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজের সহিত মিশ্রিত করা হয়। কলেজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—সিনিয়র ও জুনিয়র। সিনিয়র বিভাগের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। অধ্যক্ষ ব্যতীত কাপ্তেন হ্যারিস, উইলিয়ম মাস্‌টার্স এবং উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক নামক তিন জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিনিয়র বিভাগের ছাত্রদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি অনেক ছাত্র এখানে আসিয়া ভর্ত্তি হন। শম্ভুচন্দ্র এবং কৃষ্ণদাস পাল সিনিয়র বিভাগের ছাত্র ছিলেন। শম্ভুচন্দ্রের জ্ঞানতৃষ্ণা এখানে আসিয়া আরও বর্দ্ধিত হয়। কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেবের ন্যায় পণ্ডিত আমাদের দেশে কখনও পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া শম্ভুচন্দ্র পরম প্রীতি লাভ করিলেন। কাপ্তেন সাহেবও শম্ভুচন্দ্রকে বিশেষ সাহিত্যানুরাগী দেখিয়া তাঁহার উপর স্নেহবান হন। শম্ভুচন্দ্র যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইতেন তাহা তিনি দেখিয়া অতি আগ্রহের সহিত পড়িয়া সাহিত্যবিষয়ে শম্ভুচন্দ্রকে উপদেশ দিতেন। শম্ভুচন্দ্রের অন্যতম শিক্ষক কাপ্তেন হ্যারিস—তিনি সে সময়ে মর্ণিং ক্রণিকেল নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনিও শম্ভুচন্দ্রকে সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে উৎসাহিত করেন। এমন কি শম্ভুচন্দ্রের প্রবন্ধাদি আপনার পত্রিকায় অতি সমাদরের সহিত প্রকাশ করিতেন।

হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজে পড়িবার সময় শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণদাস ব্যতিত এই বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজেন্দ্রনাথ দত্তের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ঘটনা।

বন্ধু সুরেশ চন্দ্রের অনুকম্পায় শম্ভুচন্দ্র এবং কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু ইনটেলিজেনসার নামক পত্রিকার সম্পাদক প্রসিদ্ধ ইংরাজি কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের সহিত পরিচিত

---

* সাহেবেরা ইহাকে রাজেন্দ্র দত্ত বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার উদারতায় এবং দয়াদাক্ষিণ্যে মোহিত হইয়া সাধারণে তাঁহাকে রাজাবাবু বলিয়া ডাকিত। রাজেন্দ্র দত্ত খৃঃ ১৮১৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন তারিখে স্বর্গলাভ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ অক্রূর দত্তের প্রপৌত্র ইঁহার পিতার নাম পার্ব্বতীচরণ দত্ত। ইঁহার জীবনচরিত শম্ভুচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া ১৮৮৯ সালের ৮ই জুন তারিখের রেইস এণ্ড রাইয়টে প্রকাশিত হয়।

† বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিচারপতি ৺অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ।

‡ চিৎপুরের রাস্তা এখন যেখানে হ্যারিসন রোডের সহিত মিলিয়াছে তথায় এই বাটি অবস্থিত ছিল।

হন। পঠদ্দশায় শম্ভুচন্দ্র এবং কৃষ্ণদাস কাশীপ্রসাদ ঘোষের কাগজে প্রতিসপ্তাহে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এইসময়ে শম্ভুচন্দ্র এবং কৃষ্ণদাস গোপনে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাহার নাম ছিল কলিকাতা মান্থ্লি ম্যাগাজিন। শম্ভুচন্দ্র এবং কৃষ্ণদাস পালের শৈশবের বন্ধু প্রসাদ দাস দত্ত এই মাসিক পত্রিকার সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পত্রিকা স্থায়ী হয় নাই; কয়েক খণ্ড বাহির হইবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজের লীলা শেষ হয় এবং শম্ভুচন্দ্রের পঠদ্দশাও সেই সঙ্গে সমাপ্ত হয়। হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজে পড়িবার সময় শম্ভুচন্দ্র আরও তুইজন পণ্ডিতের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন। তদানীন্তন হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের রচনা নৈপুণ্যে বিমোহিত হইয়া তিনি হরিশ্চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানস কাশী-প্রসাদ ঘোষের নিকট ব্যক্ত করিলে, কাশী-প্রসাদ ঘোষ শম্ভুচন্দ্রকে এক পরিচায়ক পত্র দেন। এই পত্র লইয়া শম্ভুচন্দ্র প্রাতঃস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন।

অপর খ্যাতনামা পুরুষের নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইঁনি হিন্দু পেট্রিয়টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই তিন জনকে শম্ভুচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য গুরু বলিয়া মান্য করিতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শম্ভুচন্দ্র কলিকাতা জোড়াসাঁকো নিবাসী রাধানাথ বটব্যালের জ্যেষ্ঠাকন্যার সহিত পরিণীত হন।

হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজ বন্ধ হইলে শম্ভুচন্দ্রের পঠদ্দশা শেষ হয়। ইহার পর তিনি আইন শিক্ষার জন্য মেকার-টিচ্ নামক এটর্নির আপিসে আরটিকেল ক্লার্ক নিযুক্ত হন। ইহা তাঁহার পিতার ইচ্ছা, কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের ইহা মনঃপুত হয় নাই। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের শেষে মণিংক্রণিকেল নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক কাপ্তেন হারিস উক্ত কাগজের স্বত্বাধিকারী লভ সাহেবের সহিত ঝগড়া করিয়া পদত্যাগ করিলে, লভ সাহেব শম্ভুচন্দ্রকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিবস পরে উক্ত স্বত্বাধিকারী শম্ভুচন্দ্রের বাল-কোচিত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতে নিরস্ত হন। কাজে কাজেই শম্ভুচন্দ্রকে পুনরায় এটর্ণির আপিসে কার্য্য করিতে হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহি বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে দেশ মধ্যে ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং লর্ড ক্যানিং সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য এক আইন পাস করেন। বেঙ্গল হরকরার সম্পাদক ভৎর্সিত হন, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক হেন্‌রি মিডকে তাঁহার কার্য্যালয় হইতে সৈন্য সাহায্যে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং পারস্য ভাষায় রচিত তুরবিন নামক সংবাদ পত্রের মুসলমান সম্পাদক কারারুদ্ধ হইলেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ভয়ে তাঁহার হিন্দু ইনটেলিজেনসার নামক কাগজ বন্ধ করেন এবং মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয় করেন। এই সকল ঘটনা দেখিয়া শম্ভুচন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহের কারণ সকল নির্দ্দেশ করিয়া এক পুস্তক লেখেন এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতে ম্যালকলম লিউইন সাহে-বের নিকট প্রেরণ করেন। লিউইন সাহেব ইহার এক অবতরণিকা লিখিয়া বিলাতের ষ্টানফোর্ড কোম্পানির দ্বারা এই পুস্তক বাহির করেন।

এই বৎসরাবধি শম্ভুচন্দ্র কখন বা পিতার দোকানে কখন বা এটর্ণির আপিসে কখন বা কলিকাতা পবলিক লাইব্রেরিতে থাকিয়া সময় ক্ষেপণ করেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রশমিত হইলে এবং কোম্পানির শাসন শেষ হইলে, কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক সুবিধা ঘটে। এই বৎসর কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কার্য্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে, উক্ত সভার তদানীন্তন সহকারী সম্পাদক মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার এক জন সহকারীর প্রয়োজন বোধ করেন। সভায় হরিশ্চন্দ্রের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই বিষয় জানিতে পারিয়া শম্ভুচন্দ্রকে এই কার্য্যের প্রার্থী হইতে বলেন। শম্ভুচন্দ্র এবিষয় তাঁহার পিতাকে জানান। মথুরা নাথ পাকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত পরিচিত ছিলেন, এই কারণে তাঁহাদের সাহায্যে এই কার্য্য পুত্রকে দেওয়াইবেন এই রূপ মনস্থ করেন। শুভদিন দেখিয়া রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ভাবিয়া কয়েক দিন গত হয়! পরে রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হন যে, এই কার্য্যের সমস্ত ভার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত, তিনি যাহাকে

মনোনীত করিবেন, তিনিই এই কার্য্য পাইবেন। পিতা পুত্রকে এই সংবাদ যথাসময়ে জানান। ইতিপূর্ব্বে যে ঘটনা হেতু শম্ভুচন্দ্রকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয় তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিকট এই কার্য্যের সংবাদ পাইবার পর, শম্ভুচন্দ্র তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণদাস পালকে একদিন কথা প্রসঙ্গে এই কার্য্যের সংবাদ বলিয়া ফেলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস পাল শম্ভুচন্দ্রের নিকট প্রতিশ্রুত হন যে এই কার্য্য পাইবার জন্য তিনি চেষ্টা করিবেন না। কৃষ্ণদাস পাল কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। রাজা রমানাথ ঠাকুর এবং বাবু হরচন্দ্র ঘোষের সাহায্যে তিনি অতি সত্বরে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই কার্য্য প্রাপ্ত হন। যে দিন প্রাতঃকালে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণদাস পালকে সহকারী নিযুক্ত করেন, সেই দিবস ১০ ঘটিকার সময় শম্ভুচন্দ্র পিতার নিকট হইতে পাকপাড়া রাজাদিগের খবর পাইয়া, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলিটারি অডিটার জেনারেল আপিসে দেখা করেন। হরিশ্চন্দ্র কৃষ্ণদাসকে এই কার্য্যে, সেই দিবস প্রাতঃকালে নিযুক্ত করিয়াছেন জানান এবং এই কার্য্য শম্ভুচন্দ্রকে দিতে না পারায় অত্যন্ত তুঃখিত হন।

বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের অনতিবিলম্বে পুনরায় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ডাকাইয়া হিন্দূ পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই কার্য্য শম্ভুচন্দ্র অধিক দিন করিতে পারেন নাই। নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ তিনি স্বয়ং এই কর্ম্ম পরিত্যাগ-করেন। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভা যাহাতে সিভিল সারভিস্ পরীক্ষা এদেশে হয় তজ্জন্য তদানীন্তন সেক্রেটারি অব ষ্টেট সার চার্লস্ উড সাহেবের নিকট এক আবেদন পাঠান এবং এই আবেদন পত্র হিন্দুপেট্রিয়টে সম্পাদকের মন্তব্য সমেত ছাপা হয়। এই আবেদন পত্র হরিশ্চন্দ্রমুখোপাধ্যায়ের লেখা। হিন্দু পেট্রিয়টে এই আবেদন পত্র প্রকাশ হইলে শ্রীরামপুরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধি-কারী এবং সম্পাদক মেরিডিং টাউনসেণ্ড সাহেব তীব্র উপহাস পূর্ণ এক প্রবন্ধ তাঁহার কাগজে প্রকাশ করেন। টাউনসেণ্ড সাহেবের প্রবন্ধ পড়িয়া শম্ভুচন্দ্র বিশেষ চটিয়া যান এবং এক তীব্র প্রতিবাদ রচনা করেন।* প্রবন্ধ ছাপা হইবার পূর্ব্বে শম্ভুচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রকে তাহার এক প্রুফ প্রেরণ করেন। প্রুফ দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র তাহার কিয়দংশ অভদ্রজনোচিত ভাষায় লিখিত মনে করিয়া বাদ দেন। পুনরায় প্রুফ সংশোধনের সময় উক্ত পরিত্যক্ত অংশ বাদ না দিয়া যেরূপ লেখা হইয়াছে সেইরূপই বাহির করার জন্য শম্ভুচন্দ্র হরিশবাবুকে অনুরোধ করেন। শম্ভুচন্দ্র একে বালক ও অপরিণামদর্শী তাহাতে আবার হরিশবাবুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কাজে কাজেই হরিশ্চন্দ্র যখন দেখিলেন যে শম্ভুচন্দ্র একেবারে নাছোড়বান্দা তখন শম্ভুচন্দ্রকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য প্রবন্ধ যেরূপ লেখা হইয়াছিল সেইরূপ বাহির হইতে আজ্ঞা দেন। প্রবন্ধ বাহির হইবার পর দিবস শম্ভুচন্দ্র যেরূপ সময়ে প্রত্যহ আফিসে আসেন সেইরূপ আসেন। আসিয়া দেখিলেন টেবিলের উপর কয়েকখানি পত্র সম্পাদকের নামে আসিয়া রহিয়াছে। সম্পাদকের সমুদয় পত্রাদি শম্ভুচন্দ্রের দেখিবার ক্ষমতা ছিল। পত্রগুলি খুলিতে খুলিতে দেখেন যে তাহার মধ্যে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্সি কমিসনার ডবলিউ, জে, হারসেল সাহেবের একখানি চিঠি। এই চিঠিতে হারসেল সাহেব শম্ভুচন্দ্রের প্রবন্ধ বিষয়ে হরিশ্চ-ন্দ্রকে তীব্রভাবে লিখিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া শম্ভুচন্দ্র অত্যন্ত ভীত হন এবং হরিশ্চন্দ্রকে অনর্থক বিরক্তিভাজন করাইয়াছেন দেখিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হন। এই ক্ষোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আর কার্য্য করিবেন না স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ হিন্দুপেট্রিয়টের আফিস ত্যাগ করেন। কার্য্য পরিত্যাগ বিষয়ে হরিশ বাবুকে কোন কথা বলেন নাই। পরিশেষে হরিশ বাবু হারসেল সাহেবের চিঠি পড়িয়া সমস্ত বিষয় অবগত হন এবং শম্ভুচন্দ্রকে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু শম্ভুচন্দ্র লজ্জায় হরিশ্চন্দ্রের সহিত দেখা পর্য্যন্ত করেন নাই।

হিন্দুপেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদকতা পরিত্যাগের পর শম্ভুচন্দ্রের পরম হিতকারী বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার নিজের ব্যবসায়ে দত্ত লিনজী নামক কোম্পানীর

---

* এই প্রবন্ধে তিনি যীশুখৃষ্টকে জারজ সন্তান বলিয়া বর্ণনা করেন।

আপিসে তাঁহাকে একটি কাজে নিযুক্ত করেন। তখন দেশ মধ্যে ইন্‌কাম টেক্স লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। সিপাহি বিদ্রোহে ভারত ধনাগার শূন্য হয়। অর্থের অনটন দূরীকরণার্থে বিলাতের প্রসিদ্ধ অর্থনীতি বিশারদ জেমস উইলসন সাহেবকে ভারতে প্রেরণ করা হয়। উইলসন সাহেব তিনটি নূতন কর স্থাপন করিয়া অর্থানটন নিবারণ করিবার জন্য লাট ক্যানিংকে পরামর্শ দেন। তন্মধ্যে ইন্‌কমটেক্স বা আয় কর একটি। লাট রাজি হইলে লাট সভায় আইন পেশ হইল। এই আইনের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রবন্ধ লিখিয়া শম্ভুচন্দ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি লাট ক্যানিং এবং অর্থসচিব জেমস্ উইলসন সাহেবের উপর বিশেষ কটূক্তি বর্ষণ করিলেও ইহার রচনা-নৈপুণ্য এবং যুক্তিমার্গ সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকায় এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে জুনমাসে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বরাহনগরে যাইয়া শম্ভুচন্দ্রকে পুনরায় পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারায় শম্ভুচন্দ্র পুনরায় হিন্দু পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি "Mookerjee's Magazine" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার পরম বন্ধু গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার রাজমহল গমন বৃত্তান্ত ইহাতে প্রকাশ করেন। শম্ভুচন্দ্র শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণের এক জীবনচরিত ইহাতে প্রকাশ করেন। কিন্তু এই পত্রিকা স্থায়ী হয় নাই, পাঁচ সংখ্যা মাত্র বাহির হয়। শেষ সংখ্যায় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিতের প্রথম অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৬১ খৃঃ অব্দের জুন মাসে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যু সময়ে হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত ঋণজালে জড়িত ছিলেন এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণের কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। শম্ভুচন্দ্র এবং হরিশবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিন্দুপেট্রিয়টের কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার মানসে হরিশবাবুর বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করেন। বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রভৃতি সকলে একত্রিত হইয়া স্থির করেন যে, হিন্দুপেট্রিয়ট বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট ৫০০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া হরিশের সমস্ত ঋণ পরিশোধ এবং তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইবে। হিন্দুপেট্রিয়টের মুদ্রাযন্ত্র ভবানীপুর হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকোর বাটিতে আনয়ন করা হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পত্তি হইবার পরও শম্ভুচন্দ্র ইহার সম্পাদকতা করেন। পূর্ব্বে হিন্দুপেট্রিয়ট বৃহস্পতিবারে বাহির হইত, শম্ভুচন্দ্রের আমলে ইহা সোমবারে বাহির হইতে লাগিল। হিন্দুপেট্রিয়টের আকারও ৬ পাতা হইতে ৮ পাতায় বর্দ্ধিত হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহের বহুল অর্থের আনুকূল্যে হিন্দুপেট্রিয়টের অবস্থার ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু ইহাতে দেশের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি চটিলেন। শম্ভুচন্দ্র স্বভাবতঃ স্বাধীনচেতা পুরুষ, কাজেই তাঁহার কাগজে অনেক অপ্রিয় সত্য বাহির হইতে লাগিল। শম্ভুচন্দ্রের ন্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহও কাহারও ভ্রূক্ষেপে দৃষ্টিপাত করিতেন না। কাজে কাজেই দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহ শম্ভুচন্দ্রের পরম বন্ধু, কাজেই শম্ভুচন্দ্রকে তাঁহার দ্বারা হিন্দুপেটিয়টের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা অসম্ভব। অনেক রকম উপায় নিষ্ফল হইলে চক্রীদিগের মধ্যে দুই জন কালীপ্রসন্ন সিংহের মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সন্তানের অমিতব্যয়িতা শম্ভুচন্দ্রের উপর আরোপ করিয়া মিথ্যা অপবাদ ঘোষণা করিতে লাগিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের মাতা তাহাদের কথা মন্ত্রবৎ জ্ঞান করিলেন এবং শম্ভুচন্দ্র যাহাতে আর হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক না থাকিতে পারেন তাহার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। ষড়যন্ত্রের ফল ক্রমে ক্রমে ফলিতে লাগিল কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের আশ্বাস বাক্যে প্রথমে শম্ভুচন্দ্র ইহা উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে, ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ১৮ই নবেম্বর তারিখের হিন্দুপেট্রিয়টের সংখ্যা প্রকাশ করিয়া দিয়া শম্ভুচন্দ্র কালী প্রসন্ন সিংহকে কোন কথা না বলিয়া বরাহনগরে চলিয়া

যান। পরদিন এই কথা জানিতে পারিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ শম্ভুচন্দ্রকে পুনঃ আনয়ন করিবার জন্য বরাহনগরে গমন করেন এবং তথায় দুই দিন যাবৎ বাস করেন, কিন্তু শম্ভুচন্দ্র কিছুতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে রাজি হন নাই। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাসঙ্কটে পড়িলেন। পর সংখ্যা হিন্দুপেট্রিয়ট কিরূপে বাহির করিবেন ইহার জন্য অনন্যোপায় হইয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর তখন কালীপ্রসন্নের মহাভারত তরজমার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে * বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সংখ্যা হিন্দুপেট্রিয়ট লিখিতে বলেন। এই সংখ্যা প্রকাশিত হইলে ইংরাজি সংবাদ পত্রে হিন্দুপেট্রিয়ট বালকের দ্বারা লিখিত হইয়াছে বলিয়া তীব্র সমালোচনা বাহির হয়। লজ্জায় বিদ্যাসাগর এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ অধোবদন হইলেন। বিদ্যাসাগর তাহার পর সংখ্যা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে লিখিতে বলেন, কিন্তু তিন সংখ্যা বাহির হইবার পর কাগজের অবস্থা ক্রমেই হীন হইতে লাগিল। পঞ্চম সংখ্যা দ্বারিকা নাথ মিত্র † কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। কিন্তু ইহাও রীতিমত লেখা হয় না। পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃষ্ণদাস পালকে হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক নিযুক্ত করিবার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুমতি দেন।

হিন্দুপেট্রিয়টের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগের পর কয়েক দিনের মধ্যেই শম্ভুচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পুনরায় প্রবেশ করিবার মানস করেন কিন্তু তাঁহার পিতা পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শম্ভুচন্দ্র পিতার উপর অসন্তুষ্ট হন। পিতার পুনরায় দারপরিগ্রহের পূর্ব্বেই ১৮৬২ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পরম বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্তের নিকট মুঙ্গের পির পাহাড়ে গমন করেন। তথায় থাকিবার সময় তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ হইতে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যার তালুকদারদিগের সভার সহকারী সেক্রেটারী এবং সভার "সমাচার হিন্দুস্থানী" নামক কাগজের সম্পাদক করিবার মানসে পত্র লিখিলে তিনি উভয় কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দের মে মাসে শম্ভুচন্দ্র প্রথম লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। শম্ভুচন্দ্রের আমলে তালুকদার সভার মুখপত্র "সমাচার হিন্দুস্থানী" কাগজের এত দূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, বিলাতের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র সকল ইহা হইতে তদানীন্তন রাজনৈতিক বিষয়ক অনেক বিষয় উদ্ধৃত করিত। তদানীন্তন অর্থসচিব স্যামুয়েল লেং সাহেব বড় লাট সভায় প্রকাশ্যভাবে সমাচার হিন্দুস্থানীকে সুখ্যাতি করিতেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যাবতীয় ইংরাজ সম্পাদিত খবরের কাগজে ইহার ভূরি ভূরি প্রশংসা হইয়াছিল। কি রচনা নৈপুণ্যে, কি রাজনৈতিক তর্কে সকল বিষয়েই "সমাচার হিন্দুস্থানী" শীর্ষ স্থান অধিকার করে। ১৮৬২ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড ক্যানিং বিলাতে মারা যান। শম্ভুচন্দ্র অযোধ্যায় যাহাতে তাঁহার রীতিমত দেশীয়ভাবে শ্রাদ্ধ হয় তজ্জন্য "সমাচার হিন্দুস্থানী"তে এক প্রবন্ধ লেখেন এবং তালুকদার সভায় মন্তব্য প্রকাশ করেন। লর্ড ক্যানিংএর প্রতি তালুকদারদিগের অগাধ ভক্তি ও প্রেম ছিল কারণ এই মহামতি ক্যানিংএর জন্য তালুকদারগণ তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন নাই। ১৫ অক্টোবর ১৮৬২খৃঃ অব্দে সমস্ত অযোধ্যার তালুকদারগণ একত্র হইয়া মহামতি ক্যানিংএর দেশীয়ভাবে শ্রাদ্ধ করেন। তাঁহার কিরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে এ বিষয়ে শম্ভুচন্দ্র প্রকাণ্ড এক প্রবন্ধ লিখিয়া তালুকদারগণকে তাঁহার নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার পরামর্শ দেন। ইহার ফল লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ। ১৮৬২ অব্দের ডিসেম্বর মাসে শম্ভুচন্দ্র তাঁহার মাতৃদেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ সমাধা করিবার জন্য এক মাসের ছুটি লইয়া বরাহনগরে আসেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পুনর্ব্বার লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া যান।

হিন্দুপেট্রিয়ট কৃষ্ণদাস পালের হস্তে আসিলে পর ইহা অধিক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে থাকে নাই। বিদ্যাসাগরের অনুকম্পায় কৃষ্ণদাস পাল হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার অধীনে থাকিয়া হিন্দুপেট্রিয়টের কার্য্য চালান তাঁহার মনোগত ভাব ছিল না। দুই তিন মাস গত হইলে কৃষ্ণদাস পাল গোপনে

* পরে ইনি ছোট আদালতের জজ হন।

† ইনি পরে হাইকোর্টের জজ হন।

বিদ্যাসাগরকে হিন্দুপেট্রিয়টের অধ্যক্ষতা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কয়েক জন সভ্যের সহিত মিলিত হইয়া ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। কৃষ্ণদাসের অসৎ ব্যবহারের কথা ক্রমে বিদ্যাসাগর বুঝিতে পারিলে তিনি বিরক্ত হইয়া হিন্দুপেট্রিয়টের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহও ইহাতে বিশেষ চটিয়া যান। হিন্দুপেট্রিয়টের কার্য্যভার নিজ হস্তে রাখিতে তাঁহার কখন বাসনা ছিল না। কাজে কাজেই অনন্যোপায় হইয়া ১৮৬২ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে চারি জন ট্রষ্টীর* উপর সমস্ত ভার নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট ট্রষ্টীদিগের হস্তে যাইলে কাগজখানি এক রকম ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার মুখপত্র হইল দেখিয়া অনেকে বিরক্ত হয়েন এবং ১৮৬২ খৃঃ অব্দের শেষভাগে বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (Mr. W. C. Bonerjee) এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধুদিগের উদ্যমে এবং অর্থে "বেঙ্গলী" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। "বেঙ্গলী" খ্যাতনামা গিরিশচন্দ্র ঘোষের দ্বারা প্রথম সম্পাদিত হয়। গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে শম্ভুচন্দ্র প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে "বেঙ্গলীতে" লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে "ইণ্ডিয়ান রিফরমার" নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল কারণে কৃষ্ণদাস পালের হস্তে প্রথমে হিন্দুপেট্রিয়টের বড়ই দুরবস্থা ঘটে। এমন কি কৃষ্ণদাস এই কাগজের সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া জনাই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবার জন্য বারংবার ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ঠাকুরদাস এরূপ কার্য্য হইতে কৃষ্ণদাসকে বিরত করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল।

* রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (এখন মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে, সি, এস, আই,) এবং বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র হিন্দুপেট্রিয়টের প্রথম ট্রষ্টী হন।

দিনাজপুরে বাণ রাজার গড়।

বিগত ষষ্ঠবর্ষের ৮ম সংখ্যা "প্রদীপে" প্রকাশিত "শোণিতপুর" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার দীর্ঘকাল সঞ্চিত বিশ্বাসের উপর একটি সন্দেহের ছায়া পতিত হইয়াছে। নতুবা সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ আন্দোলন ও আলোচনা দ্বারা প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার ভ্রম সংশোধন এবং সত্যনির্দ্ধারণ হওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে ১২৯১ সালে উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর জেলায় অবস্থান কালে, চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে বাণরাজার স্থাপিত ৺ বিরূপাক্ষনাথ মহাদেবের চড়ক পূজা দর্শনেচ্ছুক হইয়া স্বনামখ্যাত বলিরাজ পুত্র বাণ রাজার গড়ে গিয়াছিলাম এবং তথায় আমি স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়াছি। যে স্থানে বাণরাজার বাড়ী ছিল বলিয়া লোকে বলিয়া থাকে সেই স্থান হইতে বিরূপাক্ষনাথ মহাদেবের মন্দির প্রায় এক মাইল দূরে। এই দুই স্থান কি নামে পরিচিত তাহা আমার স্মরণ পথে উদিত না হওয়ায় ঐ দুই স্থানের একই নাম, কি ভিন্ন ভিন্ন নাম তাহা এক্ষণে বলিতে পারিতেছি না। তবে যে স্থানে বাণ রাজার বাড়ী ছিল সেই স্থানটীকে লোকে সচরাচর "বাণ রাজার গড়" বলিয়া থাকে, এবং আমিও তাহাই শুনিয়াছিলাম বলিয়া উহার আর অন্য কোন নাম আছে কি না তাহা জানিবার জন্য তত যত্ন করি নাই।

একটি ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বতীর তীরে ৺ বিরূপাক্ষনাথ মহাদেবের মন্দির স্থাপিত। বলা বাহুল্য যে, ঐ নদীটীর নাম এখন আমার স্মরণ নাই। মন্দিরটি খুব বড়ও নহে একবারে ছোটও নহে মন্দিরের পার্শ্বেই আর একটি ছোট পূজার দালান আছে, উহার মধ্যেও অন্যান্য বিগ্রহ দেখিয়াছিলাম। স্থানীয় প্রবাদ, এই বিরূপাক্ষনাথ মহাদেবের সাধনা সম্বল করিয়াই বাণ রাজা ধন্য হইয়াছিলেন এবং এই বাণ রাজা হইতেই চড়ক পূজার সৃষ্টি। পুরাণে উল্লিখিত আছে একদা বাণ রাজা মহাদেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া অতি কঠোর সাধনা করিয়াও দর্শন

লাভ না হওয়াতে চড়ক পূজা ব্রত অবলম্বন করিয়া স্বীয় পৃষ্ঠ, চক্ষু প্রভৃতি স্থান অম্লান বদনে বিদ্ধ করিয়া * তত্তৎস্থানে রজ্জু সংযোগে নিজেই চড়কে ঝুলিয়াছিলেন, এবং এই প্রকার কঠোর সাধনায় ইষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করিয়া স্বীয় অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন অদ্যাপিও সে স্থানে বাণ রাজার স্থাপিত ৺বিরূপাক্ষনাথ মহাদেবের চড়ক পূজা চির প্রচলিত প্রথানুযায়ী হইয়া আসিতেছে। এই উপলক্ষে কেবলমাত্র ঐ দিন একটি ছোট রকম মেলা সেখানে হইয়া থাকে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ নিকট ও দূরবর্ত্তী গ্রাম সমুদয় হইতে বহুতর দর্শনাভিলাষী ভদ্রাভদ্র স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়। বিশেষতঃ রোগমুক্তি ও সন্তান কামনায় ১৫।২০ ক্রোশ, কোন কোন সময় তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থানেরও বহুতর লোক আগমন করে। এবং ঐ সমুদয় যাত্রী স্বীয় অভীষ্ট পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ষাঁড় ও অন্যান্য নানাবিধ সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া বিরূপাক্ষনাথের প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করিয়া দিয়া থাকে। কেহ কেহ তদীয় সেবাইত ব্রাহ্মণকে প্রদান করে। কথা প্রসঙ্গে সেই সময়ে শুনিয়াছিলাম যে ৺ বিরূপাক্ষনাথের সেবা পূজাদির জন্য দিনাজপুরের মহারাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষের প্রদত্ত দেবোত্তর ভূমি পুরুষানুক্রমে উক্ত বিগ্রহের নামে চলিয়া আসিতেছে। ঐ নিষ্কর দেবোত্তর সম্পত্তি পুরুষপরম্পরাক্রমে এই সেবাইত ব্রাহ্মণগণ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা বিগ্রহের সেবা পূজাদি যথারীতি চালাইয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ ঐ চড়ক পূজার দিনটি সেবাইত ঠাকুরের পক্ষে বৎসরের মধ্যে একটি বিশেষ দিন, এই দিনে তাঁহার যথেষ্ট প্রাপ্তি হয়।

৺বিরূপাক্ষনাথ মহাদেব যে গৌরীপাটের উপরে স্থাপিত সেই গৌরীপাটখানি অত্যন্ত প্রকাণ্ড না হইলেও শিবলিঙ্গটির পরিমাণে খুব বৃহৎ এবং শিবলিঙ্গটি গৌরীপাটের সঙ্গে একত্র সংলগ্ন নহে অর্থাৎ আল্‌গা; টানিয়া খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেই সময়ে স্থানীয় একটি সৎ ব্রাহ্মণের কাছে শুনিয়া ছিলাম যে, বাণ রাজার স্থাপিত সেই বিরূপাক্ষনাথ শিবলিঙ্গ এখন আর নাই। উল্লিখিত সেবাইত ব্রাহ্মণ স্বীয় উপজীবিকার একমাত্র সম্বল নিষ্কর দেবোত্তর বজায় রাখার অভিপ্রায়েই অন্য একটি যেমন তেমন শিবলিঙ্গ ঐ গৌরীপাটের উপর স্থাপিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, আমারও যেন কতকটা ঐরূপ ধারণা হইয়াছিল। কারণ যে গৌরীপাটের উপরে বর্ত্তমান শিবলিঙ্গটি স্থাপিত আছে, উহার গোড়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ ছিদ্রের পরিমাণে বুঝা যায় যে, ইহা অপেক্ষা অনেক বড় একটি শিবলিঙ্গ পূর্ব্বে ঐ ছিদ্রে সংস্থাপিত ছিল।

৺বিরূপাক্ষনাথ মহাদেবের দর্শনান্তে আমরা মাধ্যাহ্ন্যায়া পূজাদি নির্ব্বাহ করিয়া সুবিখ্যাত বাণ রাজার গড় দর্শন করিতে তথা হইতে অনুমান এক মাইল দূরবর্ত্তী উক্ত গড়ে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, অনুমান দুই হাজার বিঘা পরিমিত ভূমি ব্যাপিয়া গড় অবস্থিত। দূর হইতে দেখিলে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় বলিয়া অনেক সময়ে ভ্রম জন্মিতে পারে। উহার চতুষ্পার্শ্ব সুগভীর গড়খাই দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিরক্ষিত রহিয়াছে। চৈত্র মাসে আমি যে সময়ে দেখিয়াছিলাম তৎকালে উক্ত গভীর গড়খাইয়ের কোন স্থানেই জল ছিল না, কিন্তু বর্ষাকালে ঐ সকল গড়খাই জলে পরিপূর্ণ হয়। এবং অবশ্যই তখন বাণ-গড়ের সৌন্দর্য্য আরও মনোমুগ্ধকর হইয়া থাকে।

গড়ের একস্থানে দেখিলাম একটি ছোট বাড়ীর পরিমিত স্থানের চতুষ্কোণে চারিটি অতি প্রাচীনকালের সুন্দর কারুকার্য্যখচিত পিলারের মধ্যে একটি ফকির ভিক্ষার্থী হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি সকল সময়েই সেখানে থাকেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হইল না। সম্ভবতঃ ঐ মেলার দিনে বাণ রাজার গড় দর্শন করিতে বহু লোকের সমাগম হয় বলিয়া তিনি কিছু পাইবার প্রত্যাশায় সেখানে বসিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, উক্ত চারিটি পিলারের

* চড়কপূজা উপলক্ষে সন্ন্যাসিগণ এক প্রকার লোহার কাঁটা (গুচ্ছাবদ্ধ) আছে তদ্দ্বারা নিজ নিজ পৃষ্ঠের কতক পরিমাণ স্থান বিদ্ধকরতঃ চড়কগাছে ঝুলিয়া অকাতরে তাহাতে ঘুরিত। যদিও ব্রিটাশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ পদ্ধতি রহিত হইয়াছে তথাপিও সন্ন্যাসিগণ ঐ সমস্ত কাঁটা পূর্ব্বনিয়ম রক্ষার্থে এখন সঙ্গে করিয়া আনে মাত্র। এমন লোক এখনও আমাদের দেশে দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা সন্ন্যাসী দলভুক্ত হইয়া ঐ রূপ পিঠ ফোড়াইয়া চড়কে ঝুলিয়াছিল। একটিকে আমি দেখিয়াছি সে একাদিক্রমে সাতবার ঐ রূপ ঝুলিয়াছিল।

উপরে কোন ছাদ নাই। দেখিয়া বোধ হইল এককালে উহার কোনরূপ ছাদ ছিল।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকার স্তূপের মধ্যে তিনটি কি চারিটি (ঠিক মনে নাই) ছোট ছোট পুষ্করিণী আছে, এবং তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে জলও ছিল। আরও দেখিলাম, স্থানে স্থানে উহার কোন কোন অংশ কৃষকদিগের দ্বারা কর্ষিত হইতেছে। তথাপি আমি যে সময়ে দেখিয়াছিলাম তখনও ঐ গড়ের কোন কোন স্থানে যথেষ্ট জঙ্গল ছিল তাহাতে মনে হইল বর্ষাকালে ঐ গড় একটি ক্ষুদ্র অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ গড়ের মধ্যে মনুষ্যের বসবাস নাই। গড়ের বহির্ভাগে এক মাইল, কি দেড় মাইল দূরে কতিপয় গ্রাম দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়।

স্থানে স্থানে দেখিলাম, অতি প্রাচীনকালের সুবৃহৎ বৃক্ষরাজি, স্তূপাকার পরিমিত ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত হিন্দু দেবদেবীর ভগ্নাবশেষ এবং প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন কতকটা পাথরের তক্তার ন্যায় বরগা ও দরজার চৌকাঠ প্রভৃতির কতক কতক অংশ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অনুসন্ধানে শুনিলাম ঐ সমুদয় কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরাদির মধ্যে যেগুলি ভাল অবস্থায় ছিল তন্মধ্যে চৌকাঠ প্রভৃতি কতক কতক দিনাজপুরের সুবিখ্যাত মহারাজ বংশ লইয়া গিয়া তদীয় রাজবাটীস্থ কতিপয় ইষ্টকগৃহে ব্যবহার করাইয়াছেন। আমি নিজেও দিনাজপুর রাজবাটীর সম্মুখস্থ কতিপয় ইষ্টক গৃহের দরজায় ঐরূপ কারুকার্য্য সম্পন্ন প্রস্তর নির্ম্মিত চৌকাঠ সংলগ্ন দেখিয়াছিলাম।

ঐদিন বৈকালে উক্ত গড় দর্শনান্তে আমার তৎকালীন কর্ম্মস্থান উল্লিখিত বাণরাজার গড় হইতে অনুমাণ ৪।৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে গো শকটে যাইতে যাইতে উক্ত গড় সম্বন্ধে নানামত চিন্তা করিয়া পরিশেষে ইহাই স্থির করিয়াছিলাম যে, ইহা পুরাণোল্লিখিত সুবিখ্যাত বাণরাজার বাড়ী না হইলেও অতি প্রাচীনকালের কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু রাজবংশের আবাসস্থান ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ।

উক্ত স্থানে অবস্থানকালে এই সম্বন্ধে স্থানীয় অনেক প্রাচীন লোকের নিকটে শুনিয়াছি যে, ইহাই পুরাণোক্ত বলিরাজপুত্র সুবিখ্যাত বাণ রাজার আবাস স্থান।

আসামে "রক্ত" অর্থাৎ "শোণিত" শব্দকে "তেজ" রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে বলিয়া "তেজপুর" ও "শোণিতপুরে" ঐক্য হওয়ায় এবং উহার অদূরবর্ত্তী স্থানে কতিপয় প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ ও কারুকার্য্যনির্ম্মিত প্রস্তরাবলীর এবং হিন্দু দেবমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া উহাকেই পুরাণোল্লিখিত সুবিখ্যাত বলিরাজপুত্র বাণরাজার আবাসস্থান শোণিতপুররূপে নির্দ্ধারিত করা অভ্রান্ত নাও হইতে পারে। উহা বাণরাজার আবাসস্থান শোণিতপুর না হইয়া প্রাচীনকালের অন্য কোন হিন্দু রাজবংশের রাজধানী ছিল ইহাও হইতে পারে।

অথবা ঐ তেজপুরই ঠিক শোণিতপুর আর আমি যে বাণরাজার গড় ও তৎস্থাপিত ৺বিরূপাক্ষ নাথ মহাদেবের বিষয় বলিতেছি তাহা হয় ত অপর কোন প্রাচীন হিন্দু রাজকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এরূপও হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার রীতিমত আন্দোলন হইয়া ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান ও মীমাংসা হওয়া অবশ্যই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গের প্রাচীন রাজবংশ দিনাজপুর রাজবাটীতে এতৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতে পারে। দয়া ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ ও বিদ্যোৎসাহী বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুর দয়াপরবশ হইয়া সাহায্য করিলে, এ বিষয়ে সত্যের অনুসন্ধান ও উদ্ধার হইতে পারে।

ফল কথা এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইলে লুপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের পঙ্কোদ্ধার হইতে পারে।

শ্রীচন্দ্রেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

আসামীয় বঙ্গভাষা।

প্রকাশিত অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির ভাষা হইতে বর্ত্তমান "আসামী ভাষা" ক্ষিপ্রগতিতে পৃথক হইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ "আসামী ভাষা" এখন স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য আসামী ভ্রাতাগণ বিশেষ যত্নবান। তাঁহারা "বাঙ্গালা ভাষার" প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই হউক অথবা স্ব ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই হউক স্বদেশীয় প্রাচীন পুঁথির ভাষা গ্রহণে অনিচ্ছুক। এই নিমিত্তই তাঁহারা ভাষাকে নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত করিতেছেন। ইহা এক হিসাবে মন্দ নহে। তবে ভাষার উন্নতিবিধান ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হেতু ভাষাকে বিকৃত করা যুক্তিযুক্ত নহে। আসামের প্রাচীন কবিগণ ৪০০।৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যে ভাষায় "ঘোষা, কীর্ত্তন, ভক্তিরত্নাবলী, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত" প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বঙ্গীয়। যখন দেখিতেছি প্রাচীন পুঁথির ভাষা উভয় প্রদেশেই এক তখন অবশ্যই বলিব বঙ্গভাষাই আসামের আর্য্য হিন্দুদিগের ভাষা ছিল এবং এখনও আছে।

শব্দই ভাষার ভিত্তি। শব্দের সমষ্টিই ভাষা। শব্দের উচ্চারণভেদে ভাষা ভেদ হয় না। তবে লিখিত ব্যবহার উচ্চারণানুযায়ী হইলে প্রাদেশিক ভাষা হয়। প্রাদেশিক ভাষা পৃথক নহে। "আসামী ভাষা" প্রাদেশিক। ইহার শব্দগুলিই তাহা প্রমাণ করিতেছে। আমরা নিম্নে কতকগুলি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি তদ্দৃষ্টে পাঠকগণ আমাদের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন :—

প্রচলিত আসামীয় বাঙ্গলা শব্দ (উচ্চারিত)	প্রচলিভ বাঙ্গলা শব্দ	লিখিত প্রাচীন ব্যবহার	লিখিত বর্ত্তমান ব্যবহার (আসামে)
মই = (ময়)	আমি	মুই, আমি মঞি, মুঞি,	মই
তুমি	তুমি, তোমা,	তোমা	—
তই	তুই	তোহোর	—
—	তোমার	তঁয়ু	—
তোমাক	তোমাকে	—	তোমাক
মোর	আমার / মোর	মোহোর	মোর
আমার	আমাদের	—	আমার
মোক	আমাকে	—	মোক
যি	যে	যে	যি
সি	সে	সে	সি
তেঁও	তিনি	—	তেঁও
কেঁও	কে	কে	কেঁও
কি	কি	কি	কি
ই	ঐ / এই	—	ই
এ	এক	এক	এ
এটি	একটা	একটী	এটা
এনে	এইরূপে	—	এনে
এনেতে	এমন সময়ে	—	এনেতে
ইয়াত	এখানে	—	ইয়াত
—	এত	এতেঁক	—

বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের কতকগুলি কথিত শব্দ (উচ্চারণানুযায়ী)

কোয়ানের	কোনখানের / কোথাকার
ওল	নাব
থেয়ে	থেকে
ক্যাম্বায়	কেমন করে
ওম্বায়	অমন করে / ও রকমে
ওলনা	হলনা (হ = ও)
আমাগে	আমাদের
যাব অনে	যাব এখন
হইছে	হইয়াছে
এডা	এটা
থোও	রাখ
কুণ্ঠি / কুত্থি	কোথা
ক্যা	কেন
খাবু	খাবে
বাপা	বাবা

করিছ	করচ
খাইচ্ছ	খাচ্ছ
বলিচ্ছ	বল্‌চ

ইত্যাদি।

আজকাল আসামে অক্ষরেরও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে যথা ঃ—

স=চ, যথা ঃ—চাহব (সাহেব), চফর (সফর), চহর (সহর) চেনেহ (স্নেহ), আচলত (আসলে)।

ষ=হ, যথা ঃ—মানুহ (মানুষ), শেহত (শেষে)।

স=হ, যথা ঃ—কিহেরে (কিসেরে), আহিলোঁ (আসিলাম) উলাহর (উল্লাসের)।

চ=ছ, } যথা ঃ—গুছুরা (ঘুচান), ছলাব (চলাব)
ঘ=গ, } চালান গুচাই (ঘুচাই)।

ছ=চ যথা ঃ—মূর্চ্চা (মূর্চ্ছা), চল চলীয়া (ছল ছল)

ফ=প, যথা ঃ—পেলাই (ফেলাই)।

উ=অ, যথা ঃ—অলেখ (উল্লেখ)

শ=চ, যথা ঃ—বেচি (বেশী)—ইত্যাদি।

এখন আমরা আসামের প্রাচীন কবিগণের লেখা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব ঃ—

আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক কবি শঙ্করদেবরচিত "কীর্ত্তন" প্রকাশিত পুঁথি হইতে নিম্নে কয়েকটী পদ প্রদত্ত হইল।

* * *

আপন গৃহক, চলি গৈলা পাছে
উদ্ধবক লৈয়া সঙ্গে॥

* * *

চন্দন অর্পণ, বিনে কুবুজীর,
আন কিছু পুণ্য নাই।
এতেকতে হেন, দেখিয়ো পরম
প্রসাদ পাইলেক তাই॥

৺অনন্ত কন্দলিকৃত সুভদ্রাহরণ হস্তলিখিত পুঁথি হইতে নিম্নে কয়েকটী পদ প্রদত্ত হইল।

কহিয়ো করুণাময় ইহাক সম্প্রতি।
কিমতে জিনিব জরাসন্ধ মন্দমতি॥
অনন্তরে কুন্তিসুতে শুনিলা মনতে।
জরাসন্ধ রাজাক জিনিবা কেন মতে॥
সেহি বেলা শুনিলন্ত আকাশি বচন।
নচাড়িবা পুত্র রাজা তেজভয় মন॥
শুনি দমঘোষ রাজা ভাবীয়ে সহিতে।
আগবাড়ি যাদবক নিল হরিষতে॥

৺রাম সরস্বতী কৃত উদ্যোগ পর্ব্ব হস্তলিখিত পুঁথি হইতে নিম্নে কয়েকটী পদ প্রদত্ত হইল।

তাত হন্তে অত দুখ পাইব নিরন্তর।
নাহি মোর শোক আর কৌতুক বিস্তর॥
বিদুরর বচনত মহা লাজ পাই।
মহাক্রোধে দুর্য্যোধনে দশন ছোবাই॥
অঙ্গুলি টোয়াই বিদুরক প্রতি বৈল।
কৃষ্ণের আগত পাছে বুলিবাক লৈল॥
দুর্য্যোধন বদতি নজানে পুর্ব্বাপর।
অকারণে মোক দোষ দিয়া দামোদর॥

কবি অনন্ত কন্দলি রচিত দশম স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত পুঁথি হইতে নিম্নে কয়েকটী পদ প্রদত্ত হইল।

উষার বদন, নিরীক্ষি সঘন
তোলন্ত মধুর হাস।

* * *

উষার সন্তাপ, কহিতে না পারি,
স্বামিত অপার বেথা।

* * * *

অনন্ত কন্দলি, কহে কৃতাঞ্জলি,
ডাকি বোলা রাম রাম॥

কবি মাধবদেবরচিত "ঘোষা" ও "ভক্তিরত্নাবলী" প্রকাশিত পুঁথিদ্বয় হইতে নিম্নে কয়েকটি পদ প্রদত্ত হইল।

* * * *

হরিত শরণ লৈয়া যিতো জনএ,
হরির চরিত্র শ্রবণ কীর্ত্তন করে।
দুর্ঘোর অপার সংসার সাগরএ,
সিতো মহাজনে অতি অপ্রয়াসে তরে॥

* * *

ন করি সংশয় চয় শুনা স্থির মনে।
ইহার প্রমাণ লৈয়ো নারদ বচনে॥

পাঠকগণ স্ব স্ব পল্লীর, স্ব স্ব প্রদেশের কথিত শব্দগুলির সহিত উক্ত উদ্ধৃত শব্দগুলির অপূর্ব্ব মিলন দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন আর বলিবেন "তাইত এ শব্দগুলি দেখ্‌ছি আমাদেরই পল্লী ব্যবহৃত শব্দ, এ পদগুলি দেখ্‌ছি আমাদেরই প্রাচীন কবিদিগের পদ, ইহা আবার "আসামী ভাষা হইল কি প্রকারে?" বাস্তবিক কথিত ভাষা বিস্তৃত বঙ্গের সর্ব্বাংশেই স্বতন্ত্র। ইহার লিখিত ব্যবহার সাহিত্য ক্ষেত্রে হইলে বিকট স্বতন্ত্রতারই সৃষ্টি হইত—"আসামীয় বঙ্গভাষার" ন্যায় সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ দুষ্ট, স্বাধীনতাবর্জ্জিত, বিশৃঙ্খল ও সীমাবদ্ধ হইয়া যাইত আর শত শত ভাষার সৃষ্টি করিত।

ভাষার বিস্তৃতিই উন্নতি ও জীবন। প্রাদেশিক ভাষা দেশীয় ভাষার সহিত সংঘর্ষক্ষেত্রে উপনীত হইলে পরাজয়ই পরিণাম ফল। দেশীয় ভাষার গর্ভে তাহাকে প্রবেশ করিতেই হইবে—ইহা স্বাভাবিক। তাই বলিতেছি "আসামী ভাষা" সেবকগণ যে ভাবে ভাষাকে চালাইতেছেন তাহাতে অচিরেই আসামী ভাষার প্রাণ চরম সীমায় উপনীত হইবে।

কথিত ভাষার উচ্চারণভেদ বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যেরূপ আছে আসামেও সেইরূপ থাকিবে। উহা ভাষার ক্রমোন্নতির সহিত, লোকশিক্ষা বিস্তারের সহিত, বিভিন্ন অংশের লোকের পরস্পর সম্মিলনের সহিত ধীরে ধীরে বহু শতাব্দীর পর তিরোহিত হইবে। কথিত ভাষার ভেদ আছে বলিয়া, লিখিত ব্যবহারে ঐ ভেদ রাখিতে হইবে, ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা দেশের ও ভাষার শত্রু। দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে তথ্য বহন করে ভাষা। ভাষার ভিতর দিয়াই সহানুভূতি ও একতার সৃষ্টি—ভাষার ভিতর দিয়াই পরস্পরের মনোভাব বিনিময়—ভাষার অধীনে থাকিয়া আমরা প্রত্যেকেই সবল। এহেন ভাষাকে যদি শতধা বিভক্ত করা যায়—উচ্চারণ ভেদে যদি ভাষা ভেদ করা যায়—তাহা হইলে আমরাও বিভক্ত হইব। বারান্তরে এই বিষয়ে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

অদ্ভুত গুপ্ত লিপি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্মস্থান হুগলী জেলার কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামে। কিন্তু এ সকল পরিচয়ের এস্থলে কোন প্রয়োজন নাই। আমি প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর কাল কলিকাতায় পুলিশে ডিটেক্‌টিভের কার্য্য করিতেছি এই বলিলেই যথেষ্ট পরিচয় হইল।

চৈত্রমাস সূর্য্যের প্রখর কিরণে কলিকাতা সহর ঝাঁঝাঁ করিতেছে। কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া যখন থানায় আসিয়া পদার্পণ করিলাম, তখন দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। আহারাদি এখনও হয় নাই। পরিহিত জামা ও উড়ানিখানি রাখিয়া কিঞ্চিৎ শ্রান্তি লাভাশায় যেমন হাতে মুখে একটু জল দিতে যাইতেছি, এমন সময় টুংটুং করিয়া দেওয়াল সংলগ্ন বেলের শব্দ আমার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল। আমি হস্তস্থিত জলপাত্র রাখিয়া দ্রুতপদে অফিসের ভিতর গমন করিয়া টেলিফোনের চোঙ্গা কানে লাগাইলাম। শুনিলাম "মাথাঘসার লেনে * * নম্বর বাটীতে ঐ বাটীর মালিক মৃত অবস্থায় পতিত আছে। বাটীতে অপর কোন ব্যক্তিও নাই। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যার্থে অবিলম্বে তুমি তথায় গমন কর। ইহা তোমার উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীর আদেশ জানিবে।"

পিপাসায় ছাতি ফাটিতেছে, স্নানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, এই অবস্থায় উক্ত আদেশ পাইয়া আমার মনের ভাব যে কিরূপ হইল, তাহা আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। পুলিশের চাকুরীর প্রতি মনে মনে শত ধিক্কার আসিতে লাগিল, আর সহস্র ধিক্কার আসিতে লাগিল আমাদের এই পাপময় জীবনে, প্রাতঃকাল হইতে অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্নানাহারান্তে কোথায় একটু বিশ্রাম করিব, না তৎপরিবর্ত্তে মড়া ঘাঁটিতে যাইতে হইবে। কিন্তু কি করি উপায় নাই, আদেশ পালন করিতেই হইবে।

আমি পকেট্ হইতে একটি দুয়ানি বাহির করিয়া দিয়া, একজন হিন্দুকনেষ্টবলকে দোকান হইতে কিছু

মিষ্টান্ন আনিতে বলিয়া মুখ, হাত ধুইয়া লইলাম। দোকান থানার নিকটেই ছিল, জলখাবার আসিতে বিলম্ব হইল না। আমি তাড়াতাড়ি আমার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া জল খাইয়া লইলাম এবং অবিলম্বেই গমনোদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। অল্পদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই এক খানি আরোহী শূন্য চল্‌তি গাড়ী যাইতে দেখিয়া তাহা ভাড়া করিলাম।

মাথাঘসা গলিতে প্রবেশ করিয়াই গাড়ী হইতে দেখিতে পাইলাম অনতিদূরে একটি বাটীর সম্মুখের পথে অনেক লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকটি লাল পাগড়ীও দেখিতে পাইলাম। যথাস্থানে পৌঁছিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম, স্থানীয় পুলিষ ও দারোগা রমেশ বাবু অগ্রেই উপস্থিত হইয়াছে। বাটীর দরজা বন্ধ রহিয়াছে, পুলিষ কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। আমাকে দেখিয়া পুলিষের লোকেরা সম্মান প্রদর্শন করিল। দারোগা বাবুর সহিত আমার বিশেষ আলাপ না থাকিলেও তিনি একেবারে আমার অপরিচিত নহেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাটীর দরজা বন্ধ রাখিবার কারণ কি? আপনি কি এপর্য্যন্ত কোনরূপ তদারক করেন নাই?" দারোগা বলিলেন,—"আমি ভিতরে গিয়া লাস্ দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু ঐ মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া, উহার সাধারণ ভাবে মৃত্যু হইয়াছে কি কাহারও কর্ত্তৃক হত হইয়াছে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। বাটীর ভিতর একটিও জনমানব নাই, অথচ বাক্স, সিন্দুক ও বিবিধ দ্রব্যাদি রহিরাছে দেখিয়া আমি পুলিষ সাহেবকে সংবাদ পাঠাই। তদুত্তরে আপনার আসিবার সংবাদ পাইয়া আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

আমি একজন পাহারাওয়ালাকে দ্বারে থাকিতে আদেশ করিয়া কয়েকজন প্রতিবেশী ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দারোগা বাবু অগ্রে অগ্রে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে লাগিলেন, পশ্চাতে ভদ্রলোক কয়টি ও পুলিষের লোক কয়জন আসিতে লাগিল। প্রথমে ক্ষুদ্র উঠানের ধারের একটি অপ্রশস্ত রোয়াক অতিক্রম করিয়া ছোট একটি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম, এবং দুইটি ঘরের পর রাস্তার ধারের একটি কোণের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ঘরটির আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। এক পার্শ্বে একটি সুন্দর কাঠের আলমারি ও দুই খানি কুশন চেয়ার, অন্য পার্শ্বে একখানি বৃহৎ মুকুর এবং দেওয়ালের গাত্রে কয়েকখানি বিলাতি ছবি ও কয়েক জোড়া দেওয়ালগিরি। মেজের সমুদয় অংশ ফরাশে আবৃত এবং তদুপরি কয়েকটি তাকিয়া ইতস্ততঃ ভাবে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একটির উপর হত ব্যক্তি অর্দ্ধশায়িত ভাবে পড়িয়া আছে। প্রথম দেখিবামাত্র, উহাকে মৃত কি জীবিত স্থির করা যায় না, হঠাৎ মনে হয় যেন তাকিয়ায় ঠেশ্ দিয়া হাতের উপর মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছে। মুখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। অবয়ব দেখিয়া বোধ হইল মৃতের বয়ঃক্রম চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে না। বর্ণ সুন্দর, শরীরও বলিষ্ঠ পরিধানে একখানি দেশী ধুতি। ট্যাঁকে একটি টাকার মত কি রহিয়াছে।

আমি মৃতদেহ স্পর্শ না করিয়া, প্রথমে উত্তমরূপে একবার লাস দেখিয়া লইলাম। কোন স্থানে কোন প্রকার আঘাতের চিহ্ন বা অন্য কিছুই অস্বাভাবিক দেখিতে পাইলাম না। তখন রমেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি লাস্‌কে প্রথম কি ভাবে দেখিয়াছিলেন?"

দারোগা বাবু বলিলেন, "আমিও ঠিক এই ভাবেই পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখি নাই।"

কোনরূপ ব্যাধিজনিত মৃত্যু ঘটিয়াছে, কি কোন নৃশংস পাষণ্ড এই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে, তাহা স্থির করিবার জন্য লাস টিকে চিৎ করিয়া ফেলিলাম। সকল অঙ্গ বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন প্রকার আঘাতের বা দৈব মৃত্যুর লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। কেবল দক্ষিণহস্তে একটি দাগ দেখিতে পাইলাম, ক্ষণপরেই উহা কোন তাগার দাগ বলিয়া মনে হইল। মুখের ভাব অতি সামান্য মাত্র বিকৃত। কিন্তু দেখিয়া বোধ হইল মৃত ব্যক্তি একজন সৌখীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ওষ্ঠ তখনও তাম্বুলরাগ রঞ্জিত।

যে বাটীতে অদ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য আসিয়াছি, তথায় ঐ বাটীর মৃত অধিকারী ভিন্ন আর কেহ নাই। এস্থলে আমার অভিলষিত প্রশ্নসকলের উত্তর কাহার

নিকট হইতে জানিতে পারিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ ও ঠিক পার্শ্বের বাটীর প্রতিবেশী-বর্গকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলাম। উহাদের নিকট হইতে যে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিলাম তাহা একে একে সমস্ত লিখিয়া লইলাম। তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—

১ম। মৃত ব্যক্তির নাম নবগোপাল সান্যাল। উঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ পঁয়তাল্লিস বৎসর। ক্লাইভষ্ট্রীটে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করিতেন। তাঁহার শরীরে কোন বিশেষ ব্যাধি ছিল বলিয়া প্রকাশ নাই। সন্ধ্যার সময় কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

২য়। সংসারে তাঁহার দুইটি পুত্র, একটি কন্যা ও স্ত্রী ভিন্ন একজন জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগ্নী থাকিতেন। স্ত্রী, পুত্রদ্বয় ও কন্যাটি প্রায় কুড়িপঁচিশ দিন পূর্ব্বে সহরে বসন্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ার কারণ ফরাশডাঙ্গায় শ্বশুরালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। বিধবা ভগ্নী বাটীতেই ছিলেন কবে কোথায় গিয়াছেন কেহ বলিতে পারে না। দাস দাসীদিগকে কল্যও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

৩য়। দুই তিন মাসের মধ্যে বাটীতে কোন নূতন লোক আসিয়া বাস করিয়াছিল বলিয়া কাহারও জানা নাই। তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা কদাচিৎ আসিয়া দুই এক দিবস থাকিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার এক ভাগিনেয় আসিতেন এবং বড় অধিক দুই এক ঘণ্টা থাকিয়া চলিয়া যাইতেন।

৪র্থ। নবগোপাল বাবুর জন্মস্থান কলিকাতায় নহে, মফস্বলের কোন পল্লীগ্রামে। তিনি দশ বার বৎসরের অধিক কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

৫ম। সন্ধ্যার পর প্রায় প্রতিদিন তিনি বৈঠকখানায় বসিতেন, এবং কোন কোন দিন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত গল্প করিতে করিতে বা তাস দাবা খেলিতে রাত্রি এগার বারটা পর্য্যন্ত বাজিয়া যাইত। গত রজনীতেও বোধ হয় ঐ ঘরে বসিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ। তাঁহার অর্ডারের কার্য্যে বেশ পশার আছে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অফিসের রামলাল ও শরৎ চন্দ্র নামক দুইজন কর্ম্মচারী কর্ম্মসূত্রে কখনও কখনও বাবুর সহিত বাটীতে আসিয়া থাকেন।

৭ম। নবগোপাল বাবুর সামান্য পানদোষ ছিল, কিন্তু বাটীতে সে কার্য্য বড় করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি সরল ছিল এবং কোনরূপ অহঙ্কারের চিহ্ন আদৌ দেখিতে পাওয়া যাইত না। কাহারও সহিত বিশেষ বিবাদ ছিল বলিয়া কাহারও জানা নাই।

৮ম। যে খোট্টা চাকর প্রায় সর্ব্বদা দরজায় থাকিত তাহার নাম রামধনীয়া।

৯ম। প্রাতঃকাল হইতে বাটীর সদর দরজা খোলাই রহিয়াছে।

কে এই লাস প্রথম দেখিয়াছিল বা কাহার দ্বারা এই সংবাদ থানায় প্রথম প্রেরিত হয় তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলাম না। লোক পরম্পরায় এই লোমহর্ষণ সংবাদ থানায় পৌঁছে দারোগা বাবুর নিকট ইহাই অবগত হইলাম।

—:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি উক্ত বিষয় সকল অবগত হইয়া, দারোগা বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ডেড্ হাউসে পরীক্ষার্থে লাস পাঠাইয়া দিলাম। শবের ট্যাঁকে একটি টাকার মত যে সামগ্রীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা চাবির রিং, বলা বাহুল্য উহা ট্যাঁক হইতে খুলিয়া লইয়াছিলাম। আমি এইবার একে একে সকল ঘরের সকল স্থান বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলাম। যে যে কক্ষের তালা বন্ধ ছিল তাহা খুলিয়া দেখিলাম। আমার অনুসন্ধানের সাহায্য হইতে পারে এ প্রকার কোন দ্রব্যই কোন স্থানে পাইলাম না।

যে গৃহে শব ছিল তাহার পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে একটি ছোট লোহার আলমারি রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। চাবির রিং লইয়া উহা খুলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা ব্যার্থ হইল। তখন পূর্ব্বোল্লিখিত কাষ্ঠের আলমারি খুলিবার ইচ্ছায় চাবি মিলাইতে লাগিলাম, সহজেই চাবি লাগিয়া গেল। দেখিলাম উহার ভিতর কতকগুলি পরিষ্কার জামা, কাপড়, রুমাল প্রভৃতি পরিচ্ছদ ভিন্ন আর কিছুই নাই। একটি ড্রয়ার টানিয়া দেখিলাম উহার মধ্যে অপর একটি ছোট রিংয়ে একটি পিতলের ও একটি লোহার বাক্সের চাবি রহিয়াছে উহা দেখিয়াই লোহার

আলমারির চাবি বলিয়া মনে হইল এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত পক্ষে আলমারি খুলিতেও পারিলাম। উহার ভিতর একটি সিকি ও কতকগুলি পুরাতন দলিল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

সামান্য গৃহস্থের বাটীতেও দুই এক খানা অলঙ্কার এবং কিছু টাকা কড়ি থাকে; কিন্তু নবগোপাল বাবু ব্যবসাদার ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ে বেশ প্রতিপত্তি আছে শুনিতেছি; এরূপ অবস্থায় তাঁহার আলমারি হইতে মূল্যবান কিছুই না পাইয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল নিশ্চয়ই কোন দুষ্টলোককর্ত্তৃক এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে এবং যাহা কিছু অর্থ বা অলঙ্কার ছিল তাহা তৎকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। গৃহ অনুসন্ধান কালে অপর একটি ক্ষুদ্র গৃহে একটি টিনের তোরঙ্গ দেখিয়াছিলাম। উহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশেষে সর্ব্ব সমক্ষে তাহা ভাঙ্গিতে আদেশ প্রদান করিলাম। দেখিলাম তাহার ভিতর কতকগুলি নূতন ও পুরাতন কাপড় ও একটি ছোট টিনের বাক্স, ঐ বাক্সের মধ্যে বস্ত্রখন্তে বাঁধা পুরাতন রূপার গোট একছড়া, সোনার হার একছড়া, একগাছি ভাঙ্গা অনন্ত ও দুইটি মাকড়ি এবং অন্য নেকড়ায় বাঁধা ৫৭৲টি টাকা মাত্র। এই সকল দ্রব্যের একটি ক্ষুদ্র তালিকা লিখিয়া লইয়া ঐ লেখা সমেৎ ছোট বাক্সটি একজন পাহারাওয়ালার জিম্মায় রাখিয়া দিলাম।

তৎপরে আমি আর একবার একাকী বাটীর নীচু উপুর সকল স্থান দেখিলাম। ছাদের সিঁড়িতে উঠিয়া দেখিলাম উহার কপাট উন্মুক্ত রহিয়াছে। ছাদের উপর হইতে বেশ করিয়া পার্শ্বের বাড়ীগুলি দেখিয়া লইলাম। এই স্থানের বাড়ীগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে সামান্য আয়াসে প্রায় এক বাড়ীর ছাদ হইতেই সকল বাড়ীর ছাদে যাওয়া যায়। তন্মধ্যে ঠিক উত্তরে যে বাটীটি আছে তাহার ব্যবধান এত অল্প যে, একখানি তক্তার সাহায্যে অতি সহজে এ বাটী হইতে ও বাড়ী যাওয়া যাইতে পারে। এই বাড়ীর দরজা জানালা প্রায় সমুদয় বন্ধ রহিয়াছে, নীচেয় নামিয়া জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিলাম, উহা একটি ভাড়াটীয়া বাড়ী প্রায় মাসাধিক কাল শূন্য অবস্থায় বন্ধ আছে।

বাটীর মধ্যে যে সকল উল্লেখযোগ্য দ্রব্যাদি রহিল, তাহার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ করিয়া সকল গুলি একটি ঘরে পূরিয়া তালা বন্ধ করিয়া শিল করিয়া দিলাম, এবং সেই গহনা টাকা ও উভয় তালিকা থানায় পাঠাইয়া দিলাম। অবশেষে প্রধান দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া এক জন পাহারাওয়ালা মোতায়েন করিয়া, এই হত্যার কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিলাম।

আমার প্রথম চিন্তা, ইহার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়াছে কি ধনাদি অপহরণের জন্য কেহ গুপ্ত হত্যা করিয়াছে। দ্বিতীয় চিন্তা, বাটীর দাস দাসী প্রভৃতি পলাইল কেন, তবে কি তাহারাই এই পাপ কার্য্য করিয়া পলায়ন করিয়াছে? অথবা তাহারা না করিলেও হয়ত ইহা তাহাদের জানিত। আবার মনে হইল যে বিধবা ভগ্নীর কথা শুনিলাম তিনিও কি এই ভয়ানক কার্য্যে লিপ্ত থাকা সম্ভব? তৃতীয় চিন্তা, মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটিলেও দাস দাসী প্রভৃতির ভয়প্রযুক্ত পলায়ন করা একেবারে অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু সেই বিধবা ভগ্নী পালাইবেন কেন? চতুর্থ চিন্তা, যদি হত্যাই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে এরূপ হত্যা নিতান্ত মূর্খ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, অতএব সামান্য দাস দাসীর দ্বারা ইহা হইতে পারে না। পঞ্চম চিন্তা, যদি কোন ব্যাধি জনিত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেও চাকর বাকরের দ্বারা টাকাকড়ি চুরি হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু পতিপুত্রহীনা বয়স্থা ভগ্নীর তাহাতে যোগ দেওয়ার স্বার্থ কি? ষষ্ঠ চিন্তা, যদি অর্থাদি চুরি না হইয়া থাকে তাহা হইলে হত্যা না হওয়াই সম্ভব।

এই প্রকার বিবিধ অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তার উদয় হইয়া মাথার ভিতর কেমন গোলমাল বাধাইয়া দিতে লাগিল। আমি স্থির করিলাম আমার প্রথম কার্য্য, ডাক্তার সাহেবের রিপোর্ট দেখিয়া মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ দূর করা। দ্বিতীয় কার্য্য, বাটীতে যে স্ত্রীলোক, এবং দাস দাসী ছিল তাহাদের অনুসন্ধান করা। তৃতীয়, প্রকৃত কোন দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে কি না সন্ধান করা! এই গুলি জানিতে পারিলে তবে, যদি হত্যা হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার নায়কের সন্ধান হইলেও হইতে পারিবে, নচেৎ কোন প্রকারেই কিছু করিতে পারিব না।

—০—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মাথাঘসা লেন হইতে যখন থানায় আসিয়া পৌঁছিলাম তখন বেলা ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। আহারের বড় আর প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু স্নানের লোভ ছাড়িতে পারিলাম না। স্নান সমাপনান্তর দোকান হইতে গরম লুচি আনাইয়া জলযোগ শেষ করিলাম। তাহার পর ডাক্তারের পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রবল হইতে লাগিল, কিন্তু ডেডহাউসরূপ নরক দর্শণ করিতে আর ইচ্ছা হইল না। একজন কর্ম্মচারীকে লাসের Postmortem Report আনিতে মেডিকাল কলেজে পাঠাইলাম।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে প্রেরিত লোক প্রত্যাগমন করিয়া আনীত রিপোর্ট আমার হস্তে দিল। উহা পাঠে অবগত হইলাম * * * নম্বর মাথাঘসা লেনে যাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল হাইড্রোসেনিক এসিডের আঘ্রাণে তাহার জীবন নাশ হইয়াছে। লাস তদারকের সময় যেরূপ দেখিয়াছিলাম তাহাতে নবগোপাল বাবু যে আত্মহত্যা করেন নাই এই ধারণার বিরূদ্ধে কোন প্রমাণই পাই নাই, সুতরাং ইহা যে গুপ্ত হত্যা সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না।

এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিয়া এই ভয়ানক হত্যা-রহস্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, কিরূপেই বা নবগোপাল বাবুর অপহৃত সম্পতির উদ্ধার সাধন করিয়া উপযুক্ত প্রমাণাদির সাহায্যে নরঘাতককে রাজদ্বারে আনয়ন পূর্ব্বক উচিৎ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিব, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে থানা হইতে বহির্গত হইলাম। আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। ক্লাইব ষ্ট্রীটের অধিকাংশ দোকানগুলিই এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, দুই চারি থানি যাহা খোলা আছে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া নবগোপাল বাবুর অফিসের কোন সন্ধান পাইলাম না। অনন্যোপায় হইয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বের দোকানগুলির বর্হিদেশের ট্যাবলেট বা সাইনবোর্ড গুলি দেখিতেছি এমন সময় কোন ভদ্রলোকের মুখে শুনিলাম, রাজা উদ্‌মন্ত ষ্ট্রীটে সান্যাল কোম্পানি নামে একটি ছোট অফিস আছে, উহার মালিকের নাম নবগোপাল সান্যাল, কথাবার্ত্তায় জানিলাম নবগোপাল বাবুর সহিত ঐ ব্যক্তির আলাপ আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি উহার হত্যার সংবাদ কিছুই জানেন না। আমার অনুরোধে এই ভদ্র লোকটি সান্যাল কোম্পানির অফিস দেখাইয়া দিলেন। উহা বন্ধ রহিয়াছে দেখিয়া পার্শ্বের একখানি দোকানে জিজ্ঞাসায় জানিলাম অদ্য কেহ দোকান খোলে নাই। এই স্থানে আরও শুনিলাম তাঁহারা কিছু পূর্ব্বে নবগোপাল বাবুর সম্বন্ধে ভয়ানক অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছেন; কিন্তু বিশ্বস্ত ভাবে অবগত না হওয়ার কারণ, আমার নিকট এই সংবাদের বিবরণ কিছুই প্রকাশ করিলেননা। ঐ দোকানে যে সকল কর্ম্মচারী কাজ করেন তাহাদের নাম জানিয়া লই-লাম, কিন্তু উক্ত দোকানদার বা ঐ স্থানের কোন ব্যক্তি তাহাদের ঠিকানা বলিতে পারিল না, পূর্ব্বে তদন্তের কালে যে দুই জন কর্ম্মচারীর নাম জানিতে পারিয়াছিলাম এক্ষণে তাহাদের ভিন্ন, রাধিকানাথ দত্ত নামক আর একটি যুবক ও মহাদেব চৌবে নামক এক হিন্দুস্থানী জমাদারের নাম জানিতে পারিলাম। এবং কেবলমাত্র এক জনের নিকট শুনিলাম রাধিকানাথ দত্ত চোরবাগানের কোন বাটীতে থাকে।

আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া চোরবাগান অভিমুখে গমন করিলাম। তথায় পৌঁছিয়া প্রত্যেক গলির প্রত্যেক বাটীতে রাধিকানাথ দত্তের অনুসন্ধান করিলাম। কেহই তাহার কথা বলিতে পারিল না, কেবল রাম-শীলের বাটীর পশ্চিমধারে একটি মেসে রাধানাথ দত্ত নামক এক জন কলেজের ছাত্রকে পাইলাম। তখন অগত্যা নিরাশ হৃদয়ে নিজ বাসাভিমুখে ফিরিলাম। বাসায় আসিবার কালে কোন প্রকারে রামধনীয়ার বা বাটীর দাসীর যদি সন্ধান জানিতে পারি এই মনে করিয়া পুনরায় একবার মাথাঘসা গলি হইয়া আসিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু এখন রাত্রি প্রায় ১১॥০টা বাজিয়া গিয়াছে, এসময় কাহাকেও দেখিতে পওয়া সম্ভব নয় মনে করিয়া আর তথায় যাইলাম না। স্থির করিলাম, আজ কিছুই হইল না, কল্য প্রাতে প্রথমে পুনরায় মাথাঘসার গলিতে যাইব এবং আবশ্যক হইলে আর এক বার রাজা উদ্‌মন্ত ষ্ট্রীটে গমন করিয়া কর্ম্মচারী ও জমাদারের সন্ধান লইব।

বাসায় আসিয়া নিয়মমত কালি কলম লইয়া আমার প্রাইভেট ডায়রিতে অদ্যকার প্রয়োজনীয় সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। যখন শয্যা গ্রহণ করিলাম তখন

ক্লক্ঘড়িতে ঠংকরিয়া একটা বাজিল। শয়ন করিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব রজনীর সঙ্কল্পমত প্রাতঃকালেই পুনরায় মাথাঘসার গলিতে গমন করিলাম। যে বাটীতে নৃশংস ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার পূর্ব্বদিকে একটি অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র গলি আছে। ঐ গলির ঠিক পরপার্শ্বে যে বাটীটি অবস্থিত, তাহার একটি প্রকোষ্ঠ হইতে যে প্রকোষ্ঠে নবগোপাল বাবু হত হইয়াছিলেন তাহা উত্তমরূপে দেখিতে পাওয়া যায় বিবেচিত হইল। আমি প্রথমেই এই বাটীতে প্রবেশ করিলাম এবং সম্মুখেই বাটীর কর্ত্তাকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। আগমনের কারণ বলিবার পূর্ব্বে অগ্রে তাঁহার পরিচয় লইলাম এবং যথার্থ আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। এই বাবুর নাম মোহিনীমোহন মজুমদার, বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ * * কলেজে প্রফেসারি করেন। ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্ম। অন্যান্য কথার পর আমি বলিলাম,—

"মহাশয়! আমি অদ্য যে কারণে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন।"

"যখন আপনি একজন ডিটেক্টিভ্ পুলিস বলিতেছেন, তখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি বই কি।"

"মহাশয়, গত কল্য আপনার পার্শ্বের বাড়ীতে যে হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছে, আমার প্রতি তাহার অনুসন্ধানের ভার পড়িয়াছে কিন্তু কি সূত্র ধরিয়া যে এই ভয়ানক কাণ্ডের সকল রহস্যভেদ করিতে পারিব তাহার উপায় দেখিতে পাইতেছি না। এই কারণ আপনার নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাইতে পারি কি না এই মনে করিয়া আসিয়াছি। ভরসা করি এই বিষয়ের আপনার দ্বারা যে টুকু সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাহা করিতে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না।"

"মহাশয়! আমিও ইহার বিষয় আদৌ অবগত নহি। পরশ্ব যখন কলেজে যাই, তখন নবগোপাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার পর আর হয় নাই। কল্য বৈকালে কলেজ হইতে আসিবার সময় পথে শুনিলাম, মাথাঘসা লেনে খুন হইয়াছে, কিন্তু কে খুন হইয়াছে তাহা কিছুই শুনি নাই। বাসায় আসিবার সময় দেখিলাম আমার বাসার নিকট কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে, মনে একটু শঙ্কা হইল। তৎপরে নিকটে আসিয়া সবিশেষ জানিলাম, তখন পুলিষ তদারক করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"আপনি এ বাড়ীতে কতদিন আছেন, এবং নবগোপাল বাবুর সহিত আপনার কতদিন আলাপ?"

"আমি প্রায় আট মাস এই বড়ীতে আসিয়াছি এবং আসিবার পর অল্প দিনের মধ্যেই আলাপ হয়।"

"পূর্ব্বে আপনি কোন্ স্থানে ছিলেন?"

"পটলডাঙ্গার পিরুখানসামার গলিতে।"

"আপনি কি সর্ব্বদা নবগোপাল বাবুর বাটীতে যাতায়াত করিতেন।"

"খুব অল্প, আমার যাইবার সময়ও অধিক ছিল না।"

"আচ্ছা, যে ঘরে নবগোপাল বাবুর মৃত্যু হয় এবং যেখানে তিনি অধিকাংশ অবসর সময় অতিবাহিত করিতেন, আপনার উপরের ঘর হইতে তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়।"

"যায়, কিন্তু আমি প্রায় ও কক্ষে যাই না, উহাতে আমার এক কন্যা থাকেন। এবং ঘরের ঐ ধারের জানালাও প্রায় সর্ব্বদা বন্ধ থাকে।"

"পরশ্ব সন্ধ্যার পর যদি তিনি নবগোপাল বাবুকে দেখিয়া থাকেন তবে কত রাত্র পর্য্যন্ত কিভাবে তিনি দেখিয়াছিলেন যদ্যপি আপনার কন্যাকে একবার অনুগ্রহ ক'রে জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে বড়ই অনুগৃহীত হই।"

"আপনি বলিতেছেন, আমার জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সম্ভবতঃ সে কিছুই বলিতে পারিবে না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।"

মোহিনী বাবু চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণের পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"না মহাশয়, সে কিছুই দেখে নাই, তবে অন্যান্য দিনের মত পরশ্বও সে যতক্ষণ জাগরিতছিল অর্থাৎ প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত নবগোপাল বাবু প্রভৃতির কথা শুনিতে পাইয়াছিল।"

"আপনাকে অনেক বিরক্ত করিতেছি, কিছু মনে করিবেন না। নবগোপাল বাবুর বিষয় আসয় এবং উঁহার সংসারের অবস্থা আপনার কিছু জানা আছে কি?"

"না মহাশয়, উঁহার সংসারিক কথা কিছুই জানি না। শুনিয়াছি দোকান আছে। আমার বিশ্বাস তাঁহার অবস্থা মন্দ নহে।"

"ঐ বাটীতে যে সকল দাসদাসী ছিল তাহাদের কাহারও কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। আপনারও হিন্দুস্থানী চাকর দেখিতেছি, উহাকে জিজ্ঞাসা করিলে রামধনীয়ার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না কি?"

"উহাকে আমি সবে মাত্র তিন দিন নিযুক্ত করিয়াছি, উহাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আচ্ছা দাঁড়ান মহাশয়, বামুন ঠাকুর বোধ হয় মৃত নবগোপাল বাবুর বাটীর পাচক বামুনকে জানে। সেদিন সে বলিতেছিল, বৈশাখ মাসে বাড়ী যাবে এবং উহাকে আমার বাটীতে রাখিয়া যাইবে।"

"একস্থানে নিযুক্ত থাকিয়া কিরূপে আপনার বাটীতে কাজ করিবে?"

"উড়িয়া বামুনেরা এক সময় ২।৩ জায়গায় কাজ করিয়া থাকে।"

এই কথা বলিয়া মোহিনী বাবু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন— "অর্জ্জুন।"

মলিন বস্ত্রপরিহিত হরিদ্রারঞ্জিত হস্তে উড়িয়া ব্রাহ্মণ অর্জ্জুন আসিয়া উপস্থিত হইল। মোহিনী বাবু তাহাকে বলিলেন,—"হ্যাঁরে নবগোপাল বাবুর বাড়ী যে বামুন রাঁধে সে কোথা থাকে জানিস্?"

ব্রাহ্মণ।—সে পাথুরেঘাটায় থাকে।

মোহিনী বাবু।—একবার তাকে ডেকে আন্তে পারিস।

ব্রাহ্মণ।—এখন তো সে বাসায় নাই, সকালে ওখানে এক জন কাদের বাড়ীতে রাঁধে, তারপর এখানে আসে।

মোহিনী বাবু।—একবার তাকে ডেকে নিয়ে আস্তে পারিস্?

ব্রাহ্মণ।—এখনই যাব?

মোহিনী বাবু।—যা, বলিস বেশী দেরী হবে না।

উড়িয়া পাচক চলিয়া গেল, আমার মনে একটু আশা হইল যে এইবার কতকগুলি বিষয় জানিতে পারিব। আমি মোহিনী বাবুর সহিত এই উড়িয়া পাচকের প্রসঙ্গে কত ছোট লোকদের সহিত আমাদের ব্যবহার করিতে হয়, কত ঘৃণাকর স্থানে আমাদের গমনাগমন করিতে হয় এই সব কথা কহিতেছি, প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে অর্জ্জুন তৎসদৃশ আর একজন খোঁপা বাঁধা উড়িয়াকে লইয়া উপস্থিত হইল। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও আমাদিগকে অবনত মস্তকে নমস্কার করিল। তাহার মনে যে তখন একটি নূতন ভাল চাকুরি পাইবার আশা উপস্থিত না হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে। মোহিনী বাবু বলিলেন,—এইবার ইহাদ্বারা যদি কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন দেখুন।"

আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি নবগোপাল বাবুর বাটীতে রাঁধ?"

আমার এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বামুন ঠাকুর মোহিনী বাবুর দিকে ঈষৎ ভীতভাবে চাহিল এবং কোন উত্তরের পরিবর্ত্তে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। মোহিনী বাবু সাহস দিয়া বলিলেন—"বাবু যা জিজ্ঞাসা করেন বল কোন ভয় নাই।" তখন সে ধীরে ধীরে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে এই সকল প্রশ্নোত্তর আর এখানে তুলিয়া দিলাম না। তাহার এজাহারে নূতন কথা যাহা জানিতে পারিলাম তাহার সার মর্ম্ম এই,—(১) রাত্রে আহারাদি করিবার পর নবগোপাল বাবুর মৃত্যু হয়। (২) বামুন ঠাকুর যখন কাজ সারিয়া চলিয়া যায় তখন রামধনীয়া ও সৌরভ নামক দাসী বাটীতে ছিল। (৩) নবগোপাল বাবুর জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগ্নী অদ্য চারি দিবস হইল তাঁহার দেবর-কন্যার বিবাহোপলক্ষে বাড়িতে গিয়াছেন। (৪) বাবুর স্ত্রীর সহিত যে দাসী চন্দননগরে গিয়াছে তাহার নাম চাঁপা। (৫) যে দিন নবগোপাল বাবু হত হন সে দিন সন্ধ্যার পর দুই জন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ছিল। তাহাদের নাম ধাম জানা না থাকিলেও উক্ত পাচক ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে দেখিলে চিনিতে পারে কারণ তাহারা প্রায় আসিতেন। (৬) ঘর তল্লাসিকালে যে কক্ষে একটি ছোট টিনের ভিতর দুইটি টাকা ও কয়েক-খানি সোণার ও রূপার অলঙ্কার পাই, ঐ গৃহে বাবুর ভগ্নী থাকেন। (৭) বাবুর স্ত্রী দেখিতে সুশ্রী। (৮) আট

দশ দিনের মধ্যে কোন নূতন লোককে সে বাটীতে আসিতে দেখে নাই। (৯) বাবুর যে ভাগিনেয়র কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম তাহার নাম বিনোদলাল রায়।

এই ব্যক্তি যাহা যাহা বলিল তাহাতে আমার কোন অবিশ্বাস হইল না, কেবল তাহার একটি কথা আমার মিথ্যা বলিয়া মনে হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কল্য প্রাতে রাঁধিতে আসিয়া সে বাবুকে কিরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিল। তাহার উত্তরে সে বলিল তাহার জর হওয়ার কারণ কল্য রাঁধিতে আসে নাই। একথা আমার আদৌ বিশ্বাস হইল না। আমি আসিবার কালে নবগোপাল বাবুর ভগ্নীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে জানিয়া লইলাম এবং মোহিনী বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীহরিহর শেঠ।

চীন-প্রসঙ্গ।

পৃথিবীর মধ্যে চীন অতি প্রাচীনতম সাম্রাজ্য। চীনের ইতিহাস এত পুরাতন যে কোন বিচক্ষণ ঐতিহাসিকই ইহার নিশ্চিত সময় নির্দ্ধারণে প্রয়াসী হন নাই। খৃঃ পূর্ব্বের হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনেরা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, যেরূপ সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করিত এবং যেরূপ রাজনৈতিক পদ্ধতি মানিয়া চলিত বর্ত্তমান সময়েও তাহারা সেইরূপই করিতেছে।

সময়ের পরিবর্ত্তনে কত জাতি, কত দেশ, কত মহাদেশের সামাজিক রীতি নীতি ও সভ্যতার কতরূপ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে কিন্তু চীন অতি প্রাচীনতম কাল হইতে একই ভাবে চলিতেছে। সংক্ষেপে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় চীনারা অত্যন্ত রক্ষণশীল জাতি। চীন প্রাচীন ইজিপ্সিয়ান, আসিরিয়ান এবং জুইসদিগের সমসাময়িক রাজ্য এবং বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর মধ্যে চীনের ন্যায় অপর কোন প্রাচীন রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। চীনের অতি পুরাতন ইতিহাস বিশেষরূপে পর্য্যলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিখ্যাত কন্‌ফিউসাসের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহারা একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে, এই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে জাতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই তাহারা যে জগতের ইতিহাসে বিস্ময় উৎপাদন করিবে তাহার আর সন্দেহ কি?

কালের পরিবর্ত্তনে সময় সময় ঘটনাচক্রে চীনরাজ্যের সীমার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু খাস চীন রাজ্য অতি প্রাচীন কাল হইতে যে অষ্টাদশ প্রদেশে বিভক্ত ছিল তাহার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, উহা আজিও সমভাবে বিদ্যমান আছে।

চীনের অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, জগতের অন্য কোন দেশ বা জাতির সহিত ইহার অতি অল্পই সম্বন্ধ ছিল। চীনারা স্বদেশের সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধবিগ্রহ ব্যবসা বানিজ্য সম্পন্ন করিত। পৃথিবীর অপর কোন দেশ বা জাতির সহিত ইহাদের কোন সংস্রব ছিল না। বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি অথবা রাজ্যলাভলালসার বশবর্ত্তী হইয়া কখনও তাহারা নরশোণিতে ধরণীর অঙ্গ প্লাবিত করে নাই। স্বদেশজ পণ্যদ্রব্যে স্বীয় অভাব পূরণ করিয়া চীন আপন মনে আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিত; জগতের অপরাংশে কোথায় কি হইতেছে তাহার বড় একটা খোজ খবর রাখিত না। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনের প্রতি ইউরোপীয় শক্তিনিচয়ের দৃষ্টি পড়ে। এবং প্রকৃত পক্ষে সেই সময় হইতেই চীনও পৃথিবীর অপরাংশের সংবাদ লইতে শিখিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশীয়গণ কিরূপভাবে চীনের প্রতি ব্যবহার করিতেছে তাহা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন সুতরাং সে বিষয়ের পুনরুক্তি, এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

চীনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ, সর্ব্ব প্রথমে চীনের উত্তর পশ্চিমস্থ সেন্‌সি নামক স্থান হইতে আসিয়া চীনে বসবাস করে বলিয়া অনুমিত হয়। তৎপরে 'ফহি' নামক এক ব্যক্তি তাহাদের আদি শাসনকর্ত্তারূপে নির্দ্ধারিত হন। ফহিকে আজিও চীনারা দেবতা জ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাঁহার উদ্দেশে পূজা

দিয়া থাকে। ভারতের মনুর ন্যায় ফহি চীনদেশের আইন কানন ও আচার-পদ্ধতির প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পরবর্ত্তী একজন উত্তরাধিকারীর নাম হাংটী। হাংটীর অর্থ স্বর্গের সম্রাট। ফলতঃ এই সময় হইতেই চীন সম্রাটের পদ সৃষ্ট হয়। হাংটী স্বীয় দেশ দশ প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে দশটি বিভাগ, প্রত্যেক বিভাগে দশটি জেলা, এবং প্রত্যেক জেলায় দশটি করিয়া নগর সংস্থাপিত হয়। হাংটী চীন পঞ্জিকার অবিষ্কর্ত্তা এবং তাঁহার পৌত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রের সংস্কারক অথবা আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হাংটীর উত্তরাধিকারীর মধ্যে "জাওর" নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাও সর্ব্বদা প্রজাপুঞ্জের সুখ সমৃদ্ধির ও তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির চিন্তায় দিনাতিপাত করিতেন। প্রজারঞ্জক নরপতি বলিয়া চীন ইতিহাসে তাঁহার নাম বিশেষ গৌরবান্বিত। জাও চুণ নামক একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রীপদে মনোনীত করিয়া তাঁহার সাহায্য ও সৎপরামর্শে রাজ্য শাসন করেন, এবং মৃত্যু কালে চুণকেই স্বীয় রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীরূপে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়া যান। চুণ অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া পরে 'জু' নামক এক ব্যক্তিকে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

জাও, চুণ এবং জুর শাসনকাল চীন-ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সুশাসন কাল "রাম রাজত্বের কাল" বলা যাইতে পারে। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই এই ভাবে সম্রাট পদে বরিত হইত। প্রচলিত প্রথানুসারে জু মৃত্যু সময়ে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান কিন্তু তাঁহার পুত্র টিকি বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন এবং এই সময় হইতে

সম্রাট্ কন্লুং।

চীনের সম্রাট্ বংশ স্থাপিত হয় এবং বংশপরম্পরা রাজ্যশাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। টাঁকির শাসনকাল হইতে প্রথম হিয়া বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। খৃঃ পূঃ ২১৯৭ বর্ষে এই ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। এই বংশের ১৭ জন নরপতি পর্য্যায়ক্রমে খৃঃ পূঃ ১৭৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত চীনের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন।

চীনের দ্বিতীয় রাজবংশ চাং। এই বংশীয় ২৮ জন নরপতি ৬৫৪ বৎসর কাল অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১১২২ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন; কিন্তু ইঁহাদের শাসনকালে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। পরে চৌ নামক তৃতীয় রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশীয় রাজাগণ ৮৬৭ বৎসর কাল চীনের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। এই বংশে ভাল মন্দ উভয় প্রকার নরপতির আবির্ভাব হয়। এই রাজবংশের শাসনকালে বিখ্যাত সংস্কারক মনস্বী লাউসি, কন্‌ফিউসাস্ এবং মেন্‌সিয়াস্ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পর অনেকানেক রাজবংশ চীন-রাজ্য শাসন করেন।

বর্ত্তমান সময়ের নরপতিদিগের মধ্যে কিন্‌লুংএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সৈন্যগণ হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া পামীরে প্রবেশ করে এবং তিনি মধ্য এসিয়ায় চীন-প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে চীনের অশেষবিধ উন্নতি সাধিত হয় এবং তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ১৭৪৫ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

বর্ত্তমান সময়ে চীনের সম্রাটগণ ম্যাণ্ডারিন্ বা বিভাগীয় শাসনকর্ত্তাদিগের সাহায্যে, রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছেন, রাজ্যশাসন বিষয়ে, এই ম্যাণ্ডারিন্‌দিগের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। ইঁহাদিগের হস্তে দেশের দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়বিধ ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, ম্যাণ্ডারিন্‌গণ স্ব স্ব অধিকারের পরিমাণ ফলানুসারে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করিয়া, সম্রাটের আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। পার্শ্বে এক জন মিলিটারী ম্যাণ্ডারিনের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

প্রাচীন ইতিহাসের কথা বলিতে হইলে, চীনের সাধারণ লোকদিগের সভ্যতা বিষয়ে দুই এক কথা বলা

মিলিটারী ম্যাণ্ডারিন্।

একান্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ চীনের লোকগুলি শিল্পকার্য্যে বিশেষ পটু। ইঁহাদের শিল্পনৈপুণ্যের বিষয় পৃথিবীর অপর দেশ মহাদেশে পরিব্যাপ্ত। কি কারুকার্য্য, কি চিত্র কার্য্য, কি পূর্ত্ত কার্য্য, সর্ব্ব বিষয়েই চীনারা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। চীনের স্থাপত্য বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ চীনের প্রাচীর ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ক্ষেত্রে জলসেচন জন্য উৎকৃষ্টতর পয়ঃপ্রণালী ও খালসমূহ খনন দ্বারা এবং স্থলে স্থলে উহার উপর সুন্দর সুন্দর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, চীনারা বিশেষ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে।

চীনে কৃষিকার্য্যের উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে। বিখ্যাত চাউ বংশের রাজগণের রাজত্বকালে সরকারী কর্ম্মচারিগণ কৃষকদিগের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন এবং উৎকৃষ্টতর কৃষিকার্য্য বিষয়ে লোকদিগকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করিতেন। এই প্রকার প্রণালী অনুসরণে, চীনে কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। চীনের কৃষকগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং কর্ম্মঠ। তাহা-

দের সুস্থ সবল দেহ তাহাদের কর্ম্মজীবনের অনুরূপ নিম্নে এক জন পূর্ণবয়স্ক কৃষকের প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইল।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে যে কার্য্য প্রয়োজন হয়, তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই চীনারা ন্যূনাধিক কৌশল

চীনের লোকেরা এতই কৌশলী যে, একটি লবণ প্রস্তুতের কারখানায় বয়লারের পরিবর্ত্তে আগ্নেয়গিরি ব্যবহৃত হইতেছে। আগ্নেয়গিরি এইরূপ সুরক্ষিত যে তদ্দ্বারা লোকের কোনরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। অথচ অল্প ব্যয়ে

চীনকৃষক।

প্রকাশ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য না পাইয়াও, চীনারা দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপন্ন বিষয়ে, সহজ অথচ সুন্দর কৌশল উদ্ভাবন করিয়া জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

প্রকৃতির সাহায্যে কেবল বুদ্ধিকৌশলে কত বড় বৃহৎ কার্য্য সাধিত হইতেছে। চীন অতি উৎকৃষ্ট মাটির বাসনের জন্য বিখ্যাত। এই মাটির বাসনের প্রস্তুত প্রণালী অতীব সহজ; এমন কি ক্ষেত্রকর্ষণ অপেক্ষাও ইহা সহজসাধ্য।

চীনদেশে জলের সাহায্যে অনেক ইঞ্জিনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে চীনে টেলিগ্রাফের যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু চীনারা তাহাদের প্রাচীন ডাকের প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ডাক বহন করিবার বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরে এক একটি ঘাঁটি বা আড্ডা আছে, তথায় উপযুক্ত সংখ্যক অশ্বারোহী পত্রবাহকগণ সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকে এবং এইরূপে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অতি অল্প সময় মধ্যে চিঠি পত্র ও সংবাদাদি প্রেরিত হয়। এইরূপে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০ দিনের পথে ডাক চলিয়া যায়।

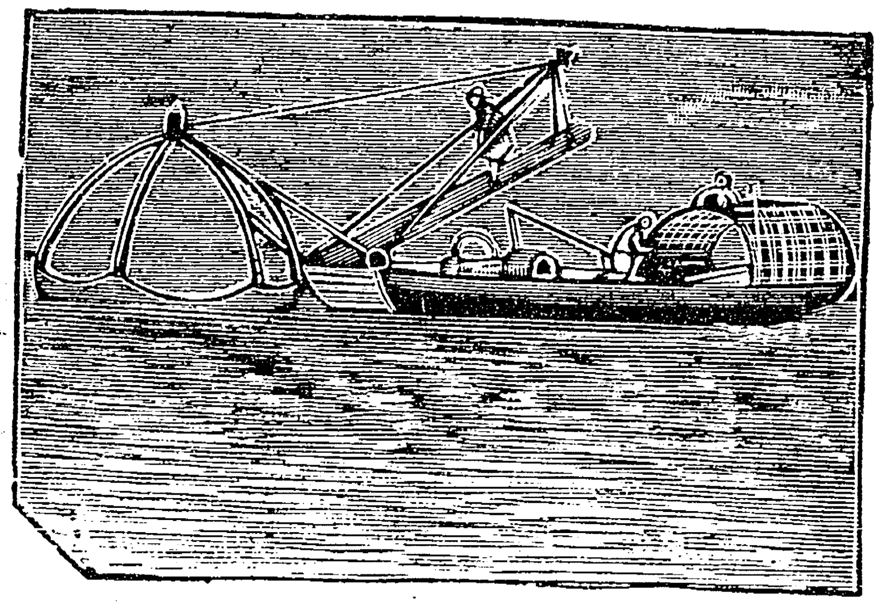

মৎস্য ধরিবার কৌশল।

চীনারা সর্ব্ববিষয়ে কৌশলী পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পার্শ্বে মৎস্যধরিবার কৌশলের নিদর্শন স্বরূপ একটি চিত্র প্রদত্ত হইল।

চীনের কৃষি-উৎসব এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ জাওর রাজত্ব কাল হইতে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর বসন্তকালে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ছোট বড় আপামর সাধারণ সকলেই এই ব্যাপারে যোগ দিয়া থাকে। মৃত্তিকা নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড গাভীর মূর্ত্তি ও অন্যান্য অনেক গুলি ছোট বড় মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। ঐ সকল মূর্ত্তি সমূহ লইয়া এক মিছিল বাহির হয়। দেশের প্রধান ম্যাণ্ডারিন এই মিছিলের অগ্রে অগ্রে চলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে ঐ বৃহৎকায় গাভী মূর্ত্তি এবং উহার পর অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি বহন করিয়া ক্ষেত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থলে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় সমবেত হইয়া কৃষিকার্য্যের গুণ কীর্ত্তন ও কৃষিবিষয়ক বক্তৃতাদির পর উপস্থিত জনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করেন। এইরূপে এই মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। চীনে ইহা একটি প্রধান উৎসব।

চীনাদের ক্ষেত্রে জলসেচন প্রণালীও সুন্দর। নদী, নালা, খাল প্রভৃতি উচ্চ অথবা নিম্ন স্থান হইতে নিম্ন প্রদ-

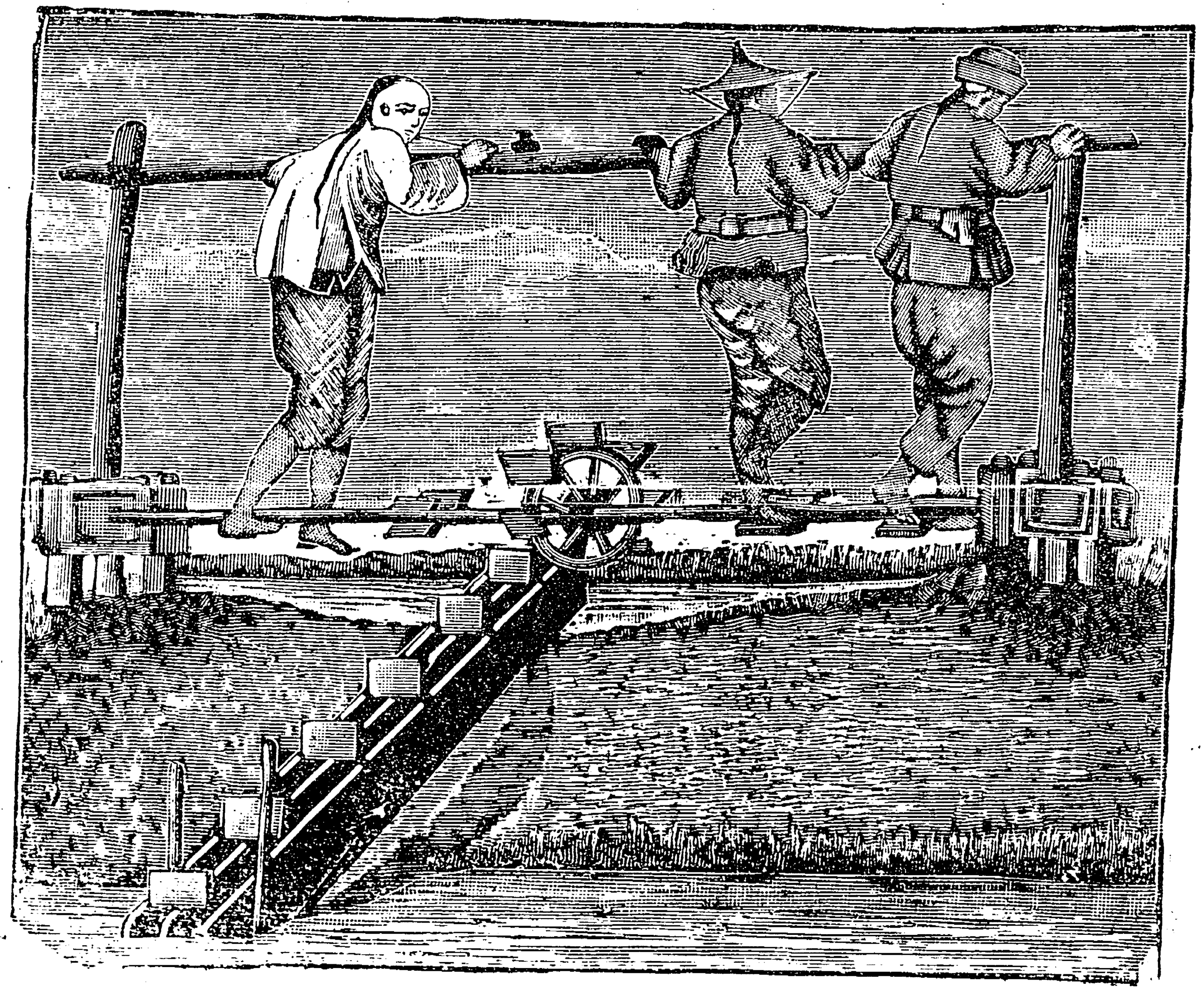

ক্ষেত্রে জল সেচন-প্রণালী।

শিত উপায়ে ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া চীনারা প্রচুর শস্য উৎপাদন করে।

চীনে ধান হইতে চাউল প্রস্তুত প্রণালী প্রায় আমাদের দেশের অনুরূপ। আমাদের ঢেঁকীর ন্যায় যন্ত্র চীনে ধান ভানিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, নিম্নে উহার এক চিত্র প্রদত্ত হইল।

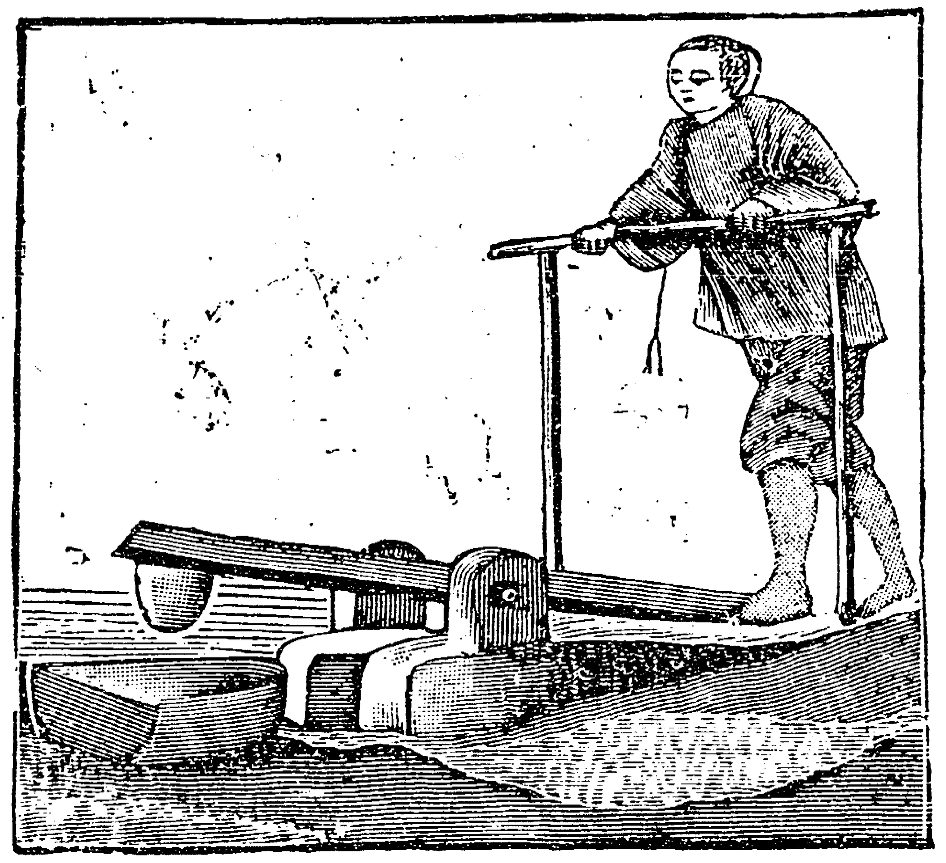

ধান ভানিবার যন্ত্র।

চীনের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। এই কারণে চীনের লোক সংখ্যাও খুব বেশী। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক চীনে বাস করে, খাস চীনের পরিমাণ ফল সমগ্র ইউরোপের তুল্য, এবং তথায় প্রায় ৪০ কোটী লোকের বাস।

চীনে শিক্ষিত লোকের সম্মান খুব বেশী। বিদ্যানুরাগ চীনদেশীয় লোকের হৃদয়ে এরূপ ভাবে বদ্ধমূল যে, সাধারণ শিক্ষার জন্য আইন কানন বিধিবদ্ধ করিতে হয় না। চীনের বর্ণমালা ভাবদ্যোতক। আমাদের বর্ণমালা ক খ ইত্যাদি কিম্বা ইংরেজী বর্ণমালা এ, বি, সি প্রভৃতির যেরূপ কোন অর্থ নাই, চীনের বর্ণমালা সেরূপ নহে। চীনের এক একটী বর্ণমালায় এক একটি বিষয়ের বা ভাবের অর্থ বোধ হয়, এই জন্য চীনের বর্ণমালার সংখ্যাবাহুল্য দৃষ্ট হয়। এই সংখ্যাবাহুল্যের জন্যই ইহা আয়ত্ত করিতেও বিশেষ আয়াস আবশ্যক। ভাষা শিক্ষার সম্বন্ধে বিদেশীয় লোকের পক্ষে ইহা এক প্রধান অন্তরায়।

নয়খানি প্রাচীন পুঁথি অধ্যয়ন করিলেই চীনে সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এই নয়খানি গ্রন্থের মধ্যে কন্‌ফিউসাস সংগৃহীত "সিকিং" অথবা সঙ্গীত পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকে সমাজ, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম এবং প্রধান প্রধান লোকের জন্ম মৃত্যু উপলক্ষে আনন্দ বা শোক প্রকাশার্থ রচিত উৎকৃষ্ট জাতীয় সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে।

চীনের পুস্তক সংগ্রহ এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইউরোপের বিখ্যাত "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার" ন্যায় সুবৃহৎ পুস্তকও চীনের পুস্তকসংগ্রহের নিকট হার মানে। চীনে মিং রাজগণের রাজত্ব সময়ে এক "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া," প্রস্তুতের আদেশ হয় কিন্তু উহা সম্পূর্ণ হইতে বহুবর্ষ অতীত হয়। এই পর্ব্বতাকার সুবৃহৎ গ্রন্থে ২২৯৩৭ খানি পুস্তকের সার সংগ্রহ আছে। উহা আর মুদ্রিত হয় নাই। এখনও এই হস্তলিখিত পুঁথি পিকিনের রাজকীয় পুস্তকাগারে সুরক্ষিত রহিয়াছে।

চীনে শিক্ষিত লোকের ক্ষমতা যথেষ্ট। প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষিত লোকের মধ্য হইতে সরকারী কার্য্যে লোক নিযুক্ত হয়। শিক্ষিত লোকের সংখ্যার অনুপাতে অতি অল্প লোকেই সরকারী চাকুরী পাইয়া থাকে, সুতরাং এই শিক্ষিত লোকেরা চাকুরী প্রাপ্তি বিষয়ে বিফলমনোরথ হইয়া দেশে অশান্তির স্রোত শতগুণে বর্দ্ধিত করে। ইহারা দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ দেশের মহদনিষ্ট করিয়া থাকে, রাজকীয় বিধানানুসারে চীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী গ্রাজুয়েটগণ সর্ব্ববিষয়ে মুক্ত হস্ত। ইহারা গুরুতর অপরাধ করিলেও বিনাদণ্ডে অনায়াসে নিস্কৃতি পায়। কারণ সম্রাটের বিশেষ আদেশে ইহাদিগের উপাধী কাড়িয়া না লইলে তাহাদিগের অপরাধের বিচার করিতে কোন মাজিষ্ট্রেট বা ম্যাণ্ডারিণেরই ক্ষমতা নাই। আইনের বলে বলীয়ান হইয়া এই শিক্ষিত লোকেরা আপনাদিগকে উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সমকক্ষ জ্ঞান করিয়া থাকে এবং মূর্খ নিরক্ষর লোকদিগকে নানা উপায়ে উৎপীড়িত করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করে। যে সমুদয় শিক্ষিত লোক সরকারি চাকুরী না পায় তাহাদের জীবিকার্জ্জনের জন্য দুই পথ মুক্ত আছে—এক চিকিৎসা ব্যবসায় অপর বাণিজ্য। কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা ব্যবসায়কে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। সূত্রধরের পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া আর হাতুরী বাঁটাল হস্তে ছুতারের কার্য্য করিতে রাজী হয় না। সরকারী কার্য্যের

সংখ্যার অল্পতা হেতু সকলেরই চাকুরী জুটে না সুতরাং বেকার থাকিয়া ইহারা কেবল দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে, এবং নানাপ্রকার অশান্তির বীজ বপন করে।

নিম্নে চীনের একজন বেকার শিক্ষিত লোকের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

বেকার শিক্ষিত লোক।

বর্ত্তমান সময়ে চীনদেশে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ভীষণ দারিদ্র্যের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। যতদিন চীনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্যক প্রচলন না হইবে ততদিন এই দৈন্যভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। চীনে শিক্ষিত সম্প্রদায় সরকারি চাকুরীর জন্য কিরূপ লালায়িত তাহার একটা দৃষ্টান্ত না দিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। ১৮৯২ খৃঃ পিকিন নগরে একটি সরকারি কার্য্যের জন্য লোক গ্রহণের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। আমাদের দেশের মুদ্রার পরিমাণ অনুসারে ঐ পদের মাসিক বেতন প্রায় একশত টাকা। পাঠকগণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, ঐ চাকুরীর জন্য প্রায় দেড় হাজার আবেদন উপস্থিত হইয়াছিল। এদৃশ্য আজি কালি আমাদের দেশেও বিরল নহে। এই জীবন-সংগ্রামের দিনে চাকুরীর জন্য ভারতবর্ষেও কিরূপ তুমুল কাণ্ড ঘটিতেছে তাহা প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিই সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার খাস বাঙ্গালা দেশের আরো ভীষণ অবস্থা। বাঙ্গালীও শিক্ষিত চীনাদের ন্যায় সরকারী চাকুরীর মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ। এদেশেও দুই জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিয়োগের প্রতিযোগী পরীক্ষা গ্রহণ করিলে দুই শতের অধিক পরীক্ষার্থী উপস্থিত হয়। সামান্য কেরাণীগিরির জন্য বিজ্ঞাপন বাহির হইলে শত শত উমেদার উপস্থিত হয়। আফিসের কর্ত্তারা (No vacancy অথবা Vacancy filled up) 'চাকুরী খালি নাই' 'কর্ম্মে লোক নিযুক্ত হইয়াছে' ইত্যাদি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উমেদারগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এখন আর বাঙ্গালী বিদেশ গমনে ভীত হয় না! পেটের দায়ে চাকুরীর মায়ায় ভেতো বাঙ্গালী এখন হনলুলু, ইছাণ্ডুলা অথবা জুলুল্যাণ্ডে যাইতেও প্রস্তুত!

সুতরাং চীনের ন্যায় আমাদের দেশের অবস্থাও ভীষণ হইতেছে। কবে যে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, ভগবানই জানেন। বারান্তরে চীন সম্বন্ধে আরো অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঃ—

পাহাড়ী বাবা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহামায়ার বিবাহ তাড়াতাড়ি দিবার জন্য বিমলার এত আগ্রহের কারণ—কেবল পাহাড়ী বাবা নহে, অন্য কারণও ছিল। একেত কন্যার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তারপর দেশে আসা অবধি কন্যার ভাব গতিকও কেমন ভাল নহে। দুর্গাদাসের গৃহে থাকিতে থাকিতেই বিমলার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই কারণ বিমলা তাড়াতাড়ি আপনার বাড়ী চলিয়া আইসে। এখানে দুই একদিন বাস করিবার পর, বিমলার মনে কিন্তু আর সে সন্দেহ রহিল না, তখন সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইয়া গেল। কি ঘটনায় এইরূপ হইল, তাহা বলিতেছি।

মহামায়া যে দিন নিজ বাড়ীতে আসিয়াছিল, তারপর দিন জননীকে কহিল—"মা, আমার এ বাড়ীতে থাক্‌তে ইচ্ছে করে না, কাকা মহাশয়ের বাড়ীতে কেবল যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে।"

বিমলা উত্তর করিল—"সে কি মা? এ যে তোমার নিজের বাড়ী, সে বাড়ী যে পরের বাড়ী।"

মহামায়া। আমার বড় মন কেমন করে মা।

বিমলা। কার জন্যে মন কেমন করে মা?

মহামায়া। কেন—অতুল দাদার জন্যে!

কথাটা শুনিয়া বিমলা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বিমলার মুখে আর কথা নাই। মহামায়া পুনরায় কহিল—"আচ্ছা মা, অতুল দাদার জন্যে তোমার কি মন কেমন করে না?"

এ অবস্থায় কন্যার এ সরলতা জননীর বিষতুল্য মনে হইতে লাগিল। কি ভাবিয়া বিমলা কহিল—"কর্‌বে না কেন—করে। তোর মন কি রকম করে আমায় খুলে বল্ দেখি।"

মহামায়া। দেখ মা, আমার কেবল তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, তাঁর কাছে থাক্‌তে ইচ্ছে করে, তাঁর কথা শুন্‌তে ইচ্ছে করে।

এমন সময় হঠাৎ বিমলার মুখ হইতে বহির্গত হইল—"দূর হতভাগী—তবে তুই মরেছিস্!"

মহামায়া জননীর এ কথার কোন অর্থই বুঝিতে পারিল না। একটু অপ্রস্তুত হইয়া কেবল তাঁহার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। মহামায়ার অপরাধ কি?

বিমলা এই সময় কন্যার মুখমণ্ডলের প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারপর কহিল—"তোর অতুল দাদাকে কি তোর বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে করে?"

বিবাহের কথায় মহামায়ার সেই প্রস্ফুটিত মুখকমল ঈষৎ আকুঞ্চিত ও আরক্ত হইল। মহামায়া চক্ষু অবনত করিয়া কহিল—"না মা।"

বিমলা তখন এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"তেমন অদৃষ্ট কি তোর হবে? দেখি—জগদম্বার মনে কি আছে? দেখ্ মহামায়া, আজ আমার কাছে যে সকল কথা বল্‌লি, আর কারু কাছে এ সকল কথা বলো না মা। ছি! বল্‌তে নেই! তুমি ত এ দেশের রীতিনীতি জান না, মা। এ রকম কোন কথা শুন্‌লে হয় পাগল বল্‌বে, না হয়, নিন্দে কর্‌বে।"

সরলা বালিকা সরল ভাবেই জননীকে প্রশ্ন করিল—"কি কথা বল্‌তে নেই না?"

বিমলা। এই এখন যে কথা তুই আমার কাছে বল্‌লি।

মহা। কি কথা বলেছি মা?

বিমলা। এই তোর অতুল দাদার জন্যে মন কেমন করার কথা। তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে—তার কাছে থাক্‌তে ইচ্ছে করে,—এ সকল কথা আর কারু কাছে কখন বলো না মা।

মহা। কেন বল্‌বো না মা?

বিমলা। ছি! বড় লজ্জার কথা—বড় ঘৃণার কথা! দেখ মহামায়া, যার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো, কেবল তার জন্যে তোর ঐ রকম মন কেমন করা উচিত, আর কারু জন্যে নয়।

মহা। তবে অতুল দাদার জন্যে মন-কেমন কেন করে মা?

বিমলা। কর্‌তে নাই—কর্‌লে পাপ হয়।

মহামায়ার সেই প্রফুল্ল মুখ তখন বিষণ্ণ হইল। এমন সময় দূর হইতে লোহিয়া ডাকিল—"মহামায়া!"

মহামায়া চম্‌কিয়া উঠিল! তারপর—"লোহিয়া কেন ডাক্‌ছে—যাই মা"—বলিতে বলিতে দ্রুতপদে জননীর নিকট হইতে প্রস্থান করিল। লোহিয়ার নিকট আসিয়া মহামায়া কহিল—"কেন লোহিয়া?"

লোহিয়া মহামায়ার সেই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া এবং অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রথমে বিস্মিত নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল—"তোর মুখ শুক্‌নো আছে—কেনরে মহামায়া?"

মহামায়া সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। বরং সে প্রশ্নে তার মুখখানি যেন আরো শুকাইয়া গেল। লোহিয়ার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। লোহিয়া আকুল প্রাণে কহিল—"মহামায়া!"

লোহিয়ার সম্মুখে মহামায়ার ক্রন্দন! এইবার মহামায়া কাঁদিয়া ফেলিল। কি সর্ব্বনাশ! ব্যাঘ্রী আপন শাবকের হঠাৎ বিপদ দেখিলে, যেমন সে বিপদ উদ্ধারের চেষ্টায় মুহূর্ত্তের মধ্যে লাপাইয়া পড়ে, লোহিয়াও তৎক্ষণাৎ সেইরূপ মহামায়ার উপর ঝাফাইয়া পড়িল তারপর মহামায়াকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিয়া লোহিয়া কহিল—"হামি বুঝেছে—হামি বুঝেছে—মা তোঁকে বকেছে। কেন বকেছেরে মহামায়া?"

বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রীর ন্যায় লোহিয়া ফুলিয়া উঠিল। মহামায়া এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। লোহিয়ার বক্ষে মস্তক রাখিয়া কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহামায়াকে কাঁদিতে দেখিয়া লোহিয়াও কাঁদিল। যেন কঠিন পর্ব্বত ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী ছুটিল। লোহিয়ার চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কেন মহামায়া কাঁদে, মহামায়া তাহা জানে না। কেন লোহিয়া কাঁদে, লোহিয়াও তাহা জানে না। কিছুক্ষণ পরে লোহিয়ার সে হুঁস হইল। লোহিয়া মহামায়াকে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুহারে কাঁদায়েছে মহামায়া?"

মহামায়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"কেউ আমায় কাঁদায়নি লোহিয়া।"

লোহিয়া। তব্ কেন তুহি কাঁদ্‌লি আর হামারে ভি কাঁদালি মহামায়া?

মহামায়া। সত্য বল্‌চি—আমায় কেউ কাঁদায়নি, আমার প্রাণটা কি জানি কেন, আপ্‌নি কেঁদে উঠ্‌লো —লোহিয়া।

লোহিয়া। তুহার মনে কিছু দুঃখ্ আছে। কি দুঃখ্ আছে হামায় বল্‌বে না মহামায়া?

মহামায়া। কই দুঃখ ত কিছু নাই। তবে থেকে থেকে একটা কথা আমার কেবল মনে হয়। মা বলেন—সে কথাটা মনে হতে নাই।

লোহিয়া। সে কি কথা আছেরে মহামায়া?

মহামায়া। মা যে কারু কাছে সে কথা বল্‌তে বারণ করে দিয়েছেন।

লোহিয়া। হামায় বল্‌তে বারণ না করেছে। হামারে বল্‌তে কিছু দোষ না আছে।

মহামায়া তখন তাহাই বিশ্বাস করিয়া কহিল—"এই অতুল দাদার কথা।"

লোহিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—"তুহার অতুল দাদার কি কথা আছেরে।"

মহামায়া অপেক্ষাকৃত ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল—"দেখ লোহিয়া, অতুল দাদাকে দেখ্‌তে না পেলে আমার বড় মন কেমন করে। মনে হয়—ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসি। পূর্ব্বেত এমন হতো না। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত আমার মনটা এই রকম হয়েছে। মা বলেন—এ রকম হওয়া ভাল নয়—এতে পাপ হয়। পাপই যদি হয়, তবে আমার মন কেন এমন হলো লোহিয়া?"

প্রশ্ন শুনিয়া লোহিয়ার আগ্রহ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। লোহিয়া আগ্রহের সহিত কহিল—"তুহার কথা শুনে, হামার পরাণটা কেমন কর্‌ছে। তুহি কি অতুল দাদাকে ভালবাসিস্?"

মহামায়া সরলভাবে উত্তর করিল—"তা কেমন করে বল্‌বো? আমি মাকে যেমন ভালবাসি, তোকে যেমন ভালবাসি—এ ভালবাসা ত সে রমক নয়।"

লোহিয়া। হামি বুঝ্‌ছে—কিছু কিছু বুঝ্‌ছে। মহামায়া, সেটি হবে না—হামার জান্ যাবে, তবু সেটি হবে না। এবার যখন মন কেমন কর্‌বে—হামায় বল্‌বে, হামি তুহার অমন মন টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবে।

মহামায়া ভীত হইয়া লোহিয়ার মুখের প্রতি চাহিল। সে মুখ দেখিয়া সে ভয়ের মাত্রা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না। মহামায়া তখন অপরাধীর ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অপরাধ যে কি করিয়াছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে মহামায়া ডাকিল—"লোহিয়া!"

সে কণ্ঠস্বরে লোহিয়ার সে উগ্রমূর্ত্তি আর নাই! লোহিয়া মহামায়ার মুখচুম্বন করিয়া উত্তর করিল—"কেন মহামায়া?"

মহামায়া। যে কথা মনে রাতদিন জাগে, সে কথা কাউকে বল্‌তে নেই কেন লোহিয়া? আর সকলের জন্যে মন-কেমন কর্‌তে আছে, কেবল অতুল দাদার জন্যে মন কেমন কর্‌তে নেই কেন লোহিয়া? কর্‌লে পাপ হয় কেন লোহিয়া?

লোহিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল "পাহাড়ী বাবার হুকুম, তুহার এখন বিয়ে হবে না। তুহি কারু সাথে সে ভালবালা করিস্ না। অতুল দাদা তুহার দুস্‌মন্ আছে। তুহার মন্‌মে তাকে আস্‌তে না দেবে। এলে জোরে তাড়িয়ে দেবে। পাহাড়ী বাবার হুকুম না শুন্‌বে—আর পাপ হবে না?"

মহামায়া উত্তর করিল—"ছি লোহিয়া! এমন কথা মুখে এনো না। অতুল দাদাকে দুস্‌মন্ কখন বলো না। অতুল দাদা আমাদের কোন মন্দ করেন নাই, কারুই কোন মন্দ করেন নাই—মন্দ কর্‌তে জানেনেই না। তুমি তাঁকে দুস্‌মন্ বলো না লোহিয়া।"

লোহিয়া। তুহারে যে সাধী কর্‌তে মাংচে, সেই হামাদের দুস্‌মন্—এ পাহাড়ী বাবার কথা।

মহামায়া। আমি বিয়ে কাউকে কর্‌বো না লোহিয়া। তুমি স্বীকার কর অতুল দাদাকে দুস্‌মন্ মনে করবে না?

লোহিয়া। আচ্ছা, হামি দেখ্‌বে—এখন কিছু মনে কর্‌বে না—দুস্‌মনের কাম কর্‌লে মনে কর্‌বে। হামি দেখ্‌বে—ছোড়বে না—দেখ্‌বে।

এই কথা বলিয়া লোহিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। কি ভাবিয়া এই সময় মহামায়া একবার সদর বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিল। এ ঘর সে ঘর কাহার অনুসন্ধান করিয়া যেন বেড়াইতে লাগিল। সদর বাড়ী শুন্য—কেহ কোথাও নাই। হঠাৎ এই সময় সদর বাড়ীর সম্মুখস্থিত উদ্যানের দিকে দৃষ্টি পড়িল। একি! ঐ না অতুলচন্দ্র বাগানে ফুল তুলিতেছে? মহামায়া আর স্থির থাকিতে পারিল না—দৌড়িয়া অতুলচন্দ্রের নিকট আসিল। ফুল চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িলে যেরূপ হয়, অতুলচন্দ্রের অবস্থা এখন সেইরূপ হইল। কিন্তু মহামায়াত ফুল-চোর ধরিতে আসে নাই। মহামায়া আসিয়া কহিল—"অতুল দাদা, আমি তোমায় ভাল ভাল ফুল তুলে দিচ্ছি।"

অতুল দাদার বুকের ভিতর যেন ধড়াস ধড়াস শব্দ হইতে লাগিল—মুখে কোন কথাই নাই। মহামায়া অনেকগুলি ভাল ভাল ফুল তুলিয়া অতুলচন্দ্রকে দিল। চোরের মতন অতুলচন্দ্র সে সকল ফুল গ্রহণ করিল। পাছে কেহ দেখিতে পায়—অতুলচন্দ্রের এই ভয়। এমন সময় লোহিয়া ছাদের উপর হইতে ডাকিল—"মহামায়া!" লোহিয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া অতুলচন্দ্র দ্রুতবেগে সেখান হইতে পলায়ন করিল, আর মহামায়া হতবুদ্ধির ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিমলার গৃহে হঠাৎ পাহাড়ী বাবার আগমনের সহিত লোহিয়ার কোন সম্বন্ধ ছিল কি না—বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি—লোহিয়াই পাহাড়ী বাবার চর। পাহাড়ী বাবা এখানে আসিয়া বিমলার গৃহে বাস করিলেন না, তিনি কালীঘাটের ৺কালীমন্দিরে এবং কেওড়াতলার শ্মশানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি উভয় স্থানেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন, সুতরাং তিনি যে একজন ঘোরতর তান্ত্রিক, সে কথা ঐ অঞ্চলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এই সকল ক্রিয়ার জন্য তাঁহার অন্যের সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইত, এই কারণ তাঁহার দুই তিন জন শিষ্যও জুটিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল রামচন্দ্রের সহিত আমাদের এই আখ্যায়িকার সম্বন্ধ আছে। শূল বেদনা, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি কয়েকটি কঠিন কঠিন রোগেরও তিনি আশুফলপ্রদ ঔষধ জানিতেন এবং আরোগ্যও করিয়াছিলেন এই কারণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে কেওড়াতলার শ্মশানে লোকে লোকারণ্য হইত।

রোগী ব্যতীত তাহাদের মধ্যে অন্য রকমেরও অনেক লোক আসিত। কেহ মোকদ্দমা জয়ের আশায় পাহাড়ী বাবার শরণাগত হইত, কেহ পুত্র কামনায় আসিত, কেহ বা ইহা অপেক্ষা অধিকতর গোপনীয় উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইত। কিন্তু পাহাড়ী বাবা যে কয়েকটি রোগের ঔষধ জানিতেন, কেবল সেই কয়েকটি রোগেরই ঔষধ দিতেন। অন্য কার্য্যে কেহ তাঁহার কোন সাহায্যই পাইত না। তথাপি লোকে অন্য রকম ভাবিত, ব্যর্থমনোরথ হইয়া লোকে ভাবিত—তাহারই দুরদৃষ্টক্রমে তাহার প্রতি বাবার দয়া হইল না।

এইরূপে পাহাড়ী বাবার নাম ও কার্য্য যখন ঐ অঞ্চলে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন হঠাৎ একদিন পাহাড়ী বাবা দুর্গাদাস বাবুর গৃহে দর্শন দিলেন। দুর্গাদাস বাবু সে সময় ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাহ্নিকে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং অতুল ও অনুকূলচন্দ্র আসিয়া পাহাড়ী বাবার অভ্যর্থনা করিলেন। পাহাড়ী বাবা আসন গ্রহণ করিয়া বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় তাহাদের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এই সকল কথাবার্ত্তার সময় অতুলচন্দ্র দেখিলেন—পাহাড়ী বাবার সেই বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি তাহারই মুখের উপর কি জানি কেন স্থাপিত থাকে। অতুলচন্দ্র ইহার কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতে লাগিল—যেন সেই জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর প্রক্ষিপ্ত রশ্মি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিতেছে। অতুলচন্দ্র শেষে আর থাকিতে পারিলেন না—পাহাড়ী বাবাকে স্পষ্ট কহিলেন "পাহাড়ী বাবা, আপনি আমার মুখের দিকে এরূপভাবে চাহিয়া থাকেন কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া পাহাড়ী বাবা উত্তর করিলেন "কোন প্রিয়জনের মুখ তোমার মুখ দেখে মনে পড়ে বলিয়া। তারা—তারা।"

অতুল। আমার মুখের সহিত কি তাঁর মুখের সাদৃশ্য আছে? আপনার সে প্রিয়জন কে?

পাহাড়ী। না—সাদৃশ্য নাই। তুমি যার কথা এখন ভাবছ—সেই আমার প্রিয়জন। তুমি এইমাত্র যাকে দেখতে যাবে মনে করছো—সেই আমার প্রিয়জন। তারা—কুলকুণ্ডলিনী মা আমার।

অতুলচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অনুকূলচন্দ্রও বিস্মিত নেত্রে অতুলের মুখের দিকে চাহিলেন। কি ভাবিয়া অতুলচন্দ্র এই সময় পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং পাহাড়ী বাবার কথাটা উপহাস ছলে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় কহিলেন—"আপনার অনেক আসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনেছি। শুনেছি বুজরুকীতে আপনি একজন অদ্বিতীয়। আপনার দুই একটা বুজরুকী দেখান দেখি।"

পাহাড়ী বাবা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"তোম্‌রা নব্য সম্প্রদায়। ইংরেজী বিদ্যা শিখে যোগবলকে বুজরুকী ভিন্ন আর কি বল্‌বে? কিন্তু তোমাদের গুরু অনেক ইংরেজও এখন আমাদের বুজরুকীতে বিশ্বাস করেন। ফলিত জ্যোতিঃশাস্ত্র তুমি কি বিশ্বাস কর বাপু?"

অতুলচন্দ্র উত্তর করিলেন—"না।"

পাহাড়ী বাবা কহিলেন—"আচ্ছা হাতে হাতে ফল্‌লেই বিশ্বাস কর্‌বে। দেখি তোমার করকোষ্ঠী?"

অতুলচন্দ্র পাহাড়ী বাবাকে করকোষ্ঠী দেখাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু অনুকূলচন্দ্র তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করায় তিনি অগত্যা পাহাড়ী বাবাকে করকোষ্ঠী দেখাইলেন। পাহাড়ী বাবা অতুলচন্দ্রের হাতখানি লইয়া কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে দেখিলেন, তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "তোমার অদৃষ্টে জীবন্মৃত্যু রয়েছে দেখ্‌ছি। তারা—তারা।"

"জীবন্মৃত্যু!"—বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পাহাড়ী বাবার মুখের প্রতি চাহিয়া অতুলচন্দ্র কহিলেন—"জীবন্মৃত্যু! জীবন্মৃত্যু কি রকম পাহাড়ী বাবা?"

অনুকূলচন্দ্রও পাহাড়ী বাবার এই কথা শুনিয়া বিশেষ ভীত হইলেন। তিনি মনে মনে জীবন্মৃত্যুর একটা অর্থ করিয়া কহিলেন—"পক্ষাঘাৎ রোগ হবে না কি পাহাড়ী বাবা?"

পাহাড়ী বাবা উত্তর করিলেন—"না।"

অনুকূলচন্দ্র পুনরায় কহিলেন—"তবে কি মূর্চ্ছারোগ?" পাহাড়ী বাবা এবারও পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"না।"

সে উত্তর শুনিয়া অতুল ও অনুকূল পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাহি করিতে লাগিলেন। পাহাড়ী বাবা কহিলেন, "জীবন্মৃত্যু যাই হউক তোমার অদৃষ্টে স্পষ্টাক্ষরে ঐ কথা

লেখা আছে। তুমি কি তার হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও? তারা—তারা।"

অতুল। আমি কি ইচ্ছা কর্‌লে রক্ষা পেতে পারি?

পাহাড়ী। পার—মনে কর্‌লে সহজেই পার। কখন বিবাহ করো না।

এ কথায় অতুলচন্দ্রের মস্তকে যেন অকস্মাৎ এক বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। অবনত মস্তকে অতুলচন্দ্র স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। পাহাড়ী বাবা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"তুমি যে বালিকাকে প্রাণের সহিত ভালবাস—তাকে বিবাহ কর্‌বার আশা একবারে পরিত্যাগ কর। সে বিবাহের ফল কখনই শুভ হবে না। এমন কি তাকে বিবাহ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও তোমার অদৃষ্টে জীবন্মৃত্যু ঘট্‌বে—কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। সাবধান! অতুলচন্দ্র সাবধান! তারা—কুলকুণ্ডলিনী মা আমার।"

কি ভয়ঙ্কর কথা! অতুলচন্দ্রের মুখে আর কথা নাই। তাঁহার প্রাণের ভিতর এই সময় একটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ শব্দ হইতে লাগিল। অনুকূলচন্দ্র তখন তাঁহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ অতুল, পাহাড়ী বাবার কথা কি সত্য না বুজ্‌রুকী?"

উত্তরে অতুলচন্দ্র সে কথা গোপন না করিয়া কহিলেন—"পাহাড়ী বাবার কথা সত্য—কিন্তু এযে বড় ভয়ঙ্কর সত্য।"

তার পর পাহাড়ী বাবাকে কহিলেন—"পাহাড়ী বাবা, এখন আর সাবধান হবার উপায় নাই। আমি তাকে বড়ই ভালবাসি।"

পাহাড়ী। আমি সে কথা জানি। তোমার পছন্দ খুব ভাল, কিন্তু অদৃষ্ট বড় মন্দ।

এই সময় অনুকূলচন্দ্র কহিলেন—"কে সে বালিকা অতুল?"

প্রশ্ন করিয়াই আগ্রহের সহিত অতুলচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন—যেন সেই প্রশ্নের উত্তরের উপর তাঁহারও জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। অতুলচন্দ্র উত্তর করিলেন—"সে কথা পরে বল্‌বো অনুকূল।"

উত্তর শুনিয়া একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহ অনুকূলের মনে উদয় হইল। সেই সন্দেহের-যন্ত্রণায় তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"কর্ত্তা মহাশয়ের পূজো আহ্নিক শেষ হয়ে গেছে, তিনি পাহাড়ী বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন।

ভৃত্যের কথা শুনিয়া পাহাড়ী বাবা গাত্রোত্থান করিলেন। সে গৃহ পরিত্যাগ করিবার সময় কহিলেন—"অতুলচন্দ্র, নিজের জীবন অপেক্ষা প্রিয়বস্তু আর এ পৃথিবীতে নাই। কেন ইচ্ছা করে আপনার জীবনকে নষ্ট কর্‌বে? তোমার মতন শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র যুবকের সুন্দরী পাত্রীর অভাব হবে না—তবে কেন অপনার অকল্যাণ আপনি টেনে আনো? সাবধান! অতুলচন্দ্র সাবধান! তারা—তারা।"

এই কথা বলিয়া পাহাড়ী বাবা সে গৃহ হইতে দুর্গাদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অতুলচন্দ্র বিষণ্ণ মনে অন্যমনস্কভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনুকূলচন্দ্র কিন্তু অস্থিরভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত অতুলচন্দ্রকে কহিলেন—"কে সে বালিকা অতুল—আমায় বল্‌বে না?"

অতুলচন্দ্র একটু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"মহামায়া।"

অনুকূলচন্দ্রের মস্তকে যেন বজ্রাঘাৎ হইল। তিনি চাবিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

অতুলচন্দ্র অনুকূলচন্দ্রের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু মহামায়ার নাম শুনিয়া তিনি যে সন্তুষ্ট হন নাই সে কথা বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। অতুলচন্দ্র কি ভাবিয়া কহিলেন—"দেখ ভাই অনুকূল, তোমার কাছে কোন কথা গোপন করা উচিত নয় বলেই আমি বলে ফেলেছি। কিন্তু এ কথা আর কারু কাছে তুমি প্রকাশ করো না।"

অল্পক্ষণ চিন্তার পর অনুকূলচন্দ্র উত্তর করিলেন—"আচ্ছা, আমি এ কথা প্রকাশ কর্‌বো না, কিন্তু তুমি মহামায়াকে ভুলে যাবে আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।"

অতুল। সে কি! আমি সে কথা মনে ধারণা করিতেও পারি না। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হবো কি করে?

অনুকূল। তবে তোমার অদৃষ্টে জীবন্মৃত্যুই আছে।

অতুল। জীবন্মৃত্যুর আর আমার বাকী কি আছে? মহামায়াকে না পেলে আমার এ জীবন জীবনই নয়—এত আমার পক্ষে মৃত্যুই বটে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অনুকূলচন্দ্র কহিলেন, "এখন আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। তুমি পরীক্ষার ভাণ করে এতদিন আমাদের ভুলিয়ে রেখেছিলে। এই রকম করে তুমি কি এবার পরীক্ষা দেবে নাকি?"

অতুল। আর আমার পরীক্ষা! এখন মহামায়াকে কি রকম ভালবাসি—কেবল সেই পরীক্ষা দিতে পারি। কলেজের পরীক্ষার কথা আর আমার মনেও নাই।

অনুকূল। পাহাড়ী বাবার গণনায় কি তোমার বিশ্বাস হলো না?

অতুল। বিশ্বাস হওয়া না হাওয়া আমার পক্ষে দুই সমান।

অনুকূল। সে কি! তুমি কি মৃত্যুর ভয় করো না?

অতুল। মৃত্যুর ভয় করি—কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে মহামায়ার আশা পরিত্যাগ করতে পারিব না! এখন এই পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত আছি। ভাই অনুকূল, এ বিষয়ে তুমি আমার অনুকূল হবে কি?

অনুকূল। না—বরং প্রতিকূল হবো। প্রাণ থাক্‌তে মহামায়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে দেবো না।

অতুল। শুনেছি পাহাড়ী বাবা অনেক রকম যাদু জানেন। তোমায়ও তিনি যাদু করেছেন বোধ হয়। পাহাড়ী বাবার কথায় কখন বিশ্বাস করো না। আমি শুনেছি তাঁর নিজেরই কোন কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ কর্‌বার জন্য আমাকে এইরূপ বৃথা ভয় দেখাচ্ছেন। তুমি যদি আমার যথার্থ শুভানুধ্যায়ী ভাই হও, তবে আমি যাতে মহামায়াকে লাভ করতে পারি—সে পক্ষে আমার সাহায্য কর। আমার এ অনুরোধ তুমি রাখ্‌বে না?

অনুকূল। তোমার এ অনুরোধ আমি রাখ্‌তে পারি না।

অতুল। তবে তুমি আমার শুভানুধ্যায়ী ভাই নও। আমি যে তোমায় সহোদর ভাইএর মতন দেখি—তার পুরস্কার কি এই?

অনুকূলচন্দ্র এইবার যেন উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—"তোমার কথাই ঠিক—এখন আর আমি তোমার শুভানুধ্যায়ী ভাই নই। আজ হতে শুন অতুল, আমি তোমার শত্রু—আজ হতে তুমি আমায় শত্রু বলেই জেনো। আজ হতে তোমার অনিষ্ট, আমার ইষ্ট—তোমার অমঙ্গল, আমার মঙ্গল—তোমার অশুভ, আমার শুভ। এমন একদিন ছিল—যে দিন তোমার ইষ্ট সাধনের জন্য আমি হাস্‌তে হাস্‌তে এ জীবন বিসর্জ্জন দিতে পার্‌তুম—যে দিন তোমার মঙ্গলকে আমি নিজের মঙ্গল মনে করতুম—যে দিন তোমার শুভকার্য্যের জন্য আমি নিজের অশুভ অনুষ্ঠানেও পশ্চাৎপদ হতুম না। কিন্তু সেদিন আর নাই—আজ তোমার মুখে যা শুন্‌লুম, তাতে আমার মনে এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তোমার মতন শত্রু আমার আর এ পৃথিবীতে নাই।"

স্নেহপালিত বিহঙ্গম হঠাৎ বিষধর সর্প মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সোহাগে চুম্বনোদ্যত প্রতিপালকের অধরে দংশন করিলে প্রতিপালকের মনের অবস্থা যেরূপ হয়, অনুকূলচন্দ্রের উপরোক্ত কথায় অতুলচন্দ্রের মনের অবস্থাও সেইরূপ হইল। তিনি স্নেহময় ভ্রাতার অকস্মাৎ এই মূর্ত্তিপরিবর্ত্তনে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তার পর হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল—"আমার অপরাধ?"

পূর্ব্বের ন্যায় উত্তেজিতভাবে অনুকূলচন্দ্র উত্তর করিলেন—"তোমার অপরাধ—তুমি বামন হয়ে চাঁদ ধরতে প্রয়াসী। তোমার অপরাধ—তুমি খোঁড়া হয়ে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন কর্‌তে চাও। তোমার অপরাধ তুমি অন্ধ হয়ে, প্রকৃতির শোভা দেখ্‌তে চাও। তোমার অপরাধ—তুমি আজন্ম কালা হয়ে সুমধুর সঙ্গীত শুন্‌তে চাও। আমি থাক্‌তে তুমি যখন মহামায়াকে বিবাহ করতে চাও, তখন তোমার মতন অপরাধী আর কে আছে? কিন্তু সাবধান! তখন না জেনে শুনে যে কাজ করেছ—এখন জেনে শুনে সাবধান হও। শুন অতুল, আর গোপনে কাজ নাই—আমি তোমায় স্পষ্ট বল্‌ছি আমি মহামায়ার প্রার্থী আমি মহামায়াকে ভালবাসি। তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইও না। পাহাড়ী বাবার গণনায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে তুমি মহামায়াকে বিবাহ করলে আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে আন্‌বে। আমার পথ পরিষ্কার কর—তুমি সে আশা ত্যাগ কর।"

অতুলচন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"একি সত্য না স্বপ্ন? একি অনুকূলের কথা না পাহাড়ী বাবার ভোজবাজী?"

অনুকূল। এ স্বপ্ন নয়—সত্য ঘটনা। এ পাহাড়ী বাবার ভোজবাজীও নয় অনুকূলের প্রাণের কথা!

অতুলচন্দ্র তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অনুকূলের ন্যায় উত্তেজিত স্বরে কহিলেন,—"তবে আজ থেকে তোমায় শত্রু বলেই মনে কর্‌বো। পূর্ব্ব স্নেহ, মায়া ও ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিয়ে, তবে আজ থেকে আমি তোমার শত্রু হলুম। শত্রু হলুম বটে, কিন্তু আমি তোমার শত্রুতা কর্‌তে পারবো না। তেমন নীচবংশে আমার জন্ম নয়। আজ থেকে কেবল জান্‌তে পারলুম তুমি আমার ভাই নও—প্রতিদ্বন্দ্বী,—তুমি আমার বন্ধু নও—শত্রু, তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী নও—অশুভাকাঙ্ক্ষী।"

অনুকূল। এতে যদি তোমার ক্ষতিবোধ হয়, তার উপায় কর।

অতুল। বিশেষ ক্ষতি বোধ করি—কিন্তু উপায় কি?

অনুকূল। ইচ্ছা থাকলে উপায়ও আছে। অতুল, আমি তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসি, তুমি ইচ্ছা করে কেন জলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দেবে? ভাই, আমার কথা শোন—মহামায়ার আশা পরিত্যাগ কর। তোমার মঙ্গল হবে।

অতুল। অনুকূল, ভাই, আমায় ক্ষমা কর। আমি প্রাণ থাক্‌তে তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারবো না। তোমার মতন এত নিষ্ঠুর হই নাই যে, সেই সংসার অনভিজ্ঞ সরলা বালিকার মনে কষ্ট দেবো। মহামায়ার প্রতি যদি তোমার যথার্থ ভালবাসা থাক্‌তো তবে তুমি এরূপ প্রস্তাব কখনই মুখে আন্‌তে পার্‌তে না। আমি না হয়—তোমার শত্রু হলুম। কিন্তু সে সরলা বালিকাকে কেন তুমি চিরদুঃখিনী কর্‌বে? আমি যদি তোমার পক্ষে অপরাধী হই—তার কি অপরাধ? এই কি তোমার ভালবাসা? এই কি তোমার ভালবাসার জন্য স্বার্থত্যাগ?

অনুকূল। তোমার এ কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি কি আমায় জানাতে চাও যে, মহামায়াও তোমায় ভালবাসে? মিথ্যাকথা—অসম্ভব—বিশ্বাসের অযোগ্য।

অতুল। যদি তোমার চক্ষু থাকে—যদি আজও স্বার্থে একবারে অন্ধ না হয়ে থাকো—তবে দেখ্‌তে পাবে একথা মিথ্যা নয়—সত্য, অসম্ভব দূরের কথা—সম্পূর্ণ সম্ভব, অবিশ্বাসের অযোগ্য নয়—সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

অনুকূলচন্দ্র তখন বিস্ময়-সাগরে একবারে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। সে কথা মনে স্থান দিতেও যেন তাঁহার অসহ্য কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তিনি আর সে স্থানে থাকিতে পারিলেন না। অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতুলচন্দ্র তখন কথা কয়েকটি শেষ করিয়াই ক্রোধে ক্ষোভে মনোকষ্টে ও মর্ম্মবেদনায় একবারে ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। কি ভাবিয়া আকুল প্রাণে অতুলচন্দ্র একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। অনুকূলচন্দ্রের চিহ্নও তথায় নাই!

ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কবিতাগুচ্ছ।

ছায়া। *

অপূর্ব্ব কবির সৃষ্টি কে তুমি ললনে?
বিস্মৃত বিরহ ব্যথা, জাগাইতে পূর্ব্বকথা,
আসিয়াছ ছায়ারূপে পঞ্চবটী বনে।

উজ্জ্বল বিরহানলে ইন্ধনরূপিনী,
সঙ্গে তব সহচরী বাসন্তী বনের নারী
কহে ভূতপূর্ব্ব কথা বিয়োগকাহিনী।

আজও তেমনি আছে পঞ্চবটী বন,
তেমনি বহিছে তথা গোদাবরী খরস্রোতা,
তেমনি শোভিছে তরু আগেও যেমন।

* ভবভূতির উত্তররাম চরিতের ছায়া সীতাকে উদ্দেশ করিয়া।

তেমনি পুষ্পিতা লতা কানন ভিতর,
কুসুমিত শাখে থাকি, তেমনি ডাকিছে পাখী,
তেমনি নাচিছে শিখী হরষ অন্তর।

ঐ দেখ আর্য্য-পুত্র সম্মুখে পতিত,
শ্যামল সুন্দর কায় বিশীর্ণ কঙ্কালপ্রায়,
বনপথ মাঝে আজি স্মরিয়া অতীত।

অশরীরি-বাণী প্রায় তব কণ্ঠস্বর,
পশি শ্রবণের মূলে কি ব্যথা জাগায়ে তুলে,
বুঝ নাকি ছায়াময়ী বিরহকাতর?

একি খেলা খেলিতেছ প্রাণনাথে ল'য়ে
আজি যুগান্তের পরে তেমনি সোহাগ ভরে
দেখাও ও মূর্ত্তি তব মূর্ত্তিমতী হ'য়ে।

উঠুক হরষে কাঁপি রামের হৃদয়,
মৃদু পুষ্প তুলনায় শোকে দ্রবীভূতপ্রায়
কর্ত্তব্যের পথে যাহা বজ্রসারময়॥

শ্রীদেবব্রত কবিরত্ন।

আদর্শ।

কোথায় সে চিরশুদ্ধ আদর্শ মহান্?
আদরে ধরিব বুকে সমগ্র জীবনে!
কোথায় সে দিব্যমূর্ত্তি দেব মহাপ্রাণ?
সতত নিরখি যাঁরে জুড়াব নয়নে!
কোথা সে নির্ম্মলচিত্ত স্বভাবসুন্দর;
সুস্নিগ্ধ প্রেমের উৎস দিতেছে ঢালিয়া;
কে জুড়ায় চিরদগ্ধ তাপীর অন্তর?
কে রেখেছে মুক্তপ্রাণ এ বিশ্ব ব্যাপিয়া?
কোথা আছ হে আরাধ্য—কোন্ নিকেতনে?
প্রেম আলিঙ্গনে বাঁধি জুড়াও আমায়;
জ্বলে বক্ষ এ সংসার-ভুজঙ্গ দংশনে,
দাও হে কোমল করে অমৃত মাথায়!
হও মোর চিরাদর্শ জীবনে মরণে,
সকলি ভুলিব আমি পূজিব তোমায়!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

তুমি।

তুমি সুপ্ত ভুবনে মধুর উজ্জ্বল
শুভ্র জ্যোছনা হাসি,
তুমি গগনে পবনে বিশ্বভবনে
শান্ত সুষমারাশি;
তুমি স্নিগ্ধ প্রভাতে কুন্দকুসুম
মন্দ সুরভি ঢালা,
তুমি ঝিল্লিমুখর রজনীকণ্ঠে
স্ফুট তারারি মালা;
তুমি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত যমুনা বক্ষে
বিশ্বমোহন তান,
তুমি স্তব্ধ নিশিথে সাহানা বেহাগে
মুগ্ধ বাঁশীর গান;
তুমি পুষ্পখচিত কুঞ্জকুটীরে
শান্তিরূপিনী ছবি,
তুমি পূর্ব্ব গগনে পুলকদীপ্ত
তরুণ অরুণরবি;
তুমি অশ্রুপ্লাবিত উদাস বক্ষে
প্রীতির প্রতিমা সম
এস পূত নির্ম্মল সুন্দর সখা
অন্ধ হৃদয়ে মম!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

প্রদীপ।

৭ম ভাগ।
[৩য় সংখ্যা।]

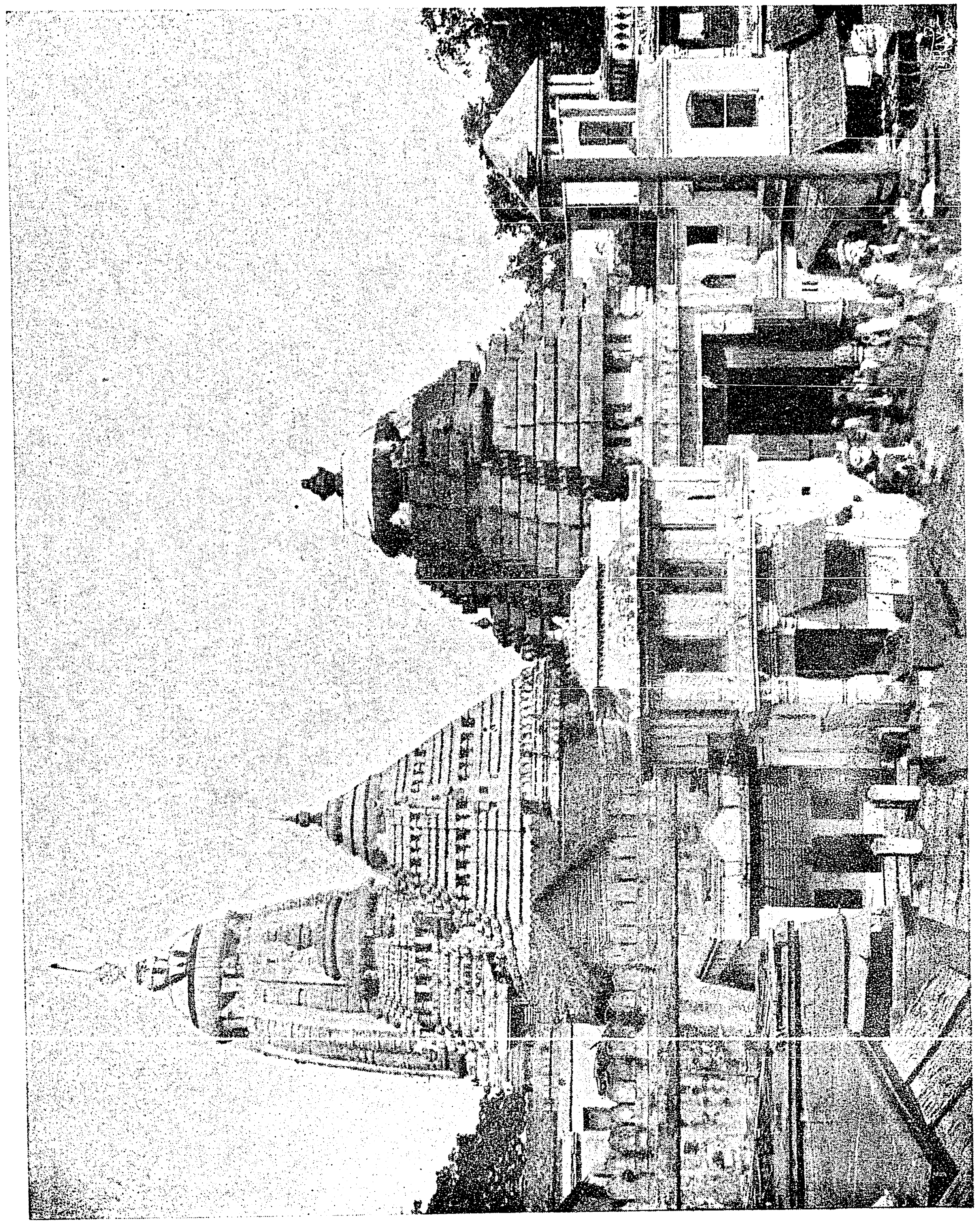

শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির।

৭ম ভাগ। | আষাঢ়, ১৩১১। | ৩য় সংখ্যা।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

বিগত তিন বৎসর কাল এতদ্দেশে বাঙ্গালা ব্যাকরণ লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে। ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়। কলিকাতা সেণ্ট্রাল্ টেক্সট বুক কমিটির সভ্যগণ উক্ত আন্দোলনের জন্য অংশতঃ দায়ী। বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই শত ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ গুলি ছাত্রগণের পাঠ্য এবং কোন্‌গুলি অপাঠ্য তাহা নির্ণয় করিবার ভার টেক্সট বুক কমিটির হস্তে ন্যস্ত আছে। কমিটির সভ্যগণ স্ব স্ব সংস্কার অনুসারে কতকগুলি ব্যাকরণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করেন এবং অপর কতকগুলি একেবারে বর্জ্জন করেন। তাঁহারা কি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই নির্ব্বাচন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন, তাহা সাধারণের অবিদিত। দরিদ্র গ্রন্থকারগণ—বিশেষতঃ যাঁহাদের গ্রন্থ কমিটির অনুমোদিত না হয় তাঁহারা—অত্যন্ত ব্যাকুল অন্তঃকরণে অনুসন্ধান করেন—ব্যাকরণের বিশুদ্ধি ও অশুদ্ধির নিয়ামক কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের প্রশ্নের সমুচিত উত্তর দিবার লোক নাই। টেক্সট বুক কমিটির সকল সভ্যের মত একরূপ নহে। সাহিত্য পরিষদ্, সাহিত্য সভা, সাহিত্য সম্মিলন প্রভৃতি বঙ্গীয় সমিতি সমূহ এখনও কোন আদর্শ বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত করেন নাই।

অথচ বিশুদ্ধ ব্যাকরণ বিদ্যমান না থাকায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সবিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে। অধুনা বাঙ্গালা লেখকগণ কোন নিয়মের বশবর্ত্তী নহেন। তাঁহারা মনে করে তাঁহাদের লেখনী হইতে যাহা নির্গত হয় তাহাই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ। তাঁহাদের এই অনায়াস সুলভ পদ প্রয়োগে বাঙ্গালা রচনার যে কি বিশৃঙ্খলা হইতেছে তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বকালে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিতেন তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ ব্যাকরণ, অভিধান, অলঙ্কার, ছন্দঃ প্রভৃতি শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিতে হইত। শব্দ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে কেহই লেখনী ধারণ করিতেন না। কিন্তু অধুনাতন সাহিত্যের অবস্থা স্বতন্ত্র। আজকাল অনেকেই মনে করেন—যাঁহারা শব্দ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গ্রন্থ লিখিতে যাইবেন, তাঁহাদের রচনা প্রণালী অবশ্যই অস্বাভাবিক হইবে। এই হেতু যাঁহারা শব্দ শাস্ত্রের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহারাই লেখক শিরোমণি বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহাদের লেখন রীতিই অস্বাভাবিকতা দোষ বিবর্জ্জিত বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্বাভাবিক রচনার প্রভাবে ধাতুর চিরন্তন অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, ণত্ব ও ষত্ব

বিধির প্রয়োজনীয়তা একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের প্রভেদ সংরক্ষণ করিবার আদপেই আবশ্যক নাই, এবং রস ভাব গুণ দোষ অলঙ্কার ইত্যাদি শাব্দিক বিধিসমূহ উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে শব্দ শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ বিরচিত হইতেছে, তাহাদের সারবত্তা কতদূর তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বড়ই সুখের বিষয় ১৩০৮ সালের প্রারম্ভ হইতে কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ বাঙ্গালা ব্যাকরণের সূত্র সঙ্কলন কল্পে ব্রতী হইয়াছেন। এই সকল লেখকের সহ সময়ে সময়ে আমাদের মতভেদ হইয়াছে বটে কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা যে বিশেষ প্রশংসনীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণ লইয়া যাঁহারা গত তিন বৎসর কাল নিরন্তর আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের কতিপয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রবন্ধাদির সার মর্ম্মও প্রদত্ত হইল।

১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্যপরিষদের কোন অধিবেশনে "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" শীর্ষক একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ ১৩০৮ সালের পরিষদ্ পত্রিকার ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—এদেশের ব্যাকরণ সমূহ "দুই শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক দুই প্যাটেণ্টে প্রস্তুত হইতেছে; একটী মুগ্ধবোধ প্যাটেণ্ট, গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর একটী হাইলি প্যাটেণ্ট, গ্রন্থকার মাষ্টারগণ। অনেকে আবার দুই প্যাটেণ্ট মিশাইয়া এক প্রকার খিচুড়ী প্রস্তুত করেন। সে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ। তাহাতে যুক্তির লেশমাত্রও নাই; বহুদর্শিতার নামও নাই।" শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত আদর্শে প্রস্তুত, ইংরেজী আদর্শে প্রস্তুত ও উভয়ের মিশ্রণে প্রস্তুত—এই তিন শ্রেণীর বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানা কথা বলিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ইংরেজী ব্যাকরণের সহ সম্বন্ধ না রাখিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত কর। প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন—বাঙ্গালা ব্যাকরণে কণ্ঠ্য তালব্য মূর্দ্ধন্য দন্ত্য ইত্যাদি উচ্চারণ স্থান বিষয়ক বিধি লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বাঙ্গালা ব্যাকরণে সন্ধি ও সমাসবিষয়ক নিয়ম সমূহ বিন্যস্ত করিবারও প্রয়োজন অনুভব করেন না। তাঁহার মতে ঐ সকল নিয়ম যাঁহারা জানিতে চান তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠের কয়েক সপ্তাহ পরেই শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় উক্ত প্রবন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাহিত্য সভায় "জাতীয় সাহিত্য" নামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ সাহিত্য-সংহিতায় মুদ্রিত হইয়াছে। পাঁড়ে মহাশয় ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

১৩০৮ সালের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় "বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত" নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ঐ প্রবন্ধ ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসে সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের প্রারম্ভে রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—উচ্চারণ অনুসারে বানান করা উচিত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রয়োগ করা উচিত নহে।

রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠের দুই এক সপ্তাহ পরেই শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্যপরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে "নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ" নামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয় দ্বয়ের মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধকার বলিয়াছেন—বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে প্রস্তুত করা উচিত।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর প্রবন্ধ পাঠের কিয়ৎকাল পরেই শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া সাহিত্যপরিষদে "বাংলা ব্যাকরণ" নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ ১৩০৮ সালের পৌষ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা দ্বারা অনুমান হয় তিনি বাঙ্গালা ব্যাকরণের সহ সংস্কৃত ব্যাকরণের বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখিতে অনিচ্ছুক।

রবীন্দ্র বাবুর উল্লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া ১৩০৮ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতী পত্রিকায় পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় "ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষা" নামে আর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। উহা ১৩০৮ সালের পৌষ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী এবারেও বলিয়াছেন—সংস্কৃত ব্যাকরণকে ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

১৩০৮ সালের মাঘ মাসের ভারতীতে আমি "ভাষার সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ" নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করি। উহাতে আমি কথিত ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা এতদুভয়ের মধ্যে ভেদ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলাম—কারক বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি ও পদান্বয় এই তিনটী বিষয় বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিজ সম্পত্তি। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রায় আর সমস্ত বিষয়ই সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১৩০৮ সালের সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "বাঙ্গলা ব্যাকরণ" নামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আমার প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া নিজে কতকগুলি সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"আমাদের সাহিত্য সমাজের সুধীগণ স্থূলতঃ দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এক পক্ষ সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী; তাঁহারা সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষার পার্থক্য বজায় রাখিতে ও এমন কি সেই পার্থক্য বাড়াইতে চাহেন। অপর পক্ষ সাহিত্যের ভাষা ও লৌকিক ভাষার পার্থক্য রাখিতে চাহেন না। ইঁহারা সংস্কৃতশব্দ-বহুল বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিরূপ।" রামেন্দ্র বাবু উভয় পক্ষের যুক্তি সমূহ তুলিত করিয়া বলিয়াছেন—উভয় পক্ষের যুক্তিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে। এবং বোধ করি উভয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই শ্রেয়স্কর হইতে পারে।

১৩০৮ সালের সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত" নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তিনিও বোধ হয় বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী করিতে চাহেন না।

১৩০৮ সালে বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। এইরূপ ১৩০৯ ও ১৩১০ সালেও বাঙ্গালা ব্যাকরণ লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে।

১৩০৯ সালে বাঙ্গালা ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে বীরবল (ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়?) কৃত "কথার কথা" নামক প্রবন্ধ সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধ ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক আমার ও পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর মত সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন বাঙ্গালা ব্যাকরণের সহ সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রবন্ধের উপসংহারে বীরবল লিখিয়াছেন—বাঙ্গালার স্কন্ধে সংস্কৃতের মৃতদেহ চাপাইও না; বাঙ্গালার প্রাণ একটুখানি অতখানি চাপ সইবে না।

১৩০৯ সালের সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার ১ম সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গালা কর্ম্মকারক" সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার চিন্তাশীলতা ও বহুদর্শিতার পরিচায়ক। ললিতবাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১০ সালের সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় "বাঙ্গালা কর্ম্মকারক" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা হইতে ও বাঙ্গালা ব্যাকরণের কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা শব্দসমূহের সংগ্রহ ও সমালোচনা বিষয়ে যে সকল মহাত্মা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত বাবু মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত বাঙ্গালা শব্দের যে তালিকা ১৩০৮ সালে সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহাও বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঙ্কলন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিবে।

PAGES MISSING #41 to 80

বাঙ্গালা ব্যাকরণ বিষয়ে সর্ব্বশেষ আন্দোলন গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সংঘটিত হয়। এই সময়ে সাহিত্য পরিষদের কোন বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভাষার ইঙ্গিত" নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমি ঐ প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ" নামে এক প্রবন্ধ ১লা আষাঢ়ের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। দীনেশবাবুর মতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতিভা স্বতন্ত্র। সুতরাং বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন কালে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ অপ্রয়োজন।

যে সকল মহাত্মা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাঁহাদের কতিপয়ের নাম এস্থলে উদ্ধৃত হইল। এতদ্ভিন্ন অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি সভা সমিতিতে উপস্থিত হইয়া ব্যাকরণ সম্বন্ধে স্ব স্ব সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্য হইতে কতিপয় মহাত্মার নাম এস্থলে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নানা প্রসঙ্গে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-নিগড়ে শৃঙ্খলিত করা একান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলেন বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম যতদূর সম্ভব প্রবর্ত্তন করা উচিত কিন্তু ইহাও যেন মনে থাকে যে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের মতে কথিত ভাষার সহ লিখিত ভাষার প্রভেদ যত কম থাকে ততই ভাল। তিনি বলেন—বাঙ্গালা ভাষার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যাকরণের সৃষ্টি করাই উচিত। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয়ের মতে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত করা উচিত। রায় বাহাদুর পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দ্বয়েরও অবিকল এইরূপ মত। সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঙ্কলনের উপযুক্ত কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। অবসর প্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন নাটকাদি লঘু সাহিত্যে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার না করিয়া পারা যায় না, সুতরাং তাহার জন্য কতকগুলি বাঙ্গালা সূত্রের প্রয়োজন। এইরূপ আরও অনেক মহাত্মা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন।

এপর্য্যন্ত অনেক সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। অতএব এবিষয়ে এখনও পুনরান্দোলনের প্রয়োজন। বহু আন্দোলন ও বহু আলোচনা করিতে করিতে অবশ্যই কোন সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যাইবে। সাহিত্য পরিষদ্ এবিষয়ে অনেক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। সাহিত্য সভাও এবিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ভারতী পত্রিকায় নিরন্তরই এতদ্বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনও ইহাতে যোগ দিয়াছেন। কেবল সাহিত্য সম্মিলন এবিষয়ে উদাসীন। সম্মিলনকে বাঙ্গালা ব্যাকরণের আন্দোলনে নিয়োজিত করিবার জন্য আমি আপনাদের সমীপে দুইটী প্রস্তাব উৎথাপিত করিতেছি।

প্রথম প্রস্তাব—বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে কি না?

দ্বিতীয় প্রস্তাব—যদি থাকে তাহা হইলে বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে প্রস্তুত করা উচিত কি না?

প্রথম প্রস্তাবের সপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে তাহার কয়েকটী যুক্তি এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে। ইহার বিপক্ষেও অবশ্য অনেক যুক্তি আছে। ব্যাকরণের সূত্রে বদ্ধ হইলে ভাষা মরিয়া যাইবে। ব্যাকরণ ভাষার প্রাণসংহারক। ব্যাকরণ সূত্রের বজ্র বন্ধনে বদ্ধ হইলেই ভাষার বৃদ্ধি ও ক্ষয় তিরোহিত হয়। হ্রাস বৃদ্ধির অভাবই ভাষার প্রাণহীনতার পরিচায়ক। আমার মনোগত অর্থ একটি উদাহরণ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছি। মনে করুন আপনারা নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া সূত্র করিলেন—"জোড়া কথা তৈরী করিতে হইলে ধাতুর দ্বিত্ব করিয়া প্রথমার্দ্ধের শেষে "আ" ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষে "ই" যোগ করিতে হয়। কিন্তু যেখানে আদ্যক্ষরে ইকার উকার বা ঔকার আছে সেখানে আ প্রত্যয়কে তাহার বন্ধু ওকারের শরণাপন্ন হইতে হয়। যেমন কিলোকিলি,

খুনোখুনি, দৌড়োদৌড়ি * যদি আপনাদের কেহ বাঙ্গালা ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়া পরিশুদ্ধভাবে গ্রন্থ লিখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে আজিই হউক, পাঁচশত বৎসর পরেই হউক, সহস্র বৎসর পরেই হউক, কিলাকিলি অর্থে "কিলোকিলি" এই পদেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু সম্ভবতঃ সহস্র বৎসর পরে কথিত ভাষায় "কিলোকিলি" এই পদের প্রয়োগ থাকিবে না। কথিত ভাষা সাধারণ লোকের ভাষা। সাধারণ লোক ব্যাকরণের অনুশাসন মানে না। সুতরাং কথিত ভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। মানবদেহ যেমন নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, মানব ভাষাও তেমনই নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পাঁচ সাত শত বৎসর পরে কথিত ভাষার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিবে। যখন "কিলোকিলি" এই পদ কথিত ভাষা হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইবে, সাহিত্যের ভাষায় অন্ততঃ আপনাদের ব্যাকরণে তখনও উহা বিদ্যমান থাকিবে। "কিলোকিলি" প্রভৃতি মৃতশব্দ লইয়া আপনাদিগকে সাহিত্যের ব্যবহার চালাইতে হইবে। তখন যদি আপনারা তৎকাল প্রচলিত সজীব কথিত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহা হইলে আপনাদিগকে অধুনাতনকাল রচিত ব্যাকরণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। বস্তুতঃ কথিত ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ব্যাকরণেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রতিদিন অলক্ষ্যভাবে ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে, এবং ঐ সঙ্গে যদি আপনারা ব্যাকরণেরও পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আপনাদিগের সাহিত্যের স্থায়িত্ব থাকিবে কিরূপে? যে সাহিত্য দুই চারিশত বৎসর পরে দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িবে এমন সাহিত্যের প্রয়োজন কি? অথচ বাঙ্গালী জাতির এই অভ্যুদয়ের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টির নিতান্ত প্রয়োজন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে সাহিত্যের উন্নতি ব্যতীত কোন জাতির অভ্যুৎথান হয় না। বস্তুতঃ জাতীয় অভ্যুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হয়। এই হেতু বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি আমাদের সকলেরই কামনীয়। ব্যাকরণ ব্যতীত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ সঙ্কলন নিতান্ত আবশ্যক। ব্যাকরণ সাহিত্যের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেয়। ব্যাকরণই শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্যক্ত করে। বাক্যের মধ্যে পদবিশেষের অবস্থান ব্যাকরণ দ্বারাই নির্ণীত হয়। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত ভাষার গঠন প্রণালী বুঝিতে পারা যায় না।

আমরা দেখিলাম – সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে ব্যাকরণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় অথচ ব্যাকরণের সূত্রে বদ্ধ হইলেই ভাষা মরিয়া যায়। ব্যাকরণ-বদ্ধ ভাষার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? আমার মতে যে সকল শব্দের বা পদের হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সেই সকল শব্দ ও পদকে সাহিত্যের মধ্যে আনয়ন না করাই উচিত। আর যে সকল শব্দ ও পদ পূর্ণ পুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং যাহাদের আর ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই, কেবল সেই সকল শব্দ ও পদকে সাহিত্যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ব্যাকরণ ও সাহিত্য হইতে প্রাদেশিক ও ক্ষণভঙ্গুর শব্দ একেবারেই বিদূরিত করা উচিত। যে সকল শব্দ দেশের সকল লোকে বুঝিতে পারে না এবং যাহা উন্নত সাহিত্যে এখনও স্থান লাভ করিতে পারে নাই। ঐ সকল শব্দ অবশ্যই বর্জ্জনীয়। যে সকল শব্দ বহুস্থান ও বহুকাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল শব্দকেই সবল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে উহারা অত্যন্ত সবল। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র সমূহ যথোচিত পরিবর্ত্তিত করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রয়োগ করিলে বোধ হয় ঐ সকল সূত্রও বহুকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে পারিবে। অতএব সংস্কৃত ব্যাকরণ যে প্রণালীতে রচিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ব্যাকরণ যদি সেই প্রণালীতে রচিত হয়, তাহাহইলে উহা কিছুকাল স্থায়ী হইবে এরূপ আশা করা যায়। এই হেতু আমার মতে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত করা উচিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে যখন বহু সংস্কৃত মূলক শব্দ থাকিবে, তখন বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে সন্ধি ও সমাস পরিত্যাগ করিলে চলবে না। আমরা যখন সাহিত্যে বর্ণবিন্যাসকালে শ, ষ, স, ণ, ন ইত্যাদির ভেদ এখনও রক্ষা করিয়া থাকি, তখন বাঙ্গালা ব্যাকরণে বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ক বিধি ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

* রবীন্দ্র বাবুর "ভাষার ইঙ্গিত"—ভারতী, আষাঢ়, ১৩১১।

ষত্ব ও ণত্বের অধ্যায় বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে তুলিয়া দিলে অর্থবোধের অনেক বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব ঐ বিষয়টী ও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। কৃৎ তদ্ধিত স্ত্রীত্ব ইত্যাদি বিষয়ক সূত্র ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট শব্দ সমূহের ব্যবহার করা কঠিন, অতএব ঐ সকল সূত্রেরও প্রয়োজন। উপসর্গ, অব্যয় ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করেন।

সুপ ও তিঙ অর্থাৎ কারক বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি—এই দুইটী বিষয়ে অবশ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ করিতে অক্ষম। কিন্তু এই দুইটী বিষয়ে ও সংস্কৃত ব্যাকরণের "প্রণালী" অবলম্বিত হইতে পারে। পুরুষ, বচন, কাল ইত্যাদি বিষয়ক বিভাগ বাঙ্গালায়ও প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে লিখিয়া উহার প্রত্যেক অধ্যায়ে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দে প্রযুজ্যমান দুই চারিটী সূত্র যোগ করিয়া দিলেই চলিতে পারে। সেই হেতু আমি বলি সংস্কৃত ব্যাকরণ অলঙ্কার ও ছন্দঃশাস্ত্র মন্থন করিয়াও ঐ সকল শাস্ত্রের ভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাঙ্গালায় ব্যাকরণ প্রস্তুত করুন।

বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহা কে অস্বীকার করিবেন? বাঙ্গালার প্রতিভা ও সংস্কৃতের প্রতিভা এক নহে—তাহাই বা কে অপলাপ করিতে পারেন? বাঙ্গালা ভাষার গতি যে স্বাধীন ও উদ্দাম তদ্বিষয়েও আমার মত ভেদ নাই। কিন্তু যিনি "বাঙ্গালা ভাষার স্বাধীন উদ্দাম গতি"* রুদ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহার নিতান্তই দুঃসাহস। কোন ভাষারই উদ্দাম গতি রুদ্ধ করিতে পারা যায় না। কিন্তু হে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার অভিভাবকগণ দেখিবেন যেন আপনাদের সতর্কতার অভাবে ও নিজের উদ্দাম গতির প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষা ক্ষয় রোগে আক্রান্তা না হন। আপনারা লক্ষ লক্ষ সূত্র করিয়া উদ্দাম ভাষাকে বাঁধিতে যাইতেছেন, কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখেন না যাহা উদ্দাম তাহাকে কখনও বাঁধিয়া রাখা যায় না। উদ্দামের স্বভাব এই যে হয় উহা স্বাধীন গতিতে অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিচরণ করিবে অথবা অন্য কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিবে। উদ্দাম রুদ্ধ হইয়া এক মুহূর্ত্তও অবস্থিতি করিতে পারে না। আপনাদের আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ। আপনারা উদ্দাম ভাষাকে চির কাল ব্যাকরণের সূত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন। আমাদের অভিলাষ অত উচ্চ নহে। আমরা উদ্দামকে বাঁধিতে যাইতেছি না। যে সকল শব্দের উদ্দামতা নাই, যাহা ভাষায় "শীতীভূতো নিরঞ্জনঃ" হইয়া অবস্থিত আছে। আমরা সেই সকল স্থির শব্দকে সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য গঠন করিতে যাইতেছি। মনে করুন আপনারা বাঙ্গালা ভাষার স্বাধীন উদ্দাম গতির অনুসরণ করিয়া "যাচ্ছি", "যেতেছি", "যাতিছি," "যাত্যাছি" ইত্যাদি পদ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু ইহাদের পরিণাম কি হইবে? ইহারা স্বীয় উদ্দামতার প্রভাবে আপনাদের সূত্র ছিন্ন করিয়া ভিন্ন গতি অবলম্বনপূর্ব্বক রূপান্তর গ্রহণ করিবে। আমরা এই সকল উচ্ছৃঙ্খল পদকে শৃঙ্খলা বদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া "যাইতেছি" এই কল্পিত পদ পদ প্রয়োগ করিতেছি। এই পদটী স্থির সুতরাং স্থায়ী সাহিত্যের উপযোগী।

শুধু পদ প্রয়োগ বিষয়ে নহে পদান্বয় বিষয়েও আমাদিগকে এইরূপ চিরাচরিত বা কল্পিত পথের অনুসরণ করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে যতক্ষণ ভাষার গতি স্থির না হইবে ততক্ষণ উহার ব্যাকরণ প্রস্তুত হইতে পারে না।* (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

* বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ, ভারতী আষাঢ় ১৩১১।

* সাহিত্যসম্মিলনের বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

১লা আষাঢ়ের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয়ের প্রবন্ধ পাঠকরিয়া ঢাকার সুবিখ্যাত সাহিত্যসেবী রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর আমাকে ৬ই আষাঢ় তারিখে লিখিয়াছেনঃ—"আপনার কথানুসারে গতকল্য রাত্রে ভারতী অতিশয় মনোযোগের সহিত পাঠকরিয়াছি। * * প্রবন্ধ লেখকদিগের সহিত প্রকৃতবিবাদ কোথায় তাহা আপনি লক্ষ্য করেন নাই, আমি লক্ষ্যকরিয়াছি। বাঙ্গালাভাষায় 'ঢেকি''কুলা''ধুচনী' প্রভৃতি অসংখ্য বস্তু-বোধকশব্দ এবং 'ফুটিল', 'ছুটিল', 'যুটিল', প্রভৃতি নব্য প্রাকৃত ক্রিয়াপদের প্রয়োজন আছে। ইহা আমি বহুকাল হইতে বলিয়া আসিতেছি এবং প্রয়োগ করিয়া দেখাইতেছি। কিন্তু আমাদিগের অর্থাৎ আমি, আপনি ও আর যাঁহারা সংস্কৃতে অনুরাগী তাঁহাদিগের মুখ্য কথা এই যে বাঙ্গালায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্পর্কে সস্কৃত ব্যাকরণকে সম্পূর্ণরূপে সম্মান করিয়া চলিতে হইবে। যথা বাঙ্গালায় কখন ও "মনোহারিণী পন্থা" লিখিব না। মনোহরের স্ত্রীলিঙ্গে'মনোহরা' লিখিব, 'মনোহরী' লিখিব না। আর 'সপক্ষ' স্থলে কখন ও 'সাপেক্ষ' লিখিতে সাহস পাইব না। এই ত তর্ক, এই ত প্রতিবাদ। ইহা লইয়া এত বাদ বিসংবাদের আর স্থল থাকে কোথায়? আপনি কথাটা চিন্তা করিয়া আমাকে জানাইবেন, আর পরিষদের অন্যান্য সভ্যের কি মত তাহাও আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।" প্রঃ লেঃ।

উষা অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধের উক্তিঃ—

চাহগো শুধু, এসেছে বঁধু,
আজিকে তব দুয়ারে
তপন হেরি কমল দল
ঢাকা কি থাকে নীহারে!
ও দুটী আঁখি রেখেছ ঢাকি
তবু অতুল মাধুরী,
মানস অলি পড়িছে ঢলি
ললিত পদে তাহারি।
বুঝিতে নারি তুমি কি প্রিয়ে
চিত্রে আঁকা রূপসী,
অথবা তুমি প্রিয়ার ছবি
আমার প্রিয় মানসী!
অধর যুগ মিশিয়া আছে
তাদের সুখ কত যে,
আমরা দোঁহে মিলিব কবে
অমনি সুখ রভসে!
কপোল আহা উঠিছে কাঁপি
স্বপন বায়ু পরশে,
অধীর মোর অধর ছুটে
হৃদয় ভরা হরষে।
শ্রবণ দুল উঠিছে দুলি
তারাও সুখী আজিকে,
উঠগো বালা নিবার জ্বালা
ফিরাবে কিগো পথিকে?
মেঘেতে ঢাকা চাঁদিমা চারু
সুষমা কত শোভনে;
নিদয় নিদ যাওরে সরি
উঠগো নীল বসনে।
বিরহ নিশি গিয়াছে মিশি
তবু নীরব উষারে,
শুধু কি রবি ঘুমান ছবি
দেখিবে বসি দুয়ারে?

উষার উক্তিঃ—

জাগালে কেন হৃদয় নাথ,
সুখ স্বপন ভাঙ্গালে,
কেন এ ছল. কি হবে বল,
কাঁদায়ে দুখী কাঙ্গালে?
ডাকিলে উষা নিমেষ মাঝে
রবি যে উঠে অমনি,
তোমার তরে বরষ ধরে
কেঁদেছে দীনা রমনী।
দিবস সম প্রহর গেছে,
বরষ সম দিবারে,
সেত গো কভূ চাহেনি ফিরে
পাইনি আমি তাহারে।
আজিকে সখা স্বপন বশে
দেখেছি হৃদি রতনে,
শিয়রে বসি অলক দাম
সরায়ে দিল যতনে।
বদন আনি কহিল কানে
দুইটী কম কথা সে,
শুনিয়া বুক উঠিল ভরি
ঘুচিল সব ব্যাথা যে।
অধর রুচি কপোল তলে
উঠিল যবে ফুটিয়া
উছসি মোর উঠিল হৃদি,
স্বপন গেল টুটিয়া।
এসেছ তুমি, এসেছ নাথ,
চরণে দাসী প্রণতা;
ঘুমায়ে ছিনু ক্ষমহে প্রিয়
বারেক শুন বারতা।
এ সুখ মাঝে জাগা কি সাজে,
এ মৃদু মধু পরশে,
বধির হয় শ্রবণ যুগ,
মুদে যে আঁখি হরষে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চীনদেশীয় মুসলমান।

ঠিক কত বৎসর হইল মুসলমানগণ চীনদেশে আসিয়াছে এবং তাহাদের প্রথম এদেশে আসার উদ্দেশ্যই বা কি তাহার বিশ্বাসযোগ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এবিষয় আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে ক্রটি করি নাই, কিন্তু আশানুযায়ী ফললাভ না হওয়ায় এক্তপ্রকার হতাশ হইয়াছি। সাহেবগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, প্রায় পাঁচ ছয়শত বৎসর হইল কতকগুলি মুসলমান বাণিজ্য করিবার উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথমে এদেশে আইসে। ক্রমে ঐসকল লোক এদেশে বিবাহাদি করিয়া স্থায়ী হয়। তাহাদের বংশধরগণই এদেশের বর্ত্তমান মুসলমানগণ।

আমাদের প্রতিবেশী একজন বৃদ্ধ মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, ঠিক কত বৎসর হইল তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা তাহারা জানে না। তবে এই বলিতে পারে যে চীনদেশের তিনটী রাজবংশ গত হইল তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এদেশে আসিয়াছিলেন। কি উপলক্ষে তাঁহারা এদেশে প্রথম আসেন তাহার কারণ এই "তাৎকালীন চীনরাজ্যে সয়তানের উপদ্রব অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজ্য মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ও দুষ্ট লোকের উপদ্রব বৃদ্ধি হওয়ায় সর্ব্বত্রই অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। চীনসম্রাট শান্তি স্থাপনে অপারগ হইয়া আরবে কতকগুলি মুসলমান সৈন্য চাহিয়া পাঠান। তজ্জন্য "লমুগোয়ে" (আরব) দেশ হইতে তিন হাজার মুসলমান সৈন্য আইসে। ঐসকল সৈন্যের চারিজন সেনাপতি ছিল। তাহাদের তিনজনেরই পথিমধ্যে মৃত্যু হয়, মাত্র একজন চীনদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার নাম ফাওজিম (কাশিম)। মুসলমান সৈন্যগণ পিকিনে উপস্থিত হইলে সম্রাট "তাওয়াং" (Tha wang) তাহাদের সাহায্যে বিদ্রোহিগণকে দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। সম্রাট তাহাদের সৌর্য্যবীর্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদিগকে চীনদেশে বাস করিতে অনুরোধ করেন এবং ইহাদের বিবাহাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। সেই মুসলমানগণের সন্তানাদিতে ক্রমে তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল।

"ইউনান প্রদেশে মুসলমানগণের আগমনের কারণ এই যে টেঙ্গিয়ে* বা মোমিন সহর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় নান্তান (নন্দন) নামক রাজার অধীন ছিল। বর্ম্মাদিগকে তাড়াইয়া এদেশ দখল করিবার জন্য চীনসম্রাট অনেক সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই সৈন্য দলে বহুসংখ্যক মুসলমান ছিল। বর্ম্মাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া টেঙ্গিয়ে ও তন্নিকটবর্ত্তী সানদেশ সকল চীনারা অধিকার করে। মুসলমান সৈন্যদের বীরত্বই নাকি এই যুদ্ধজয়ের প্রধান কারণ। যে সকল মুসলমানগণ এদেশে অর্থাৎ ইউনান প্রদেশে সৈনিককার্য্যে আসিয়াছিল তাহারা পিকিনে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া এদেশেই বসবাস করিতে লাগিল এবং বিবাহাদি করিয়া তাহাদের দলবল বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

মুসলমানদিগকে চীনারা "তহায়েজ" বলে এবং সান ও বর্ম্মাগণ "পথী বলে।" দুর্বৃত্ততায় এবং দুর্দ্ধষতায় মুসলমানগণ সকল দেশেই প্রসিদ্ধ। চীনারা মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। "পাথী হোয়েজ" গণকে চীনারা আদৌ বিশ্বাস করে না। অনেক স্থলে হিন্দুগণ যেমন মুসলমানদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, চীনারাও ঠিক সেই প্রকার করিয়া থাকে। কোন কারবার বা কার্য্যাদি মুসলমানগণের সঙ্গে যদি করিতে হয়, তবে চীনারা পরস্পর বলাবলি করে যে সাবধান "হোয়জের সঙ্গে কারবার!" চীনারা আরো বলে যে "হোয়েজেরা বিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক ও অধর্ম্মী। হোয়েজের ভাত খাও কিন্তু তাহার কথা বিশ্বাস করিও না।" চীনা স্ত্রীলোকগণ পরস্পর ঝগড়া করিলে একজন হয় ত অপর জনকে বলে যে "তুই কি আমাকে হোয়েজে মনে করিয়াছিলি।" বাস্তবিক মুসলমানগণ ইউনান প্রদেশে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে চীনাদিগের উপর বড়ই অত্যাচার করিত। কোন গ্রামে হোয়েজগণ আসিয়া উপস্থিত হইল আশঙ্কায় লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত। তাহারা আসিয়াই গ্রামের মোড়লদিগকে ডাকাইয়া বলিত আহারাদির জন্য মুরগী ভেড়া ও গরু চাই এবং ঘোড়ার খোরাকির

* যেথানে আমরা আছি।

জন্য ধান ও ঘাস চাই। তৎক্ষণাৎ না পাইলে মোড়লদিগের শিরশ্ছেদ করিত এবং গ্রাম লুণ্ঠন করিত। কাহারও কোন সুন্দরী স্ত্রী বা কন্যা থাকিলে তাহা পাওয়ার দাবী করিত, না দিলে জোর পূর্ব্বক লইয়া যাইত। এসকল কথা হিন্দুগণের নিকট বোধ হয় নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। স্ত্রীলোকের সতীত্বের মূল্য অনেক মুসলমানের নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ। আমার ইণ্টারপ্রিটারের (দোভাষীর) বাড়ী টেঙ্গিয়ে নিকট একটী প্রসিদ্ধ গ্রামে। সে বলে যে হোয়েজগণ চীনাদিগের জীবনকে একটা মুরগীর জীবনের সমানও বোধ করিত না এবং সামান্য অপরাধে লোকের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিত। একদা একদল পাথী বা হোয়েজ তাহাদের গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহার পিতামহীর নিকট নানা দাবী করে, এবং তাহাকে অপমান করে। তাহার পিতা তখন ছোট বালক। বালকের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহার পিতামহী তাহার পিতাকে একটা সিন্দুকে পুরিয়া রাখে। হোয়েজগণ জোর করিয়া টাকা কড়ি গহনাদি সমস্তই লইয়া যায়। এ ঘটনা দিনে দুপুরে ঘটে। আমাদের দেশে যেমন যবন কথাটা ব্যবহার হয়, হোয়েজ কথাটাও চীনারা সেই প্রকার ব্যবহার করে।

চীনা মুসলমানগণের পোষাক।

সহসা চেহারা দেখিয়া বুঝিবার যো নাই যে, কে চীনা এবং কে মুসলমান। কেননা গোঁপ দাড়ি প্রায় কাহারো নাই। সকলেরই মাথায় বেণী এবং মাথার দুই তৃতীংশ মুড়ান। সকলের মাথায় একপ্রকার টুপি, পরিধানে একপ্রকার পা জামা ও একই প্রকারের কোট ও জুতা। স্ত্রীলোকদিগেরও একই পোষাক। পা বাঁধা মাথায় খোপা ও অন্যান্য আভরণ, কোট ও পা জামা একই প্রকার এবং কুমারী বালিকাগণের মাথায় বেণী, কপালে কপালী প্রভৃতি সমস্তই অভিন্ন। বিবাহ প্রণালীও প্রায়ই এক প্রকার। স্ত্রী নির্য্যাতন উভয় জাতিরই সমান। বাল্য বিবাহ কাহারও নাই। পাত্রাভাবে বা অর্থাভাবে ইহাদের কুমারীগণও ২৫।৩০ বা ততোধিক বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে। এবিষয়ে ইহারা বঙ্গদেশীয় কুলীনব্রাহ্মণগণের সমকক্ষ।

ধর্ম্মকার্য্য।

চীনাদের যেমন ঘরের মধ্যে কুঠুরিতে দেওয়ালের গাত্রে ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা কথা লেখা লাল কাগজ সকল লাগান থাকে, ইহাদেরও তাই। ইহাদের কাগজ সকল আরবী অক্ষরে লেখা। চীনাদের অনেকের দেওয়ালের গাত্রে দেবমূর্ত্তি স্থাপিত থাকে, এবং ধুনুচিতে ধুনা ও দশাং জ্বালান হয় এবং একখানি করিয়া টেবিল তাহার সম্মুখে থাকে। মুসলমানদিগের কোন মূর্ত্তি স্থাপিত নাই কিন্তু ধুনুচিতে ধূপ এবং দশাং জ্বালান হইয়া থাকে। বৃদ্ধ মুসলমানগণের মধ্যে কেহ কেহ নমাজ বা উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা অতি বিরল। ইহাদের এখন কোন মস্‌জিদ নাই; লড়াইয়ের সময় চীনারা সমস্ত মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া ও পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। চীনা মুসলমানগণ চীনাদের সঙ্গে একত্র আহারাদি করে তবে শূকরটা খায় না। আমাদের দেশী মুসলমানগণ যেমন কোন জন্তু হালাল বা জবাই করিতে হইলে "বিশমোল্লা" বলিয়া আড়াই পোঁচে জন্তুটীর গলার নলীটা কাটিয়া ছাড়িয়া দেয়, চীনা মুসলমানগণ তাহা করে না। ইহারা জন্তুটীর গলনালীর দুই পার্শ্বের দুইটী ধমনীকে পৃথক পৃথক কাটিয়া দেয়। ধমনী কাটিলেই রক্তপাত হইয়া জন্তুটীর মৃত্যু হয়। একটী ছাগল বা ভেড়াকে এই প্রকার মারিয়া পূর্ব্ব কাটা ছিদ্রের সঙ্গে মুখ লাগাইয়া জোরে ফু দিতে থাকে। ফু দেওয়ার পূর্ব্বে একখানা সরু বাঁশের লাঠি চামড়া ও মাংসের ভিতর দিয়া লেজ পর্য্যন্ত চালাইয়া দেয়। এই প্রকার উভয়দিক দেওয়া হইলে পরে ফুদিয়া ভিতরে হাওয়া প্রবেশ করাইয়া দিয়া জন্তুটী ফুলাইয়া উঠায় এবং ক্ষত স্থান কসিয়া বাঁধিয়া অতিশয় উত্তপ্ত জলেয় টবমধ্যে হত জন্তুটি কিছুকাল রাখিয়া পরে সমস্ত পশম ফেলিয়া দেয়। এবং যখন বিক্রয় করে চামড়া সহকাটিয়া দেয়। বিবাহের কলমা পড়ার রীতি বা বালকদিগের সুন্নতের রীতি বিশেষ নাই। স্ত্রীর তাল্লাক দেওয়ার প্রথাও নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু শুনিলাম কোরাণ কাহারও ঘরে নাই।

চীনা মুসলমানদিগের নামও চীনা নামের সদৃশ। "মা ঠিং কান্" "লি লাউদাস, ইয়াং হো সেই" ইত্যাদি।

পাথী মুসলমানগণের চীনা পোষাক পরার কারণ এই

যে চীনদেশে কোন বিদেশী লোক চীনাপোষাক ও চীনা নাম ভিন্ন বাস করিতে পারিত না। অনেক ইউরোপীয় পাদ্রিগণ চীনাদেরমত মাথা মুড়াইয়া বেণী রাখিতেন, এবং চীনাপোষাক পরিয়া থাকেন এবং সকলেরই চীনা নাম আছে। পিকিনের যুদ্ধের পর হইতে চীনেরা অনেক নম্র হইয়াছে এবং বিদেশী লোককে ভয় করিতেছে, নচেৎ আমাদেরও মাথায় বেণী রাখিতে হইত।

যে ফটোগ্রাফ এই স্থানে প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই চীনদেশী মুসলমানের চেহারা অনুভূত হইবে। নিম্ন-শ্রেণী লোকদের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি বাঁধে কেবল এই একটু পার্থক্য।

চীনা ও মুসলমানে যুদ্ধ।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাৰ্থী মুসলমানগণ প্রবল হইয়া রাজবিদ্রোহী হয় এবং চীনা সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া প্রায় সমস্ত ইউনান প্রদেশের শাসন ভার আপনা-দিগের হস্তে গ্রহণ করে। টালিপু নামক প্রধান সহরই ইহা-দের রাজধানী হয়। টালিপু এখান হইতে ১২ দিনে পথ এবং এই নগর সমুদ্র হইতে হাজার ফুট উচ্চে স্থাপিত। প্রায় বিস বৎসর যাবৎ পাৰ্থীগণ এদেশে রাজত্ব করে। এই বিস বৎসর কালএদেশে ঘোর অরাজকতা এবং নৃশংসতার লীলাভূমি হইয়াছিল। যদিও এই সকল ঘটনা বেশী দিনের নহে তবুও ইহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। হয়ত যে সকল লোকের নিকট আমি অনুসন্ধান করিয়াছি তাহারা ইহার প্রকৃত সংবাদ রাখে না। মুসলমানদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া এ প্রদশের চীনাগণ বাদসাহের নিকট ক্রমে আপনাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা করায় চীন সম্রাট বহু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন এবং সেই সঙ্গে ইউনান প্রদেশের সমুদয় চীনা, মুসলমান-দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। প্রায় দুই তিন বৎসর যাবৎ এই প্রকার নানা স্থানে লড়াই হইয়া প্রজার সর্ব্ব-নাশ হয়। প্রথমত চীনারা পরাভূত হয়। পরে চীন সৈন্য-গণ জেনারেল “ইয়াং ইঃ হো” নামক বিখ্যাত সেনা-পতির অধীনে টালিপু নগর পুনরায় আক্রমণ করে। টালি-পুতে ঘোর যুদ্ধ হয়, অসংখ্য চীন সৈন্যের সঙ্গে পাৰ্থী মুসলমানগণ আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া পাৰ্থী রাজা টুয়েনসিও * আত্ম সমর্পণের প্রস্তাব করে এবং চীনা জেনারেলের নিকট প্রণদান প্রার্থনা করে। জেনারেল ইয়াং ইঃ হোও তথাস্তু বলিয়া পাৰ্থীগণকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে আদেশ করেন এবং নগর প্রাচীরাভ্যান্তরে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিয়া চীন সম্রাটের পতাকা উড্ডীন করেন। জেনারেল তখন হৃষ্ট মনে পাৰ্থী দলপতিগণকে নিমন্ত্রণে আহ্বান করেন। পাৰ্থীগণও মহা সন্তুষ্ট চিত্তে জেনারেলের মহত্বে মুগ্ধ হইয়া সাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পাৰ্থী রাজা ও সরদারগণ নিম-ন্ত্রণ রক্ষার জন্য জেনারেলের গৃহে উপস্থিত হইলে ইয়াং ইঃ হোর আদেশে চীনাগণ অতি ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে পাৰ্থীদলপতিগণের শিরশ্ছেদ করেন। দলপতি-গণের শিরশ্ছেদ হওয়ার পর চীনাগণ যেখানে যেখানে পাৰ্থীকে দেখিতে পাইয়াছিল, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল-কেই এক দিনে হত্যা করে। সেই এক দিনে ত্রিশহাজার পাৰ্থীর মাথা কাটা যায়। টালিপু হইতে পাৰ্থীগণ নিপাত হইলে শেষে ইউলছালফু নামক সহরে পুনরায় যুদ্ধ হয়, তথায়ও পাৰ্থীগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া অধিকাংশ হত হয় অল্প সংখ্যক পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে। ইতিমধ্যে টেঙ্গিয়ে বা মোমিন সহরে ঘোর লড়াই হয়। পাৰ্থীগণ এখানেও পরাজিত হইতে লাগিল। এই সময়ে এদেশের যে দশা হইয়া ছিল তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত পল্লীর স্ত্রীলোক ও বালকগণ পর্য্যন্ত পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। কৃষি কার্য্য ও বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় বহু লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছিল। ইহার মধ্যে যখন মুসলমানগণ সুযোগ পাইত তখন চীনাদের শিরশ্ছেদ, গৃহ লুণ্ঠন এবং গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। আবার চীনা-রাও ফাঁক পাইলেই ঐ কার্য্যের প্রতিশোধ লইত। পাৰ্থী ও চীনাদের যুদ্ধের কারণ প্রথমোক্তগণ বলে যে চীনারা জোর করিয়া পাৰ্থীদিগকে শূকর খাওয়াইতে চেষ্টা করিত, এবং তাহাদের ধৰ্ম্ম কার্য্যের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই নানাবিধ অন্যায় আচরণ করিত।

আমার সংবাদদাতা বৃদ্ধ মুসলমান বলিল যে যখন এই যুদ্ধ হয় তখন তাহার বয়স ১৭ বৎসর সে নিজেও লড়াই

* টুয়েনসিওর মুসলমান নাম সোলেমান।

করিয়াছিল। সে বলিল যে, এই টেঙ্গিয়ে সহরে তিন হাজার ঘর হোয়েজ বা পাথী ছিল এবং পাথীগণের মত ধনী কেহ ছিল না এবং এখন এখানে মাত্র ২০১২৫ ঘর পাথী আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা প্রাণে কেমন করিয়া বাঁচিলে? তাহাতে সে বলিল, যেমন বেড়াজালে ঘেরিয়া মৎস্য ধরে, বড় বড় মৎস্য সকল জালে আবদ্ধ থাকে এবং ছোট ছোট মৎস্য সকল জালের পাশ কাটিয়া পলায়ন করে, আমরা যে কয়েক জন আছি সেই মতে অন্যত্র পালাইয়া বাঁচিয়াছিলাম। বাস্তবিক টেঙ্গিয়েতে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা পূর্ব্বকার সহরের ভগ্নাবশেষ মাত্র। নগর প্রাচীরের বাহিরে অসংখ্য উজাড় বাস্তু দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্তই মুসলমানগণের আবাস স্থান ছিল। টেঙ্গিয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ অনেক চীনা গ্রামেও উজাড়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

টেঙ্গিয়ে নগরে পাথী সরদার "মাপিয়ানসি" অত্যন্ত নামজাদা হইয়া উঠিয়াছিল। চীনারা বলে যে সে এমন নিষ্ঠুর ছিল যে, আপন হাতে কত শত চীনার প্রাণবধ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। টেঙ্গিয়ে নিকটবর্ত্তী সা-ইলঃ নামক গ্রামে মাপিয়ানসি চীনা জেনারেল কর্ত্তৃক ধৃত হয়। চীনা জেনারেল মাপিয়ানসীর জীবিতাবস্থায় সমস্ত গাত্রের চর্ম্মোত্তলন করিয়া তদ্দ্বারা ঘোড়ার চাবুক প্রস্তুত করে এবং সেই অবস্থায় ইহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হৃদ্‌পিণ্ড বাহির করিয়া লইয়া তবে তাহাকে হত্যা করে। এই হৃৎপিণ্ড তেলে ভাজিয়া মাপিয়ানসীর নিষ্ঠুরতার প্রতিহিংসা স্বরূপ জেনারেল স্বয়ং তাহা আহার করে। এই জেনারেলের মূর্ত্তি নাকি এখনও টালিপুদের মন্দিরে আছে।

যুদ্ধকালে পাথী রাজা টুয়েনসিওর পুত্র সপরিবারে ব্রহ্ম দেশে পলায়ন করেন এবং তথায় গিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ও বর্ম্মা রাজার নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি ইতি মধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, পাথীগন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নির্ম্মূল প্রায় হইয়াছে তখন নিরাশ হইয়া ইংরেজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রেঙ্গুনে বাস করিতে লাগিলেন। ইংরেজ সরকার হইতে মাসিক পেন্সনও পাইতে লাগিলেন। এই পাথী বংশের সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব পরিবার নাকি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁহদের বিস্তরিত বিবরণ জানি না।

আমাদের প্রতিবেশী ৫৬ ঘর পাথী আছে। ইহারা অল্প দিন হইল এখানে আসিয়াছে। যুদ্ধ অবসানের পর যে সকল পাথীগন ছত্রভঙ্গ হইয়া স্থানান্তরে গিয়াছিল তাহারা পুনরায় এখানে প্রত্যাগমনের প্রার্থনা করায় চীন রাজ কর্ম্মচারিগণ আদেশ করিলেন যে, প্রতিগ্রামে এক ঘর পাথীর বেশী থাকিতে পারিবে না বাস্তবিক সেইরূপই হইল। কিন্তু এদেশে ইংরেজের আগমনে পাথীগণ অনেক আশ্বস্ত হইয়াছে। ক্রমে দুই এক ঘর করিয়া এখানে আসিতেছে। বলা বাহুল্য যে রেঙ্গুনের এবং ব্রহ্মদেশের বিতাড়িত পাথীগণই ইংরেজের এদেশের ভেদ নীতির সহকারী। পাথীগণ আশা করে কালে তাহাদের দুর্গতি দূর হইবে। আজ ৩০ বৎসর হইল পাথী যুদ্ধ হইয়াছে। এবার পাথীগণ এক মস্‌জিদ প্রস্তুত করিতেছে।

কয়েক জন পাথী চীন সরকারে সৈনিক বিভাগে কার্য্য করে। ইহাদের মধ্যে মাঠিংফাং নামক ব্যক্তিই বিখ্যাত। টংকুইনে ফরাদিগের সঙ্গে চীনাদের যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে মাঠিংফার খুব শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইয়া ছিল তাই ইহার এখন পদ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহারই বাটীতে আমি বাস করি।

শ্রীরামলাল সরকার।

স্যর এড্‌ুইন আর্ণল্ড।

কবিবর! কি মধুর মোহিনী সঙ্গীতে
গেয়েছিলে পুণ্যময় অপূর্ব্ব কাহিনী!
অমৃত সমান কথা প্রাণে তৃপ্তি দিতে
ঝঙ্কারিল ও বীণায়!—সুধা নির্ঝরিণী,—
বিচিত্র সৌন্দর্য্য দৃষ্টি নয়নে তোমার,
বিকশে প্রতিভা তব ভারত-ভুবনে;
নিরখিয়ে তাজহর্ম্ম্য কূলে যমুনার,
জাগাইলে কি উচ্ছ্বাস্ প্রেমের স্বপনে!—
কি মহান্! কি সুন্দর! স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল!
হাসিছে যশের উষা বাসন্তী যৌবনে!
ক্ষুদ্র এ অপরাজিতা কবির সম্বল—
অর্ঘ্যরূপে দিনু আজি তোমার চরণে,
অর্দ্ধস্ফুট গীতি মহা বিস্মৃতি-মন্দিরে,
বাজিবে কি কর্ণে তব? ধীরে অতি ধীরে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

পরীরাজ্য।

গতবারে আমরা বর্ম্মার ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছিলাম। উপস্থিত প্রবন্ধে অপরাপর কয়েকটি আবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়া ইহার উপসংহার করিব।

আমাদের উল্লিখিত নমুনা দেখিয়া অনেকে হয়ত পরী-রাজ্যের ভাষাকে নিতান্ত শ্রুতি কঠোর জ্ঞান করিতে পারেন। নূতন ভাষায় ওরূপ জ্ঞান হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু ভাষাবিদেরা এই আপাত শ্রুতিকটু ভাষাকে 'কবির ভাষা' বলিয়া যথেষ্ঠ প্রশংসা করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানের প্রচলিত ভাষা সকলের মধ্যে পার্শী ভাষা (প্রাচীন পারস্যের ভাষা) যেমন শ্রুতি মধুরতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, বর্ম্মাভাষাও প্রায় তদ্রূপ বিখ্যাত। বর্ম্মাবাসিগণের প্রাচীন ও নব্য সাহিত্য খুব বিস্তৃত না হইলেও নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে। অনেকগুলি সুন্দর কাব্য, নাটক, কথা-গ্রন্থ প্রভৃতি এই জাতিকে প্রাচীন সভ্য জাতিগণের প্রায় সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। এসিয়াবাসিগণ প্রাচীন সময়ে বিধাতার কোন্ অদ্ভুত উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিতে পারি না। এই মহাপ্রদেশের প্রাচীন রাজ্য জাতিগণের সাহিত্য ধমনীতে সেই একই শোণিত প্রবহমান। ফর্দোসির সাহনামা, কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্য শিল্পিগণের অতুলনীয় কীর্ত্তি মূলে সেই ভাল বাসার সমাবেশ, বিস্তৃতি, বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি। এক কালিদাসের কয়েকটি চরিত্র ছাড়িয়া দিলে প্রাচ্য-দেশে উরোপীয় মহাকবি সুলভ সর্ব্বতোমুখি প্রতিভার অস্তিত্ব আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য বর্ম্মা সাহিত্য এই এসিয়াব্যাপী ভালবাসা রোগ হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বর্ম্মাভাষা, প্রাচীন বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ন্যায়, দর্শন, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে নিতান্ত দরিদ্র। যাঁহারা ঐ সকল উচ্চ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে চাহেন, তাঁহারা সাধারণত পালিভাষার ও তৎপরে আমাদের দেবভাষা সংস্কৃতের আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন। এক সময়ে ভারতে সংস্কৃতের যে আদর ও সম্মান ছিল, বর্ম্মায় পালি এখন পর্য্যন্ত তাহা অধিকার করিয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক পালি ভাষায় লিখিত। এই জন্য বর্ম্মার ফুংঙি বা ভিক্ষুগণের ঐ ভাষা বাধ্য হইয়া শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ছাত্রগণের পক্ষে ঐ দেবভাষা ততদূর আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাহারা প্রথমে সামান্য দুই একখানি ব্যাকরণ পাঠ করিয়া মাতৃভাষায় লিখিত কাব্য ও নাটক আরম্ভ করে। অবশেষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দেবভাষায় কয়েকটি সামান্য শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া পাঠ সমাপ্ত করে।

শিক্ষার এই প্রকার সঙ্কীর্ণতাবশতঃ বর্ম্মাজাতিরা আমোদের 'টোলের' ছাত্রের ন্যায় নিতান্ত কুসংস্কারাপন্ন। তাহারা নিজেদের দেশ, ভারত ও চীন ভিন্ন অপর কোনও দেশের বড় একটা সংবাদ রাখিতে ভাল বাসে না। বর্ম্মায় ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ইহারা মনে করিত যে, জগতের মধ্যে বর্ম্মাই একমাত্র সভ্য দেশ। প্রাচীন হিন্দুরা যেমন ভারত বহির্ভূত জগতকে 'ম্লেচ্ছ' জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেন, প্রাচীন গ্রীকেরা যেমন অপর সকলকে 'বারবরস্' Barbarous বলিয়া ঘৃণা করিতেন, বর্ম্মাবাসীরা তদ্রূত জগতের অপর সমস্ত জাতিকে 'কালা' নামে অভিহিত করে।

বর্ম্মাবাসীরা বৌদ্ধ, এই জন্য প্রাণীহত্যা ইহাদের মধ্যে মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু অপর কেহ হত্যা করিলে ইহারা বিনা আপত্তিতে তাহা উদরসাৎ করিতে প্রস্তুত। পাপকার্য্যে এই ধর্ম্মাচ্ছাদন নিতান্ত অমার্জ্জনীয় হইলেও, জগতের ইতিহাসে দুর্ল্লভ নহে। হিন্দুশাস্ত্র মতে যে হিন্দু বৃথা মাংস ভক্ষণ করে সে বিষ্ঠা ভোজন করে এবং ঐরূপ কার্য্যের জন্য তাহাকে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সেই জীবকে যদি দেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া, তাঁহার সম্মুখে হত্যা করা যায়, তাহা হইলে সে কার্য্যে পাপ দূরের কথা, বহুল পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের ঐ দেবীর সম্মুখে বলিদান নৃসংশতার উন্নতাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহাকে আমরা দেবী বলি, তিনিই যে জগৎজননী তাহা হিন্দু মাত্রেই স্বীকার করেন। যদি তাহাই

হয়, তবে তিনি হত্যা কার্য্য কিরূপভাবে অনুমোদন করিতে পারেন? তাঁহার কাছে ত সকলেই সমান। হতজীবের অপরাধ এই যে সে দুর্ব্বল ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ। এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী জগৎজননীও অসহায় দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি অধিকতর স্নেহশীলা হইবেন। দুর্ব্বল অসহায় জীব জন্তুকে জঠর পোষণার্থ হত্যা কর, আপত্তি করি না। কিন্তু তাহার মধ্যে দেবদেবীর দোহাই দিয়া আত্ম দোষ ক্ষালনে চেষ্টা করিও না। ইহা নিতান্ত অসহ্য।

যাহা হউক কথায় কথায় আমরা অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। ভরসা করি নিরপেক্ষ পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। আমরা বলিতেছিলাম যে বর্ম্মাবাসীরা স্বহস্তে জীবহত্যা করে না বটে, কিন্তু অপরের নিহত জীব অনায়াসে গ্রহণ করে। কিন্তু ওরূপ হত্যাকারী সর্ব্বদা সুলভ নহে বলিয়া তাহারা এক ঘৃণিত উপায়ে মাংসাহার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। হত বা মৃত প্রাণী তাহারা প্রথমে যথেষ্ট সংখ্যক সংগ্রহ করে; তাহার পর ঐসমুদয় একত্রে মিলিত করিয়া পচাইতে আরম্ভ করে। যখন তাহার ভিতর হইতে এক অপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ন্যাক্কারজনক দুর্গন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহা অতি যত্নের সহিত চট্‌কাইয়া তাল পাকাইয়া ফেলে। ঐ ঘৃণিত নারকীয় দ্রব্যের নাম 'নাপ্পী'। ইহাতে প্রায় সমস্ত জন্তুর মাংস মিশ্রিত থাকে। এমন কি সর্প ইন্দুর, মার্জ্জার, আরশুলা প্রভৃতিও পরিত্যজ্য হয় না। বর্ম্মাবাসীরা সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যে নাপ্পী মিশ্রিত করে। প্রথম প্রথম নবাগতের পক্ষে ঐ নারকীয় দ্রব্যের তীব্র ও উৎকট গন্ধ নিতান্ত অসহনীয় হয়। সুখের বিষয় অধুনা ইংরাজি সভ্যতা ও শিক্ষার গুণে নাপ্পীর প্রচার দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এই বিষ ভক্ষণ দ্বারাই যে তাহাদের নানাবিধ কায়িক ও মানসিক অবনতি সাধিত হইতেছে, তাহা এখন তাহাদের অনেকের মনে বিশেষরূপে স্থানলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

ইংরাজ পরশমনি স্পর্শে বর্ম্মা রাজ্যের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে বর্ম্মাবাসীরা অজ্ঞানতার নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তখন ইহাদের মধ্যে জাতীয় জীবন বা জাতীয় শিক্ষার বিশেষ কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইত না। অহিফেনের ঘোরে অবসন্নপ্রায় উপবিষ্ট থাকা বা জুয়াখেলায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়া ভিন্ন ইহাদের অপর কোনও বিশেষ কার্য্য ছিল না। এখন সে অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন নগরে নগরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। ইহারা যাহাতে অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন না করে, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। পূর্ব্বে বর্ম্মাবাসীরা অহিফেণের সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মাত্রায় সুরা সেবন করিত। ঐ অনিষ্টস্রোত নিবারণ কল্পে সদাশয় ইংরেজ বাহাদুর এখানে আইন করিয়াছেন যে, কোনও মদ্য বিক্রেতাই ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক মদ্য বিক্রয় করিতে পারিবে না, অথবা কোন বর্ম্মান্ মদ লইয়া নিজের বাসগৃহে যাইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্টের এই নিয়ম যে অত্যন্ত মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচায়ক তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রত্যের কার্য্যে খুঁত ধরিতে ভালবাসে। ইহারা বলে, মাদক দ্রব্য বিষয়ে সরকার বাহাদুরের নিয়মাবলী বিন্দুমাত্র মহত্ত্ব বা উদারতা প্রকাশ করে না। বর্ম্মা নববিজিত রাজ্য উহার অধিবাসীরা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, তদভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট ঐসকল মুখরোচক আইন, কানুন বিধিবদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু যখন তাহারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন হইবে, তখন গবর্ণমেণ্ট স্বমূর্ত্তি ধারণ করিবেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে এই মত নিতান্ত যুক্তিহীন। আফিং ও মদ বর্ম্মাবাসীর নিতান্ত প্রিয় সামগ্রী। গবর্ণমেণ্টের এই আইনদ্বারা তাহারা সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা বলে, তাহারা কি খায় না খায় তদ্বিষয়ে আইন প্রচলন করা সরকার বাহাদুরের নিতান্ত অন্যায়। লোকপ্রিয় হইবার ইচ্ছায় যদি ইংরাজ ঐ প্রকার নীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ত আমরা তাহাতে কোন অন্যায় দেখিতে পাই না। লোকপ্রিয় হওয়া শাসনকর্ত্তাগণের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। তাহার জন্য যাহারা তাঁহাদিগকে দোষী প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হয় তাহারা হয় বাতুল নতুবা নির্ব্বোধ।

বর্ম্মাবাসিগণের উন্নতি সাধনার্থ ইংরাজ যে যৎপরো-

নাস্তি প্রয়াস পাইতেছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অজ্ঞানতার নিবিড় অমানিশায় আচ্ছন্ন স্বাধীন ব্রহ্মকে ইংরাজরাজ যে দিন দিন সভ্যতার ও জ্ঞানের পবিত্র আলোকে আনয়ন করিতেছেন, তাহা নিরপেক্ষ ভ্রমণকারী মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় ইংরাজের ঐ চেষ্টা অনেক সময় আশানুরূপ ফললাভে সমর্থ হইতেছে না। ইহার কারণ কি?

বর্ম্মাবাসীরা মুখে যাহাই বলুক, মনে মনে তাহাদের নবীন শাসন কর্ত্তাগণের কার্য্য কলাপের উপর আদৌ সন্তুষ্ট নহে। তাহারা মনে করে, আফিং ও মদ খাইয়া তাহাদের সময় দিব্য আরামে অতিবাহিত হইতেছিল। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বর্ম্মা চাউলের জন্য বিখ্যাত। এখনও অনেক স্থানে টাকায় ২৩।২৪ সের চাউল পাওয়া যায়। আফিং ও মদ সম্বন্ধে প্রায় ঐরূপ বলা যাইতে পারে। বিশস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছিলাম যে, তথায় টাকায় আধসের তিনপোওয়া আফিং ও সাত আট বোতল সুরা পাওয়া যায়। শুনিলে প্রথমে গল্প বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহার মধ্যে একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নাই। যে দেশে লক্ষ্মীদেবী এরূপ দশভুজা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তথাকার অধিবাসীরা যে অলস ও নিতান্ত অপদার্থ হইয়া পড়িবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? যাহা হউক ইংরাজ বাহাদুর আসিয়া তাহাদের নেশার মূলে ভীষণ অশনি প্রহার করাতে যে বর্ম্মাবাসীরা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই অসন্তোষ নিবন্ধন তাহারা গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক সাধু উদ্দেশ্যে বা প্রস্তাবে অন্তরায় হইবার প্রয়াস পায়। ইংরাজি শিখাইবার জন্য সরকার বাহাদুর বহুবিধ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংসের বিশ্বাস ইংরাজি, শিক্ষা তাহাদের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর হইয়া পড়িবে। ঐ কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া ইহারা ইংরাজি শিক্ষার উপর নিতান্ত খড়্গহস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এই সুবিশাল রাজ্যে ২০।২৫ টির অধিক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় নাই। ঐসকল বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যাও নিতান্ত অল্প। সমস্ত দেশের মধ্যে দুইটি কলেজ আছে এবং এক্ষণে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হয়। যাহাতে অধিবাসীরা ইংরাজি বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হয় তদভিপ্রায়ে বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট, সামান্য ইংরাজি জানিলেই ইহাদিগকে সরকারি আফিসে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যে প্রলোভনে ভারতবাসী সর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত, সেই প্রলোভনে পড়িয়াও ইহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। সরকারি আফিসে অতি উচ্চবেতনে চাকুরী করা অপেক্ষা সামান্য দুই বিঘা জমির উপসত্ত্বে প্রাণধারণ করা ইহারা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া চাকুরী ভিখারী ভারতবাসীকে প্রতিপালন করিতেছেন।

আজকাল ভারতে চাকুরীর যে অগ্নি মূল্য, তাহাতে তথায় চাকুরী লাভ করা (বিশেষতঃ সরকারী দপ্তরে) দিন দিন এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িতেছে। আমার মতে আমাদের স্বদেশী ভায়ারা যদি একবার দেশের মায়া মমতা কাটাইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তবে তাঁহাদের বোধ হয় আর চাকুরীর দুর্ভিক্ষ অনুভব করিতে হয় না। এখনও বর্ম্মাবাসীরা চাকুরীর মধুরতা জানিতে পারে নাই। তজ্জন্য এখানে চাকুরী পাওয়া বড় একটা কষ্টকর ব্যাপার নহে। আমি যখন বর্ম্মায় অবস্থান করি, তখন তথায় দুইবৎসরের মধ্যে সাতজন বাঙ্গালী যুবক যাইয়া উপস্থিত হয়েন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন এণ্ট্রান্স পাশ ও বাকী কয়েকজন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর অধিক অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু নিতান্ত সুখের বিষয় এই যে তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও দুইমাসের অধিক অপেক্ষা করিতে হয় নাই। এখন বোধ হয় তাঁহারা প্রত্যেকে গড়ে মাসে ৫০।৬০ টাকা রোজগার করিতেছেন।

বর্ম্মা নিতান্ত দূরদেশ বলিয়া অনেকে তথায় গমন করিতে সম্মত হয়েন না। কিন্তু চাকুরীর জন্য বাঙ্গালীর ছেলে যখন উগাণ্ডা, মম্বাশা, আসাম, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ পর্য্যন্ত যাইতেছেন তখন বর্ম্মায় যে কেন যাওয়া যায় না বুঝিতে পারি না। যখন চাকুরীর জন্য জীবনের প্রিয় নিকেতন জন্মভূমি ও আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিতে হইতেছে, তখন দূরত্বের সামান্য আপত্তি তুলিয়া বর্ম্মায় না যাওয়া নিতান্ত মূর্খতার কাজ। এখন সংসারে ভীষণ জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence) উপস্থিত। যাঁহারা কর্ম্মপটু, কষ্টসহিষ্ণু ও বিদেশ গমনে নির্ভীক,

এসংগ্রামে তাঁহারাই জয়লাভ করিবেন (survival of the fittest) এখন আর অদৃষ্ট নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিলে সংসারে উন্নতিলাভ করা যায় না। সাহেবেরা 'সাত সমুদ্র তেরনদী' পার হইয়া ভারতবর্ষ, মালায় দ্বীপপুঞ্জ, এমন কি সুদূর অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত গমন করেন। আজ যদি তাঁহারা আমাদের মত 'তাতস্য কুপমিতি ব্রুবাণা কাপুরুষা ক্ষারং জলং পিবন্তি' মতাবলম্বী হইয়া গৃহিনীর 'অঞ্চলের মানিক' হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আর আমরা তাহাদিগকে জগতের শীর্ষদেশে অবস্থিত দেখিতে পাইতাম না। অদৃষ্ট সাহসী লোকের দাস (Fortune rewards the brave).

অনেকে বলেন, বর্ম্মা দরিদ্র দেশ। আমি কিন্তু দেখিয়াছি, অন্নকষ্ট এখানে আদৌ নাই। এরূপ উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা ভূমি পৃথিবীর মধ্যে খুব বিরল। এখানে আমাদের দেশের মত হলচালনা বা সার দিবার প্রথা-নাই। কিন্তু ভূমির উৎপাদিকাশক্তি দেখিলে ঘোর বিস্মিত হইতে হয়। উত্তর বর্ম্মার পার্ব্বত্য প্রদেশে বিনা-হলকর্ষণে সামান্য এক মুষ্টিবীজ যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করে ভারতে বহুল পরিশ্রম দ্বারাও তাহা প্রায় সম্ভবপর নহে। যখন ভারতে ঘোর দুর্ভিক্ষ, যখন এক মুষ্টি অন্নের অভাবে সহস্র সহস্র লোক সামান্য কুকুর, বিড়ালের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছিল, তখন বর্ম্মায় বেশ ভাল চাউল টাকায় ১৪।১৫ সের। বর্ম্মা লক্ষ্মীর অন্ন ভাণ্ডার ঐরূপ পূর্ণ ছিল বলিয়া, ভারতের শত শত অন্ন ক্লিষ্ট হতভাগ্য স্বীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঠাকুরমার নিকট গল্প শুনিয়া ছিলাম যে, আমাদের দেশে টাকায় এক মণ ধান্য বিক্রয় হইত। বর্ম্মায় কিন্তু এখনও অনেক স্থানে টাকায় ৩০।৩২ সের ধান্য পাওয়া যায়।*

এখানে অন্ন প্রাচুর্য্যের প্রধান কারণ এই যে এখানকার লোক সংখ্যা ভূমির তুলনায় অত্যন্ত কম। উত্তর ব্রহ্মে এখনও সহস্র সহস্র বিঘা পতিত জমি পড়িয়া আছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহা আবাদ করাইবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতেছেন না। তাঁহারা বিনা খাজনায় ঐ সকল ভূমি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। কিন্তু লোকাভাবে তাঁহাদের সৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে-পরিণত হইতেছে না। দ্বারভাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কয়েক সহস্র বিঘা জমি এক প্রকার নিষ্করে ইজারা লইয়া তথায় বহুসংখ্যক দরিদ্র ভারতবাসীকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম কয়েক মাস তাহাদের কৃষি কার্য্যের ব্যয় ভার দূরদর্শী মহারাজ নিজে বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ঐ সকল কৃষকের অবস্থা বিশেষ উন্নত। তাহারা কেবল যে মহারাজকে নিয়মিত খাজনা প্রদান করিতেছে তাহা নহে; এখন তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক আয় গড়ে ২২ টাকা। আমাদের দেশের বড় লোকেরা যদি স্বর্গীয় মহারাজের ঐ মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাহা হইলে যে দেশের কি পরিমাণ উপকার সাধিত হইবে, তাহা সামান্য লেখনীমুখে প্রকাশ করা অসম্ভব।

অনেকে হয়ত জ্ঞাত আছেন, আজ কাল ভারতবর্ষীয় অধিবাসীদিগকে লইয়া দক্ষিণ ব্রিটিস্ আফ্রিকায় কি প্রকার ভীষণ আন্দোলন চলিতেছে। দরিদ্র ভারতবর্ষীয় কুলিরা সামান্য জীবিকার লোভে ও অন্ন কষ্টে দারুণ উৎপীড়িত হইয়া সেই এক মাসের পথ আফ্রিকায় গমন করিয়াছে। সেই অসহায় হতভাগ্যদিগকে আজ কাল কেপকলোনি গভর্ণমেণ্ট যে প্রকার নির্ম্মমভাবে পীড়ন করিতে উদ্যত, তাহাতে তাহাদের আর তথায় এক মুহূর্ত্তও থাকা বিধেয় নহে। ভারতবর্ষ দরিদ্র বহুল দেশ হইলেও ধনীর অভাব নাই। ইঁহাদের মধ্যে যদি কোন মহানুভব ও সদাশয় ব্যক্তি ঐ সকল স্বদেশী দরিদ্রদিগকে আফ্রিকা হইতে বর্ম্মায় প্রেরণ করেন ও তথায় তাহাদিগকে দ্বারভাঙ্গাধিপতির অনুকরণে বসবাস করাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে শত শত দুস্থ পরিবারের আজীবন আশীর্ব্বাদ ভাজন হয়েন এমত নহে, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে তাঁহাদেরও প্রভূত অর্থাগমের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

উত্তর বর্ম্মায় অনন্ত জঙ্গল। ঐ সকল জঙ্গলে মূল্যবান বিটপী সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোকাভাবে গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল জঙ্গল অতি অল্প করে বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত। ভারতের অনেকে এখন সামান্য মূল ধনের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল জঙ্গল হইতে বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন। আজ কাল আমাদের দেশের অনেক ব্যবসা খুঁজিয়া পায়েন না। ইহা

* ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে আমরাও বাঙ্গালার কোন স্থানে টাকায় ৷০ হইতে ৷৷০ দেড় মণ ধান্য বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি। প্রঃ সঃ

যে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক তাহা—তাঁহারা মনে করেন না। অর্থ, বল ও সাহস থাকিলে এই বিশাল জগতে ব্যবসায়ের অভাব কি? তবে নিতান্ত কূপ মণ্ডুকের মত বসিয়া থাকিলে অবশ্য পদে পদে বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। ব্যবসা করিতে হইলে, অর্থ সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রথমেই হৃদয়ের সুকুমার ভাব সকলকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে হয়। কথায় কথায় প্রিয়তমার মুখ বা পুত্র কন্যার স্নেহ যদি মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে তাহা হইলে এ সংসারে 'পুরুষ' বলিয়া পরিচয় প্রদান না করাই ভাল। সাহস ও অর্থবল যাহার আছে সমস্ত সংসার তাঁহার ব্যবসাক্ষেত্র। অধিকদূর যাইবার প্রয়োজন নাই। উল্লিখিত মূল্যবান্ জঙ্গল সকল যদি রীতিমত বন্দোবস্ত করা যায় আমার বিশ্বাস তাহা হইলে একবৎসরের মধ্যে ব্যবসায়ীর মূলধন চতুর্গুণ হইয়া পড়ে।

বর্ম্মা নব বিজিত রাজ্য। এখনও তাহার চতুর্দ্দিকে পয়সা ছড়ান রহিয়াছে। কিন্তু কুড়াইয়া লইবার লোক নাই। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, চাকুরী প্রভৃতি সমস্ত অর্থকরী বিষয়ে বর্ম্মা এখনও একপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী শূন্য। যাঁহাদের অর্থ আছে, সাহস আছে, উৎসাহ আছে, তাঁহারা আমার এই কয়েকটি কথা হৃদয়ঙ্গম করিলে নিতান্ত বাধিত হইব। ভাই! দেশের মায়া ছাড়! দুই পা অগ্রসর হইতে আরম্ভ কর। বড় ভয়ানক জীবন-সংগ্রাম সম্মুখে উপস্থিত। ইহাতে যিনি ক্ষমতাশালী, উৎসাহশীল হইবেন, তাঁহারই জিত। নতুবা দুই মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে হইবে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মে ব্রিটিস সাম্রাজ্য।

ব্রহ্মের প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন ভারত ইতিহাসের মত নানাপ্রকার অলীক ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত এমন কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা সাধারণের মনোজ্ঞ হইতে পারে। তজ্জন্য আমরা উপস্থিত প্রস্তাবে ঐ প্রদেশের আধুনিক ইতিহাসের কয়েকটি প্রধান ঘটনা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইব।

যে সময় পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত রাজলক্ষ্মী চিরকালের জন্য ইংরাজ রাজের করায়ত্ত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ব্রহ্মের রত্ন সিংহাসনে আলোমপোরা উপবিষ্ট ছিলেন। ভারত ইতিহাসে শিবজী, হায়দর আলি প্রভৃতি যে শ্রেণীভুক্ত, বর্ম্মা ইতিহাসে আলমপোরার সেই স্থান। তাঁহার পূর্ব্বে সমগ্র ব্রহ্মরাজ্য এক সার্ব্বভৌম নৃপতির অধীন ছিল না। পেগু, টেনিসরণ, আরাকান, উত্তর ব্রহ্ম প্রভৃতি তখন ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। আলমপোরা স্বীয় প্রতিভা, দূরদৃষ্টি ও অপ্রতিহত ক্ষমতাবলে একে একে সমগ্র ব্রহ্ম দেশকে এক করিয়া নিজেকে তাহার প্রথম সার্ব্বভৌম সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন।

টেনিসরণ ও আরাকান প্রদেশ পূর্ব্বে শ্যাম রাজ্যের অধীন ছিল। আলমপোরা উহাদিগকে জয় করিবার পর তথায় একজন সুযোগ্য ও বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। নববিজিত প্রদেশদ্বয়ের কোন কোনও অধিবাসী কিন্তু ঐ নূতন শাসন প্রণালীর উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল এবং গোপনে গোপনে শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল। সৌভাগ্যের বিষয় উহা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই শাসনকর্ত্তা মাংপোর শ্রুতিগোচর হয়। তখন রীতিমত ধরপাকড় আরম্ভ হইল। কিন্তু ঐ বিষয়ে যাহারা নেতা ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই আত্মরক্ষার উপায় করিয়া রাখিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহারা গোলযোগের আভাস পাইবামাত্র স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হয়েন এবং আপনাদিগকে মাংপোর অত্যাচারে প্রপীড়িত নিরীহ বর্ম্মা অধিবাসীরূপে পরিচয় প্রদান করিয়া ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এই সময়ে বোধ হয় বড়লাট বাহাদুর লর্ড আমহর্ষ্ট বর্ম্মা অধিকার করিবার কোনও সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কারণ তিনি বিনা অনুসন্ধানে ঐসকল নবাগত বর্ম্মাবাসীর কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, এবং তাঁহাদের ঈপ্সিত আশ্রয় প্রদান করিতে মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিলেন না।

আলোমপোরা ইংরাজের ঐ ব্যবহারে মনে মনে বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইংরাজের পরাক্রম তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না। ইংরাজের যে বলবুদ্ধি দেখিয়া একদিন পঞ্জাব কেশরী রণজীৎ সিং সমস্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র লোহিতবর্ণ ধারণ করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাধিপতিও আজ সেই

বলবুদ্ধি স্মরণ করিয়া স্বীয় ক্রোধ বহ্নি হৃদয়ে দমন করিয়া নিতান্ত শান্তভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। তিনি অতি সরল ও সংযত ভাষায় বড়লাট বাহাদুরকে জ্ঞাত করিলেন যে তাঁহার আশ্রিত বর্ম্মাবাসীরা রাজদ্রোহী সুতরাং আশ্রয়প্রাপ্তির অযোগ্য। আমহার্ষ্ট কিন্তু—জানি না কোন্ নীতি অনুযায়ী—ব্রহ্মাধিপতির কথা অপেক্ষা ঐ সকল রাজদ্রোহীর কথা অধিকতর মূল্যবান্ ও বিশ্বাস যোগ্য মনে করিলেন। সহসা তাঁহার ধর্ম্মভাব জাগরুক হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন যে অত্যাচারী বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের হস্তে তিনি কোনও মতেই ঐসকল উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবেন না। স্বাধীন ভূপতি আলমপোরা ইংরাজের ঐরূপ ব্যবহারে যে নিতান্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ঐসময়ে তাঁহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিতান্ত বিপদ পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার সার্ব্বভৌম ক্ষমতায় বিরক্ত হইয়া কতিপয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিবার আয়োজন করিতেছিল। তজ্জন্য তিনি লর্ড আমহর্ষ্টের উদ্ধত ব্যবহারের কোনও প্রকার উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না।

যখন উভয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে ঐরূপ গোলযোগ চলিতেছিল তখন সহসা এক সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া ধূমায়িত শত্রুতাবহ্নি প্রবলবেগে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। আরাকানের নিকটে সাহাপুরী নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপ বহুদিবস হইতে পর্টুগিজদিগের অধীনে ছিল। ১৮২০ খ্রীঃ মার্চ্চমাসে ইংরাজ উহা উহাদিগের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লয়েন। ১৮২০ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে মাংপো কতিপয় কারণ দর্শাইয়া, উহা যে আরাকানের অধীন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। শেষে উভয় গভর্ণমেণ্টের অভিমতানুসারে উহার সত্ত্ব সাব্যস্তাভিপ্রায়ে এক কমিসন (Joint commission) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উহার কার্য্য রীতিমত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মাংপোর জনৈক কর্ম্মচারী ঐ দ্বীপটি বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। এই কারণের উপর নির্ভর করিয়া লর্ড আমহর্ষ্ট আলোমপোরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন না যে ঐ ব্যাপারে মাংপো বা বর্ম্মাধিপতি স্বয়ং কতদূর সংলিপ্ত। তিনি কেবল মাত্র নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্কের প্রভাবে কয়েকজন সামান্য ব্যক্তির কথার উপর নির্ভর করিয়া বিশাল বর্ম্মা সাম্রাজ্যের অধিপতিকে যেরূপ অবিশ্বাস করিয়াছিলেন, এখন আবার সেই মস্তিষ্কের প্ররোচনায় এক সামান্য কারণে স্বাধীন বর্ম্মাভূপতির স্বাধীনতা হরণোদ্দেশে এক বিরাট আয়োজন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিলেন না।

অধিকাংশ ইংরাজ ঐতিহাসিক, প্রথম বর্ম্মা যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব ও অপরাধ অম্লান বদনে হতভাগ্য আলোমপোরার স্কন্ধে আরোপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আলোমপোরা অত্যাচারী নরপতি। তাঁহার কু-শাসনে ও অমানুষিক অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্জের করুণ আর্ত্তনাদ গগণ বিদীর্ণ করিয়াছিল, এবং বঙ্গীয় উপসাগরের সহস্র মাইল অতিক্রম করিয়া উহা কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট হাউসের নিভৃত কক্ষে উপস্থিত হওয়াতে, নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে বড়লাট সাহেব ঐ যুদ্ধের সূত্রপাত করেন। (পাঠক এইস্থানে মনে রাখিবেন ঐসময়ে মার্কনি সাহেবের তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তা প্রণালী—Wireless telegraphy আবিষ্কৃত হয় নাই!) বর্ম্মা প্রজাগণকে অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত করা ভিন্ন এই বর্ম্মা অভিযানের অপর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কি সহৃদয়তা কি উদারতা! এই মহৎ উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়াই এক সময়ে ইউরোপীয়েরা আমেরিকার আদিম অসভ্য অধিবাসীদিগকে দলে দলে মানবলীলা সম্বরণ করাইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, অসভ্যাবস্থায় থাকা অপেক্ষা মানবের মৃত্যু বহুগুণে শ্রেয়স্কর! তাঁহাদের এই অভূতপূর্ব্ব মহত্ত্বের জন্য আজ এসিয়া ও আফ্রিকার দুর্ব্বল স্বাধীন জাতিসকল জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য অকাতরে ইতর প্রাণীর ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। মানব স্বার্থের বশীভূত হইয়া কতদূর হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইতে পারে বর্ম্মাযুদ্ধ তাহার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যাহারা ভারত ইতিহাস স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইয়াছেন তাঁহারা জানেন, আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। স্বার্থ ও গরিমার বশীভূত হইয়া মানব যে কিরূপ ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিতে পারে; বর্ত্তমান তিব্বত অভিযান তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

যাহা হউক, তাহার পর দরিদ্র ভারতবাসীর শোণিত

তুল্য অজস্র অর্থ ব্যয়ে এক বিপুল বাহিনী রেঙ্গুনে প্রেরিত হইল। আলোমপোরা জানিতেন যে ইংরাজের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে তিনি কখনই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন না। সেই জন্য রেঙ্গুনে ইংরাজ সৈন্য উপস্থিত হইবার অগ্রেই, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিলেন এবং যাহাতে শত্রুপক্ষ রসদ সংগ্রহ করিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার ঐ কার্য্যে আশাতিরিক্ত ফল ফলিবার উপক্রম হইল। রসদ অভাবে ইংরাজ সেনা এরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, তাহারা বর্ম্মাজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে সহসা মান্দ্রাজ হইতে আহার্য্য প্রেরিত হওয়াতে ইংরাজ সৈন্য নবোৎসাহে কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। তাহার পর—আর তাহার পর কি? পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ক্ষমতার সংঘর্ষণে চির দিন যাহা হইয়া থাকে, সেই মহাবীর আলেকজান্দারের সময় হইতে আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস যাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ইংরাজ-বর্ম্মা সমরে তাহারই পুনরভিনয় হইল মাত্র। কয়েকটি যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজিত হওয়াতে বর্ম্মাধিপতি অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির প্রধান সর্ত্তগুলি এই ঃ—চিনিসরম ও আরাকান ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবে; মণিপুর স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে, যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ আলোমপোরা দুই কোটি মুদ্রা প্রদান করিবেন। ইংরাজের বহুকালের অভিসন্ধি পরিপূরিত হইল। যে দিন চট্টগ্রাম তাঁহাদের অধীন হইয়াছে, সেই দিন হইতে টেনিসরম ও আরাকান অধিকার করিবার জন্য তাঁহারা নিতান্ত ব্যগ্র ছিলেন। এত দিন কোন বড়লাটই তাহার কোনও সুবিধাজনক পন্থা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন নাই! আজ লর্ড আমহর্ষ্টের কুট রাজনীতি চক্রে পতিত হইয়া বর্ম্মা ভূপতি স্বয়ং তাঁহাদের সেই চির আকাঙ্ক্ষিত বাসনা পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

বৈদ্যুতিক মৎস্য।

ভীষণ তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ-ভূমধ্য ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের অসীম লবণাম্বুরাশি মধ্যে সিলিউরিয়াস্ (Silurus) জিম্নোটস্ (Gymnotus) এবং টরপেডো (Torpedo) প্রভৃতি নানা জাতীয় মৎস্যের এক অতি অদ্ভুত গুণ লোকলোচনের দৃষ্টিপথগামী হয়। এই সকল জীব প্রাণীজ তাড়িতের,* (Animal electricity) এক অভিনব তত্ব প্রকাশ করিয়া বৈজ্ঞানিক বিবুধ মণ্ডলীর মনোযোগ তৎপ্রতি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জিম্নোটস্ (Gymnotus) মৎস্য দেখিতে কতকটা আমাদের দেশীয় কুচিলার ন্যায়। ইহারা দৈর্ঘে যখন ৫।৬ ফিট লম্বা হয় তখনই উহাদের শরীরে তাড়িতের প্রভাব অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের পৃষ্ঠ ও তলদেশে পরস্পর বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন সংযোজক (positive electricity) ও বিযোজক, (Negative electricity) তাড়িতের অবস্থান পরিলক্ষিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে।

আরবীয় ভাষায় টরপেডোকে “র‍্যাদ” (ra-ad) বলে; উহার অর্থ বিদ্যুৎ। †

মৎস্যের প্রত্যেক মাংসপেশীই বৈদ্যুতিক গতি সঞ্চালক মৌলিক পদার্থ সমূহ (electromotor elements) দ্বারা নির্ম্মিত এইরূপ অনুমান করিয়া লইলেই বিষয়টী সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এবং ঐ সকল পদার্থ গোলাকার ও উহারা এরূপভাবে মৎস্যের শরীর মধ্যে অবস্থিত যেন উহাদের অক্ষ রেখা মাংসপেশী সমূহের সহিত সমান্তরাল রহিয়াছে। এইরূপ হইলে অভ্যন্তরস্থিত পরস্পর বিপরীত দিকের সংযোজক তাড়িত সকলের কার্য্য অকর্ম্মণ্য হইবে, কেবলমাত্র পার্শ্বদেশে সংযোজক তাড়িতের প্রভাব অক্ষুন্ন থাকিবে; এইরূপে বিযোজক তাড়িতের প্রভাবও কেবল মাত্র প্রান্তভাগেই অক্ষুন্ন রহিবে।

* পার্থিব যাবতীয় জীবদেহেই তাড়িতের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

† It is a curious point that the Arabian name for the Torpedo, ra-ad" signifies lightning,—foot note. S. P.

Thompson's Electricity & Magnetism.

এক্ষণে মৎস্যের শিরোভাগে এক হস্ত ও পুচ্ছদেশে অপর হস্ত কিম্বা তাড়িত প্রবাহ সংবাহক কোনও ধাতব পদার্থ দ্বারা স্পর্শ করিলে ভয়ানক আঘাত (shock) প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে যদি তাড়িত প্রবাহ প্রতিরোধক (insulator) কোনও পদার্থ দ্বারা উক্তরূপে স্পর্শ করা যায় তবে তাড়িতের কোনও প্রভাবই দৃষ্ট হইবে না। এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিলে আঘাতের জোরও ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়। এবং প্রাণীজ তাড়িতের এবম্ভুত অপচয়ে উহার জীবনীশক্তিও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।

জীবিতাবস্থায় টরপেডোর শরীরের যে কোনও স্থান হইতে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা টরপেডোর এক প্রকার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে; কিন্তু যতই উহার জীবনীশক্তি হ্রাস হইতে থাকে তাড়িতের প্রভাবও ততই কমিতে থাকে। পৃষ্ঠদেশের যে কোনও স্থানে সংযোজক তাড়িতের প্রভাব এবং ঠিক উহার বিপরীত দিকেই আবার বিযোজক তাড়িতের আধিক্য দৃষ্ট হয়।

পণ্ডিতপ্রবর মেটিউসাই (Mateucii) পরীক্ষা দ্বারা ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মৎস্যের মস্তিষ্কের পেশীতেই তাড়িতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং উহাই তাড়িৎ উৎপাদনের প্রধান স্থান। মস্তিষ্কের পেশীগুলি উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে তাড়িতের প্রভাবও আর পরিলক্ষিত হয় না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

খৃঃ ১৮৭৬ অব্দের প্রারম্ভে লর্ড নর্থব্রুকের ভারত শাসনকাল শেষ হয়। অন্যান্য লাটের ন্যায় লর্ড নর্থব্রুকও একজন সুদক্ষ এবং প্রজাবৎসল শাসনকর্ত্তা ছিলেন কিন্তু কয়েকটি রাজ নৈতিক বিভাগের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বিশেষ অপ্রীতিভাজন হইতে হয়। বরোদা রাজ্যের মহারাজা মালহার রাও’র প্রতি অসদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রতি সমস্ত ভারতবাসী ক্ষুণ্ন হয়। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে কলিকাতার ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যগণ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত করিবার জন্য এক সাধারণ সভা সেরিফ কর্ত্তৃক টাউন হলে আহুত করেন। এই সভার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই শম্ভুচন্দ্রকে উত্তেজিত করেন কিন্তু শম্ভুচন্দ্র প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার অধিক আস্থা ছিল না। যথাসময়ে তাঁহারা উপস্থিত হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিবেন কিনা তদ্বিষয়ে শম্ভুচন্দ্রের সন্দেহ ছিল। তথাচ তিনি উক্তরূপ কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ঠিক করেন যে সাধারণ সভায় প্রথম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি সংশোধিত প্রস্তাব করিবেন। এই সংশোধিত প্রস্তাব করিবার জন্য তিনি প্রথমে বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে* অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি অসম্মত হইলে শম্ভুচন্দ্র ব্যারিষ্টার মন্মথচন্দ্র মল্লিককে উক্ত কার্য্য করিতে বলিলে তিনি স্বীকৃত হন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে শম্ভুচন্দ্র, বাবু যদুনাথ ঘোষ এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব সহ টাউন হলে গমন করেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব। ইহা ভিন্ন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত এমেণ্ডমেণ্টের এক খণ্ড ছোটলাট

* ইনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার।

বাহাদুরের হস্তে দেওয়া হইল। এই কাগজ পাইয়া সার রিচার্ডের মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি শম্ভুচন্দ্রেরদিকে তাকাইয়া তাঁহাকে এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু শম্ভুচন্দ্র লাটের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। নিজের কর্ত্তব্যের পথে দৃঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সভামধ্যে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। সংশোধিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রথমে বলা হয় যে, যখন এই সভা কেবলমাত্র লর্ড নর্থব্রুকের বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক আহুত তখন ইহাতে কিছুতেই ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে না। প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে ইহা সাধারণ সভা এবং সেরিফের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক পত্র ইহার সমর্থনরূপে সভাপতিকে দেওয়া হইল। শেষে সভাপতি বলিলেন যে সভার নির্দ্ধারিত প্রস্তাব প্রথমে অনুমোদিত হউক পরে এমেণ্ডমেণ্টের আলোচনা হইবে। কিন্তু এই প্রস্তাব নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া সেরিফ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইল। চারিদিক হইতে কটুকাটব্য প্রকাশ্যভাবে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। লাট বাহাদুর অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। পরিশেষে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব অনুসারে ইহা স্থির হয় যে, এমেণ্ডমেণ্ট প্রস্তাবিত হইবে কিন্তু প্রস্তাবক এবং তাঁহার সমর্থক উহার সাপক্ষে কোন যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। ইহাতে শম্ভুচন্দ্র ও তাঁহার দলভুক্ত বন্ধুগণ বিশেষ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন যে এ সভা যথার্থ সাধারণ সভা নহে এবং ইহার প্রতি সাধারণের কোন সহানুভূতি নাই। এইরূপ বলিয়া তাঁহারা সভা ত্যাগ করিলেন। পরদিন সংবাদপত্রে উক্ত বিষয়ের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। লর্ড নর্থব্রুকের বন্ধু কৃষ্ণদাস তাঁহার হিন্দুপেট্রিয়টে উপহাস* করিয়া শম্ভুচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণকে "Immortal Ten" বলিয়া উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় সংবাদ পত্র শম্ভুচন্দ্রের এই সৎসাহসের প্রশংসা করেন। বোম্বাই সহরের "ইন্দুপ্রকাশ" বলিয়াছিলেন "Bombay is on the side of the Ten."

কিন্তু এই বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম অতীব কৌতুহলাবহ। তখন ইণ্ডিয়ান্ লিগের সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন সভ্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন যে শম্ভুচন্দ্র এবং মন্মথচন্দ্র মল্লিক যে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাহা লিগের পক্ষ হইতে হয় নাই। বাস্তবিক শম্ভুচন্দ্র যে বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহা লিগের পক্ষ হইতে করেন নাই। কিন্তু এই রেভারেণ্ড মহাশয় এবং শিশির বাবু সর্ব্বপ্রথমে শম্ভুচন্দ্রকে বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য উত্তেজিত করেন। পরন্তু তাঁহারা শম্ভুচন্দ্রের উক্ত কার্য্য লিগের অনুমোদিত নহে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকটে নির্দ্দোষ* সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব লিগের কোন সভায় অনুমোদিত হয় নাই। ইহা লাট সাহেবের সন্তোষার্থ রেভারেণ্ড মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছিল বলিয়া পরে প্রকাশ পায়। এই জন্য শম্ভুচন্দ্র এবং লিগের অন্যান্য সভ্যগণ লিগ ত্যাগ করেন এবং ইহাতেই লিগের অস্তিত্ব লোপ পায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শম্ভুচন্দ্র ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের শেষে তাঁহার পত্রিকা "Mookerjee's Magazine" বন্ধ করিয়া এলাহাবাদে আইন পরীক্ষা দিবার জন্য গমন করেন। শারীরিক অসুস্থতা হেতু পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। স্বাস্থের জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণ করিবার জন্য পুনরায় লক্ষ্ণৌ যান। তথায় অবস্থান কালিন জয়পুরের মহারাজ রামসিংহ তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী জয়পুরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। কিন্তু যখন জয়পুরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন কলিকাতা হইতে তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার † বিবাহের সংবাদ পান এবং খৃঃ ১৮৭৭ অব্দের মার্চ্চ মাসে ত্বরায় কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। ইহাই তাঁহার শেষ পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ।

কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া পুনরায় শম্ভুচন্দ্র কার্য্য-

* এই উপহাসপূর্ণ প্রবন্ধের উত্তর বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করেন কিন্তু কৃষ্ণদাস উহা চাপিয়া রাখেন। পরে এই উত্তর ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসের সম্পাদক মহাত্মা জেমস্ উইলসন বাহির করেন। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় এই সকল রহস্যপূর্ণ পত্রাদি প্রদত্ত হইবে।

* ঠিক এই সময়ে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনমোহিনী হুইলারকে ৫০০ শত টাকা বেতনে ছোটলাট স্ত্রী শিক্ষা বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত করেন।

† শম্ভুচন্দ্রের দুই কন্যা, অভয়াদেবী এবং অমাদিনী দেবী। কনিষ্ঠা অমাদিনী ইহ সংসারে নাই।

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৮৭৭ অব্দের মে মাসে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউস পত্রিকার বিজ্ঞাপনানুযায়ী তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার রাজমন্ত্রীর পদ প্রার্থী হইয়া আবেদন করেন। তখন মহারাজ বীরচন্দ্র দেব বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাবু নীলমণি দাস দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার মানসে নূতন লোকের প্রয়োজন হয়। আবেদনপত্র রাজকর্ম্মচারীদিগের ষড়যন্ত্র হেতু মহারাজের নিকট পৌছিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু আবেদন প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ স্বহস্তে শম্ভুচন্দ্রকে তাহার উত্তর দেন এবং পুনরায় আবেদন করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে শম্ভুচন্দ্র পুনরায় আবেদন পেশ করিলেন এবং মহারাজ তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা মাসিক বেতনে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ১৮৭৭ অব্দের ৯ই জুন তারিখে শম্ভুচন্দ্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরায় গমন করেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র শম্ভুচন্দ্রকে লইয়া যাইলেন বটে কিন্তু তথায় যাইয়া শম্ভুচন্দ্রকে অনেকদিন যাবৎ বিনা কর্ম্মে সময় ক্ষেপণ করিতে হয় কারণ মহারাজ তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাজসরকারের অনেকে প্রথম হইতেই শম্ভুচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য মহারাজকে বারংবার বলিলেও তিনি শম্ভুচন্দ্রকে আশ্বাস বাক্যে স্বীয় রাজধানীতে রাখেন এবং পরিশেষে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। মহারাজ তিনটি প্রধান কার্য্যের জন্য শম্ভুচন্দ্রকে নিযুক্ত করেন। তাহার প্রথমটি এই। বহুকালাবধি ত্রিপুরায় ক্রীতদাস ব্যবসা চলিয়া আসিতে ছিল। রাজপরিবারে বহুল ক্রিতদাস ছিল এবং রাজ্যমধ্যেও ক্রিত দাসের ব্যবসা বিলক্ষণ লাভবান ছিল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মহারাজকে উক্ত ব্যবসা উঠাইয়া দিতে আদেশ করেন এবং ক্রিতদাসদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য হুকুম জারি করেন। বহুকালের ব্যবসা হঠাৎ উঠাইয়া দিতে মহারাজ ইতস্ততঃ করেন এবং শম্ভুচন্দ্রকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সহিত লেখালিখি করিয়া যাহাতে ব্যবসাটি বজায় থাকে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। মহারাজকে তিনি ইহার উত্তরে বলেন যে, এই বিষয় লইয়া লেখালিখি করিলে সুফল না ফলিয়া বিষময় ফল ফলিবার আশঙ্কা আছে। তাঁহার মতে সে ব্যবসাটি লোপ করিয়া দেওয়াই উচিত। মহারাজ শম্ভুচন্দ্রের কথানুযায়ী অনিচ্ছাসত্বেও ক্রিতদাস ব্যবসা ত্রিপুরা হইতে লোপ করিয়া দিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য এই। সকল করদ রাজ্যের ন্যায় পূর্ব্বে ত্রিপুরায় বড়লাট সাহেবের পলিটিকেল এজেণ্ট থাকিত। মহারাজ বীরচন্দ্র শম্ভুচন্দ্রকে এই পলিটিকেল এজেন্সি যাহাতে উঠিয়া যায় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। শম্ভুচন্দ্র এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বড়লাটের সহিত লেখালিখি করিয়া ত্রিপুরার পলিটিকেল এজেন্সি রহিত করিয়া দেন। গভর্ণমেণ্ট এজেন্সি রহিত করিয়া ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টার সাহেবকে বিনা বেতনে Exofficio Agent নিযুক্ত করেন। ইহাতে ত্রিপুরার অনেক ব্যয় ভার কমিয়া যায়। Mr. C. W. Bolton সাহেব ত্রিপুরার শেষ পলিটিকেল এজেণ্ট *। তৃতীয় কার্য্য ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ উন্নতি সাধন। শম্ভুচন্দ্র তৃতীয় কার্য্যটি কত দূর পরিমাণে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শম্ভুচন্দ্র ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে ত্রিপুরায় প্রথম গমন করেন। এই বৎসরের অক্টোবর মাসে পুনর্ব্বার কলিকাতা চলিয়া আসেন। নবেম্বর মাসে জয়পুরের মহারাজ রামসিংহ কলিকাতায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। পূর্ব্বে শম্ভুচন্দ্রকে দেখিবার জন্য মহারাজ রামসিংহ তাঁহাকে আহ্বান

* ত্রিপুরার পলিটিকাল এজেণ্টের বিশেষ কোন কাজ ছিল না। অথচ বেতন বেশ মোটা ছিল। পলিটিকাল এজেন্সি রহিত করার চেষ্টা পাইলে বোলটন সাহেবের সহিত শম্ভুচন্দ্রের মনোবিবাদ হয়। এই মনোবিবাদের জন্য শম্ভুচন্দ্রের ইংরাজি জীবনচরিত লেখক Mr. F. H. Skrine. বোলটন সাহেব কর্ত্তৃক অতি অভদ্রজনোচিত ব্যবহার প্রাপ্ত হন। ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজ সিংহাসন অধিরোহণ করিবার সময় ৺শম্ভুচন্দ্র মূখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা জীবনচরিত প্রকাশের সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া বর্ত্তমান লেখকের নিকট চট্টগ্রামের কমিসনর বাহাদুরের তদানিন্তন পারসোনাল এসিটাণ্ট কবি নবিনচন্দ্র সেনের দ্বারা 'অফিসিয়ালি" পত্র লেখেন। কিন্তু তখন বোল্টন সাহেব বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার অনুমোদনের জন্য উক্ত প্রস্তাব যাইলে তিনি পূর্ব্বতন মনোবিবাদ হেতু উক্ত ৫০০ টাকা দেওয়া রহিত করেন। এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় এ বিষয়ের সকল রহস্য প্রকাশ হইবে।

করেন কিন্তু যে কারণে শম্ভুচন্দ্রের জয়পুরে যাওয়া হয় নাই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ রামসিংহ শম্ভুচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার দেওয়ান মৃত রাওবাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। কান্তিচন্দ্রের * সহিত শম্ভুচন্দ্রের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না সুতরাং কান্তিচন্দ্র শম্ভুচন্দ্রের নিকট আসিবার জন্য তাঁহার বন্ধু যদুনাথ ঘোষ † মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া শম্ভুচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাজের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তদনুযায়ী শম্ভুচন্দ্র মহারাজ রামসিংহের ‡ সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজের সহিত শম্ভুচন্দ্র বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে কথাবার্ত্তা কহিলে মহারাজ বড়ই প্রীতিলাভ করেন। সেই সময় রেওয়ার মহারাজও § তথায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ রামসিংহ শম্ভুচন্দ্রকে রেওয়ার মহারাজের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। তাঁহার সহিত শম্ভুচন্দ্রের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্য বিষয়ে অনেক কথোপকথন হয়। যতদিন মহারাজ কলিকাতায় ছিলেন প্রায় প্রত্যহই শম্ভুচন্দ্রকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইতেন। মহারাজ রামসিংহ অত্যন্ত গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। শম্ভুচন্দ্রকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ইহাতে তাঁহার রাজকর্ম্মচারীরা কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এমন কি একদিন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তাহারা শম্ভুচন্দ্রকে অনর্থক বসাইয়া রাখে এবং মহারাজের নিকট তাঁহার সংবাদ পাঠাইতে বিলম্ব করে। তাহারা ভাবিয়া ছিল যে বিলম্বের জন্য শম্ভুচন্দ্র মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া যাইবেন, কিন্তু তিনি রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারের বিষয় পূর্ব্বে বিশেষরূপে জানিতেন বলিয়া, অপেক্ষা করেন এবং মহারাজের নিকট এত্তেলা যাইলে শম্ভুচন্দ্রকে তিনি ডাকাইয়া পাঠান। শম্ভুচন্দ্র মহারাজকে তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের এতাদৃশ ব্যবহার সম্বন্ধে জানান। মহারাজ রামসিংহ প্রত্যেকে কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া এজন্য বিশেষ তাড়না করেন। মহারাজ রামসিংহ * শম্ভুচন্দ্রকে জয়পুরে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু সে সময় তিনি ত্রিপুরার কার্য্য করিতে ছিলেন বলিয়া শম্ভুচন্দ্র যাইতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল।

---

* রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—যিনি ভগবান কৃপায় জয়পুরের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হন এবং যাঁহার প্রতাপে সমস্ত জয়পুর এক সময় কাঁপিয়াছিল, তিনি চব্বিশপরগণাস্থ রেহুতা গ্রামে (ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে ষ্টেশন শ্যামনগর হইতে দেড় মাইল পূর্ব্বে) অতি দরিদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। চুঁচুড়ার ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ে কান্তিচন্দ্র বিনা বেতনে সামান্য ইংরাজি বিদ্যালাভ করিয়া প্রথমে জনাই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন পরে জয়পুর কলেজের জন্য শিক্ষক আবশ্যক হইলে জয়পুরের তদানীন্তন দেওয়ান হরিমোহন সেন তাঁহাকে জয়পুরে লইয়া যান ক্রমে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষতা করেন এবং কালে জয়পুরের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হন। ইহার পিতার নাম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। কান্তিচন্দ্র ১৯০১ খৃঃ অব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন।

† যদুনাথ ঘোষ আমাদের দেশের এক জন বিশেষ কৃতবিদ্য লোক। ইনি মতিলাল শিলের অবৈতনিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা অনেক দিন যাবৎ করেন। কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাকে Arnold of India বলিতেন।

‡ মহারাজ রামসিংহ বরোদার রাজা মালহার রাওর বিচারের জন্য যে কমিসন বসে তাহার একজন সভ্য ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র মালহার রাওর বিচার সম্বন্ধে তাঁহার পত্রিকার যে তিব্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহার সুখ্যাতি লোক পরম্পরায় মহারাজ জানিতে পারিলে এই প্রবন্ধ উর্দ্দুতে অনুবাদ করান এবং স্বয়ং পাঠ করেন। সেই অবধি শম্ভুচন্দ্রের উপর মহারাজের যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মে।

§ যখন শম্ভুচন্দ্র মহারাজ রামসিংহের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন তখন রেওয়ার মহারাজ নিস্তব্ধভাবে এইসকল শুনিতে ছিলেন কিন্তু কোন কথার জবাব বা কোন রকমে কথা কহিলেন না দেখিয়া শম্ভুচন্দ্র তাঁহাকে কথা বলাইবার জন্য নানা বিষয়ের অবতারণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রেওয়ার মহারাজ একেবারে নিস্তব্ধ। রেওয়ার মহারাজাকে কথাবার্ত্তায় প্রীত না করিতে পারিলে মহারাজ রামসিংহ কি ভাবিবেন ভাবিয়া শেষে শম্ভুচন্দ্র এক ব্যাঘ্র শিকারের গল্প আরম্ভ করিলেন। এবারে আর রেওয়ার মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন না। ইনি আগ্রহ সহকারে শম্ভুচন্দ্রের সহিত শিকার কথা বলিতে লাগিলেন। রেওয়ার মহারাজ অতীব বলবান পুরুষ এবং উত্তম শিকারী ছিলেন।

* এই সাক্ষাতের অল্পদিন মধ্যেই মহারাজ রামসিংহ ইহলোক ত্যাগ করেন।

পুরুষোত্তমদর্শন*।

প্রাতঃকালে ও জানি না যে, অদ্যই আমাকে উৎকল যাত্রা করিতে হইবে। সন্ধ্যাকালে পরামর্শ স্থির হইল। ঠিক তারিখটা স্মরণ হইতেছে না। বোধ হয় ১৩০৫ সনের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার হইবে। রাত্রি চারি ঘটিকার সময় হাইকোর্টের সন্নিহিত কদমতলার ঘাটে সিগল নামক অর্ণবযানে আরোহণ করিলাম। বলা বাহুল্য তখন বেঙ্গল-নাগপুর-রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই। সঙ্গে কটকের কোন সবডেপুটী কলেক্টরের সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার শিশুপুত্র, পরিচারিকা ও একটী স্কুলের ছাত্র। বন্ধুতনয়া শ্রীমতী ও তাঁহার শিশুপুত্র ও পরিচারিকাকে ক্যাবিনের মধ্যে দিয়া আমিও স্কুল্‌বালকটী বাহিরে ডেকে শয্যা প্রস্তুত করিয়া বসিলাম। কিছু দুর গিয়া রাত্রি প্রভাত হইল। হস্ত মুখ প্রক্ষালনাদি শেষ করিয়া ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থ নয়নপ্রীতিকর শস্যশ্যামল প্রান্তর ও বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিলাম। প্রাতঃকাল হইতেই আকাশ কিছু মেঘাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল। সহস্রাংশু ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণাংশু বিতরণ করিতে লাগিলেন, কখন বা বারিদখণ্ডে সমাবৃত হইয়া নয়নপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকার সময় অর্ণবপোত সাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইল। আমি অর্ণবযানে বসিয়াই সঙ্কল্প-পাঠপূর্ব্বক সাগর-সঙ্গমের পবিত্র জলে স্নান করিলাম। সংক্ষেপে আহ্নিক শেষ ও কলিকাতা হইতে আনীত কিছু ফল ও মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ শেষ করিয়া একখানি পুস্তক লইয়া বসিলাম। তরঙ্গিত বঙ্গোপসাগরের বক্ষে দোদুল্যমান অর্ণবপোত শোঁ শোঁ রবে ধাবিত হইল। আমি ইহার পূর্ব্বে বম্বেনগরীর (ব্যাকবে) সন্নিহিত সমুদ্রের প্রশান্ত মূর্ত্তি ও মহালক্ষ্মীর পাদপদ্ম-বিচুম্বী আরবসাগরের উত্তালতরঙ্গমালা-সঙ্কুল ভয়াবহ দৃশ্য নয়নগোচর করিয়াছি কিন্তু জলধিবক্ষে কখনও বিচরণ করি নাই। আমার নিকট তখন সেই জলধি-সলিলের অনন্ত নীলিমা কি রূপ মধুর বোধ হইতে লাগিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য শিল্প-চাতুরী, প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব নিয়ম, এ জগতে যাহা কিছু মহৎ পদার্থ দৃষ্টিগোচর করা যায়, সমুদয়ই যেন ভীষণ ও কমনীয় গুণে সংমিশ্রিত। এখন যে সমুদ্রলহরী আমাদের হৃদয়ে কত আনন্দ প্রদান করিতেছে, ইহাই যে কয়েক ঘণ্টা পরে কৃতান্তের করাল দৃশ্য প্রদর্শন করিবে, উহা একবার ও মনে উদিত হয় নাই।

বেলা একটার সময় হইতেই ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড সকল ক্রমশঃ পরস্পর সংযোজিত ও ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ু-বেগ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে ছিল। তখন সেই অতিবিক্ষুব্ধ জলধিবক্ষে ক্ষুদ্র অর্ণবযান তরঙ্গ-মালায় আহত হইয়া ব্যাকুল-ভাবে ধাবিত হইতে লাগিল। যখন জাহাজ কালাপানিতে উপস্থিত হইল, তখন প্রকৃতির কি ভয়াবহ মূর্ত্তিই দেখিয়াছিলাম। ঐ অবস্থা ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত ভাষা নাই, উহা চিরকাল স্মৃতি-পটে অঙ্কিত থাকিবে। নৈয়ায়িকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জল গন্ধ-গুণ-বিহীন কিন্তু কালাপানিতে উহার সম্পূর্ণ ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। উহার জলের তীব্রগন্ধে অনেকে বমন করিতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে জগৎ হইতে যেন আলোক সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। যে দিকে দৃক্‌পাত করি, কেবল নীলবর্ণ। মেঘ নীল, আকাশ নীল, সমুদ্র নীল, বিশ্বসংসার যেন নীলিমায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। সেই শুভ মুহূর্ত্তে প্রভঞ্জন ও স্বীয় প্রভাব প্রদর্শনে বিরত হইলেন না। তখন সেই বিশ্বগ্রাসী তিমির-মধ্যে সমুদ্র-গর্জ্জন, মেঘগর্জ্জন, বায়ুর শব্দ একত্রিত হইয়া কর্ণ বধির করিয়া তুলিল। যতক্ষণ আলোক ছিল, ঊর্দ্ধমুখে অভ্রস্পর্শি উত্তাল-তরঙ্গ-মালার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। প্রতিমুহূর্ত্তেই বোধ হইতেছিল, এই বারের তরঙ্গাঘাতেই আমাদিগকে জলধির অতল তলে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহার পর, ঘোর

---

* এই প্রবন্ধটী প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়, কিন্তু কোন বন্ধুর নিকট পড়িয়াছিল। সংপ্রতি 'প্রদীপ' সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিলাম। 'প্রদীপ' সম্পাদক মহাশয় আমার অনুরোধে এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের একটী চিত্র সন্নিবেশিত করিলেন। আশা করি উহা পাঠকগণের অপ্রীতিকর হইবে না। (প্রবন্ধ লেখক)

অন্ধকারে আর ঊর্ম্মিমালা দেখা গেল না কিন্তু এত ক্ষণ উহা নিম্নস্থ আরোহিগণকেই প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, এই বার ডেকের উপর জল আসিল। এতক্ষণ বালকটীকে নানা কথায় ভুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। সে এক এক বার খেলার বন্দুকটী লইয়া বলিতেছিল, “আমি সমুদ্রকে গুলি করিব, সে আমাদের জাহাজ দোলাইতেছে কেন?” শিশুর কথা শুনিয়া ডেকের আরোহীরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারে নাই। এই বার যথার্থই জীবন মৃত্যুর মধ্যস্থলে উপনীত হইলাম। দুই তিনটা তরঙ্গ ডেক্ প্লাবিত করিয়া চলিয়া গেল। আমরা পূর্ব্বেই শয্যা গুঁটাইয়া ক্যাবিনে রাখিয়াছি এবং বাক্‌স তোরঙ্গ ও সব ভিতরে। এখন কেবল আর্দ্রবস্ত্রে শীতার্ত্ত কলেবরে ঈশ্বর চিন্তা করিতে গিয়া মৃত্যু চিন্তা করিতেছি। সহসা ডেকে উঠিবার সিঁড়ীতে মহাজনতা ও ভয়ানক কলরব শ্রুত হইল। নিম্নতলায় বহুক্ষণ ব্যাপিয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত আরোহিগণ স্থধু ডেকের ভাড়া কেন? সর্ব্বস্ব দিয়াও ডেকে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। জাহাজের কাপ্তান তাড়াতাড়ী সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য কাতর শীতার্ত্ত যাত্রিগণকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া নামাইয়া দিল। আমি জাহাজের বাঙ্গালী কেরানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম “উহাদিগকে উপরে আসিতে দেওয়া হইতেছে না কেন?” বাঙ্গালী বাবু বলিলেন “আপনারা সমস্ত দিন ডেকে বসিয়া অভ্যস্ত হইয়াছেন, উহারা অনভ্যস্ত. উপরে আসিয়া কথনই স্থিরমস্তকে বসিতে পারিবে না, দলে দলে সমুদ্রজলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বিশেষ উপরে স্থানে ও কুলাইবে না”। এদিকে ঝটিকা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ডেকের মধ্যে শ্রীমতী তাঁহার অশ্রুমুখ তনয়টীকে বুকে চাপিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই এক প্রকার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি, ভাবিলাম যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে ভাল করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করি কিন্তু উহার পূর্ব্বেই সহধর্ম্মিণী ও পুত্র দুইটীর কথা মনোমধ্যে সমুদিত হইল। কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বস্ত্রাবৃত-দেহে থাম জড়াইয়া বসিয়া মনে মনে ভগবানের নাম করিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় দুই তিন ঘণ্টা কাটিল, রাত্রি যখন নয়টা তখন সেই দ্রুতগামী অর্ণবযান কালাপানি অতিক্রম করিয়া অপর সমুদ্রে পড়িল। অনতি বিলম্বে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটী “লাইট্‌হাউস্” বা আলোক-গৃহ দৃষ্টিগোচর হইল। উহা দেখিয়া জাহাজের ক্লান্ত কর্ম্মচারিগণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। তাহারা বুঝিল কালাপানি ছাড়িয়া আসিয়াছি। বায়ুর প্রতিকূলতা-প্রযুক্ত অতিবেগে জাহাজ চালাইতে হইয়াছিল। তাহারা তখন অত্যন্ত শ্রান্ত ও অবসন্ন, কালাপানিতে জলের গভীরতার ইয়ত্তা নাই, তজ্জন্য এতক্ষণ নোঙর করিতে পারে নাই। এখন ঐখানেই রাত্রি যাপনের জন্য নোঙর করিয়া ভোজনে বসিয়া গেল। প্রায় ১৫ মিনিটের পর আলোকগৃহ হইতে বারংবার লোহিত বর্ণ আলোক প্রদর্শিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালী কেরানীটী কেবল তখন ভোজনে বসিবেন, তিনি উহা দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া কাপ্তান সাহবকে বলিলেন। সাহেব তাড়াতাড়ী ভোজন শেষ করিয়া দেখিলেন নোটবুকে লেখা আছে ঐ দিবস সমুদ্রে সামান্য ঝটিকা হইবে। তিনি ও দুই জন ইংরেজ কর্ম্মচারী অতিক্ষিপ্রতার সহিত খালাসীদের সাহায্যে জাহাজের উপরিস্থ ক্যাম্বিসের আচ্ছাদন নামাইয়া ফেলিলেন। এবং লাইফ্‌বোটগুলি (জীবনতরী) প্রস্তুত রাখিলেন। কাপ্তানসাহেব. ডেকের ও ক্যাবিনের প্রত্যেক আরোহীর নিকট গিয়া বলিলেন “এখনই ঝড় আরম্ভ হইবে, তোমরা ভীত হইও না, সকলে থাম ধরিয়া বসিয়া থাক।” দেখিতে দেখিতে প্রবলবেগে জলও ঝড় উপস্থিত হইল। এক এক বারে যেন প্রভঞ্জনের বেগে জাহাজ খানি উল্‌টাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতে লাগিল। নিম্নে সমুদ্র, উভয় দিকে উত্তাল তরঙ্গমালা ও উপরে মুসলধারে বারিধারার পতন, তখন যেন সমস্ত বিশ্বসংসার কেবল জলময় বোধ হইল। এই ভাবে প্রায় দুইঘণ্টা অতিবাহিত হইল। রাত্রি বারটার সময় ক্রমে ক্রমে পবনের বেগ হ্রাস হইয়া আসিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে আকাশ নির্ম্মল, জলধি প্রশান্ত মূর্ত্তিতে বিরাজমান, জ্যোৎস্নালোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইল। আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না, আমরা যেন মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর, ডেকের উপর সতরঞ্চ তোষক পাড়িয়া নিরুদ্‌বেগে শয়ন করিলাম। ছয়টার পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম অর্ণবপোত বৈতরণীনদীর মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় অর্ণবযান চাঁদবালীতে পৌঁছিল। চাঁদবালী একটী প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সন্ধি-স্থলে অবস্থিত। এক সময় ধান্য ও চাউলের ব্যবসায়ের জন্য এই বন্দরটী অতি প্রসিদ্ধ ছিল। জাহাজের নিম্নতলার সেই শীত-ক্লিষ্ট উপবাসকাতর কোটরগত-চক্ষু বহু নরনারীর সহিত জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া একটী বাসা ভাড়া করিলাম। এখানে যে সকল লোক দেখিলাম উহাদের পরিচ্ছদ ও কথা উড়িয়া এবং উহারা উৎকলের অধিবাসী বলিয়া আত্মগৌরব অনুভব করে। নিম্নশ্রেণী স্ত্রীলোকদের কাছা ও নাসিকা-বিলম্বী বৃহদাকার নত্ দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। আমরা সত্বর রন্ধন ও ভোজন সমাপ্ত করিয়া ষ্টিমারে উঠিলাম। কটক হইতে দুই জন ভৃত্য আসার কথা ছিল কিন্তু তাহাদের না দেখিয়া শ্রীমতী কথঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। ষ্টিমার যুগল তীরভূমি ত্যাগ করিয়া মৃদু মন্দগতিতে কটক অভিমুখে চলিল। আমরা পূর্ব্বেই ষ্টিমারে উঠিয়া মনোগত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলাম। শেষে এত ভিড় হইল যে, স্থান না পাইয়া একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁহার পত্নী ও পাচিকা সহ আমাদের নিকটে স্থান প্রার্থনা করিলেন। আমরা তাঁহাদের ও অন্যান্য বাঙ্গালী নরনারীর সহিত মহা উৎসাহে চলিলাম। বৈতরণী নদী ত্যাগ করিয়া ষ্টীমার আর একটী নদীতে গিয়া পড়িল। নদীর উভয় তীরে নারিকেল-গুবাক আম কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ-পরিশোভিত গ্রামগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। অপরাহ্নে ষ্টীমার কৃত্রিম নদী বা খালে প্রবেশ করিল। উড়িষ্যার এই কুল্যা বা কৃত্রিম জলপ্রণালী নির্ম্মাণে গবর্ণমেণ্টের বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার ব্যয় সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক প্রজাকেই অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে হয়। তাহা হইলেও ইহা যে সহৃদয় ইংরেজ-রাজের একটী মহাকীর্ত্তি তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কুল্যার উভয় তীরে নয়নরঞ্জন শস্যক্ষেত্র। ঐ সকল ক্ষেত্রে যথাসময়ে জলদানের উত্তম ব্যবস্থা আছে। আজ আকাশ পরিষ্কার নীলবর্ণ, নিদাঘের রমণীয় অপরাহ্নে মৃদুগতি ষ্টীমারে বসিয়া সান্ধ্য বায়ু সেবন বড়ই শান্তিপ্রদ। উদ্যানে কুসুমরাজির ন্যায় একটী একটী করিয়া নক্ষত্র গগনমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অচিরোদ্‌গত চন্দ্রালোকে জগৎ আলোকিত হইল। সমস্ত নিশা ষ্টীমার চলিল। গভীর রাত্রিতে আমরা নিদ্রামগ্ন হইলাম। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম গ্রাম পার্শ্ব দিয়া ষ্টীমার চলিতেছে। উভয় তীরে গুবাকবৃক্ষশ্রেণী শান্তিময় পল্লীগুলির বেশ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ নতের দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় অলঙ্কৃত করিয়া প্রতিঘাটে উৎকল সুন্দরীগণ সস্মিতবদনে ষ্টীমারের প্রতি কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া আছে। ক্রমেই বেলা হইতে লাগিল। পথ আর ফুরায় না, ক্রমশঃ বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর, একাদশ ঘটিকার সময় ষ্টীমার কটকে পৌঁছিল। ষ্টীমার-ষ্টেসনে লোক না দেখিয়া শ্রীমতী অতিশয় চিন্তিত হইলেন। বাসায় গিয়া শুনা গেল, পূর্ব্বোক্ত সবডেপুটী শ্রীমান্ ··· ··· ··· প্রায় বিংশতি দিন মফস্বলে আছেন। পোষ্ট ও টেলিগ্রাম অফিসে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, আমরা যখন যাত্রা, করি তাহার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে টেলিগ্রামটী করিয়াছিলাম, উহা এবং তৎপূর্ব্ব প্রেরিত চিঠিসকল পোষ্ট অফিসেই মজুত রহিয়াছে। আহারান্তে আমরা মফস্বলে টেলিগ্রাম করিব ভাবিতেছি, এমন সময় পাচক ব্রাহ্মণ ও চাকর আসিল। তাহারা বলিল “বাবু অদ্যই রাত্রি আট ঘটিকার সময় আসিবেন। আপনারা যে এত শীঘ্র আসিবেন, তিনি তাহা কিছুই জানেন না। শ্রীমতী আহারের এক বিরাট আয়োজন করিলেন। অপরাহ্ন চারি ঘটিকা হইতে আহার্য্য প্রস্তুত আরম্ভ হইল। যথাসময়ে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইল। শ্রীমান্ শিবিকা হইতে নামিয়া আমাকে দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত। অভিবাদন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেই আমি ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি অপ্রতীক্ষিত অবস্থায় গৃহ সজ্জিত ও আলোকিত দেখিয়া বিশেষতঃ শিশুর স্নেহপূর্ণ পিতৃ-সম্বোধন শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আহারান্তে অনেক রাত্রে শয়ন করা গেল। পরদিনই আমি পুরী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম কিন্তু শ্রীমান্ ও শ্রীমতীর অনুরোধক্রমে সেদিন অবস্থান করিলাম। আগমনকালে ষ্টীমারে বেঙ্গলসেক্রেটারিয়েটের একটী কেরাণীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার শ্বশুরালয়

কটকে। তিনি আসিলে অপরাহ্নে তাঁহার সহিত রাভেন্সা-কলেজের অধ্যক্ষ বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ের বাসায় গেলাম। সেখানে কলেজের আরও কতিপয় অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই নীলকণ্ঠবাবুর সহিত পরিচয় ছিল, তিনি নানাবিধ শিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ কলিকাতার নূতন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কটক নগর অতিপ্রাচীন। ভবগুপ্তের অনুশাসন পত্রে ইহার উল্লেখ আছে। ভবগুপ্ত খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে রাজ্য করেন। অতএব উক্ত সময়েও ইহা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই অতি প্রাচীন নগরী এখন আর বিদ্যমান নাই। বর্ত্তমান নগরীর প্রাকৃতিক অবস্থানটীও বড় সুন্দর। মহানদী দ্বিধারা হইয়া একটী দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই-খানে মহানদী ও কাটজুড়ি নদীর মুখে কটক নগর অব-স্থিত। ইহার পার্শ্বেই পর্ব্বতমালা। অপরাহ্নে ষ্টীমার ষ্টেসন-সন্নিহিত সেতুর উপরিভাগ হইতে ঐ সকল নীলবর্ণ শৈলরাজির দৃশ্য অত্যন্ত নয়নপ্রীতিকর। আসিয়া পাহাড়ই সর্ব্বপ্রধান। ইহার প্রাচীন নাম চতুষ্পীঠ পর্ব্বত। ইহার কোন শৃঙ্গে হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি, কোনটীতে বৌদ্ধ-মূর্ত্তি, কোন শিখরে মুসলমানের মস্‌জিদ্ বিরাজিত। কোন কোন শৈলনিতম্বে নাকি অতি প্রাচীন রাজধানী ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কোন শিখরের কারুকার্য্য এতই মনোহর যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। উৎকলের মাদলাপঞ্জীর মতে প্রায় নয়শত বৎসর পূর্ব্বে কেশরীবংশীয় কোন রাজাকর্ত্তৃক এই কটক নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্ত-মান কটক নগরে ও বড়বাটী নামে একটী দুর্গ আছে। উহা খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে তদানীন্তন রাজা অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া-ছেন—ঐ দুর্গমধ্যে রাজা মুকুন্দদেবের নয়তলা একটী প্রাসাদ ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে ও ইহার সমৃদ্ধির অভাব ছিল না। বর্ত্তমান ইংরেজ-রাজত্বেও ইহা উড়িষ্যা-বিভাগের প্রধান নগর। বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা এখানে অবস্থিতি করেন। এই নগরে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত ও স্কুল কালেজ্ ইত্যাদি আছে। নগরটী প্রায় তিন ক্রোশ ব্যাপী। এখানে অনেকগুলি বাজার আছে। নর্ম্ম্যাল্ স্কুলের সন্নিহিত গণেশঘাটের গভীর এবং বিমল জলে গ্রীষ্মকালে স্নান করায় বড়ই আরাম।

পর দিন পূর্ব্বাহ্নে আহার সমাপ্ত করিয়া একখানি গোযানে ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তখন সহর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ গিয়া শকটে আরোহণ করিতে হইত। নগরের দক্ষিণাংশে বিশুষ্কতোয়া মহানদীর সিকতাময় বক্ষঃ অতিক্রমপূর্ব্বক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণে দগ্ধপ্রায় হইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবরে ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। পরদিন স্নানযাত্রা। ষ্টেসনে অত্যন্ত জনতা। একজন শিখাধারী মান্দ্রাজী হ্যাটকোট্ পরিয়া টিকিট বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু টিকিট-ঘরের সম্মুখের ভিড় কমিতেছে না। একটী লোক ও টিকিট পাইতেছে না। শেষে দেখিলাম লোকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক অন্য দ্বার দিয়া টিকিট গ্রহণ করিতেছে। আমি কি করিব, ভাবিতেছি, এমন সময় হটাৎ আমাদের নবদ্বীপের একটী বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বাবাজী আমার অগ্রে ভুবনেশ্বরে অবতরণের সঙ্কল্প অবগত হইয়া বলিল "ঠাকুর! বলেন কি? কা'ল স্নানযাত্রা, আজ পুরী না পৌছিতে পারিলে রত্নবেদীতে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন হইবে না।" তাহা শুনিয়া অগ্রেই পুরী যাওয়া স্থির করিলাম। বাবাজীর পূর্ব্বেই ষ্টেসন মাষ্টারের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, কারণ সে অনেকগুলি যাত্রীর তত্ত্বাবধায়ক। আমার টিকিট খানি পূর্ব্বের পরিচয়েই লইয়া আসিল। আমরা ট্রেণে আরোহণ করিলাম। অনেকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে টিকিট না পাওয়ায় পড়িয়া রহিল। খুড়দায় প্লেগডাক্তারের নিকট পরীক্ষিত হইতে হইবে। ডাক্তার একটী ফিরিঙ্গী, আর মেয়ে ডাক্তারটী বঙ্গ-মহিলা। নবদ্বীপের সন্নিহিত স্থানবাসী কতকগুলি গৃহস্থ-বধূ কাঁদিয়া আকুল। তাহারা ঐ স্থান হইতেই ফিরিতে উদ্যত। তাহাদের ধারণা প্লেগডাক্তার কোন ক্যাম্পে লইয়া গিয়া তাহাদের লজ্জাশীলতার হানি করিবে এবং তজ্জন্য তাহারা স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইবে। আমি এবং উক্ত বৈষ্ণব অনেক বুঝাইয়া তাহাদের ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিলাম। মেয়ে ডাক্তার দেখিয়া তাহারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া অবতরণ করিল। উহারা পল্লীবাসিনী সুতরাং অত্যন্ত ভীরু। তথাপি আমাকে সঙ্গে থাকিতে হইল। তাহারা বলিল "তুমি দেশের ঠাকুর আমাদের সাক্ষী রহিলে, পাছে লোকে দেশে গিয়া কোন অকথা কুকথার প্রচার না করে।" তখন মহাকবি ভবভূতির কবিতাংশ স্মরণ হইল। "যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনোজনঃ।" মেয়ে ডাক্তারটী পরীক্ষা কার্য্যে বেশ নিপুণ। তিনি তিন হাত দূরে থাকিয়া (তাঁহারও ত প্রাণে ভয় আছে) রজ্জুবদ্ধ সীমার মধ্যস্থিত শ্রেণীক্রমে সজ্জিত রমণীমণ্ডলীর হস্ত কয়খানি গণনা করিয়া অতিক্ষিপ্র-গতিতে বাঙ্গালো অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পুরুষ ডাক্তারের পরীক্ষাকার্য্য ও উহারই অনুরূপ। ট্রেন্ ছাড়িল, আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি-লাম। অপরাহ্নে বাষ্প-শকট পুরীর সন্নিহিত হইল। গাড়ী হইতেই পুরীর মন্দিরের সেই গগনস্পর্শী ধ্বজ সন্দর্শন করিয়া যাত্রিগণের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইল। পুনঃ পুনঃ ভগবান্‌কে প্রণিপাত করিয়া আমরা অবতরণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। প্রায় চারি ঘটিকার সময় বাষ্প-শকট ষ্টেসনে পৌছিল। তত্রত্য কলেক্‌টরের নাজিরের বাটীতে আমি থাকিব স্থির ছিল। সেখানে সাদরে অভ্যর্থিত হইলাম। নাজিরের পিতা বৃদ্ধ শ্যাম বাবু ও একসময় পুরীর কলেক্‌টরির নাজির ছিলেন। এখন তিনি পুত্রকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়া স্বয়ং অবসরবৃত্তি ভোগ করিতেছেন। শ্যাম বাবুর ন্যায় ভক্ত পুরীধামে নিতান্ত বিরল। তিনি জগন্নাথের প্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই গ্রহণ করেন না। উপস্থিত হইবামাত্র শ্যামবাবু কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে লইয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন। কারণ ধূলি পায়ে ভগবদ্দর্শন করিতে হয়।

যখন আমরা মন্দিরের দ্বারে উপনীত হইলাম তখন সায়ংকাল আগত প্রায়। সম্মুখের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। ছড়ীদারগণ সেই ভগবদ্দর্শন পিপাসু বহু দূরাগত দীনবেশ যাত্রিগণকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া নিষ্কাশিত করি-তেছে। সহসা শ্যামবাবুকে উপস্থিত দেখিয়া "শ্যামো বাবু আউচন্তি" বলিতে বলিতে তাহারা সরিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমন্দিরে শ্যামবাবুর প্রতিপত্তি অল্প নহে, পাণ্ডাগণ ও মন্দিরের অন্যান্য সেবক সকলেই শ্যামবাবুর দ্বারা উপকৃত। তাহারা আমাকে অতিশয় যত্ন সহকারে ভিন্ন দ্বার দিয়া রত্নবেদীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। ঘৃতের প্রদীপ ও চন্দন চূয়ার এবং কর্পূরের সুগন্ধে গৃহ আমোদিত। বেদীর উপরিভাগে সিংহাসনে বামে জগন্নাথ, দক্ষিণে বলভদ্র, মধ্যে সুভদ্রাও পার্শ্বে সুদর্শন, এই মূর্ত্তি-চতুষ্টয় বিরাজমান। বহুদিনের আশা পূর্ণ হইল। ভগন্মূর্ত্তি চতুষ্টয় সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বহু দিনের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল, বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এই দীনের নয়নপথে উপনীত হইয়াছেন। গল-লগ্নী-কৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে একটী স্তোত্র পাঠ করিলাম। ছড়ীদারগণ ত্বরা করিতে লাগিল, সুতরাং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া সাগরে স্নান করিতে গেলাম। পথের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য ভিক্ষাজীবী। অনেকে অর্থের জন্য নিদারুণ শারীরিক যাতনা ভোগ করিতেছে। কেহ ভূতলে প্রোথিত হইয়াছে, কেহ কেহ অতি দুর্বহ বৃহৎ পাষাণখণ্ড বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া শয়ান রহিয়াছে। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদিকে সেই নীলোর্ম্মিমালা-সঙ্কুল মহাজলধি গম্ভীর রবে নিত্য বিরাজমান। সমুদ্রতটে উপনীত হইলেই একজন পুরোহিত আসিয়া সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করাইলেন। লৌকিক-প্রথা অনুসারে ঢেউ লইতে হয়, সুতরাং বালু-কার উপর স্থিরপদে উপবেশন করিলাম, যথাক্রমে তিনটী ঢেউ পৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা শেষ করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সঙ্গী পাণ্ডার সহিত সমুদ্র-তীরস্থ স্বর্গ-দ্বারে উপনীত হইলাম। এখানে এক বৃহৎ হনুমন্মূর্ত্তি বিদ্য-মান। কথিত আছে;—এক সময় সমুদ্রের গর্জ্জনে সুভদ্রা ভীত হন, জগন্নাথ সমুদ্রকে আদেশ করেন, তোমার গর্জ্জন যেন মন্দির-মধ্যে প্রবেশ না করে। তজ্জন্য ভগবানের আজ্ঞায় হনূমান্ সাক্ষি-স্বরূপ সাগর গর্জ্জন শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সেই জন্য লোকে ইঁহাকে কাণপাতা হনূমান্ বলে। এখানেও সঙ্কল্পের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তাহার পর, চক্রতীর্থে উপনীত হইলাম। কথিত আছে; এই স্থানেই প্রথম ব্রহ্মদারু ভাসিয়া আসিয়া লাগিয়া ছিল। চক্রতীর্থে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। আমি ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া চক্রতীর্থ সরোবরের তীরস্থ চক্রনারায়ণকে সন্দর্শন করিলাম। পাণ্ডা বলিল "অদ্যই লোকনাথের পূজা শেষ করিয়া

চলুন, কারণ এখান হইতে ঐ স্থান অধিক দূর নহে, অন্য দিন অন্য দিকে যাইতে হইবে। উৎকলে লোকনাথ অতিপ্রসিদ্ধ। উড়িয়ারা লোকনাথকে অত্যন্ত ভয় করে। এমন কি, তাহারা জগন্নাথের নাম করিয়া অনায়াসে শপথ করিতে পারে কিন্তু কোন উড়িয়া লোকনাথের নামে শপথ করে না। উন্নতানত বন্য পথ দিয়া অনেক দূর যাইতে হইল, অন্যূন দেড়ক্রোশ গিয়া লোকনাথের মন্দির প্রাপ্ত হইলাম। এখানে কয়েকটী মন্দির আছে। এক স্থানে একটী উৎসের মধ্যে পাষণময় লোকনাথ শিব-লিঙ্গ বিরাজমান। অনবতরত ঐ উৎস হইতে জল উদ্গীর্ণ হইতেছে। লিঙ্গের উপরিভাগে পিত্তল-নির্ম্মিত সর্প ফণা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। লোকনাথ শিবের পূজা শেষ করিয়া পথে আসিতে একটী কুণ্ডের তীরে সঙ্কল্প পাঠ করিয়া উহার সলিল স্পর্শ করিতে হইল। তাহার পর, প্রায় মধ্যাহ্ন একটার সময় অত্যুষ্ণ সিকতাময় বন্যপথ অতিক্রম করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম-কলেবরে বাসায় উপস্থিত হইলাম। একটু বিশ্রামান্তে হস্তমুখে জল দিয়া পুনরায় শ্রীমন্দিরে চলিলাম। অদ্য স্নানযাত্রা, অসংখ্য যাত্রী স্নানবেদীর চতুর্দ্দিকে ভগদ্দর্শ-নের নিমিত্ত উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। তখন ও ভগবন্মূর্ত্তি প্রকটিত হন নাই, সুতরাং বিলম্ব দেখিয়া নাটমন্দিরে আসিয়া বসিলাম। অনেকগুলি শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইল। যেই মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হইল, পূর্ব্বোক্ত শ্যামবাবু আমাকে টানিয়া লইয়া বেদীতে উঠিলেন। আমি তাড়াতাড়ী এক ভাণ্ড জল লইয়া "সহস্রশীর্ষ" মন্ত্রে ভগবানের মূর্ত্তি-ত্রয়ের উপর ঢালিয়া দিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে সহস্র সহস্র নর নারী আসিয়া অজস্র জল ঢালিতে লাগিল। কিন্তু পাণ্ডারা মূর্ত্তি বিগলিত হইয়া যাইবে আশঙ্কায় পাঁচমিনিট কাল ও জল ঢালিতে দিল না। দেখিতে দেখিতে বস্ত্র দ্বারা প্রতিমা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল এবং বেত্রাঘাতে মূর্ত্তির নিকট হইতে যাত্রীদিগকে সরাইয়া দিল। ইহার পূর্ব্বক্ষণে বেদীতে ভগবন্মূর্ত্তি প্রকটিত দেখিবার জন্য নর নারীগণের ব্যাকুলতা দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইলাম। পৃথিবীতে এরূপ প্রার্থনীয় বস্তু বোধ হয় আর নাই, যাহার জন্য মানুষ এতদূর করিতে পারে। মধ্যাহ্ন-কাল, প্রখর সূর্য্য, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় রশ্মি বিকিরণ করিতেছেন, ভূতল ও স্নানবেদী অগ্নিতুল্য উষ্ণ হইয়াছে। দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে শত শত অসূর্য্যম্পশ্যা রাজান্তঃ-পুরবাসিনী হইতে দরিদ্র-মহিলা পর্য্যন্ত কাতরনয়নে ভগবানের দর্শন প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কাহার ও অন্য কথা নাই, কাহার ও চিত্তে অন্য চিন্তা নাই, কেবল ভগবন্মূর্ত্তি দর্শনের জন্য ব্যাকুল। সূর্য্যদেব অগ্নিকণা বর্ষণ করিয়া ও তাহাদের একাগ্রতা নষ্ট করিতে পারিতেছেন না। সকলেই তন্ময়চিত্তে ভগবদ্ধ্যান নিরত। একটী হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী, হরতি দরতি তিমিরমতি-ঘোরম্।" ইত্যাদি জয়দেবের পদাবলী উচ্চারণ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া অজস্র বাষ্পবারি পরিমোক্ষণ করিতেছেন। যে যে ভাবের উপাসক, সে সেই ভাবেই ভগবানের ধ্যান করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্ম-ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শিষ্যশাখা-সমন্বিত হইয়া বেদীর এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। আমি তদানীন্তন স্নানবেদীর দৃশ্য দেখিয়া যারপর নাই মোহিত হইলাম এবং ভগবান্কে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিয়া একটু জনতা থামিলে বাসায় আসিয়া মাধ্যাহ্নিক আহার সম্পন্ন করিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় মন্দিরে গেলাম। জগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দির হিন্দুজাতির এক অদ্ভুতকীর্ত্তি। মন্দির-প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬৬৫ ফিট্ ও প্রস্থে উত্তর দক্ষিণে ৬৪৪ ফিট্। ইহার চারিদিক্ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। মন্দিরের চারিটী দ্বার, পূর্ব্বদিকে সিংহ-দ্বার, ইহা কৃষ্ণবর্ণ পাষাণে নির্ম্মিত। এই দ্বারের কারু-কার্য্য অতিচমৎকার। ইহার কপাট শালকাষ্ঠের এবং ইহার ছাদ চূড়াকারে নির্ম্মিত। দুই পার্শ্বে দুইটী সিংহমূর্ত্তি এবং দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি আছে। এই দ্বারের সম্মুখে ৪৪ ফিট্ উচ্চ এক অরুণস্তম্ভ বিরাজমান। পশ্চিমে খঞ্জাদ্বার, ইহাতে কোন মূর্ত্তি নাই। উত্তরে হস্তিদ্বার, এই দ্বারে এক হস্তিমূর্ত্তি বিদ্য-মান। আর দক্ষিণে অশ্বদ্বার, ইহাতে এক অশ্বের মূর্ত্তি রহিয়াছে। পূর্ব্বদ্বারে প্রবেশ করিয়া বামভাগে কাশীবিশ্ব-নাথ ও রামচন্দ্র-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাঙ্গণের মাঝখানে জগন্নাথের মূলমন্দির, তাহার সম্মুখে মা মোহন, মোহনের সম্মুখে নাটমন্দির। উহার পূর্ব্বভাগে ভোগ-মণ্ডপ। ভোগমণ্ডপের দেয়ালে অনেক কারুকার্য্য আছে

এবং এমন সকল অশ্লীল মূর্ত্তি আছে যে, দেখিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। এই ভোগমন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে অতিমনোহর নবগ্রহ-মূর্ত্তি বিরাজিত। অনেক ক্ষণ মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া নানাবিধ দৃশ্য দেখিলাম। স্নানযাত্রার দিন ভোগ হইতে বড় দেরী হয়। আজ স্নান বেদীতেই ভোগ হইবে, সুতরাং সন্ধ্যাকালে ভোগ দেখিবার জন্য অত্যন্ত জনতা হইল। পোলিশ-প্রহরিগণ শান্তিরক্ষা করিতে লাগিল। শোওয়ারগণ যেই ভারে ভারে অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া স্নানবেদীতে রাশীকৃত করিতে লাগিল, অমনি আকাশে ভয়ানক মেঘ হইল। তখন রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা, অনেকে এমন কি সমাগত যাত্রিগণের প্রায় তৃতীয়াংশ ভোগের প্রতীক্ষায় অনাহারে আছে। অনেক দুঃস্থ এবং ভিক্ষার্থী, ধনী এবং জমিদারগণের দাতব্য প্রসাদের জন্য ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে। যেরূপ মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল, তাহাতে ভোগ বুঝি হয় না, ক্ষুধার্ত্ত যাত্রিগণ কাতরভাবে বলিতে লাগিল "হা ভগবন্ হে মহাপ্রভো! তোমার নামে থাকিয়া আমরা অনাহারে দিন যাপন করিব, আমরা কোন্ পাপে তোমার প্রসাদে বঞ্চিত হইব?" যদিও বহু ভোগ আসিয়াছে, এখন অনায়াসে ভোগক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে কিন্তু পাণ্ডারা তাহা করিতে দিবে কেন? তাহারা সমাগত যাত্রিগণের নিকট হইতে বহু টাকা গ্রহণ করিয়া ভোগ প্রস্তুত করিয়াছে। সে সমুদয় জগন্নাথের সম্মুখে না আসিলে ভোগ হইতে পারে না। কারণ যাহা জগন্নাথের সম্মুখে না আনা হইবে তাহা প্রসাদ নহে, উহা যাত্রিগণ বা অন্য কোন লোক গ্রহণ করিবে না। কাজেই সমুদয় অন্ন ব্যঞ্জন না পৌঁছা পর্য্যন্ত ভোগ হইল না। যেই সমুদয় পৌঁছিল অমনি ভোগের হুকুম হইল। পূজক কয়েকটী তুলসীপত্র প্রক্ষিপ্ত করিয়া স্বল্প কালের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। তখন ভয়ানক গোল উপস্থিত হইল। কেহ প্রসাদ ক্রয় করিতে লাগিল, কেহ কেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, কোন কোন ক্ষুধার্ত্ত যাত্রী ঐ স্থানে দাড়াইয়াই প্রসাদ ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে মুসলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল, কে কোথায় যায়। পূর্ণিমা হইলেও আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার এবং মহা জনতাও কোলাহল। পাণ্ডাগণ প্রসাদ ভাসিয়া যাইবে আশঙ্কায় হাঁড়ীর উপর হাঁড়ী স্থাপন পূর্ব্বক উপরের হাঁড়ীর মুখ ঢাকিয়া মশাল হাতে চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমরা তাড়াতাড়ী আসিতে পথি-পার্শ্বস্থ একটী ঘরের বারান্দায় আশ্রয় লইলাম। জগন্নাথের ভোগ যাহারা পাক করে এবং বহন করে উহাদের নাম শোওয়ার বা দৈতাপতি। দৈতাপতিগণ যথার্থ দৈত্যপতিই বটে। উহারা এক এক ব্যক্তি দুই তিন মণ প্রসাদ বাঁকের সাহায্যে স্কন্ধে করিয়া মশাল হাতে সেই জলের মধ্যে উন্নতানত পিচ্ছিল পথে দ্রুত বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। বাসায় আসিয়া জানিলাম, আমাদের প্রসাদও পৌঁছিয়াছে। মহাপ্রসাদ ভোজনে বর্ণভেদ নাই। অনেকগুলি বাঙ্গা-লীও উৎকলবাসী একত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। পরদিন প্রত্যুষে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য লইয়া মন্দির হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে গমন করিলাম। কথিত আছে;—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞের ঘৃত হইতে এই সরেবরের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে স্নান সন্ধ্যা তর্পণও শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া সরোবর-তীরস্থ নৃসিংহ ও নীলকণ্ঠের মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। তাহার পর, শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া রত্নবেদীতে পূজা করিলাম। কথিত আছে, রত্নবেদীতে লক্ষ শালগ্রাম প্রতিষ্ঠিত আছেন। তখন জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা মন্দিরের বাহিরে বিরাজমান, সুতরাং লক্ষ্মী বিশ্বধাত্রী ও মাধবের অর্চ্চনা করিয়া সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। তৎপরে যথাক্রমে মন্দিরের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী বদরীনারায়ণ, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, বটেশ্বর, নরসিংহ, অষ্টশক্তি, বিমলাদেবী, গণেশ, ভূষণ্ডীকাক, রাধাকৃষ্ণ, গোপীনাথ, লক্ষ্মী, সর্ব্ব-মঙ্গলা, সূর্য্যনারায়ণ, রাধাশ্যাম প্রভৃতি বহু দেবদেবী মূর্ত্তির যথাশক্তি প্রদক্ষিণ প্রণাম ও অর্চ্চনা করিয়া প্রায় ১২টার সময় বাসায় গমন করিলাম। আহারান্তে শ্যামবাবুর সহিত প্রথমে বৈকুণ্ঠ নামক স্থান দর্শন করিতে গেলাম। উহা শ্রীমন্দিরের অতিসন্নিহিত এবং লতাগুল্ম-পরিবৃত। একটী দ্বিতল গৃহ আছে। ঐ গৃহ-মধ্যে জগন্নাথের নবকলেবর প্রস্তুত করা হয়। দ্বাদশ বর্ষান্তে জগন্নাথের পুরাতন দেহ এই বনে পরিত্যক্ত হয় এবং নবকলেবর শ্রীমন্দিরে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত করা

হইয়া থাকে। ঐ স্থান হইতে পাকশালা সন্দর্শন করিতে গেলাম। গবাক্ষপথে শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য চুল্লী সন্দর্শন করিলাম। চুল্লীর উপরে স্তরে স্তরে হাঁড়ী সাজান হয়। সুতরাং এককালে বহু পরিমাণে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার পর, আমরা গুণ্ডিচাবাড়ী সন্দর্শন করিলাম। এই স্থানটী শ্রীমন্দির হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে;—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের গুণ্ডিচা নাম্নী এক পাটরাণী ছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এখানেও মূলমন্দির, নাটমন্দির ও ভোগ মণ্ডপ আছে। রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথ ঐ মন্দিরস্থ রত্নবেদীতে সাতদিন অবস্থান করেন। দারুব্রহ্ম সিংহদ্বার দিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন ও বিজয় দ্বার দিয়া নির্গত হন। আগমন কালে যমেশ্বরের মন্দির, অলাবুকেশ্বরের মন্দির ও কপালমোচনের মন্দির সন্দর্শন করিয়া অপরাহ্নে বাসস্থানে প্রত্যাগত হইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে মার্কণ্ডেয়-সরোবরে স্নান করিতে গেলাম। এই সরোবরও অতিপ্রাচীনও প্রসিদ্ধ। এখানেও বহু নর নারীর সমাগম হইয়াছে দেখিলাম। বিশেষ সঙ্কল্প পাঠপূর্ব্বক স্নান ও সন্ধ্যা শেষ করিয়া সরোবরের মধ্যস্থ কালিয়-সর্পের ফণার উপরিস্থিত বংশীধর কৃষ্ণমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। তাহার পর, তীরস্থ মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দিরে আম্রনাথ, হরপার্ব্বতী, কার্ত্তিকেয়, পঞ্চপাণ্ডবলিঙ্গ ও ষষ্ঠীমাতা প্রভৃতির সন্দর্শনও প্রণামাদি করিয়া সরোবরের উত্তর ভাগস্থ অপর একটী মন্দিরে গমন করিলাম। সেখানেও চতুর্ভুজা, সপ্তমাতৃকা, গণেশ, নবগ্রহ ও নারদের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি বিরাজমান। ঐ সকল সন্দর্শন শেষ হইলে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নানা সম্প্রদায়ের অনেক গুলি মঠ আছে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায়, উহার সংখ্যা প্রায় ৭৫০ হইবে। তন্মধ্যে বালুসাহীর শঙ্করমঠ, নিমাইচৈতন্যের মঠ, নানকসাহী-মঠ, কবীরপন্থী-মঠ ও মূলকদাসের মঠই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। বাসায় আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করিয়া মঠসমূহ দর্শনার্থ চলিলাম। সঙ্গে সেই পরম বৈষ্ণব বৃদ্ধনাজির শ্যামবাবু। এক একটী মঠ অতি-বৃহৎ। উহাতে নানাবিধ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ সকল মঠে ভারতীয় সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীরই দর্শন পাওয়া যায়। উক্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানী লোকও অনেক আছেন। দুই এক স্থলে উপনিষৎ ও বেদান্তের চর্চ্চা হইতেছে দেখিলাম। প্রায় সকল মঠেই ভগবদ্-গীতার আলোচনা চলিতেছে। মঠের অধিকারিগণ অতিশিষ্ট ও মিষ্টভাষী। যেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলাম, সেখানেই বৃদ্ধনাজির আমাকে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত করিয়া দিতে লাগিলেন। মঠাধিকারিগণ আমার অত্যন্ত আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। আর প্রত্যেক মঠেই মধ্যাহ্ন আহারের জন্য অনুরুদ্ধ হইতে লাগিলাম। অনেক করিয়া উল্লিখিত অভ্যর্থনার প্রত্যাখ্যান করিতে হইল। মঠস্বামিগণ মঠের দেবমূর্ত্তি ও অতিথি সেবার জন্য সঞ্চিত দ্রব্যাদি দেখাইতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এক এক মঠে গোলা-পরিপূর্ণ ধান্য ও সহস্র সহস্র বস্তা তণ্ডুল বুঁট, মটর, অরহর প্রভৃতি পর্ব্বতাকারে সঞ্চিত রহিয়াছে। মিষ্ট কুষ্মাণ্ডের ত সংখ্যাই নাই। ভারতীয় রাজন্যবর্গের দানশীলতায়ই এই সকল মঠের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মঠেরই মফস্বলে দেবোত্তর ভূমি আছে। একজন মঠের কর্ম্মচারী বলিলেন "আমাদের মঠে ও ইহার মফস্বল কাছারীতে যে ধান্য চাউল ও অন্যান্য রবিশস্য সঞ্চিত আছে, যদি উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা হইলে আমরা এই সকল খাদ্যদ্বারা পুরীজেলার সমুদয় অধিবাসীকে এক বৎসর বাঁচাইয়া রাখিতে পারি।" পূর্ব্বেই লিখিয়াছি (অনেক মঠে অনেক জ্ঞানী সাধু আছেন, তাঁহাদের সহিত সংস্কৃত ভাষায় আলাপ হইল)। কিন্তু মঠাধ্যক্ষগণ প্রায়ই সংস্কৃতবিৎ নহেন, তাঁহারা দারপরিগ্রহ-বিমুখ হইলেও পাকা বৈষয়িক! কি করসংগ্রহে, কি কুষীদব্যবহারে অথবা ধর্ম্মাধিকরণে মোকদ্দামার তত্ত্বাবধানে কিছুতেই অকৃতী নহেন। তাঁহাদের আসন, শয্যা, পরিচ্ছদ রাজোচিত। বহুমূল্যের পর্য্যঙ্ক, গদী, মশারি এবং উপাদেয় খাদ্য ও অসংখ্য দাস দাসীর সেবাতৎপরতা দেখিলে রাজভোগ ও তুচ্ছ বোধ হয়। ভ্রমণ করিতে করিতে মূলুকদাসের মঠে উপস্থিত হইলাম। এখানে বাসুদেব নামক একটি সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সুললিত সংস্কৃত-ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন। আমি যখন উপস্থিত

হইলাম, তখন তিনি ভগবদ্গীতা অধ্যাপন করাইতেছিলেন। অনেকগুলি বিদ্যার্থী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল। অনেকক্ষণ সংস্কৃত-ভাষায় ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিযোগ সম্বন্ধে পরস্পর কথোপকথন হইল। তিনি স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডান্তর্গত "পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আমাকে উপহার প্রদান করিলেন। আমি উক্ত পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশপর্ব্বক তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলাম। এই মহাত্মার মধুর ব্যবহার ও বিশ্বজনীন প্রীতি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। বস্তুতঃ যথার্থ সাধুপুরুষদের সহিত মৈত্রীলাভ অতি সহজ। কারণ তাঁহারা পৃথিবীর সকলকেই যেন কেমন এক প্রকার প্রীতির চক্ষে দেখেন! পণ্ডিত বাসুদেবের বয়স তখন ত্রিংশৎ বৎসরের কিছু ন্যূন হইবে, সমবয়স্ক বলিয়াই হউক অথবা উভয়েই সংস্কৃতশাস্ত্র-ব্যবসায়ী বলিয়াই হউক তিনি আমার প্রতি আশাতীত সৌহৃদ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বলিলেন "আমি আপনাকে একমাস যাইতে দিব না, এই মঠে আপনাকে থাকিতে হইবে"। আমি পরদিন পুরীধাম ত্যাগ করিব শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। তাহার পর, আহারের অনুরোধ। যখন শুনিলেন আমি মঠে মধ্যাহ্ন আহার করিব না, তখন কয়েকটি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ও প্রচুর মোহনভোগ আনিয়া বলিলেন "মহাপ্রসাদ গ্রহণ করাইতে আমি তোমার সম্মতির অপেক্ষা করিব না," বলিয়া মোহনভোগ ও মিষ্টান্ন মুখে তুলিয়া দিলেন। অগত্যা আমি কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্থানী সাধু পণ্ডিত বাসুদেবের নিকট বিদায় লইয়া শ্যামবাবুর সহিত বাসায় আগমন করিলাম। ঐদিন সায়াহ্নে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে গিয়া পুরীর আদালত ও অন্যান্য রাজ-কার্য্যালয় দেখিয়া আসিলাম। জলধিতীর হইতে সেই অভ্রভেদী শ্রীমন্দিরের দৃশ্য যে কি মনোহর দেখায়, উহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। বস্তুতঃ যে মহারাজ প্রথম অর্ণবতীরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার যে কি অসাধারণ সৌন্দর্য্য-নির্ব্বাচন-শক্তি ছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

উপসংহারে বক্তব্য এবার পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের ঐতিহাসিক বিষয় কিছুই বলা হইল না। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বৈষ্ণবধাম পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ও শৈবধাম ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্রের যথাযথ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(১৩১০ সালের মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যার ৪৩৩ পৃষ্ঠার পর।)

বড় আশা করিয়াই নবাব সৈন্য কাটোয়ায় উপস্থিত হইল। কাটোয়া হইতে মুর্শিদাবাদ কেবলমাত্র দুইদিনের পথ, এখানে ততটা শত্রুভয় না থাকিবারই কথা,—কয়েকদিন উপবাস অনশনে তৃণশয্যায় কাটাইবার পর কাটোয়ায় সেই শ্রমাপনোদনের পূর্ণ আশা ছিল, কিন্তু সে আশা মিটিল না—নবাব সৈন্যের প্রতি এখন বিধাতা বাম, তাহাদের অদৃষ্টচক্রে সুখের আবর্ত্তন ঘটিয়া উঠে নাই; অতএব সুখের আশা বিড়ম্বনাময়ী—তাহারা কাটোয়া পৌছিয়াই শুনিল মহারাষ্ট্রীয়েরা কাটোয়া ও তৎসন্নিহিত গ্রাম ও পল্লী লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বহু স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে—চারিদিকে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে। এই দৃশ্য দর্শনে নবাব আত্মহারা হইলেন—আপনার দুঃখ কষ্ট সমস্তই বিস্মৃত হইলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। কাটোয়াবাসীর দুঃখ দর্শনে তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা বহিল—ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে দুরাত্মাদিগের দণ্ডবিধান হয়। বড় বড় মরাই বড় বড় ধানের গোলা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে—লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থান একজনেরও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিল না। নবাব কাটোয়ার দুর্গে উপস্থিত হইয়া আপন অগ্রজ ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে মুর্শিদাবাদে আপনার অবস্থার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথাই লিখিয়া পাঠাইলেন; তাঁহারা যেন বিশেষ সতর্কতায় সহিত রাজধানী রক্ষা করেন, যেন কোন মতে মুর্শিদাবাদের শান্তি নষ্ট না হইতে পায়, আর সৈয়দ আহম্মদ খাঁ যাহাতে অবিলম্বে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য

হস্তগত হইলে তাহাদিগকে সেখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা করিবার লোভ প্রদর্শিত হইল। তাহারা সম্পূর্ণরূপে মীর হবিবের করতলে আসিল, ষড়যন্ত্র ঠিক হইল—তাহা মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির কর্ণগোচর হইল। শীষ রাও নামে এক জন মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার কতকগুলি সৈন্য লইয়া এক দিন মীর হবিবের সঙ্গে চলিল। মীর হবিব তাহাদিগকে হুগলীর অনতিদূরে লুক্কায়িত রাখিয়া আপনি পনর জন মাত্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে রাত্রিকালে হুগলী নগরে প্রবিষ্ট হইয়া ষড়যন্ত্রকারী আবুল হোসেও আবুল কাশেমকে ডাকিয়া পাঠাইল, তাহারা সানুচর মীর হবিবকে লইয়া হুগলীর দুর্গ দ্বারে উপস্থিত হইল, মীর হবিব কিয়ৎকালের জন্য আত্ম গোপন করিল। তখন দুর্গের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল, মুসলমান মহাজনেরা বলিয়া পাঠাইলেন, ফৌজদারের সহিত তাঁহারের সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আবুল হোসেন ও আবুল কাশেম তাঁহার পরিচিত বন্ধু—সময়ে অসময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায়, অতএব এরূপ স্থলে তাঁহাদিগকে দুর্গ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবার পক্ষে ফৌজদার কিছুমাত্র আপত্তি বোধ করিলেন না। দুর্গ দ্বার খুলিয়া দিবার সংবাদ পাইবামাত্র মীর হবিব শীষ রাওকে অগ্রসর হইবার কথা বলিয়া পাঠাইল। এদিকে দুর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র মীর হবিব সানুচর দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া ফৌজদারকে বন্দী করিল, তৎপরক্ষণেই সসৈন্যে শীষ রাওয়ের দুর্গ প্রবেশ—হুগলীর মসনদে মীর হবিবের উপবেশন যেন ভোজবাজির ন্যায় নিমেষ মধ্যে সাধিত হইল। সেই গভীর নিশিথে হুগলীর দুর্গে মহারাষ্ট্রীয় পতাকা উড্ডীন হইল। হুগলীতে বর্গীর হুজুক হইল। পর দিন প্রাতঃকালে নগরবাসিগণ মহারাষ্ট্রীয় প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অবনত মস্তকে মীর হবিবকে নজর দিতে লাগিল। ইহাও উপরি উক্ত দুই জন মুসলমানের কৌশল। এই সময়ে হুগলী বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সমধিক সমৃদ্ধিশালি নগর ছিল। সপ্তগ্রামের অধঃপতনে হুগলীর সৌভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। কাবুল, কান্দাহার ও পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে বড় বড় ধনী মহাজন বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য হুগলীতে আসা যাওয়া করিতেন, অনেকে স্ত্রী পুত্র পরিজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া তথায় বসবাসও করিতেন। ক্রমে ইংরেজ জাতিও শুভক্ষণে এই বাণিজ্য উপলক্ষেই হুগলীতে পদার্পণ করিয়া আজি আসমুদ্র হিমাদ্রির একছত্রী হইয়া বসিয়াছেন। অতএব হিন্দুরাজ্যে সপ্তগ্রাম, মুসলমান রাজ্যে হুগলী এবং ইংরেজ রাজত্বে কলিকাতা বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিতে হইবে।

হুগলী অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি সহজে বঙ্গদেশ পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি কাটোয়া রাজধানী করিয়া রীতিমত রাজস্ব আদায় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। মীর হবিব তাঁহার প্রধান মন্ত্রীত্ব পরিগ্রহ করিল; সে কখন হুগলীতে কখন কাটোয়ায় অবস্থিতি করিবে ইহাই স্থিরীকৃত হইল। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ দেখিলেন—পূর্ণ এক বৎসর কাল যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া তাঁহার সৈন্য সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, সমরক্লিষ্ট সেনাগণ অনেকেই অসুস্থ, অধিকন্তু বর্ষা নিকট—এ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূরীকৃত করা সহজ সাধ্য নহে। অতএব বৃথা সৈন্য ক্ষয়ে বলহীন হইবার প্রয়োজন নাই—বর্ষাকালে নিশ্চেষ্টভাবে থাকাই শ্রেয়ঃ এই ভাবিয়া তিনি মুর্শিদাবাদের অদূরবর্ত্তী আমানিগঞ্জ ও তারকপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষা উপস্থিত হইল—ভাগীরথী দুই কুল পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, কাটোয়া হইতে মুর্শিদাবাদ পূর্ব্বের ন্যায় সুগম রহিল না, ইহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যথেষ্ট সুবিধাই হইল। তাঁহারা সুবিধা পাইয়া বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরের সর্ব্বত্র লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। বালেশ্বর বন্দর তাঁহাদিগের হস্তগত হইল, উড়িষ্যার ডেপুটি গবর্ণর মীর মাসম খাঁ প্রবলের প্রতিকূলাচরণ অযৌক্তিক মনে করিয়া আপন রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিলেন। এইরূপে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী রাজসাহীর কিয়দংশ, এমন কি রাজমহল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল। কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ ও তৎসন্নিহিত গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি গ্রাম নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর বশীভূত রহিল। মুর্শিদাবাদবাসীরা কখন এরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য বা কখন ঈদৃশ অরাজকতা প্রত্যক্ষ করেন নাই। তাঁহাদের অনেকেই এখানে বসবাস করা আর নিরাপদ বোধ করিলেন না। যাঁহাদিগের ধন সম্পত্তির সমধিক খ্যাতি ছিল, এরূপ ঋদ্ধিমান

অনেক গৃহস্থ এই সময়ে বড় গঙ্গার পর পারবর্ত্তী ঢাকা, মালদহ, বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী পুত্র পরিজনবর্গ লইয়া পলায়ন করিলেন, এবং সেই সকল স্থানেই বসবাস করিতে লাগিলেন। ডেপুটী গবর্ণর নিবাইশ মহম্মদ খাঁ ও আপনার স্ত্রী পুত্র পরিজনগণকে নিকটে রাখিলেন না, মুর্শিদাবাদ হইতে এক দিনের পথ গোদাবাড়ী নামক স্থানে ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর যে কিছু ধন সম্পত্তি ছিল তথায় স্থানান্তরিত করা হইল, নিবাইশ স্বয়ং পিতৃব্যের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব স্বীকৃত দশ লক্ষ টাকা তাঁহারা আপনাদের সৈন্য ও সেনাগতিগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের মনে যে একটা অশান্তি জন্মিয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহার অপনয়ন হইল। সকলেরই সহিত পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ্য পুনঃ সংস্থাপিত হইল। সেনাপতিগণের মধ্যে যিনি যেমন উপযুক্ত তাঁহাকে তদ্রূপ উপাধিতে ভূষিত করিয়া নবাব তাঁহাদের সমধিক প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন। সকলেরই অধীন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। নবাব যে হস্তীতে আরোহণ করেন, তাহার আশে পাশে থাকিবার জন্য কতকগুলি হস্তীকে সুশিক্ষিত করা হইল। সৈনিক বিভাগের যে যে ত্রুটী ছিল, সমস্তই সংশোধন করিয়া ধৈর্য্য ধারণে নবাব বর্ষাবসানের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই বিপত্তির সময় সংবাদ আসিল যে মুরিদ খাঁ নামা জনৈক কর্ম্মচারী দীল্লি হইতে বঙ্গদেশের বাকী রাজস্ব আদায় করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ আসিতেছেন। যাবৎ মারহাট্টা বিগ্রহের অবসান না হয় তাবৎ তাঁহাকে আজিমাবাদে অবস্থিতি করিবার জন্য লিখিয়া নবাব সম্রাট্ মহম্মদ সাহকেও জানাইলেন যে "আজি কালি মুর্শিদাবাদ যুদ্ধ বিগ্রহের লীলাক্ষেত্র, মারহাট্টাদের উপদ্রবে সকলেই বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত, এ সময় বাকী রাজস্ব দেওয়া একবারে অসম্ভব ও সাধ্যাতীত। ঈশ্বরানুগ্রহে এ বিপদ চিরস্থায়ী হইবে না, দুরাত্মাদিগের দমন হইবে। তবে এই দুঃসময়ে আমার সাহায্যার্থ কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এখানে পাঠাইয়া দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য। কি জানি, যদি উপস্থিত যুদ্ধে আমার জীবনেই কোন দুর্ঘটনা ঘটে, দৈবের কথা কে বলিতে পারে, তাহা হইলে আপনার প্রভূত ক্ষতি হইতে পারে। জানিবেন, ইহা আপনারই মঙ্গলের জন্য লিখিতেছি।" দিল্লীর সম্রাট্ এই পত্র পাইবামাত্র তাঁহার সাহায্যার্থ অযোধ্যার নবাবের জামতা এবং উত্তরাধিকারী আবুল মনসুর খাঁকে স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বঙ্গদেশ তাঁহার রাজ্যের সমীপবর্ত্তী, অধিকন্তু তাঁহার অনেকগুলি সুশিক্ষিভ সৈন্য ও ভাল তোপথানা আছে, অতএব অবিলম্বে বাঙ্গালা দেশে গিয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সাহায্যার্থ প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাকে শীঘ্র রওনা করিবার জন্য সম্রাট্ আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা আমীর খাঁকেও লিখিয়া পাঠাইলেন। অধিকন্তু তিনি বালাজী রাওকেও লিখিলেন যে, দিল্লীর রাজকোষ হইতে তিনি নিয়মিতরূপে চৌথ পাইয়া থাকেন, কিন্তু মারহাট্টা দস্যুগণ বঙ্গদেশে মহা উপদ্রব করিয়া সকলকেই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, কাহারও ধন মান প্রাণ নিরাপদ নহে, অচিরে তাহার প্রতিকার না হইলে চৌথের টাকা মুসমা দিতে হইবে। তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া বিহিত উপায় অবলম্বন করিবেন।

অতঃপর নবাব তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী আবদুল আলি খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা যথাসম্ভব সৈন্য সামন্ত ও গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ লইয়া অবিলম্বে তাঁহার সাহায্যার্থ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হয়েন। দুর্দ্দান্ত মারহাট্টাদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতে না পারিলে কোন মতেই নিষ্কৃতি নাই—অতএব তজ্জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। সেই পত্র মধ্যে তিনি স্বহস্তে এই কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন—"বৃদ্ধ পিতৃব্যের মঙ্গলের জন্য যদি তোমার কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তবে ইহা অপেক্ষা তাহার উপযুক্ত সময় আর নাই।'

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

হস্তগত হইলে তাহাদিগকে সেখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা করিবার লোভ প্রদর্শিত হইল। তাহারা সম্পূর্ণরূপে মীর হবিবের করতলে আসিল; ষড়যন্ত্র ঠিক হইল—তাহা মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির কর্ণগোচর হইল। শীষ রাও নামে এক জন মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার কতকগুলি সৈন্য লইয়া এক দিন মীর হবিবের সঙ্গে চলিল। মীর হবিব তাহাদিগকে হুগলীর অনতিদূরে লুক্কায়িত রাখিয়া আপনি পনর জন মাত্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে রাত্রিকালে হুগলী নগরে প্রবিষ্ট হইয়া ষড়যন্ত্রকারী আবুল হোসেও আবুল কাশেমকে ডাকিয়া পাঠাইল, তাহারা সানুচর মীর হবিবকে লইয়া হুগলীর দুর্গ দ্বারে উপস্থিত হইল, মীর হবিব কিয়ৎকালের জন্য আত্ম গোপন করিল। তখন দুর্গের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল, মুসলমান মহাজনেরা বলিয়া পাঠাইলেন, ফৌজদারের সহিত তাঁহারের সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আবুল হোসেন ও আবুল কাশেম তাঁহার পরিচিত বন্ধু—সময়ে অসময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায়, অতএব এরূপ স্থলে তাঁহাদিগকে দুর্গ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবার পক্ষে ফৌজদার কিছুমাত্র আপত্তি বোধ করিলেন না। দুর্গ দ্বার খুলিয়া দিবার সংবাদ পাইবামাত্র মীর হবিব শীষ রাওকে অগ্রসর হইবার কথা বলিয়া পাঠাইল। এদিকে দুর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র মীর হবিব সানুচর দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া ফৌজদারকে বন্দী করিল, তৎপরক্ষণেই সসৈন্যে শীষ রাওয়ের দুর্গ প্রবেশ—হুগলীর মসনদে মীর হবিবের উপবেশন যেন ভোজবাজির ন্যায় নিমেষ মধ্যে সাধিত হইল। সেই গভীর নিশিথে হুগলীর দুর্গে মহারাষ্ট্রীয় পতাকা উড্ডীন হইল। হুগলীতে বর্গীর হুজুক হইল। পর দিন প্রাতঃকালে নগরবাসিগণ মহারাষ্ট্রীয় প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অবনত মস্তকে মীর হবিবকে নজর দিতে লাগিল। ইহাও উপরি উক্ত দুই জন মুসলমানের কৌশল। এই সময়ে হুগলী বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সমধিক সমৃদ্ধিশালি নগর ছিল। সপ্তগ্রামের অধঃপতনে হুগলীর সৌভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। কাবুল, কান্দাহার ও পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে বড় বড় ধনী মহাজন বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য হুগলীতে আসা যাওয়া করিতেন, অনেকে স্ত্রী পুত্র পরিজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া তথায় বসবাসও করিতেন। ক্রমে ইংরেজ জাতিও শুভক্ষণে এই বাণিজ্য উপলক্ষেই হুগলীতে পদার্পণ করিয়া আজি আসমুদ্র হিমাদ্রির একছত্রী হইয়া বসিয়াছেন। অতএব হিন্দুরাজ্যে সপ্তগ্রাম, মুসলমান রাজ্যে হুগলী এবং ইংরেজ রাজত্বে কলিকাতা বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিতে হইবে।

হুগলী অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি সহজে বঙ্গদেশ পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি কাটোয়া রাজধানী করিয়া রীতিমত রাজস্ব আদায় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। মীর হবিব তাঁহার প্রধান মন্ত্রীত্ব পরিগ্রহ করিল; সে কখন হুগলীতে কখন কাটোয়ায় অবস্থিতি করিবে ইহাই স্থিরীকৃত হইল। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ দেখিলেন—পূর্ণ এক বৎসর কাল যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া তাঁহার সৈন্য সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, সমরক্লিষ্ট সেনাগণ অনেকেই অসুস্থ, অধিকন্তু বর্ষা নিকট—এ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূরীকৃত করা সহজ সাধ্য নহে। অতএব বৃথা সৈন্য ক্ষয়ে বলহীন হইবার প্রয়োজন নাই—বর্ষাকালে নিশ্চেষ্টভাবে থাকাই শ্রেয়ঃ এই ভাবিয়া তিনি মুর্শিদাবাদের অদূরবর্ত্তী আমানিগঞ্জ ও তারকপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষা উপস্থিত হইল—ভাগীরথী দুই কুল পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, কাটোয়া হইতে মুর্শিদাবাদ পূর্ব্বের ন্যায় সুগম রহিল না, ইহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যথেষ্ট সুবিধাই হইল। তাঁহারা সুবিধা পাইয়া বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরের সর্ব্বত্র লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। বালেশ্বর বন্দর তাঁহাদিগের হস্তগত হইল, উড়িষ্যার ডেপুটি গবর্ণর মীর মাসম খাঁ প্রবলের প্রতিকূলাচরণ অযৌক্তিক মনে করিয়া আপন রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিলেন। এইরূপে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী রাজসাহীর কিয়দংশ, এমন কি রাজমহল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল। কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ ও তৎসন্নিহিত গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি গ্রাম নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর বশীভূত রহিল। মুর্শিদাবাদবাসীরা কখন এরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য বা কখন ঈদৃশ অরাজকতা প্রত্যক্ষ করেন নাই। তাঁহাদের অনেকেই এখানে বসবাস করা আর নিরাপদ বোধ করিলেন না। যাঁহাদিগের ধন সম্পত্তির সমধিক খ্যাতি ছিল, এরূপ ঋদ্ধিমান অনেক গৃহস্থ এই সময়ে বড় গঙ্গার পর পারবর্ত্তী ঢাকা, মালদহ, বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী পুত্র পরিজনবর্গ লইয়া পলায়ন করিলেন, এবং সেই সকল স্থানেই বসবাস করিতে লাগিলেন। ডেপুটী গবর্ণর নিবাইশ মহম্মদ খাঁ ও আপনার স্ত্রী পুত্র পরিজনগণকে নিকটে রাখিলেন না, মুর্শিদাবাদ হইতে এক দিনের পথ গোদাবাড়ী নামক স্থানে ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর যে কিছু ধন সম্পত্তি ছিল তথায় স্থানান্তরিত করা হইল, নিবাইশ স্বয়ং পিতৃব্যের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব স্বীকৃত দশ লক্ষ টাকা তাঁহারা আপনাদের সৈন্য ও সেনাগতিগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের মনে যে একটা অশান্তি জন্মিয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহার অপনয়ন হইল। সকলেরই সহিত পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ্য পুনঃ সংস্থাপিত হইল। সেনাপতিগণের মধ্যে যিনি যেমন উপযুক্ত তাঁহাকে তদ্রূপ উপাধিতে ভূষিত করিয়া নবাব তাঁহাদের সমধিক প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন। সকলেরই অধীন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। নবাব যে হস্তীতে আরোহণ করেন, তাহার আশে পাশে থাকিবার জন্য কতকগুলি হস্তীকে সুশিক্ষিত করা হইল। সৈনিক বিভাগের যে যে ত্রুটী ছিল, সমস্তই সংশোধন করিয়া ধৈর্য্য ধারণে নবাব বর্ষাবসানের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই বিপত্তির সময় সংবাদ আসিল যে মুরিদ খাঁ নামা জনৈক কর্ম্মচারী দীল্লি হইতে বঙ্গদেশের বাকী রাজস্ব আদায় করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ আসিতেছেন। যাবৎ মারহাট্টা বিগ্রহের অবসান না হয় তাবৎ তাঁহাকে আজিমাবাদে অবস্থিতি করিবার জন্য লিখিয়া নবাব সম্রাট্ মহম্মদ সাহকেও জানাইলেন যে "আজি কালি মুর্শিদাবাদ যুদ্ধ বিগ্রহের লীলাক্ষেত্র, মারহাট্টাদের উপদ্রবে সকলেই বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত, এ সময় বাকী রাজস্ব দেওয়া একবারে অসম্ভব ও সাধ্যাতীত। ঈশ্বরানুগ্রহে এ বিপদ চিরস্থায়ী হইবে না, দুরাত্মাদিগের দমন হইবে। তবে এই দুঃসময়ে আমার সাহায্যার্থ কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এখানে পাঠাইয়া দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য। কি জানি, যদি উপস্থিত যুদ্ধে আমার জীবনেই কোন দুর্ঘটনা ঘটে, দৈবের কথা কে বলিতে পারে, তাহা হইলে আপনার প্রভূত ক্ষতি হইতে পারে। জানিবেন, ইহা আপনারই মঙ্গলের জন্য লিখিতেছি।" দিল্লীর সম্রাট্ এই পত্র পাইবামাত্র তাঁহার সাহায্যার্থ অযোধ্যার নবাবের জামতা এবং এবং উত্তরাধিকারী আবুল মনসুর খাঁকে স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বঙ্গদেশ তাঁহার রাজ্যের সমীপবর্ত্তী, অধিকন্তু তাঁহার অনেকগুলি সুশিক্ষিভ সৈন্য ও ভাল তোপখানা আছে, অতএব অবিলম্বে বাঙ্গালা দেশে গিয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সাহায্যার্থ প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাকে শীঘ্র রওনা করিবার জন্য সম্রাট্ আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা আমীর খাঁকেও লিখিয়া পাঠাইলেন। অধিকন্তু তিনি বালাজী রাওকেও লিখিলেন যে, দিল্লীর রাজকোষ হইতে তিনি নিয়মিতরূপে চৌথ পাইয়া থাকেন, কিন্তু মারহাট্টা দস্যুগণ বঙ্গদেশে মহা উপদ্রব করিয়া সকলকেই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, কাহারও ধন মান প্রাণ নিরাপদ নহে, অচিরে তাহার প্রতিকার না হইলে চৌথের টাকা মুসমা দিতে হইবে। তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া বিহিত উপায় অবলম্বন করিবেন।

অতঃপর নবাব তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী আবদুল আলি খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা যথাসম্ভব সৈন্য সামন্ত ও গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ লইয়া অবিলম্বে তাঁহার সাহায্যার্থ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হয়েন। দুর্দ্দান্ত মারহাট্টাদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতে না পারিলে কোন মতেই নিষ্কৃতি নাই—অতএব তজ্জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। সেই পত্র মধ্যে তিনি স্বহস্তে এই কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন—"বৃদ্ধ পিতৃব্যের মঙ্গলের জন্য যদি তোমার কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তবে ইহা অপেক্ষা তাহার উপযুক্ত সময় আর নাই।'

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

পাহাড়ী বাবা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাদাসের মাতুলের জ্ঞাতি ভ্রাতা ভৈরবচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের নাম আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সেস্থলে তাঁহার সকল পরিচয় দেওয়া হয় নাই। দুর্গাদাস বাবুর সহিত বিবাহের উপযুক্ত কাল সম্বন্ধে যে কেবল তাঁহার মতের অনৈক্য ছিল, তাহা নহে। এই বিবাহ কার্য্যে তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিল না। বিশেষতঃ কন্যাদায়ে ভারগ্রস্ত ব্যক্তির কন্যাদায় উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এ সম্বন্ধে কেহ তাঁহার শরণার্থী হইলে, তখন ঘোষাল মহাশয়ের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যাইত। আর কেবল কন্যাদায় কেন, কেহ কোনরূপ বিপদে পড়িয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি যেরূপ উৎসাহের সহিত সে কার্য্যে প্রাণপন করিতেন, যাহার কার্য্য সে ব্যক্তি নিজেও সেরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে পারিত না। তবে অনেক সময় গুণ ও দোষে পরিণত হইয়া থাকে। ঘোষাল মহাশয় সময় সময় প্রায়ই পরের কার্য্য করিতে গিয়া নিজের কার্য্য ভুলিয়া যাইতেন।

এদিকে তাঁহার সাংসারিক অবস্থাও সেরূপ স্বচ্ছল ছিল না। যৎকিঞ্চিৎ পৈত্রিক আয় হইতে কোনরকমে অতি কষ্টে তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু সে পক্ষে ঘোষাল মহাশয়ের কোন লক্ষ্যই ছিল না।

যেদিন পাহাড়ী বাবা দুর্গাদাসের গৃহে পদার্পন করিয়াছিলেন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে অতুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া "ঠাকুর দাদা, ঠাকুর দাদা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে একবারে অন্দরের ভিতর উপস্থিত হইলেন। ঘোষাল মহাশয় তখন সবেমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু অতুলচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার আর গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইল না। তিনি আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আরে নাতি যে—আজ সকাল বেলাই কি মনে করে নাতি?"

অতুলচন্দ্র উত্তর করিলেন—"সকাল বেলা আপনাকে ধর্‌তে না পেলে ত, আর দেখা হবার যো নাই। সকাল বেলা এসে যে যে দিন আপনাকে ধর্‌বে, সে দিনই আপনি তার। আমিও বিনা কাজে আসি নাই, আমারও হাতে কাজ আছে—সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। এখন আপনার হাতে কারু বিবাহের ভার টার আছে কি? আচ্ছা ঠাকুর দাদা, ঘটকালী আপনার ব্যবসা নয়, কারু কাছ থেকে ঘটকালীর দরুণ এক পয়সাও গ্রহণ করেন না। তবে এত ঝঞ্জাট পোয়ান্ কি করে—এতে আপনার লাভ কি?

ঘোষাল মহাশয় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—"আরে ভাই, লাভ না থাক্‌লে, কেউ কোন কাজ কি করে! অবশ্যই এতে আমার কিছু লাভ আছেই।"

অতুল। কি লাভটা শুন্‌তে পাই না?

ঘোষাল। লাভের কসুর কি ভাই? সেই বর দেখা ক'নে দেখা আরম্ভ করে, গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত, বিয়ে, ফুলশয্যা, বউভাত প্রভৃতি পর্য্যন্ত এক একটা বিয়েতে কত লুচি সন্দেশ খাওয়া যায় বল দেখি। এটা কি লাভের মধ্যে নয়?

এমন সময় গৃহের মধ্য হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আমাদের ঘোষাল মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী কমলাদেবী কহিল—"ওহে ভাই, কেবল লুচিসন্দেশ খাওয়া নয়, তোমার ঠাকুর দাদার আরো কিছু লাভ হয়। সেটা পেট ভরে গাল খাওয়া। সেটা সেই লুচি সন্দেশেরই মতন কখন বরের পক্ষ থেকে হয়, কখন বা ক'নের পক্ষ থেকে হয়। আবার বরাৎ সুপ্রসন্ন হলে দুই পক্ষ থেকেও হয়।"

অতুলচন্দ্র কহিলেন—"তা ঠিক বলেছ ঠান্‌দিদি। লুচি সন্দেশে বরং অরুচি আছে, কিন্তু সে গালে আমার ঠাকুর দাদার কখনও অরুচি হয় না। বাস্তবিক ঠান্‌দিদি, আমার ঠাকুরদাদার মতন একজন পরোপকারী লোক আজকালের বাজারে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এখন কন্যা দায়ইত একটা সর্ব্বপ্রধান দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাই, ঠাকুরদাদা আমার কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধারের জন্য ঘটকালী ব্যবসা ধরেছে। তবে ঠাকুরদাদার একটা বড় দোষ—বর্দ্ধমানের সেই প্রসিদ্ধ উঁকিলের মতন আসামীর পক্ষ ভিন্ন ফরিয়াদীর পক্ষ কখন ওকালৎনামা গ্রহণ করেন না। গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের কন্যাদায় উদ্ধার ভিন্ন অন্য ঘটকালী ঠাকুরদাদার নাই। সেত ঘটকালী নয়—সে কেবল পরোপকার।"

তখন ঘোষাল মহাশয় যেন একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"দূর সালা, আমি তোদের মতন পরোপকার, দেশহিতৈষীতা, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি কখন শিখিও নাই—কখন জানিও নাই। আসল কথারে ভাই—এতে মধ্যে মধ্যে আহারটা ভালরকমই চলে। তোমার ঠান্‌দিদির সেই একঘেয়ে থোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়িথোড় কি রোজ মুখে ভাল লাগে?"

কমলা সে কথা শুনিয়া অতুলচন্দ্রকে কহিল—"তা ইনি এনে না দিলে, আমি কোথায় কি পাব বলত ভাই। উনি রাতদিন বাইরে বাইরে পরের কাজে ঘুর্‌বেন, এক পয়সা কখন রোজগারের চেষ্টা কর্‌বেন না, এদিকে নিজের সংসার হেজে যাক,—পুড়ে যাক, সেদিকে একবার ভুলেও চেয়ে দেখ্‌বে না। তা আমি ভালমন্দ খাওয়াই কোথা থেকে বল ভাই। আমার কি অসাধ—বা আমি রাঁধতে কাতর?"

তখন ঠাকুরদাদা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"অমন মাথায় মোট করে এনে দিলে, সবাই রাঁধ্‌তে পারে—সবাই খেতেও পারে। থা'ক্ ও সকল কথা এখন রাখ, তোমার কাজের কথাটা একবার বল দেখি শুনি।"

কমলা তখন সেস্থান হইতে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। অতুলচন্দ্র এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"এক অনাথা বিধবাকে কন্যাদায় থেকে আপনাকে উদ্ধার কর্‌তে হবে।"

কথাটা শুনিয়াই ঘোষাল মহাশয়ের প্রাণে কোথা হইতে একটা ভয়ঙ্কর উৎসাহের তরঙ্গ উঠিল। ঘোষাল মহাশয় তখন আগ্রহের সহিত কহিলেন—"কে সে অনাথা বিধবা ভাই?"

অতুলচন্দ্র উত্তর করিলেন—"আবার সে বিধবা কেবল কন্যাদায়গ্রস্ত নয়, একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের মধ্যেও পড়েছে। সে বিধবার গুরু একজন ভয়ঙ্কর কাপালিক, নিজেরই কোন কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ কর্‌বার জন্যই এতদিন সে কন্যাটির বিয়ে সেই গুরুই দিতে দেন নাই। কন্যার মা তখন গুরুর সে কু অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। এখন বুঝতে পেরে গুরুর ভয়ে মেয়েটিকে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে, সেই বিধবা এখন আপনারই শরণাগত। এখন আপনি তাঁকে এই দুই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।"

ঘোষাল মহাশয় তখন বিস্মিতস্বরে কহিলেন—"সে কি কথা রে ভাই! একি সত্য ঘটনা না তুই কোন উপন্যাসের ঘটনার কথা বল্‌ছিস্? এতো আর মগের মুলুক নয়—এটা ইংরেজ রাজত্ব। কোথায় সে বিধবা?"

অতুল। বিধবা আপনারই প্রতিবেসী ৺শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী বিমলা। আমি মহামায়ার বিবাহের কথা বল্‌ছি।

ঘোষাল। ভাই ভাল—রক্ষা পাই। আচ্ছা পাহাড়ী বাবা বলে বিমলার গুরু ঠাকুরটি যিনি এসেছিল, অনেকের মুখে তাঁর সুখ্যাতিও ত শুন্‌তে পাই। তিনি কি এ রকম ভয়ঙ্কর লোক? তবে কাপালিক বটে। শ্মসানে বাস, চিতাভস্ম গায়ে, গলায় কখন কখন হাড়ের মালা, কপালে অঙ্গারের দাগ, আর পরিধানে রক্তবস্ত্র, আর মুখে 'তারা—তারা'ও আছে। এত কাপালিকেরই লক্ষণ। আর অত বড় আইবুড়ো মেয়ে যখন ঐ গুরুদেবই করে রেখেছিল, তখন তাঁর উদ্দেশ্য আর জান্‌তে হবে না। হাঁ ভাই,—আমার প্রাণটা কেমন করে উঠলো যে, তুমি চিরজীবি হয়ে বেঁচে থাক, এ একটা কাজের মতন কাজ বটে।

অতুল। আর এ কাজটি কর্‌লে, আমারও বিশেষ উপকার করা হবে।

ঘোষাল। না ভাই, তবে আমি এ কাজে নাই। উপকার টুপকার আমি কারু কিছু কর্‌তে পার্‌বো না। হাঁ আর এক কথা—অতবড় ধেড়ে মেয়ের—দোজবরে—বোজবরে পাত্র না হইলে, বিয়ে হওয়াই ভার। কারণ প্রথম পক্ষের পাত্র তোমার কেউ রাজি হবে না।

অতুল। সে জন্য কোন চিন্তা নাই ঠাকুরদাদা। পাত্র তোমার ঠিকই আছে।

ঘোষাল। তবে সে পাত্রে মেয়ে দিতে পাত্রীর মার মত কি হয় না?

অতুল। পাত্রীর মার খুব মত আছে। আর পাত্র ও পাত্রী পরস্পরেরও মনের মতন হয়েছে।

ঘোষাল। তবে ত এ একখানা উপাখ্যানই বটে। এখন বুঝি কেবল এক দেনাপাওনায় আট্‌কাচ্ছে!

অতুল। তাতেও কিছু আট্‌কাচ্ছে না।

ঘোষাল। তবে আর বাধাটা কি?

অতুল। আহারাদির উদ্যোগ সব ঠিক হয়ে রয়েচে, কেবল রেঁধে বেড়ে দেওয়া।

ঘোষাল। তবে আর আমার কাজ কি আছে ভাই? তোর ঠান্‌দিদিকে নিয়ে যা, ও মাগী এক জন পাকা রাঁধুনী—অনেক যজ্ঞিতে রেঁধেছে।

এই কথা বলিবার পর, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িলে যেরূপ ভাব হয়, সেইভাবে ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"আচ্ছা, পাত্রটি কে বল্‌ দেখি।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অতুলচন্দ্র কহিলেন,—"পাত্র আমি।"

স্তম্ভিত হইয়া ঘোষাল মহাশয় একবার অতুলের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন "নাতি, এ কি সত্য না তামাসা?"

অতুলচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে তখন ঘোষাল মহাশয়ের চরণে পতিত হইয়া কহিলেন—"ঠাকুর দাদা, আমার প্রাণ যায়, আমায় বাঁচাও।"

ঠাকুর দাদাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, তার উপায় শীঘ্রই কর্‌ছি—এখন আপাতত কবিরাজ বাড়ী থেকে এক শিশি তেল এনে মাথায় দেরে ভাই, তা না হলে শীঘ্রই তোমার সেই আলিপুরের বাগান বাড়ীতে গিয়ে বাসের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।"

এই কথা বলিয়াই ঠাকুর দাদা তাড়াতাড়ি একখানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে বাহিরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কমলা তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল—"ওগো, তুমি কোথায় চলে যাও? আজ যে হাতে একটি পয়সা নেই বাজার হবে কেমন করে?"

"আঃ কি আপদ! একটা শুভ কর্ম্মে চলেছি, এমন সময় পিছু ডাক্‌লে মাগী।"—এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘোষাল মহাশয় বাড়ী হইতে অন্তর্ধ্যান হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ঘোষাল মহাশয় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দুর্গাদাসের গৃহেরদিকে চলিলেন। অতুলচন্দ্রও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। ঘোষাল মহাশয় সে বাড়ীতে পৌছিয়া দুর্গাদাসের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। অতুলচন্দ্র তখন গোপনে থাকিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘোষাল মহাশয়কে দেখিয়া দুর্গাদাস বাবু কহিলেন—"মামার আর দর্শন পাওয়া যায় না, আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা পড়েছে।"

ঘোষাল মহাশয় উত্তর করিলেন—"কি জান বাবা, ফুরসুত পাই না যে তোমার কাছে এসে দুদণ্ড কথাবার্ত্তা কই।"

দুর্গাদাস। এত কি কাজে ব্যস্ত থাক বাপু, যে একবার ভাগিনেয়ের খোঁজখবর পর্য্যন্ত নিতে পার না?

ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"কি জান বাবা, যখন যে কাজটা হাতে আসে, তখন সে কাজটা সম্পূর্ণ না করে, আমি কখনই স্থির হতে পারি না এটা বাপু, আমার বাল্যকাল থেকেই অভ্যাস।"

দুর্গাদাস। বলি—সে কাজ নিজের না পরের।

ঘোষাল। যখন সে কাজটা করা নিজের কর্ত্তব্য মনে করি, তখন তাকে নিজেরই কাজ বল্‌তে হবে।

দুর্গাদাস। কে জানে বাপু, আপনি এ যাত্রা পরের কাজ করতেই জন্মেছিলেন। পরের কাজ বা পরোপকার করা যে একটা মহৎ কাজ একথা কে না স্বীকার করবে? কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও কাজ দেখা উচিত। আপনার অবস্থাও সে রকম নয়।

ঘোষাল। বাবা, আমি যখন যে কাজ করি তখনও পরের কাজ মনে করে করি না। নিজেরই কাজ মনে করে করেথাকি। তবে সেটা আমার নিজেরই কাজ করা হয়। কে বলে আমি নিজের কাজ করি না? এখন তোমার কাছে—একটা কাজের জন্যই এসেছি, এটা পরের কাজ কি নিজের কাজ—সে বিচার তুমি এখনই কর্‌তে পার।

দুর্গাদাস বাবু ঘোষাল মহাশয়ের মুখেরদিকে একবার

সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"সে কাজটা কি আগে শুনি।"

ঘোষাল। তোমার ভাগিনেয়ের বিবাহ দিতে হবে।

দুর্গাদাস। ভাগিনেয় না ভাইপোর?

ঘোষাল। ভাইপোও বিবাহযোগ্য হইয়াছে বটে, তবে দুইজনেরই বিবাহ দিয়ে তুমি সংসারী হও।

দুর্গাদাস। আপনিত আমার মনোগত ভাব জানেন, তবে এরূপ অনুরোধ কেন করেন মামা।

ঘোষাল। সম্প্রতি এক স্বামী পুত্রহীন বিধবার কন্যার বিবাহের ভার পাইয়াছি—ঘরে এমন সোণারচাঁদ ছেলে থাকতে কোথায় ঘুরে বেড়াব বাপু?

দুর্গাদাস। সে পাত্রী যদি আপনার মনের মতন হয়, তবে অনুকূলের সঙ্গে আপ্‌নি সে বিবাহ স্থির কর্‌তে পারেন। অনুকূল এখন উপায়ক্ষম হয়েছে, তার বিবাহে আমার আর আপত্তি নাই, কিন্তু অতুলের এখনও পঠদ্দশা, এ অবস্থায় আমি বিবাহ দিতে রাজি নই, এ কথাত আপনাকে কতবার বলেছি মামা।

ঘোষাল। অনুকূলের বিবাহ ত প্রতুল চাটুর্য্যের কন্যার সঙ্গে স্থির আছে—তবে এ পাত্রীর সঙ্গে কি করে বিবাহ দেবো?

দুর্গাদাস। প্রতুলের কন্যার বয়ঃক্রম এখনও তত অধিক হয় নাই। সে কন্যার সঙ্গে পরে অতুলের বিবাহ দিলে চল্‌তে পারে।

তখন ঘোষাল মহাশয় ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন—"তা কখনই চল্‌তে পারে না—এ বিধবার কন্যার সঙ্গে অতুলের বিবাহই দিতে হবে।"

এই সময় হঠাৎ দুর্গাদাস বাবুর মুখ হইতে বহির্গত হইল—"কে সে বিধবা?

ঘোষাল মহাশয় অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"সে বিধবা অন্য কেহ নহে—তোমারই আশ্রিতা বিমলা। আমি মহামায়ার বিবাহ অতুলের সঙ্গে দিতে ইচ্ছা করি।"

দুর্গাদাস। আমি যে অনুকূলের সঙ্গে সে বিবাহ স্থির করে রেখেছি।

ঘোষাল। সে সংস্কার তোমার এখন পরিত্যাগ কর্‌তে হবে।

দুর্গাদাস। আগে আমার কথাটা শুনুন—তার পর সে অনুরোধ কর্‌বেন।

ঘোষাল। কি কথা বল।

দুর্গাদাস। আমার যা কিছু আছে—আমার ভাগিনেয় অতুলইত তার শাস্ত্র ও আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারী। কিন্তু অনুকূলের—কিছুই নাই—সমস্তই আমার ভায়া নষ্ট করে গিয়েছেন। সে সকল কথাত আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এখন আমার মনের ভাব এই শিবনাথ দাদার কন্যার সঙ্গে অনুকূলের বিবাহ দিলে শিবনাথ দাদার যা কিছু আছে—তা অনুকূলেরই প্রাপ্য হয়। শিবনাথ দাদাও বিলক্ষণ দশ টাকা রেখে গিয়েছেন। এখন আমার উদ্দেশ্য বুঝেছেন?

ঘোষাল। বুঝেছি—কিন্তু বুঝেও তোমার মতে মত দিতে পারি না। তার কোন গূঢ় কারণ আছে।

বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে ঘোষাল মহাশয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া দুর্গাদাস বাবু কহিলেন—"কি গূঢ় কারণ মামা?

ঘোষাল। প্রথমে সে কথা তোমায় বল্‌বো না মনে করে ছিলাম, এখন কিন্তু দেখ্‌ছি সকল কথা তোমায় খুলে বলাই ভাল। প্রথমতঃ বিমলার একান্ত ইচ্ছা—অতুলকে কন্যা সম্প্রদান করা। আর কেবল বিমলার ইচ্ছা নয়—এর ভিতর আরো কিছু রহস্য আছে।

বিশেষ আগ্রহের সহিত দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"আবার কি রহস্য আছে মামা?"

ঘোষাল। সে একটা ভালবাসার রহস্য। অতুল মহামায়াকে প্রাণের সহিত ভালবাসে আর মহামায়াও অতুলকে প্রাণের সহিত ভালবাসে।

"সে কি!"—বলিয়া দুর্গাদাস কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ঘোষাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"দেখ বাবা এ তোমাদের সেই ইংরাজী মতের ফল। ইংরেজী শিক্ষিত বাবুরা যে বাল্যবিবাহ সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ বলে চীৎকার করে থাকে—এ সেই চীৎকারেরই ফল। ইংরেজী মতে যৌবন বিবাহ দিতে গেলে যে, এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে, তোমার ইংরেজী সমাজেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং এস্থলে এরূপ ঘটনায় আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তোমরা যে সমাজের

অনুকরণ করবে—সেই সমাজের নিত্য ঘটনার হাতথেকে কি করে রক্ষা পাবে বল ?”

কিছুক্ষণ চিন্তার পর দুর্গাদাসবাবু কহিলেন—“এখন উপায় ?”

ঘোষাল। উপায়ের কথা ত আমি পূর্ব্বেই বলেছি। এখন উভয়ের বিয়ে দেওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই, তা নইলে ছেলেটার মাথা খাওয়া হবে—তার পড়া শুনা সব ঘুচে যাবে—আর মেয়েটাকেও চিরজীবনের জন্য অসুখী করা হবে।

দুর্গাদাস। এ যে আমার উভয় সঙ্কট দেখ্‌চি। আচ্ছা এ সংবাদ আপনি কোথায় পেলেন।

ঘোষাল। সে কথাটা নাইবা বল্লুম।

দুর্গাদাস। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনার ভ্রম হয় নাই ত ?

ঘোষাল। না—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে বিমলার কাছে তোমার মামীকে একবার পাঠিয়ে দিয়ে—আমার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় কর্‌বো। কিন্তু যদি অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায়, তবে তোমার কি মত আমায় বল।

দুর্গাদাস। অবস্থা এরূপ দাঁড়ালে, তখন আমার মতের ত আর কোন আবশ্যক করবে না—তখন আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন, তাই করবেন।

“তবে এখন আমি আসি।” এই কথা বলিয়া ঘোষাল মহাশয় বাহিরে আসিলেন। সেখানে অতুলচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অতুলচন্দ্রের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন—তাঁহাদের কথাবার্ত্তা সে গোপনে দাঁড়াইয়া সমস্তই জানিয়াছে। কিন্তু সে কথা ঘোষাল মহাশয়ের মুখে শুনিবার জন্য অতুলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ মামা বাবুর মত কিরূপ বুঝলেন ঠাকুরদাদা।”

ঠাকুরদাদা উত্তর করিলেন—“তাকে ত কিছুতেই রাজি করতে পার্‌লাম নারে ভাই।”

এই কথায় অতুলের সেই প্রফুল্ল মুখ পুনরায় বিষণ্ণ হইয়া গেল। অতুলচন্দ্র নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় পুনরায় ঠাকুরদাদা কহিলেন—“কেন তুমিও আড়ালে দাঁড়িয়ে সকল কথা শুনেছ ?

অতুলচন্দ্র শুষ্ক মুখে বিকৃতস্বরে কহিলেন—“আমি ত অন্য রকম শুনে ছিলাম। তবে আমার শুনতেই ভুল হয়ে থাকবে।”

ঠাকুরদাদা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—“তোমার শুন্‌তে ভুল হয় নাই তুমি যা শুনেছ সেই ঠিক। কিন্তু দেখ শালা—আমি এ মিলন ঘটিয়ে দিতে পার্‌লে আমায় কিন্তু বখ্‌রা দিতে হবে। সে শালী যে সুন্দরী—আমি ঘটকালী আদায় না করে ছাড়বো না।”

অতুলচন্দ্র পুনরায় প্রফুল্লমুখে ঠাকুরদাদাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে রাখিলেন। ঠাকুরদাদা আহ্লাদে আটখানা হইয়া সস্নেহে অতুলচন্দ্রের মস্তকে হাত বুলাইতে গেলেন, কিন্তু এই সময় এদিকে তাঁহার কটিবন্ধ হইতে পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া গেল।

ক্রমশঃ—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্বপ্ন ভঙ্গ।*

আশার ছলনে ভুলে, নিদ্রার কোমল কোলে
ঘুমায়ে ছিলাম আমি সুখের আবেশে।
পরাণেতে ধীরে ধীরে, মরমের শিরে শিরে
স্বপনের ছায়া এক পড়েছিল এসে।
পূরায়ে প্রাণের ক্ষুধা, সেই স্বপনের সুধা
পিতেছিনু, হতেছিনু হরষে বিভোর।
সহসা বহিল বায়, শিহরি উঠিল কায় ;
সুখ স্বপনের নিশি হয়ে গেল ভোর।
নয়ন পল্লব পুটে, প্রভাত কিরণ ফুটে
আলোকে পুলকে ধরা হাসিয়া উঠিল।
চকিত হইল প্রাণ, অশ্রুত প্রভাত গান
সুধামাখা-বিষ সম মরমে পশিল।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল।

* জীবনের কোন এক ঘটনা লইয়া ফরাসী কবি ভিক্টর হিউগোর “ফুলের স্বপ্ন” (Dream of a Flower) কবিতার ভাবাবলম্বনে লিখিত।

মেনকা ও বিশ্বামিত্র।

রাজা রবিবর্ম্মার বিখ্যাত চিত্র, শকুন্তলার জন্ম হইতে গৃহীত।

৭ম ভাগ। শ্রাবণ, ১৩১১। ৪র্থ সংখ্যা।

কবিবর

হেমচন্দ্রের কবিতা ও বঙ্গভাষার উপর তাঁহার প্রতিপত্তি।

হেমচন্দ্রের কবিতা ও ইহার কার্য্যকারিতা বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে অগ্রে কবি, কাব্য ও কবিত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা বিশেষ আবশ্যক।

প্রথমতঃ কাব্য কি তাহা বুঝিতে পারিলে কবি ও কবিত্ব কি তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। কাব্য কাহাকে বলে? "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রস নববিধ; যথা (১) শৃঙ্গার, (২) হাস্য, (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রৌদ্র, (৬) বিভৎস, (৭) ভয়ানক, (৮) অদ্ভুত এবং(৯)শান্তি। এই রসকেই ভাব (Emotion) বলে। ভাবের আবেগোত্থিত বাক্য কাব্য বটে, কিন্তু ইহাতেও কাব্যের প্রকৃত মূর্ত্তি বুঝা গেল না, কারণ এরূপ হইলে বক্তা যখন নিজ হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাব গুলি প্রকাশ দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন এমন কি ভিন্ন মতাবলম্বীকেও মতভ্রষ্ট করেন তখন তিনি ও প্রকৃত কবি আখ্যা পাইতে পারেন। এরূপ হইলে সেই শোকাতুরা রমণী যিনি হৃদয়-কান্ত সাকার দেবতা প্রাণপতিকে জন্মের মতন বিদায় দিয়া, কিম্বা নয়-নের মণি হৃদয়ের-আশা প্রাণের-প্রাণ অমূল্যনিধি সন্তান-রত্নকে চির কালের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া দারুণ কঠোর জালায় ধুল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভাব পাষাণভেদী ভাষায় ব্যক্ত করেন তিনিওত প্রকৃত কবি নামের যথার্থ উত্তরাধিকারিনী; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাঁরা কেহই তাহা নহেন। "ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে" ৺কবিবর হেমচন্দ্রের শোক সভায় স্বনাম ধন্য শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মৃদু অথচ তীব্র ও অল্প ভাষায় এই যে বলিয়া-ছিলেন "স্পষ্ট উপদেশপূর্ণ অথবা হৃদয়ের গভীর ভাব ব্যাপক কিম্বা তীব্র ও দ্রুত ভাষাই যদি কাব্যের লক্ষণ হইত তাহা হইলে "গীর্জ্জার" পাদরি সাহেবেরাও সুকবি বলিয়া আখ্যাত হইতে পারিতেন" ইহা প্রকৃতই বড়ই মর্ম্মস্পর্শী কথা। "মিল" বলেন বক্তৃতা সাক্ষাৎ ভাবে এবং কবিতা লুক্কায়িত ভাবে শ্রুত হয়, (Oretory is heard ; but Poety is over-heard) বাগ্মী যখন

বক্তৃতা করেন তখন তিনি অন্যের সত্ত্বা হৃদয়-পথে জাগরূক রাখেন কিন্তু কবি তাহা রাখেন না। বক্তা পরের ভাব উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পান, কবি নিজ ভাব বর্ণ মালায় প্রকাশে সচেষ্ট হন। আর পূর্ব্বোক্ত শোকাতুরা করুণাময়ী রমণীর সেই ভাব গুলি কেন যে কাব্য নহে তাহার কারণ এই, সে গুলি উচ্চ হৃদয়ের ক্ষুদ্র আশা এবং তাহা কল্পনা পরিশূন্য ও প্রকৃত ঘটনা মাত্র। সুতরাং তাহা সকলের নিকটই সমান। ইমার্সন (Emerson) তাঁহার কবি (The poet) শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, হে কবি তুমি জন সমাজের হিংসা ও রাজকরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সমগ্র ভূমিখণ্ডকে তোমার আরামস্থল স্বরূপ জ্ঞান করিবে, এবং সমগ্র জলধি তোমার স্নান ও জল পোত ক্রীড়ার স্থান জানিবে; হে কবি তুমি বাস্তবিকই ক্ষিতি-জল, ও ব্যোম স্বামী। তিনি আবার তাঁহার "কাব্য ও রচনা শক্তি" বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, কাব্য কখন দৃশ্যমান বাস্তব পদার্থ লইয়া নিজ অঙ্গ পরিপুষ্ট করে না। সবল ও উন্নত হৃদয়-পটাঙ্কিত আদর্শ চরিত্রই কাব্যের প্রকৃত উপাদান।

অতি সংক্ষেপে কবি, কাব্য এবং কবিত্ব বিষয়ে আলোচনা করা গেল।

বঙ্গদেশে উচ্চাঙ্গের কবির বড়ই হতাদর। সুতরাং আমরা যখন হেমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশ্য ভাবে উপেক্ষিত হইতে দেখি তখন বিশেষ রূপে দুঃখিত হইলেও বিস্মিত হইনা। কাব্য সৌন্দর্য্যের আধার। কবিতা সুন্দরী প্রকৃতি দেবীর নামান্তর মাত্র। কবি এই প্রকৃতির সেবা ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাস করেন না। তিনি তাঁহারই ধ্যানে নিজ জীবন সমাপ্ত করিতে চাহেন। তাঁহার ব্রত দীক্ষা সবই সেই নবরসাত্মিকা কল্পনাময়ী কবিতা সুন্দরীর চরণে। কবি সাকার উপাসক।

কবিবর মধুসূদন যেমন তাঁহার এক মাত্র মেঘনাদ বধের জন্য সর্ব্বজন পরিচিত, হেমচন্দ্র ঠিক তদ্রূপ নহেন। বৃত্রসংহার তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য হইলেও তিনি অনেক সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার কবিতাবলী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কবিতার জন্য বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত। বৃত্রসংহার মহাকাব্য; তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতাপুঞ্জ, অতি উচ্চাঙ্গের। এক একটী কবিতা এমনই ভাবোদ্দীপক ও প্রাণ মনোহারিনী যে, তাহা আর ভাষায় ব্যক্ত হয় না। ইহাতেও কবির উচ্চ হৃদয়ের প্রতিকৃতি উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিছত্রে লেখা রহিয়াছে। কবি নিজরূপ—আত্মজন্ম হইতে শেষ জীবনের জ্বলন্ত ইতিহাস—ধীরে ধীরে অতি সংযত ভাবে তাঁহার কবিতা কুল-তরঙ্গিনীর দুই তীরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

যৌবনোন্মত্ত কবি হৃদয়ে কি প্রকার আশার ধারা প্রবাহিত হয় তাহা আমরা অনুভব করিতে না পারিলেও অন্ততঃ আমরা কতকগুলি উচ্চ কবির রচনা পাঠে তাহা অনুমান করিতে পারি। ইঁহারা নিজ মলিন ভাব সকল কি রূপে কালির অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বর্ণনায় প্রবৃত্তি হয় না। এইরূপ স্থলে হেমচন্দ্রের যৌবন রচনা কিরূপ তাহা ভাবিবার বিষয়; ইহা ধীর, সংযত ও গম্ভীর, অথচ কর্কশ নহে। ইহাতে মাদকতা আছে, অপৌরষের ঢলা ঢলি নাই। ইহাতে তেজ আছে, দাহিকা শক্তি নাই। ইঁহার যৌবনের হতাশ গীতি কথায় কথায় দিশেহারা করিয়া প্রেমিক বা প্রেমিকাকে গৈরিক বসন পরিহিতা করিয়া নির্ব্বাসিত করেনা। বাস্তবিকই "এহেন বয়সে ইচ্ছায় কভু আশ্রমে কি আসে?" কবি সেই অবস্থাতেও প্রকৃত হিন্দুর মত জন্মান্তরে আস্থা স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উন্মত্তবেগ ধারণ করিতে সক্ষম হন তাই তিনি গাইয়াছেন "ফিরে জন্মে প্রাণনাথ পাই যেন তোমারে"। যে কবির প্রেম এত পবিত্র তাঁহার হৃদয় যে সতী সাধ্বীর দুঃখ দেখিয়া দর দর অশ্রুবিগলিত ধারায় "অনেক দিন কাঁদিবে" তাহা আর কিছু আশ্চর্য্যের নহে। কবি নিজে পুরুষ হইয়া ও হিন্দু রমনী যে প্রতিপদে আমাদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হইতেছেন তাহা তাঁহার স্বভাবোচিত উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র যে গুণে বঙ্গকুল-কামিনীগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন, কবিকুল তিলক হেমচন্দ্র সে গুণে আজ সতী সাধ্বীগণের ভক্তি ও স্নেহের পাত্র নহেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গকুল ললনাদের হৃদয়-গৃহ সজ্জিত করিবার জন্য তাঁহাদের মনোমত চিত্র সমূহ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, আর হেমচন্দ্র সমভাবে তাঁহাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছিলেন বলিয়া।

ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র এই তিনটী লইয়া জাতির সৃষ্টি;

ইহার একটীর অভাবে জাতিকে অঙ্গহীন দেখায়। ঐ তিনের কিছু কিছু আমাদের জাতীয় জীবনে কম বেশী রূপে অভাব হওয়ায় আমরা পৃথিবীর অনেক জাতি অপেক্ষা নিম্নে পতিত হইয়া রহিয়াছি। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে স্বর্গীয় কবিকুল চুড়ামণি তাঁহার স্বভাব সুলভ জীমূত সদৃশ অথচ সংযত ভাষায় আমাদের চৈতন্যোৎপাদনের জন্য যে সকল আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতারই পরিচয় প্রতিপদে প্রদান করিয়া থাকে।

হেমচন্দ্রের ভাষা কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের ন্যায় সরল না হইলেও ইহাকে কঠিন বলা যায় না। ইহার বেগ "পর্ব্বত গৃহছাড়ি বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে" সেই রূপ না হইলেও ইহাতে আমরা ভাদ্রের এক টানা সুবিস্তৃত ভরা গঙ্গার পবিত্র স্রোতের স্পষ্ট পরিচয় পাই। বাস্তবিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ঠিকই বলিয়া ছিলেন "ইঁহার ভাষা যেন কিছু আমিরি, আমিরি।" কোন ভাষার উপর কোন গ্রন্থের কি রূপ প্রতিপত্তি তাহা বুঝিতে হইলে সেই গ্রন্থকারের কেবল ভাষা কৌশল দেখিলেই চলিবে না। তাঁহার লিপিচাতুরির সহিত বর্ণনা শক্তি ও বিষয়গত ভাব ও বুঝিতে হইবে। এ সকল কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। কাব্যের লক্ষণ সর্ব্বথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

বঙ্গভাষার উপর হেমচন্দ্রের কবিতার কি রূপ প্রতিপত্তি তাহা যখন বুঝিতে হইবে, তখন তাঁহার কবিতা কোন্ শ্রেণীর তাহা দেখা অত্যাবশ্যক হইলেও তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিশদ সমালোচনার দ্বারা এ প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি করা ততটা সুযুক্তিসিদ্ধ হইবে না।

যাহারা প্রেমমদে মত্ত হইয়া ভ্রমরের ন্যায় উদ্যানের চারি ধারে চঞ্চল মনে উড়িয়া বেড়ায় তাহাদের বিলাস বিভ্রমতার অসারতা প্রতিপন্ন না করিয়া তাহাদের মনের উপর সেই সর্ব্বজীব হিতকর পরমব্রহ্মসনাতনের মহিমা গাথা নীরস (?) উক্তি বৃথাবর্ষণ না করিয়া তিনি যে রূপ যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া রাখিয়াছেন তাহা অতি মনোরম। তাহা প্রকৃতই মহাকবি গুণোচিত।

কবি, কামিনী—কুসুমের তুলনাচ্ছলে মানব মধুপকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

"কে খোজে সরস মধু বিনা বঙ্গ কুসুমে
* * * *
কে দেয় বিলাতি লিলি নলিনীতে উপমা?
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা।
* * * *
কে খোজেরে প্রজাপতি পেলে হেন ভ্রমরী?
মরি কি অপরাজিতা নীলিমার লহরী।"
* * * *

তাঁহার কাব্যে সকল সম্প্রদায়েরই পাঠোপযোগী বিষয় আছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহার কাব্য রস পানে নিজ প্রাণ সুশীতল করিতে পারেন। যোগী, ভোগী সকলেই তাঁহার কল্পনা সৃজিত-উদ্যানে নিজ নিজ প্রবৃত্তি মত অথচ স্বভাব সঙ্গত স্থান পাইতে পারেন। এইরূপ পবিত্র মনোমুগ্ধকর আশা ভরসার, নৈরাশ্য বৈরাগ্যের, ঐহিক পারত্রিকের, জলন্ত ছবি যে গ্রন্থে দৃষ্ট হয় তাহাই মহাজন পূজ্য এবং যিনি ঐ ছবির চিত্রকর তিনিই ভারতীর যোগ্য সন্তান। "তেনাম্বা সুতিনী ভবতি।"

যে গুণ থাকিলে কবি হয় তাহা হেমচন্দ্রের আছে বলিয়াই, তিনি কবি সিংহাসনারূঢ়। কি পরিমাণে আছে তাহা ইহার দ্বারা স্পষ্ট দেখান হইল না। যদি অন্যান্য মহাকবি অঙ্কিত চিত্রের সহিত ইহার তুলনা হয় তাহা হইলে সমধিক আনন্দ লাভ ও চিত্রের উৎকর্ষ পরিস্ফুট হয় বটে; কিন্তু শত সহস্র কিরণমালা প্রভাসিত সুপ্রসস্ত কুসুমে কোমল মখমল পরিব্যাপ্ত, ব্যজন সমাকীর্ণ হর্ম্ম্যতলে অপ্সরি বিনিন্দিত বামাদলের কোকিল লাঞ্ছিত স্বরলহরী ও গীতোচ্ছ্বাস এবং কোমল নিক্কণ ঠমক নৃত্য এক অভিনব অনুরাগের উজ্জল চিত্র অঙ্কিত করিলেও সেই সুবিস্তৃত প্রান্তরের ক্রোড়স্থিতা মৃদুমন্দ কলনাদিনী তটিনীর তটান্বিত অথবা অস্ফুট মর্ম্মর শব্দিনী তরুলতা বেষ্টিত পর্ব্বতের নির্জ্জন স্কন্ধজাত সঙ্গীত তরঙ্গের গগণস্পর্শী উচ্ছ্বাস মানবের শ্রবণ কুহরকে অন্যদিকে ফিরিতে দেয় না। তাই বলি আমরা হেমচন্দ্রকে নির্জ্জনে একাকী দেখিব বলিয়া অপ্রীতির কোন কারণ নাই।

মনুষ্যের বিস্তৃত জীবনে যেমন দেহের দশান্তর হয়

মনেরও ঠিক তদ্রূপ। দেহের পরিবর্ত্তন কেবল বাহ্যত ঘটে;—কেবল মাংসেরউপরই সংঘটিত হয়। কিন্তু ভিতরের অস্থি দীর্ঘ ও স্থূল হওয়া ব্যতীত অন্য কোন আকার ধারণ করে না। সুতরাং জীবনের বিস্তৃত গতিতে অস্থির উন্নতি ব্যতীত অবনতি নাই; মাংসের উন্নতি অবনতি উভয়ই আছে। সময় সময় বাহ্যাকারের এতই পরিবর্ত্তন ঘটে যে, কোন ব্যক্তিকে দিন কয়েকের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু ভিতরের সেই অস্থি নির্ম্মিত অবয়ব যথাযথ ঠিকই থাকে। সুতরাং সেই অস্থিই দৈহিক গঠনের পাকা ও সার পদার্থ। ইহার ধ্বংস ও মাংসের ন্যায় প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার অনতি বিলম্বেই সংসাধিত হয় না।

হেমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থাবলীকে আমরা যদি দেহীরূপে বর্ণনা করি তাহা হইলে ইহার অস্থির স্বরূপ কি দেখিতে পাই?—স্বদেশ প্রেম। জীবন স্বরূপ—ধর্ম্ম। আর লিপি কৌশলাদি, মজ্জা মাংস রক্তাদির স্বরূপ। এখন ভরসা করি বঙ্গ ভাষার উপর তাঁহার এই প্রতিপত্তি যে সামান্য নহে ইহা আর খুলিয়া বলিতে হইবে না। তিনি তাঁহার মাতৃভাষার কমনীয় কণ্ঠে যে ললিত মালা দোলাইয়া গিয়াছেন তাহা শুষ্ক হইবে কি না জানি না যদি হয় তাহাহইলে কত শত শতাব্দীর প্রয়োজন তাহা বলিতে পারি না। ইহাও কি একটী কম প্রতিপত্তি? যিনি বঙ্গভাষাকে পবিত্র প্রেম নিঃস্বার্থ ভালবাসা, উজ্জ্বল স্বদেশ ভক্তির জীবন্ত প্রতিমুর্ত্তির দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন, তাঁহার উক্ত ভাষায় কিরূপ প্রতিপত্তি, তাহা কি ভাবিতে বিলম্ব হয়? যিনি নৈরাশ্যের রেখা মাত্র নিজের কোন সীমায় আসিতে দেন নাই, "জীব জন্মে ভয় কিরে জগদম্বা জননী" যিনি আজীবন এই মন্ত্রে দীক্ষিত থাকিয়া উত্তাল নিরানন্দ তরঙ্গ সংকুল ভাগ্য হ্রদে ভাসিতে ভাসিতে চক্ষের জল চক্ষেই শুষ্ক করিয়া অন্তিম পর্য্যন্ত "কিহবে কাঁদিয়া?" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মাতৃভাষার চরণ কমলে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহার বঙ্গভাষার উপর কি প্রকার প্রতিপত্তি তাহাকি বুঝিতে কষ্ট হয়? যে কবি নিজ হৃদয়তন্ত্রীর উচ্চ তান গুলি বঙ্গভাষার মজ্জায় মজ্জায় মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার উক্ত ভাষায় কিরূপ প্রভাব তাহা কি অধিক ভাবিতে হয়? ভাষাতেই ভাব ব্যক্ত হয়, যে ভাষায় যত উচ্চ ভাবের বিকাশ, তাহা ততই স্থায়ী ও বহুজন পূজ্য। যিনি আবার সেই ভাবের অধিকারী তিনি কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং আমরা কবিবর হেমচন্দ্রের কাব্যের যে সকল লক্ষণ ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহা যখন ভাবিতে থাকি তখন কি আমাদের তাঁহার বঙ্গভাষার উপর কিরূপ প্রতিপত্তি তাহা বুঝিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়?

অতএব আমিও সাহিত্যসেবী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের ন্যায় "এখন গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার" ন্যায় কবির ভাষায় কবির উদ্দেশে বলি।

"গেলে চলি হেম কাঁদায়ে অকালে
পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্ত গ্রহ প্রায় ধরাতে আসিয়া
জ্বলিয়া হইলে শেষ।
ছিলে উদাসীন গেলেউদাসীন
জয় মাল্য শিরেপরি,
অনাথ কটিরে কার কাছে বল
গেলে সমার্পণ করি?
ভেবে ছিলা জানি তুমি গত যবে
গউড় বাসিরা সবে,
অনাথ পালক তোমার বালক
অঙ্কেতে তুলিয়া লবে।
হবে কি সেদিন এগৌড় মাঝে
পুরিবে তোমার আশা।
বুঝিবে কিধন দিয়াছ ভাণ্ডারে
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা।

শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্যাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউট।

(Pasteur Institute)

প্যাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউটে ক্ষিপ্ত কুকুর ও শৃগাল প্রভৃতি দংশিত ব্যক্তির চিকিৎসা হইয়া থাকে। এখানে জলাতঙ্ক (Hydrophobia) রোগের চিকিৎসা হয় না। কেবল সেই রোগ প্রতিষেধক চিকিৎসা প্রণালীরই ব্যবস্থা আছে। জলাতঙ্ক রোগ এরূপ ভয়ঙ্কর যে, এ রোগের আর চিকিৎসা নাই। ফরাসীর রাজধানী প্যারিস নগরে প্রথমে এই চিকিৎসা প্রণালী অনুষ্ঠিত হয়। ভারতে এই প্যাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত হইবার সময় ইহার বিপক্ষে সংবাদপত্রে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সে আন্দোলনের কোন ফল হয় নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সিমাল শৈলের সন্নিকট কসৌলী পাহাড়ে এই প্যাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত হয়। প্যারিসের ন্যায় কসৌলী ইন্‌ষ্টিটিউটের চিকিৎসা ফলও আশাতীত শুভজনক হওয়ায় সম্প্রতি মান্দ্রাজে একটি প্যাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। যেরূপ ক্ষিপ্ত জন্তুই হউক না কেন—দংশনের তারিখ হইতে দংশিত স্থানের মস্তিষ্কের দূরতা অনুসারে এক সপ্তাহের মধ্যে চিকিৎসা আরম্ভ করিতে পারিলে, জলাতঙ্ক রোগের আর কোন ভয় থাকে না—এ কথা ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষগণ অহঙ্কার করিয়া বলিয়া থাকেন। সুতরাং এরূপ ভয়ঙ্কর রোগের এমন সুন্দর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রণালী যাহাতে সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়, এই উদ্দেশে আজ আমি "প্রদীপের" পাঠকগণের নিকট আমার সংগৃহীত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

সম্প্রতি আমাকে আমার পুত্রের চিকিৎসার জন্য কসৌলী প্যাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউটে যাইতে হয়, এবং তথায় প্রায় এক মাসকাল থাকিতে হইয়াছিল। কসৌলী পাহাড় হইতে সিমলা পাহাড় ৩২ মাইল দূর। হাবড়া হইতে কালকা ষ্টেসন ১১১৬ মাইল; কালকা হইতে কসৌলী পাহাড় আবার ৯ মাইল। সুতরাং এই সুদূর-১১২৫ মাইল পথ আমি কিভাবে গিয়াছিলাম, এবং তথায় কিভাবে বা চিকিৎসা হইয়াছিল, আর থাকিবারই বা কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলাম, সাধারণের উপকারার্থে তাহাই যথাযথ বর্ণনা করিতেছি।

বিগত ১৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে নয়টার পঞ্জাব মেলে আমি কসৌলী রওনা হই। এই পঞ্জাব মেল গাড়ীতে প্রায় ৩৫ ঘণ্টায় কাল্‌কা পৌছান যায়, কিন্তু সাধারণ আরোহীর গাড়ী ৫৫ ঘণ্টার কমে কাল্‌কা পৌছিতে পারে না। সুতরাং মেলে গেলে আড়াই দিনের স্থলে দেড়দিন রেল গাড়ীতে থাকিতে হয়। এরূপ দূরদেশে যাইতে হইলে মেল গাড়ীতে যাওয়াই সুবিধাজনক। তৃতীয় শ্রেণীর কাল্‌কার ভাড়া ১২।৶০, কিন্তু মেলে যাইতে হইলে তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়া চলে না, অন্ততঃ মধ্যম শ্রেণীতে যাইতে হয়। মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া ১৯।৶০। ব্যয় সংক্ষেপের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিবার আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের প্রবেশের পথে যেরূপ ঠেলাঠেলি ও মারামারি দেখিলাম, তাহাতে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল।

এই মেলগাড়ীর গতি বড়ই দ্রুত। তার পর প্রধান প্রধান ষ্টেশন ভিন্ন থামিতে দেখিলাম না। প্রথমেই একবারে বর্দ্ধমানে আসিয়া থামিল, তার পরে আসান্‌সোল, এইরূপ লম্বা লম্বা পাড়ি। বরাবর এই গাড়ীতে কাল্‌কা পর্য্যন্ত যাইতে কষ্ট হইবে ভাবিয়া কানপুরে নামিবার মনস্থ করিয়াছিলাম। সেই কারণ, আমার কানপুরস্থ জনৈক বন্ধুকে একখানি টেলিগ্রাফও করি। পরদিন বৈকালে ৫টার সময় যখন গাড়ী কানপুরে আসিয়া পৌছিল তখন প্ল্যাটফরমে এদিক ওদিক্ চাহিয়া দেখি আমার বন্ধুবর আমারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যতদূর কষ্ট হইবে মনে করিয়াছিলাম, যদিও আমাদের ততদূর কষ্ট হয় নাই, তথাপি বন্ধুবরকে দেখিয়া স্নানাহারের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেদিন কানপুরেই নামিয়া পড়িলাম। বন্ধুর বাসায় আহারাদি হইল। তথায় একজন রেলওয়ে ডাক্তারের সহিত পরিচয় হয়। ডাক্তার বাবু অতি ভদ্রলোক। তিনি কসৌলীর প্যাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রণালীর বিশেষ সুখ্যাতি করিলেন। তাঁহার মুখেই শুনিলাম অল্পদিন হইল—এই কান্‌পুরে চারিজন লোককে একটা ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করে, তার

মধ্যে যে ব্যক্তি কসৌলীতে গিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিল, কেবল সেই বাঁচিয়া যায়, আরো তিনজনেরই মৃত্যু ঘটে। তিনি আরো বলিলেন—একটা ক্ষেপা শিয়ালে ১০ জন গোরা সৈনিক ও ২জন দেশীয় লোককে কামড়ায়, তাহার মধ্যে যে ১০ জন গোরা কসৌলী গিয়া চিকিৎসিত হয়, তাহারাই বাঁচিয়া যায়, অপর ২জন দেশীয় লোক দেশীয় প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু শেষে জলাতঙ্ক রোগে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমার মনে বিশেষ আশা ভরসা হইল। পরদিন প্রাতে বন্ধুর সহিত কানপুরের বাজার দেখিতে গেলাম। বাজার হইতে কিছু ঘৃত ও তরিতরকারি খরিদ করিয়া লইলাম। তথায় সে সকল দ্রব্য আমার মতে খুব সস্তা মনে হইল। ঘৃত কিনিলাম টাকায় ৴১॥৴০ হিসাবে। বেগুণ এক পয়সা সের, আলু দুই পয়সা, কড়াইসুঁটি দুইপয়সা, মূলা পয়সায় দেড়সের আর দুই আনার পয়সা দিয়া একটা বসিবার মোড়া খরিদ করিলাম। সকল জিনিষই অতি সস্তা মনে করিলাম। কিন্তু আমার বন্ধুটি আহারীয় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রমেই কানপুরে দুর্ম্মূল্য হইতেছে বলিয়া অনেক আক্ষেপ করিলেন। তিনি আজ ১৮ বৎসর কানপুরেই আছেন।

সেইদিন বৈকালে ৫টার সময় পুনরায় পঞ্জাবমেলে আমরা কাল্‌কা রওনা হইলাম। সন্ধ্যার পরেই এটোয়ায় পৌঁছিলাম। এটোয়ার জল খুব ভাল শুনিয়াছিলাম, সুতরাং এইখানেই জলযোগ করিলাম। আমরা যখন দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা সুতরাং দিল্লী নগরের আর কিছুই দেখা হইল না, কেবল দেখিলাম—ষ্টেশনটি। এমন সুন্দর ও বৃহৎ ষ্টেশন আর কোথাও দেখি নাই। চারিদিকেই ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলো—যেন রাতকে দিন করিয়াছে। এই দিল্লী ষ্টেশনটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন। ইহার পরই দিল্লী—আম্বালা—কাল্‌কা রেলওয়ে। তবে পরস্পরের বন্দোবস্তের দরুণ গাড়ী বদল প্রভৃতি কিছুই করিতে হয় না। প্রাতঃকালে আমরা অম্বালায় পৌঁছিলাম। লাহোর ও পেসোয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতে হইলে এইখানে গাড়ী বদল করিতে হয়। কাল্‌কায় পৌঁছিলাম বেলা আট ঘটিকার সময়। রাস্তায় শুনিয়াছিলাম সিমলা রেল গিয়াছে, সুতরাং মনে মনেও ভরসা ছিল, কাল্‌কা হইতে সেই রেলে কসৌলী পৌঁছিব। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলাম সে রেলের ছোট ছোট গাড়ীগুলিও প্রস্তুত রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি টিকিট খরিদ করিতে গেলাম। ও হরি!—তখন শুনিলাম সে রেল কসৌলী দিয়া যায় নাই!

বড় আশায় নৈরাশ হইলাম। সম্মুখে অলঙ্ঘনীয় হিমালয় পর্ব্বত। আমি ৩।৪ বার দারজিলিং পাহাড়ে গিয়াছিলাম, সুতরাং হিমলয়ের শোভা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই কিন্তু আমার পুত্রটি তখন দূরে অতিদূরে—হিমালয়ের সেই অমল ধবল শৃঙ্গের পার্ব্বতীয় শোভা দেখিয়াই উন্মত্ত। আমি তখন কি উপায়ে কসৌলী পৌঁছিব ভাবিতেছি, এমন সময় ২।৩ জন লোক "কোথায় যাবেন বাবু" বলিয়া আমায় ঘেরিয়া ফেলিল। আমি তাহাদের মুখে শুনিলাম—কসৌলী যাইবার ৪।৫ রকম যান আছে। ডাণ্ডী, রীক্‌সা, ঝাপান ও ঘোড়া প্রভৃতি তাহারাই সরবরাহ করিয়া থাকে। সকল রকম যানই একে একে দেখিলাম—কিন্তু কোন যানেই পিতা-পুত্রে একত্রে যাওয়া যায় না। এরূপ সম্পূর্ণ অপরিচিত পার্ব্বতীয় প্রদেশে দুইজন একত্রে যাওয়াই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। ডাণ্ডী চারিজন পাহাড়ীতে কাঁধে করিয়া লইয়া যায়। রিক্‌সা একরকম মানুষে ঠেলা গাড়ী। ঝাপান একরকম ডুলি বিশেষ। আর এসকল যানের ভাড়া অত্যন্ত বেশী। প্রত্যেক লোকের ডাণ্ডী ভাড়া ৩্ তিন টাকা মাশুল ৸০ বার আনা। রিক্‌সা ভাড়া ৫্ টাকা, আবার মাশুল ১্ একটাকা, ঘোড়ার ভাড়া অপেক্ষাকৃত সস্তা। প্রথম শ্রেণীর ঘোড়ার ভাড়া ২্ টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১॥০ টাকা। আমার পুত্র ঘোড়ায় যাওয়াই মত করিল। যদিও তাহারা নির্দ্দিষ্ট ভাড়ার মুদ্রিত তালিকা আমায় দেখাইয়াছিল, আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যাত্রীরসংখ্যা অল্প হইলে সে তালিকা অপেক্ষা অল্পহারেও ভাড়া পাইয়া তাহারা যায়। প্রত্যেক কুলীর ভাড়া। ১০্ তাহারা অর্দ্ধমণের অধিক বহন করে না।

কাল্‌কা হইতে সিমলা যাইবার দুইটি পথ আছে। আমরা যে রাস্তায় চলিয়াছি এটি পুরাতন পথ। আবার যে নূতন পথ হইয়াছে, সেই রাস্তায় টোঙ্গা যায়, এখন রেলগাড়ী চলিতেছে। সেই দুর্গম রাস্তায় ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে প্রথমে যেরূপ ভয় হইয়াছিল, কিছুদূর গিয়া

দেখিলাম সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই। পার্ব্বতীয় ঘোড়াগুলি বড়ই শিষ্টশান্ত, আর রাস্তাও বেশ প্রশস্ত। তবে সেই রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া একবার নীচেরদিকে চাহিলে মনে বড় ভয় হয়। সে রাস্তাত আর সোজা রাস্তা নয়; স্ক্রুপের পাকের মতন পর্ব্বতগাত্রে কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। এখন চৈত্রমাস—আমাদের দেশে গ্রীষ্মে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। কিন্তু এখানে এখনও ভয়ঙ্কর শীত বোধ হইতে লাগিল। দিল্লী হইতে গাড়ীতেই আমরা সেই ভয়ঙ্কর শীতের নমুনা অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম।

আমরা ক্রমেই উচ্চে উঠিতেছি। মনে হয় এই সম্মুখের পাহাড়ের উপর উঠিতে পারিলেই পর্ব্বতমালা শেষ হইয়া যাইবে। উঠিয়া দেখ—তার উপর আবার পর্ব্বতশৃঙ্গ রহিয়াছে। এইরূপে যত উঠিবে—শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে। রাস্তায় যাইতে যাইতে পর্ব্বতের গায়ে কয়েকখানি পাহাড়ী গ্রামও দেখিলাম। ২০।২৫ খানি ঘর আর কতকটা আবাদী জমী হইলেই একখানি পাহাড়ী গ্রাম হইল। আমরা প্রাতে ৯টার সময় বাহির হইয়াছিলাম, বেলা দুই প্রহরের সময় কসৌলীতে পৌঁছিলাম। বিদেশ—কাহারও সহিত পরিচয় নাই—কোথায় যাই—তখন—প্রথমে এই ভাবনাই মনে উদয় হইল। আমি ঘোড়া রাখিয়া একবারে প্যাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেদিন রবিবার। রোগীদেখিবার সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—হাঁসপাতালে বিশেষ কোন লোকজন দেখিতে পাইলাম না। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় আমার পুত্রের নিকট এখানকার ডাইরেক্টার সিম্‌পল্‌টন (Simpleton) সাহেবের নামে এক পত্র দিয়াছিলেন। সাহেব তখনও সেখানে আছেন শুনিয়া আমি একজন ভৃত্যের দ্বারা সেই পত্রখানি সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। ২।৪ মিনিট পরেই দেখি সেই পত্রহস্তে সাহেব স্বয়ং আসিয়াই উপস্থিত, তিনি বিশেষ আদরের সহিত আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সাহেব যে আবার দেশীয় লোকের প্রতি এমন ভদ্র ব্যবহার করিতে পারেন, সে ধারণা আমার ছিল না। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত সমস্ত কথা শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন—"যখন এক সপ্তাহের মধ্যেই এখানে আসা হইয়াছে, তখন ক্ষিপ্ত কুকুর হইলেও হাইড্রোফোবিয়ার কোন ভয় নাই।" সেই কুকুরকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে কি না—এই কথা সাহেব আমায় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই কুকুরের মস্তিষ্ক কি Spinal Cord পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সে কুকুর হাইড্রোফোবিয়া রোগগ্রস্ত কি না। আমার পুত্রটি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র বলিয়া এ বিষের গতি কত ধীর, কাহার দ্বারা মস্তিষ্ক চালিত হয় প্রভৃতি অনেক কথা সাহেব তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। সেইদিনই তাহার চিকিৎসা আরম্ভ হইল।

সে চিকিৎসা প্রণালীর কথা পরে বলিব, এখন প্রথমে বন্ধুবান্ধব বিহীন অপরিচিত স্থলে থাকিবার কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম তাহাই বলি। প্রথমে ডিরেক্টার সাহেবের সৌজন্যে সাহসী হইয়া তাঁহাকেই আমাদের বাসার কিরূপ বন্দোবস্ত করিব—জিজ্ঞাসা করিলাম। সাহেব কহিলেন—"হাঁসপাতালের সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ঘর আছে, আপনারা ইচ্ছা করিলে সেখানে থাকিতে পারেন। আর সেখানে থাকিবার অসুবিধা বোধ করিলে, এখানে স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়াও পাওয়া যায়, তবে দেশীয় লোকে প্রায় বাজারেই থাকেন।"

সাহেব একজন ভৃত্য সঙ্গে দিয়া আমাকে সেই সকল ঘর দেখাইতে পাঠাইলেন। দূর হইতে সে ঘরগুলি দেখিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠারী। শুনিলাম একজন ধনী মাড়োয়ারী দেশীয় দরিদ্র লোকের থাকিবার জন্য ইহা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সেই ভৃত্যের মুখে শুনিলাম—এখানে কোন ভদ্রলোক থাকেন না, নিম্নশ্রেণীর লোকেই থাকে। তাহাদের একখানা থালা, একটা লোটা আর একখানা কম্বল পাইবারও ব্যবস্থা আছে। শুনিয়াই আমার হরিভক্তি উড়িয়া গেল। সেখানে নামিয়া গিয়া আর সে ঘর দেখিবার প্রবৃত্তি হইল না। সেই ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে বাজারে যে সরাই আছে, সেখানে ৪।৫ জন বাঙ্গালী বাবু থাকেন এবং সেই সরাইএ বাবুদিগের থাকিবার উপযুক্ত ঘরও ভাড়া পাওয়া যায়। আমি তখন সেই সরাইএ যাওয়াই স্থির করিলাম। তখনও ঘোড়া বিদায় করা হয় নাই, কারণ তখনও আমাদের তিনজন কুলী আসিয়া পৌঁছায় নাই। কুলীদের নিকটই আমাদের সমস্ত

দ্রব্যাদি। একটু মনে ভয়ও হইল, কিন্তু সেই ভৃত্য কহিল—এ অঞ্চলে সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই।

পিতা পুত্রে পুনরায় ঘোড়ায় চড়িয়া তখন সেই সরাই-এর উদ্দেশে চলিলাম। সরাইএর নিকট পৌছিয়াছি, এইবার চড়াইএ উঠিলে সরাইএ পৌছিব এমন সময় সেই কুলী তিনজনের সহিত আমাদের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইল। তখন একটা দুর্ভাবনার হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। সরাইএ পৌছিয়াই তাহার বারাণ্ডায় একজন বাঙ্গালী বাবুকে দেখিতে পাইলাম। সেই বিদেশে একজন বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়া আমার মনে যে কি আনন্দ হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। আমাকে দেখিয়াই তিনি নামিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আরো তিনজন বাবু আসিলেন। কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমার এখানে আগমনের কারণ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। শেষে আমার পরিচয় পাইয়া তাঁহারা আমাকে বিশেষ আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারাই আমার থাকিবার বাসা ভাড়া করিয়া দিলেন, তাঁহাদের ভৃত্যের দ্বারা আমাদের সেদিনকার আহারাদিরও বন্দোবস্ত করা হইল। আমি স্বহস্তে রন্ধন করিলাম। শুনিলাম—এই সমস্ত কসৌলী সহরের মধ্যে তাঁহারা ৫জন মাত্র বাঙ্গালী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সপরিবারে থাকেন। সকলেই সেই সরাইএ থাকেন, এবং কমিসরিয়েটে চাকুরী করেন। কয়েকদিবস হইল, তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন কারণ শীতকালে তাঁহাদের আফিস অম্বলায় নামিয়া যায়। আমি সেই সরাইএ বাসা পাইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিলাম।

এইবার বাসা ও আহারাদির কথা বলিব। আমি যে বাসা ভাড়া লইলাম, তাহার বন্দোবস্ত এইরূপ। একটি শয়ন-ঘর। শয়ন ঘরের সম্মুখেই বসিবার ঘর বা বৈঠক থানা। বৈঠক-খানার পার্শ্বেই রন্ধনের ঘর। তাহার পশ্চাতে স্নানের ঘর, স্নানের ঘরের অপর অংশে পাইখানা। সে পাইখানায় কমোটের বন্দোবস্ত। সরাইএর নিযুক্ত মেথর প্রতিদিন ২।৩ বার তাহা পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই বাসার মাসিক ৮৲ আট টাকা ভাড়া বন্দোবস্ত আছে কিন্তু তাঁহাদিগকে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকার অধিক ভাড়া দিতে হয় না। "কুর্ত্তা-কাটা" বাবু আসিলেই ৫৲ টাকার স্থলে ৮৲ টাকা ভাড়া হয়, তবে সরাইএর মালিক বাবুদিগের অনুরোধে আমায় অনুগ্রহ করিয়া দুই টাকা কমে ভাড়া দিয়াছিলেন।

সরাইএর পরিবার বিহীন বাবু চতুষ্টয়ও দেখিলাম—এক 'মেসে' থাকেন না। সকলেরই স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। প্রত্যেকের এক একজন ভৃত্য। সেই একজন ভৃত্যই মায় জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। আমাকেও একজন ভৃত্য রাখিতে হইল, তবে চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থাটা আমি নিজহস্তে রাখিয়া দিলাম। গলায় সূত্র থাকিলেও তাহার হাতে ভাত খাইতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। এই ভৃত্যের মাসিক বেতন ধার্য্য হইল ৮ টাকা। এই বেতন ব্যতীত এখানকার ভৃত্যদিগকে 'ডাউল ও লেকড়ী' দিতে হয়। ডাউল অর্থে কেবল ডাউল নহে, দুইবেলা যে তরকারী ও মাংসাদি রন্ধন হয় তাহাই, আর 'লেকড়ী' অর্থে তাহার রুটী প্রস্তুতের জ্বালানী কাষ্ঠ। বাবুদিগের ভৃত্যের মাসিক বেতন ৫৲ পাঁচ টাকা, কিন্তু 'কুর্ত্তাকাটা' বাবু হইলেই এইরূপ উচ্চহারে বেতন দিতে হয়।

এখানে জ্বালানি কাষ্ঠ বড়ই দুর্ম্মূল্য, এমনকি বাজারে ১৷০ মণ হিসাবে বিক্রীত হইয়া থাকে। তবে প্রাতঃকালে পাহাড়ীরা পৃষ্ঠে করিয়া যে কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে আইসে, তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারিলে, অনেক সুবিধা দরে পাওয়া যায়। গৃহস্থ লোকের সেই পথই অবলম্বন করাই উচিত, কারণ আমাদের দেশ অপেক্ষা সেথানে জ্বালানী কাষ্ঠের অধিক আবশ্যক। যে শীতপ্রধান দেশ জল শীঘ্র গরম হয় না, অথচ গরমজল ভিন্ন অন্য জল ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং এখানে জ্বালানী কাষ্ঠের ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তার পর জলও দুষ্প্রাপ্য। অনেক নিম্ন স্থান হইতে জল আনিতে হয়। Supper miner বলিয়া একটা স্থান আছে, সে স্থানে আমাদের সরাই হইতে প্রায় দুইমাইল পথ। সেইখানকার জল খুব ভাল, ক্যান্টনমেন্টের গোরাসকল ও সমস্ত সহরের অন্যান্য সাহেবেরা সেইখানকার জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা তথাকার প্রত্যেক টিন জল এক আনা মূল্যে খরিদ করিতাম।

এইবার আহারাদির কথা বলিব। এখানকার চাউ-

লের দর বড় বেশী। টাকায় চারিসের কি বড় জোর সাড়ে চারিসের করিয়া চাউল খরিদ করিতাম। আর তরিতরকারীর দরের কথা শুনিলে হয়ত আপনারা বিশ্বাসই করিবেন না। বেগুনের সের ।০ আনা, কপি, কড়াইসুঁটি, কুমড়া প্রভৃতির মূল্যও ঐরূপ। তবে কেবল আলুটা এক আনা সেরে পাওয়া যায়। সে সকল শুষ্ক তরকারী দেখিয়া আমার হরিভক্তি উড়িয়া গেল। শুনিলাম সিম্লায় অনেক বাঙ্গালী থাকার দরুন এই সকল দ্রব্য তথায় অধিক পরিমাণে আমদানী হয়, এবং মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ। বাজারে মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে মাংস ।০ আনা সেরে পাওয়া যায়, সে কিন্তু কসাইয়ের জবাই করা মাংস। সুতরাং আমাকে মাংস খাইবার অন্যব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। পাহাড়ীদিগের নিকট হইতে ১।০ কিম্বা ১॥০ মূল্যে একটা পাঁঠা কিনিয়া ৩।৪ দিন আহারের ব্যবস্থা চলিত, তাহাতে সে মাংসের স্বাদের কোন রূপ ব্যতিক্রম অনুভব করিতে পারিতাম না।

এইবার চিকিৎসকের কথা বলিব। আজকাল অনেক কঠিন রোগে প্রতিষেধক যে Innoculation বা টীকা দিবার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখানকার চিকিৎসাপ্রণালীও সেইরূপ। Hypodermic Syringe বা সরু পিচকারীর দ্বারা ঔষধ পেটের চামড়ার নীচে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম পাঁচ দিন পেটের দুই পার্শ্বেই ঔষধ দেওয়া হয়। তার পর দশম ও পঞ্চদশ দিন ব্যতীত প্রত্যেক দিন একফোঁড় ঔষধ দিতে হয়। প্রত্যেক দিন সে ঔষধের উগ্রতাও বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। সচরাচর ১৮ দিন হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। তবে আমার পুত্রকে সাহেব ২৪ দিন রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেক দিন দশটার সময় হাঁসপাতালে যাইতে হয়। ঔষধ লাগাইতে ২।১ মিনিট সময় লাগে, তবে পরে পরে নাম ডাকা হয় বলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। প্রথম ৩।৪ দিন বড় যন্ত্রনা হয়, এমন কি জ্বর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তার পর আর কোন জ্বালা যন্ত্রনা থাকে না। আহারাদির কোন নিয়ম নাই, তবে পুষ্টিকর আহার এবং গরম কাপড় ব্যবহার করাই ব্যবস্থা।

এখন ঔষধ জিনিষটা কি, বলি শুনুন। একদিন হাঁসপাতালের সীমানার মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে একস্থলে বহুসংখ্যক খড়গোস পিঁজরাবদ্ধ দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম— এই খড়গোসের মস্তিষ্ক হইতেই সেই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ঔষধ প্রস্তুতের জন্য হাঁসপাতালের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড লেবোরেটারী দেখিলাম। শুনিলাম খড়গোসের শরীরের মধ্যে জলাতঙ্কের বিষপ্রবেশ করান হইয়া থাকে, সে অবস্থায় অনেক খড়গোস মরিয়া যায়, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা ক্ষিপ্ত হয়, তাহাদের মস্তিষ্ক হইতেই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এইবার এই চিকিৎসাপ্রণালীর ফলাফলের কথা বলিব। সংবাদপত্রের সহিত আমার সংস্রব আছে শুনিয়া ডাইরেক্টার Simpleton সাহেব সে সম্বন্ধে আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম— বিলম্বে আসার দরুণ চিকিৎসা অবস্থায় ৩।৪ জন রোগীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এখানে সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, এমন একজনেরও জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুসংবাদ তিনি প্রাপ্ত হন নাই। তবে চিকিৎসিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শতকরা ১০ জনের সংবাদ তিনি আদৌ জানিতে পারেন না। কারণ হাঁসপাতাল পরিত্যাগের পর দিন হইতে তিন মাস পরে কর্ত্তৃপক্ষগণকে তদীয় স্বাস্থ্যের সংবাদ দিবার যে নিয়ম আছে, অনেক মূর্খ ও অশিক্ষিত লোকে সে সংবাদ দেয় না।

যে চিকিৎসাপ্রণালীর এরূপ সন্তোষজনক ফল তাহা জনসমাজে যতই প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল, কারণ আমাদের এদেশে প্রচলিত গোঁদলপাড়া প্রভৃতি স্থানের দেশীয় ঔষধের ফল এরূপ সন্তোষজনক কখনই নহে। আমি সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লিখিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

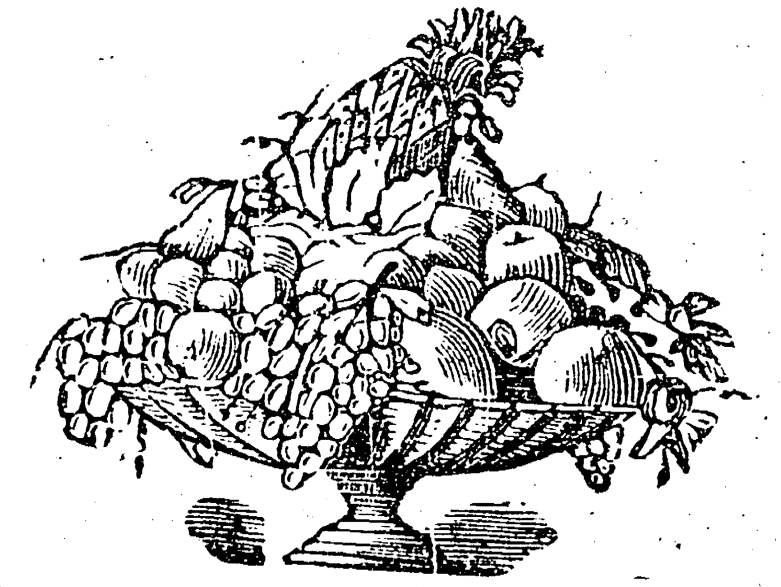

বিশ্বামিত্র ও মেনকা।

মেনকা—

হের নাথ! তনয়া বদন নিরমল
ঢল ঢল প্রভাতের শতদল সম,
হের দুটী নিদ্রালস আধ ফোঁটা আঁখি
এখনো সে ত্রিদিবের স্বপন জড়িত।
আমি যে স্বরগবাসী, মর্ত্ত্যবাসী তুমি,
এবালিকা স্বর্গ মর্ত্ত্য দোঁহে আছে চুমি।
একিরূপ, একি হাসি হে ঋষি প্রবর,
দেখ দেখ চেয়ে দেখ রূপের নিঝর।

বিশ্বামিত্র—

আর প্রিয়ে বেঁধোনাক স্নেহের বাঁধনে,
এতকি কঠিন সখি ফুলের বাঁধন।
কোথা হোম, কোথা যপ, কোথা আরাধনা,
কোথায় সে জীবনের ধ্রুবতারা সম,
কোথা সে পাষাণ সম কঠিন হৃদয়?
কাটিলাম গার্হস্থ্যের লোহার শিকলি,
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, জীবনের সখা
বিসর্জ্জিয়া চিরতরে প্রবেশিনু বনে,
তখন কাঁপেনি হৃদি; অশ্রু প্রস্রবণ
বহেনিত বিদারিয়ে হৃদি শৈল মোর?
উর্ব্বশীর রূপরাশি, বিভ্রম বিলাস,
কুবেরের রত্নরাজি, সসাগরা ধরা,
পারেনিত টলাইতে বিশ্বামিত্রে কভু;
কেন তুমি মোর কাছে এলে? এলে যদি
লয়ে এলে কেন, স্নিগ্ধ শান্ত ও লাবণ্য,
কটাক্ষ সরল, সরমে জড়িত পদ?
কেন লয়ে এলে প্রেম পূর্ণ হৃদি তব
কৈতব বিহীন? কোথা বল রেখে এলে
চঞ্চল নয়ন, উন্মাদ যৌবন শোভা
ধরণীর প্রলোভন যত? চিররুদ্ধ
এহৃদয় দ্বার, উন্মুক্ত কেবল সখি
সারল্যে তোমার। তুমি স্বর্ণমৃগদেবী
ঘোর তপোবনে এসেছিলে কি কুক্ষণে
মারীচের মত, তোমার মায়ায় ভুলি
হারালেম মুহূর্ত্তেকে যত্নার্জ্জিত ধন,
সর্ব্বস্ব আমার। বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্র!
বড় গর্ব্ব, বড় দম্ভ তব, দীন তুমি
ক্ষত্রিয় কুমার, অভিলাষী অর্জ্জিবারে
ব্রাহ্মণত্ব ভবে। কূপমণ্ডূকের মত
ভেবেছিলে ক্ষুদ্র এ ভুবন, আপনাতে
বিশ্বাস মহান্। হে কৌশিক, কোথা আজি
দৃঢ়তা তোমার? তুচ্ছ বালুকার বাঁধ
রচেছিলে, ভেঙ্গেগেছে ক্ষীণ জলোচ্ছ্বাসে।
প্রিয়তমে প্রাণাধিকে মেনকা আমার
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! তনয়াবদন
ঢেকে ফেল, রাখ ঢাকি অঞ্চলে তোমার।
কারাগার মধ্যে কারাগার! বাঁধনের
উপরে বাঁধন! জগতের লোভ তৃণ
আহরি যতনে রচেছে কঠিন বিধি
দৃঢ় এ বাঁধন, সংসার আলানে হায়
বাঁধিবারে মত্ত হাতী সম অভাগায়।

মেনকা—

বিশ্বামিত্র!
আজিতব নরত্বের পূর্ণ পরিচয়,
দেবকন্যা এসেছিনু বাঁধিতে তোমায়
ধরিতে আসিয়া নিজে ধরা দিনু হেথা।
আমরা অলকলতা ত্রিদিব নিবাসী
কি বন্ধন আছে ধরা সাথে? তুমিইত
রোপিয়াছ এলতিকা সখে ধরণীর
তপ্ত মৃত্তিকায়; তুমিই ত বাঁধিয়াছ
সুবর্ণ-পিঞ্জরে কাননের মধুলুব্ধ
মত্ত পাপিয়ায়। তুমিইত ফেলিয়াছ
আনায় মাঝারে প্রণয়কুসুমগন্ধে
অন্ধহরিণীরে। সত্য আমি এসেছিনু
স্বর্ণ মৃগীসম কুক্ষণে এবন মাঝে,
তব করে সঁপিনু পরাণ। ভুলিলাম
সুখ স্বর্গ, চির সাথীজন, ভুলিলাম
সকলি আমার, হারালেম নিজ সত্ত্ব

সত্ত্বায় তোমার। বড় দৃঢ়, বড় দৃঢ়
প্রেম কারাগার, অপত্য সে মরতের
শৃঙ্খল বিষম, সবি সত্য, সত্য জানি
এ সুষমা তপস্যার মূর্ত্ত বিঘ্ন সম;
কিন্তু সখা এযে বাঁধা পরাণে পরাণ,
এ সম্বন্ধ টুটিতে যে কেঁদে উঠে হিয়া।
বিশ্বামিত্র দেখ চেয়ে তনয়া বদন,
চেয়ে আছে মুগ্ধা তব পানে। দূরে থাক
যপ তপ, এসো সখে এসো, শ্যাম শৈলে
পর্ণ গৃহ রচি, কিরাত কিরাতী সম
তোমা আমা দোঁহে থাকি মনোসুখে সদা।
উড়িবে পবনে মোর এ চূর্ণ কুন্তল
তুমি তারে বেঁধে দিবে শ্যামলতা দিয়ে,
হীরক শ্রবণ দুল দূরে দিব ফেলি,
তুমি কর্ণে পরাইবে শিরীষ কুসুম।
বক্ষের বাসব দত্ত রম্য মণিহার
ফেলে দিব "মালিনীর" জলে তুমি প্রিয়
রচে দিবে বন্য যূথী মালা, প্রেমহার
স্নিগ্ধ অনুপম। আরণ্যক বধূ সম
বল্কলে ঢাকিব মোর এ স্থির-যৌবন।
ফিরিবে হে ধনু করে তুমি বনে বনে
আমি দিব হস্তে তব সায়ক যোগায়ে।
বক্ষমাঝে অনিবার বাঁধা রবে মোর
এ তনয়া অবনীর সুখ-শান্তি সার;
চাহি এর মুখপানে, দেখি মধু হাসি
মরত স্বরগ বলি হবে মোর ভ্রম।
কুরঙ্গ কুরঙ্গীসম বিচরিব দোঁহে
দিন শেষে ক্লান্তদেহে ফিরিব যখন
শান্তি দিবে শূল্যমাংস ভূয়িষ্ট ভোজনে।
তুচ্ছ সে স্বরগসুখ, তুচ্ছ ধনরাশি,
তোমার বয়ান হেরি, সুখনীরে ভাসি।

বিশ্বামিত্র—

প্রিয়তমে, দীন আমি দোষী আমি পদে;
ক্ষম দেবি, ক্ষম অপরাধ, তুমি উচ্চ,
নীচ আমি ভবে। ভাঙ্গিয়াছ গর্ব্বভরা
এ উন্নত বুক, ভাঙ্গিয়াছ মুহূর্ত্তেকে
অপূর্ণ সে তপ। ক্ষুদ্র আমি, নর আমি
দেবরোষে আজি মোর পূর্ণ পরাজয়;
পরাজয় বালিকারকাছে। ক্ষম মোরে।
ঢেকে রাখ কন্যামুখ তব রূপরাজি,
বিদায়, রেখোনা ধরি, বিদায় গো আজি।
স্বইচ্ছায় ভেঙ্গেছে যে সুখ হর্ম্ম্য তার
সে কি গো রচিবে সেথা কুটীর আবার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

রামকেলির মেলা।

রামকেলি, গৌড়ের মধ্যবর্ত্তী একখানি গ্রাম। এখানে প্রতিবৎসর জৈষ্ঠমাসের শেষ কয়দিন ও আষাঢ়ের প্রথম দুই তিন দিন ব্যাপী একটী মেলা হইয়া থাকে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর রূপ ও সনাতনকে দর্শন দিতে, নবদ্বীপ হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন এই ঘটনার স্মরণার্থ রামকেলিতে মেলা হইয়া থাকে। কোন্ সময় কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই মেলা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে জৈষ্ঠমাসের শেষ দিবসে ভক্ত বৈষ্ণবেরা এখানে সমবেত হইয়া বেত-ফল ক্রয় ও পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। মদনমোহনের ঠাকুরবাড়ী হইতে বারদুয়ারি বা সোনা-মস্জিদ্ পর্য্যন্ত স্থানে এই মেলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিকে রূপসাগরের জলে মেলার লোকের স্নান পান হয়। গঙ্গা ও বেশী দূরে নয়। রামকেলির সন্নিহিত গঙ্গার স্থানীয় নাম হাব্বাস খাঁ। রূপসাগর, শ্রীরূপগোস্বামীর কীর্ত্তি। কয়েকবৎসর তেমন বৃষ্টি না হওয়ায় এখন ইহাতে বেশী জল নাই। মেলায় নানাস্থান হইতে বৈরাগী বৈষ্ণবীর সমাগম হইয়াথাকে। চৈতন্যের আগমন হইয়াছিল বলিয়া বৈষ্ণবেরা রামকেলিকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। এজেলায় বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বিস্তর, তজ্জন্য রামকেলি এজেলার লোকের নিকট পবিত্র

স্থান। রামকেলিতে অন্য জাতির বাস নাই। কেবল ত্রিশঘর বৈষ্ণব বাসকরে। বৈষ্ণবেরা শান্ত প্রকৃতিক। সকলেরই বাড়ীতে ঠাকুর সেবা আছে। দশটী ঠাকুর বাড়ী আছে। তিনটী ঠাকুর বাড়ীতে গৌরনিতাই মূর্ত্তি আছেন। বৈষ্ণবদের, অতিথি সেবা প্রশংসনীয়। আমরা অনেক সময় না ভাবিয়া সম্প্রদায় বিশেষকে ঘৃণা করিয়া থাকি। বৈষ্ণবদের আখ্‌ড়ায় গেলে ইহাদের বিনয় ও সৌজন্যে মোহিত হইতে হয়।

রামকেলির অপেক্ষা বড় মেলা বাঙ্গালার অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রামকেলির অপেক্ষা মনের আনন্দ দায়ক মেলা, অন্য স্থানে নাই। বৈষ্ণবদের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকে রামকেলিতে আসিয়াথাকে। শতশত বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, খোল করতাল একতারাও গোপীযন্ত্রের বাদ্যের সঙ্গে নূপুর বাদ্য মিশাইয়া কৃষ্ণ ও-কৃষ্ণ চৈতন্যলীলা গান করিয়া লোককে মোহিত করিয়াথাকে। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবীর মনোহর নৃত্য দর্শন করিলে সকলেরই চিত্ত বিনোদন হয়। মধুর সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে দুর্বিনীত মন অনেক দিন ভালথাকে। বহুসংখ্যক গৃহস্থ, সস্ত্রীক আগমন করিয়া মেলার গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। মেলার নামে নানাবিধ কুৎসিত গল্প শুনা গিয়াথাকে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অমূলক। এমেলায় এমন কোন দ্রব্য বিক্রীত হয় না যে, যাহা অন্য মেলায় পাওয়া না যায়। লোকে সাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগের জন্যই এখানে আসিয়াথাকে। স্ত্রী পুরুষের এমন অসঙ্কোচে মেশামেশি অন্য কোন মেলায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

মেলার শান্তিবিধানের যথোচিত বন্দোবস্ত হইয়াথাকে। জেলার কর্ত্তা স্বয়ং পুলিসকর্ম্মচারিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মেলার শিয়রে অবস্থান করিয়াথাকেন। গৌড়ের যে সকল অট্টালিকা এখনও খাড়া আছে, কয়েক বৎসর হইতে সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে সে সকলের মেরামত হইতেছে। গবর্ণর জেনেরল লর্ড কর্জ্জন, গৌড় দর্শন করিয়া গিয়াছেন। ছোটলাটগণ গৌড় দর্শন করিয়াথাকেন। বড় বড় সাহেব সুবা গৌড় দেখিতে আসেন। তাঁহাদের অবস্থান জন্য, পিয়াজ্‌বাড়ী দীঘীর তীরে ডাক বাঙ্গালা নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনা যায়, পিয়াজবাড়ী দীঘীর জল পূর্ব্বে নিতান্ত অপেয়ছিল, তজ্জন্য উহা কয়েদিদিগের পানার্থ ব্যবহৃত হইত। ইহাতে কয়েদিদিগের এতদূর স্বাস্থ্য হানি হইত যে, অনেকে অল্প কালের মধ্যে মরিয়াযাইত। আকবর বাদশাহের আদেশে এই প্রথা রহিত হয়। এই গল্প সত্য বলিয়া বোধ হয় না। পিয়াজ বাড়ী দীঘীর জল এখন অতি পরিষ্কৃত ও সুস্বাদ। পূর্ব্বে অপেয়ছিল কেন, তাহা জানা যায় না। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে আকবর গৌড় অধিকার করেন। ঐসনেই গৌড় পরিত্যক্ত হয়। আকবর বাদশাহের সময় গৌড়ে কয়েদি থাকিত না, তজ্জন্য পিয়াজবাড়ী দীঘী ঘটিত উপাখ্যানটিকে সত্য বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বে পিয়াজবাড়ী দীঘীর তটে নগর রক্ষীদের একটী আড্ডাছিল, এরূপ অনুমিত হয়। এখান হইতে রামকেলি দেখা যায়। আধুনিক শান্তিরক্ষকদের বাসভবন, প্রাচীন কালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মদনমোহনের বাড়ী হইতে মেলার আরম্ভ। মদনমোহন, সনাতন গোস্বামীদের কুলদেবতা। বৃন্দাবনের মদনমোহনের যতই মহিমা বর্ণিত হউক না, রামকেলির মদনমোহন তাঁহার পূর্ব্ব রূপ। আজ যদি গৌড় পূর্ব্বাবস্থায় থাকিত, তহা হইলে রামকেলির মদনমোহনের খ্যাতিও বাড়িত। রামকেলির বিগ্রহ অপেক্ষা মদনমোহন প্রাচীন। ঠাকুরবাড়ীর নিকটে রূপ সনাতনও অনুপের বাড়ীছিল। এখন সে বাড়ীর চিহ্ন মাত্রও নাই। ইট পর্য্যন্ত তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। সেখানে ধান্যক্ষেত্র হইয়াছে। ঠাকুরবাড়ীর নিকটে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামক দুটী ক্ষুদ্র পুকুর। গোস্বামীরা তিনভাই বৃন্দাবন লীলা স্মরণার্থ কুণ্ডদ্বয় খনন করাইয়াছিলেন, এরূপ কথিত হইয়া থাকে। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

সনাতন রূপের সাধন যে প্রকার।
সে সকল বিস্তারি কহিতে সাধ্য কার॥
বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্বকানন রাধা শ্যাম কুণ্ড তাতে॥
বৃন্দাবনলীলা তাতে করিয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরজ নেত্রে ধারা সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন সেবায় রত।
সদা খেদ উক্তি তায় কহিব বা কত॥

বৃন্দাবনের শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড আগে ধান্য ক্ষেত্রের

ভিতর ছিল। গৌড়ীয় গোস্বামীগণ তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। রামকেলির রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড, তাহার পূর্ব্বেই খনিত হইয়াছিল। তবে ভক্তগণ অবশ্যই বৃন্দাবনের কুণ্ডদ্বয়কে নিত্য বলিবেন, তাহাতে কোন কথা নাই।

জীব গোস্বামী রূপসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপ বা বল্লভ গোস্বামীর পুত্র। রূপ ও অনুপ, সনাতনের অগ্রে সংসার ত্যাগ করেন। সংসার বৈরাগ্যই ভ্রাতৃত্রয়ের সংসার ত্যাগের কারণ সমুদায় বৈষ্ণব-গ্রন্থের এই মত। হোসেন সার রাজত্বকালে রূপ ও সনাতন উচ্চরাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রূপের সংসারত্যাগের আট বৎসর পরে সনাতন সংসার ত্যাগ করেন। যখন হোসেন সাহ সনাতনের রাজকার্য্যে ঔদাস্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই করে দস্যুব্যবহার। জীব পশু মারি কৈল চাকলা ছারখার।" তখন হোসেন সা হয়ত রূপকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বোধহয় রূপকে সনাতনের জ্যেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। রাজানুগ্রহের চাঞ্চল্য-নিবন্ধন রূপের সংসার ত্যাগ হইয়াছিল, যদি কেহ এরূপ মনে করেন, তবে যে তিনি অন্যায় করিলেন এরূপ মনে হয় না। গৌড়ের মধ্যে হিন্দুগণ অসঙ্কোচে স্বধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ করিতে পারিত না ইহা এদেশে প্রবাদবাক্যের মত হইয়া আছে। গৌড়ের পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গার তীরে হিন্দুদিগকে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেওয়া হইত। রামকেলি রাজবাটীর নিতান্ত সন্নিহিত ছিল। রামকেলিতে বিস্তর ব্রাহ্মণসজ্জনের বাস ছিল। এই স্থানে রূপ ও সনাতনের বাস ছিল। রূপ ও সনাতনের আশ্রয়ে অনেক পণ্ডিত বাস করিতেন। নবদ্বীপের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা রামকেলিতে গমন করিতেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তদ্‌ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি, রূপসনাতনের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে,—

রাজা হর্ষে দিল রাজ্য পৃথক করিয়া।
রাজ্যভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া॥
গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥
ইন্দ্র সম সনাতন রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হইতে॥
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি কবিগণ।
সর্ব্বদেশী সকল নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণ গণ।
কর্ণাট দেশাদি হইতে আইলা বিপ্রগণ॥
সনাতনরূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে॥
ভট্টগোষ্ঠীবাসে ভট্টবাটী নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বমতে অনুপম॥
রামকেলি গ্রামে সে সকল বিপ্র লৈয়া।
ব্যবহার কার্য্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া॥
বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণে রূপ সনাতন।
যেরূপ আদর করে নাহয় বর্ণন॥
নবদ্বীপ হইতে আইসে বিপ্রগণ যত।
কহিতে না পারি তা সভারে ভক্তি কত॥

রামকেলির কোন স্থানটিকে ভট্টবাটী বলিত, এখন তাহা জানা যায় না। রূপসনাতন গৃহত্যাগ করিলে পণ্ডিতগণ রামকেলি ত্যাগ করেন। এখন রামকেলিতে একঘর ব্রাহ্মণেরও বাস নাই। মদনমোহনের নিকটে ইষ্টকগ্রথিত এক উচ্চ ভূখণ্ডে একটী তমালবৃক্ষ আছে। বৃক্ষটি পুরাতন নয়। পূর্ব্বে সেখানে অন্য তমালবৃক্ষ ছিল কি না জানা যায় না। গৌড়ে আসিয়া এই স্থানে দাঁড়াইয়া চৈতন্যদেব উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়াছিলেন। রাজধানীর বহুলোক, এই নবীনসন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। নগর কোতোয়াল হোসেন সার নিকট জানাইল, এক হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়া ভূতের নাম করিতেছে। তাহার সঙ্গে অনেক লোক। কোতোয়ালজির মনে আশা ছিল, বাদশাহের হুকুম পাইলে সন্ন্যাসীর উপর আপনার বীরত্ব প্রকটন করেন। রাজসভার হিন্দুকর্ম্মচারিগণের জন্য কোতোয়ালজির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। হুসেন সা কোতোয়ালকে সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ করিলেন। রূপসনাতন, কেশবছত্রী প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সত্বর গৌড় ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। চৈতন্যদেব লোকসংঘট্ট পরিত্যাগ করিয়া গোপনে গৌড় হইতে প্রস্থান করেন। এখন এই স্থানে বেশী লোকের সমাগম দেখিলাম না। দুই বার এইস্থানে দুটী একটী ধ্যানস্তিমিত-

নয়ন উদাসীনকে দেখিয়াছিলাম। এবার একটী স্ত্রীলোক এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছে দেখিলাম। লোকের মনে ধর্ম্মভাব কিরূপ আধিপত্য করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা গেল।

আর এক কারণে অনেকে রামকেলি দেখিতে যায়। যেদিক্ হইতেই আসা যা'ক বিশাল ভগ্নস্তূপের মধ্য দিয়া রামকেলিতে আসিতে হয়। অনেক মৃৎপ্রাচীর অতিক্রম করিতে হয়। এক একটা মৃৎপ্রাচীর কি উচ্চ! এসকল, নগরকে জলপ্লাবন ও শত্রুগ্রাস হইতে রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক একটা উচ্চস্থানকে এক একটা শ্মশান বলিলেও হয়। এখানে কত মধুর হাসি, কত নূপুরশিঞ্জন ও কত নীরব কবিতার সমাধি হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? এই সকল স্থান কতশত গজবাজি পদাতি ও অশ্বারোহীর পদভরে কম্পিত হইয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিশালকায় দখলদরজা, বারদুয়ারি, কোতোয়ালিগেট দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মহাশ্মশান যেমন মানবকে জগতের নশ্বরত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়, মহানগরের ভগ্নাবশেষও তাই করে। রামকেলি এই মহাশ্মশানের মধ্যে থাকিয়া নীরবে কত অতীত কাহিনী কহিতেছে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

১৮৭৮ খৃঃঅব্দের ১লা জানুয়ারী শম্ভুচন্দ্র পুনরায় ত্রিপুরায় যান। ত্রিপুরার উন্নতিসাধনে শম্ভুচন্দ্র বিশেষ যত্ন করেন। এই সকলের মধ্যে প্রথম উল্লেখ যোগ্য দোগাঙ্গি জলার নিষ্পত্তি। এই জলা লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের এবং সরাইলের জমিদার কাশিমবাজারের অন্নদাপ্রসাদ রায়ের সহিত তখন বিশেষ শত্রুতা চলিতে ছিল। পূর্ব্বে অনেক মামলা মোকদ্দমা হইয়া উভয় পক্ষের বহুল অর্থ নষ্ট হয় কিন্তু কোন রূপ নিষ্পত্তি হয় না। মোকদ্দমায় কাশিমবাজারের রায় বাবুরা হারিয়াছিলেন কিন্তু বলপূর্ব্বক তাঁহারা তাঁহাদের স্বত্ত্ব রক্ষা করিতে-ছিলেন। মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা-প্রায় প্রতিদিবসই হইত এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রতিমাসে উভয় পক্ষের যথেষ্ট অর্থ নাশ হইত। শম্ভুচন্দ্র দেওয়ান হইয়াছেন শুনিয়া কাশিমবাজার হইতে অন্নদাপ্রসাদ রায় তাহার বহুদর্শি বৃদ্ধ নায়েব জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যকে গোলযোগ নিষ্পত্তি করিবার মানসে ত্রিপুরায় পাঠাইয়াদেন। দোগাঙ্গি জলা লইয়া কিরূপে কাশিমবাজারের রায় বাবু দিগের সহিত ত্রিপুরার বিবাদ আরম্ভ হয় তাহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস এখানে প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বে মুসলমান আমলে মেঘনা নদীর পর পারস্থিত সমস্ত ভূভাগ অর্থাৎ সরাইল, গঙ্গামণ্ডল, পাটকিয়ারা প্রভৃতি জমিদারী ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই সকল স্থানে সুবিশাল অরণ্যানী বিদ্যমান থাকায় ত্রিপুরার মহারাজগণ এখানে মধ্যে মধ্যে হস্তী প্রভৃতি বন্য জন্তু শিকার করিতে আসিতেন। এক সময়ে শিকার কালে ত্রিপুরার কোন মহারাজ সরাইল জমিদারীর দেওয়ান সাহেবের এক পুত্রকে দৈবক্রমে গুলি করিয়া ফেলেন। এই মৃতপুত্র দেওয়ান সাহেবের একমাত্র সন্তান। সুতরাং তাহার মৃত্যুতে দেওয়ান সাহেব অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া দরবেশী মুসলমান পরিব্রাজকদিগের ন্যায় জীবন ক্ষেপন করিবেন, স্থির করেন। মহারাজ দেওয়ান সাহেবের এইরূপ সংকল্প শ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং দেওয়ান সাহেবের ন্যায় তিনিও সংসার ত্যাগ করিবেন স্থির করেন। কিন্তু অন্যান্য অমাত্য এবং সুহৃদ্‌বর্গ উভয়কেই সন্তোষ বাক্যে তুষ্ট করিলে উভয়েই সংসার ত্যাগ বাসনা পরিত্যাগ করিলেন এবং দেওয়ান সাহেবও সরাইলে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিবেন মনস্থ করেন। দেওয়ান সাহেব সরাইলে ফিরিয়া আসিবার সময় মহারাজ তাহাকে সরাইলের জমিদারীর মালিক করিয়া দেন। তদবধি সরাইল দেওয়ান সাহেবদিগের জমিদারী হয়। পরে নানা কারণে সরাইল জমিদারীর প্রায় বার আনা অংশ অন্নদাপ্রসাদ রায়ের পিতামহ নরসিংহচন্দ্র রায় ক্রয় করেন। নরসিংহের পুত্র রাজকৃষ্ণ রায় এবং তাঁহার পুত্র অন্নদাপ্রসাদ রায় ক্রমে ইহা উত্তরাধিকার স্বত্বে

প্রাপ্ত হন। দোগাঙ্গি জলার তিন সীমানা সরাইল জমিদারী দ্বারা বেষ্টিত। অপর সীমানায় তিতাসনদী এবং ত্রিপুরার জমীদারী নুরনগর বর্ত্তমান। পূর্ব্বে এই জলা তিতাসনদীর হ্রদ রূপে ছিল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যে সার্ভে হয় সেই সার্ভের মানচিত্রে এই দোগাঙ্গি হ্রদ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রথমে এইরূপ সার্ভে মানচিত্রের বিষয় রাজকৃষ্ণ রায় জানিতে পারেন নাই কিন্তু যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া দোগাঙ্গি ত্রিপুরার জমীদারী নুরনগরের অন্তর্গত হইল তখন রাজকৃষ্ণ রায় দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করিলেন এবং তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া যাওয়া হেতু মোকদ্দমায় তাঁহার পরাজয় হইল। কিন্তু রাজকৃষ্ণ স্বত্ত্ব ত্যাগ না করিয়া বল পূর্ব্বক দোগাঙ্গি দখল করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই ত্রিপুরার কর্ম্মচারীদিগের সহিত তাঁহার সদাসর্ব্বদা দাঙ্গা হাঙ্গমা হইয়া ফৌজদারী মোকদ্দমা হইত। বহু চেষ্টাকরিয়াও রাজকৃষ্ণ এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র অন্নদাপ্রসাদ মুর্শিদবাদ হইতে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের সময়ে ত্রিপুরায় আগমন করেন। অন্নদাপ্রসাদ ভাবিয়া ছিলেন যে, এই সুযোগে মহারাজকে অনুরোধ করিলে বহুকালব্যাপী কলহ মিটিয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যে সুফল ফলে নাই। বিফল মনোরথ হইয়া অন্নদাপ্রসাদকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। শম্ভুচন্দ্র যখন নিজামতের দেওয়ানী করিতেন সেই সময় অন্নদাপ্রসাদ শম্ভুচন্দ্রের উদারতার বিষয় অবগত ছিলেন। সুতরাং যখন শুনিলেন যে শম্ভুচন্দ্র ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছেন তখন আশ্বস্ত হইয়া তিনি তাঁহার বৃদ্ধ নায়েব জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যকে পুনরায় ত্রিপুরায় পাঠান; জগন্নাথ আসিয়া শম্ভুচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় প্রভুর বাসনা জানাইলেন এবং মহারাজের নিকটে উক্ত আবেদন লইয়া দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শম্ভুচন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সৎ পরামর্শ দিয়া তাঁহার বাটিতে কিছু দিন অবস্থান করিতে বলিলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া মহারাজের নিকট দোগাঙ্গি জলার সম্বন্ধে একটা মীমাংসার জন্য আবেদন করিলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমায় বহুল অর্থ এবং জীবন নাশ হওয়া হেতু মহারাজ বিশেষ চটিয়া ছিলেন; তথাপি শম্ভুচন্দ্র কৌশল পূর্ব্বক উক্ত বিষয় তাঁহার নিকট পেশ করেন। এই বহু বর্ষব্যাপী বিবাদ যাহাতে না মিটিয়া যায় তজ্জন্য রাজ কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ চেষ্টা হইল। কারণ বিবাদ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে পারিলে উভয় পক্ষের কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ লাভ। কিন্তু শম্ভুচন্দ্র অনেক চেষ্টার পর উভয় পক্ষকে বজায় রাখিয়া অন্নদাপ্রসাদ রায় এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে উক্ত জলার পত্তনিদার নিযুক্ত করিবার জন্য মহারাজকে পরামর্শ দিলেন। মহারাজ ইহাতে স্বীকৃত হইলে জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যকে শম্ভুচন্দ্র অন্নদাপ্রসাদের মতামত জন্য পত্র লিখিতে বলিলেন। অন্নদাপ্রসাদ স্বীকৃত হইয়া পত্র লিখিলে মহারাজ তাঁহাকে দোগাঙ্গি জলার পত্তনিদার নিযুক্ত করিলেন এবং এইরূপ দীর্ঘকালের বিবাদ চিরতরে প্রশমিত হইল। অন্নদাপ্রসাদ শম্ভুচন্দ্রকে এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে শম্ভুচন্দ্র ত্রিপুরায় অবস্থানকালে ত্রিপুরায় অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পুরাতন এবং নূতন আগরতলার মধ্যবর্ত্তী মেরিয়াম নগর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে অনেক দেশীয় খৃষ্টিয়ান বাস করে। ইহাদের সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগের কয়েক জনকে ডাকাইয়া তাহাদের তদানীন্তন অবস্থার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নিজেদের অতি শোচনীয় সংবাদ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করে। তাহাদের অবস্থা এতদূর হীন ছিল যে তাহারা আগরতলা চিরতরে ত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। এই স্থানে এই সকল ফিরিঙ্গিরা কি রূপে প্রথম আসিয়া বাস করে তাহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস প্রদত্ত হইল।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মোগল সম্রাট সাজাহানের রাজত্ব কালে পর্ত্তুগীজ জল দস্যু দিগের উপদ্রবে বাঙ্গালার নৌব্যবসায় একবারে লোপ পাইবার উপক্রম হয়। মোগল সম্রাট এই সকল পর্ত্তুগীজ দস্যু দিগের উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য সায়েস্তা খাঁকে প্রেরণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে আরাকান এবং ত্রিপুরা রাজের অধীনে অনেক পর্ত্তুগীজ সমরবিভাগে চাকুরী স্বীকার করিয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ অনেক পরিমাণে পর্ত্তুগীজ জল দস্যু দিগকে বিধ্বস্ত

করিলেন বটে কিন্তু তাহারা আরাকান এবং ত্রিপুরা রাজ্যে পলায়ন করিয়া মোগল প্রপীড়ন হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিল। সেই হইতে পর্ত্তুগীজেরা ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাহারা দেশীয় দিগের সহিত বিবাহাদি করিয়া দেশীয় ফিরিঙ্গি ন্যায় হইয়া যায়। যতদিন ত্রিপুরার প্রতিপত্তি ছিল তদিন ইহাদের সম্মান ছিল, কিন্তু ইংরাজ আমলে ত্রিপুরার ক্ষমতা হ্রাস হইলে সৈন্যের অনাবশ্যক হয় সুতরাং এই সকল ফিরিঙ্গির দুরাবস্থা ঘটে শম্ভুচন্দ্র এই ফিরিঙ্গি দিগকে আগরতলা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। কিছু দিন পরে ইহাদিগকে লইয়া ত্রিপুরায় এক সৈন্যদল গঠণ করিয়া তাহাদের মধ্যে জোয়াকিম নামক একজনকে সেনানায়ক করিয়া দেন। ত্রিপুরার রাজকোষ হইতে তাহারা রীতিমত বেতন পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রকে তাহাদের দুরবস্থা দূর হয়। শম্ভুচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য তাহারা এক দিন গীর্জায় সমবেত হইয়া ঈশ্বরের নিকট তাঁহার শুভকামনা করে।

দ্বিতীয় বারে শম্ভুচন্দ্র প্রায় দুই বৎসর ত্রিপুরায় বাস করেন এবং ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ৺শারদীয় পূজা উপলক্ষে কলিকাতায় ছুটি লইয়া আসেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে শম্ভুচন্দ্র তৃতীয় বার ত্রিপুরায় গমন করেন। এই বারে শম্ভুচন্দ্র আঠার মাস ত্রিপুরায় বাস করেন। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের ৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে কলিকাতায় পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এ বারে আসিবার সময় আর পুনরায় ত্রিপুরায় আসিবেন না এই রূপ স্থির করিয়াছিলেন। নানা কারণে শম্ভুচন্দ্র এইরূপ সংকল্পে উপনীত হন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে প্রাণপণ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতের করদ রাজ্য সকলের সমক্ষে আদর্শ করিয়া তুলিবেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবার পক্ষে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। বীরচন্দ্রের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া রাজকোষে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হয় এবং তদ্দ্বারা রাজ্যের অভ্যন্তরিণ অবস্থার উন্নতি অনেক পরিমাণে সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত অনেক প্রজা হিতকর কার্য্যে শম্ভুচন্দ্র হস্তক্ষেপ করেন কিন্তু পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হন। এই সময় সঞ্চিত অর্থ পাইয়া মহারাজ বীরচন্দ্রের এক খেয়াল চাপিল। ত্রিপুরা রাজ্য অতি প্রাচীন। মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস যে, ত্রিপুরার রাজা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় এবং চন্দ্রবংশ সমুদ্ভূত। পূর্ব্বকালে যাহাই থাকুন না কেন, উত্তর কালে ইহাদের সামাজিক পদমর্য্যাদা অত্যন্ত হীন হয়। তাহার প্রধান কারণ যে মধ্যকালে তাঁহারা অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। সুতরাং ত্রিপুরার রাজারা পতিত বলিয়াই সকলের ধারণা হয়। তাঁহাদের সহিত কোন সদ্ব্রাহ্মণ আহারাদি করা দূরে থাকুক—তাহাদের পৃষ্ঠ জলও গ্রহণ করিতেন না। মহারাজ বীরচন্দ্র এই সামাজিক অবনতি সংশোধন মানসে এক নিয়ম করেন যে, প্রত্যেক রাজ কর্ম্মচারীকে কার্য্য করিবার প্রারম্ভে তাঁহার কিংবা তদীয় পরিবারবর্গের পৃষ্ঠ পানীয় সেবন করিতে হইবে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র ঢাকা, বিক্রমপুর, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হন। ইহাতে প্রভূত অর্থব্যয় হইবার উপক্রম হয়। শম্ভুচন্দ্র বারংবার মহারাজ কে এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করেন কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে অনলের যেরূপ অবস্থা হয়, মহারাজেরও এই পানীয় প্রশ্ন সেইরূপ কু-পরামর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর আকার ধারণ করিল। শম্ভুচন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া ৺শারদীয়া পূজার অবকাশে কলিকাতা চলিয়া আসেন।

ইহার তিন মাস পরে অর্থাৎ ১৮৮২ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে শম্ভুচন্দ্র তাঁহার প্রাণাধিক রেইস এণ্ড রাইয়ত নামক সপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

বাবু রামলাল ঘটক এবং কালীপদ গুপ্ত নামক দুই ব্যক্তি বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে "কর্ণওয়ালিস্ প্রেস" নামে এক মুদ্রা যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। বাবু রামলাল ঘটক পুর্ব্বে রেলওয়ে কর্ম্ম করিতেন, তজ্জন্য রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে বিশেষরূপে সর্ব্বদা খবর রাখিতেন। সংবাদপত্রে আলোচনা করিয়া রেলওয়ে ভ্রমণকারী দিগের অসুবিধা সকল বিমোচন করিবার মানসে তিনি নিজে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার উপযুক্ত লেখকের অভাব হয়। তিনি তজ্জন্য প্রথমে

কৃষ্ণদাস পালের নিকট যাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাকে বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে বলেন। নগেন্দ্র বাবু ঘটক মহাশয়ের প্রস্তাবিত কাগজের সম্পাদক হইতে অস্বীকার করিলেন কিন্তু তাঁহার কাগজে মধ্যে মধ্যে লিখিতে পারেন এই কথা বলিলেন। ঘটক মহাশয় বিফল মনোরথ হইয়া যান। ঘটক মহাশয়ের কাগজ প্রকাশের প্রস্তাব ৺নরেশচন্দ্র দত্ত জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র দত্তকে বলিলেন যে শম্ভুচন্দ্রের দ্বারা ঘটক মহাশয়ের প্রস্তাবিত কাগজ সম্পাদিত করিতে পারিলে ভাল হয়। যোগেশচন্দ্র শম্ভুচন্দ্রকে উক্ত বিষয়ের জন্য অনুরোধ করেন। শম্ভুচন্দ্র সেই সময় ত্রিপুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বরাহনগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি স্বীকৃত হইলে ঘটক মহাশয় এবং তাঁহার অংশীদার কালীপদ গুপ্ত উভয়েই নূতন সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য আয়োজন আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে একটি লেখা পড়াও হইল। শম্ভুচন্দ্র এবং যোগেশচন্দ্র সম্পাদন ভার গ্রহণ করিলেন এবং রামলাল ঘটক ও কালীপদ গুপ্ত পরিচালন বিষয়ক সমুদয় তত্ত্বাবধায়ণের কার্য্য করিতে স্বীকার করিলেন। প্রথমে স্থির হয়, বুধবারে সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইবে। শম্ভুচন্দ্র নূতন কাগজের নাম রাখিলেন 'রেইস এণ্ড রাইয়ত।' প্রথম সংখ্যা বাহির হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয় অর্থাৎ কাগজে বুধবার তারিখে লেখা, কিন্তু শনিবারে ইহার মুদ্রণ কার্য্য শেষ হয়, তজ্জন্য "রেইস" প্রতি শনিবারে বাহির হইতে লাগিল। প্রথম সংখ্যা কাগজ বাহির করিতে শম্ভুচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্রকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। বাঙ্গালীর সকল কার্য্যেই রীতিমত বন্দোবস্তের অভাব। বিশেষতঃ যাঁহারা সংবাদ পত্রের প্রকাশক তাঁহাদের সকল বিষয়েরই অনটন। মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থা অতীব শোচনীয়। কাজেই অতি কষ্টে কার্য্য চলিতে লাগিল। "রেইসের" ছয় সংখ্যা মাত্র উক্ত ঘটক এবং গুপ্ত মহাশয় প্রকাশ করেন। পরে তাঁহাদের সখ মিটিয়া যায়। তাঁহারা শম্ভুচন্দ্র এবং যোগেশচন্দ্রকে অন্য বন্দোবস্ত করিয়া "রেইস" প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং উহাদের সকল স্বত্ব ত্যাগ করিলেন। তদনুযায়ী "রেইসের" সপ্তম সংখ্যা ব্রিটেনীয়া প্রেসের স্বত্বাধিকারী মেন্‌ডিস্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। মেন্‌ডিস্ সাহেবের মুদ্রাযন্ত্র তখন দত্ত বাবু দিগের ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাটিতে স্থাপিত ছিল। কাজেই "রেইস" এখান হইতে রীতিমত প্রকাশিত হইতে লাগিল।

যোগেশচন্দ্র ব্যতীত বাবু কিশোরিমোহন গঙ্গোপধ্যায়,* বাবু সারদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, † বাবু নবগোপাল ঘোষ, ‡ পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকগণও রীতিমত রেইসে লিখিয়া শম্ভুচন্দ্রকে সাহায্য করিতেন। প্রথম হইতেই কাগজের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিলাতী ও দেশীয় সকল সংবাদ পত্রই ইহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এমন কি কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্তও ইহার প্রশংসা না করিয়াথাকিতে পারেন নাই। প্রথমে কৃষ্ণদাস ভাবিয়াছিলেন যে দুই চারি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়া "রেইস" বন্ধ হইয়া যাইবে কিন্তু যখন দেখিলেন যে দত্ত বাবুদিগের সাহায্যে রেইস রীতিমত প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইতেছে তখন কৃষ্ণদাসের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। শম্ভুচন্দ্র এবং যোগেশচন্দ্র কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষের অনুগ্রহ প্রার্থী ছিলেন না। সুতরাং নির্ভয়ে সত্য কথনে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা ছিল। রেইস আপনা আপনি অনেকের প্রিয় হইয়া উঠিল।

রেইস মহাসমারোহের সহিত চলিতে লাগিল। এদিকে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্রও শম্ভুচন্দ্রের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া বারংবার পত্র লিখিতে লাগিলেন। শেষে ১৮৮২খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে মহারাজ স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শম্ভুচন্দ্রকে ত্রিপুরায় যাইবার জন্য বহু অনুরোধ করিলেন কিন্তু সে সময় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরায় যাওয়া শম্ভুচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব দেখিয়া তিনি মহারাজকে একজন ব্যারিষ্টার তাঁহার পদে নিযুক্ত

* ৺প্রতাপচন্দ্র রায় প্রকাশিত মহাভাতের ইংরাজি অনুবাদক। ইনি এখন ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেছেন।

† বরাহনগর মিউনিসিপালীটির ভাইসচেয়ারমান এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

‡ ইহাকে সাধারণত রামশর্ম্মা বলিয়া জানা আছে ইংরাজি রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত।

করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। মহারাজ তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও চান না। কাজেই মহারাজের নিকট শম্ভুচন্দ্র প্রতিশ্রুত হন যে, যদি একান্তই মহারাজ তদানীন্তন রাজকর্ম্মচরীদিগের দ্বারা রাজকার্য্য না চালাইতে পারেন তাহা হইলে অগত্যা শম্ভুচন্দ্র যাইবেন। এই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র কলিকাতা ত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটন মানসে বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দ বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি প্রধান সাল। ইলবার্টবিলের আন্দোলন, কলিকাতা প্রদর্শনীর বিপুল আয়োজন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালত অমান্য করা অপরাধে কারাবাস, মিস্‌পিগটের সহিত ডাক্তার হেষ্টির মানহানির মোকদ্দমা প্রভৃতি লইয়া দেশময় তুমুল ব্যাপার চলিতেছিল। এই বর্ষের জানুয়ারী মাসে তদানীন্তন অর্থ সচিব মেজর বেয়ারিংএর পরামর্শানুযায়ী লর্ড রিপন কৃষ্ণদাস পালকে বড়লাট সভার সভ্য মনোনীত করেন। ইহাতে অনেকের গাত্র দাহ উপস্থিত হয়। সংবাদ পত্রেও এই মনোনয়ন বিশেষরূপে প্রশংসিত হয় নাই। কেবলমাত্র শম্ভুচন্দ্র ইহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া যাহা লিখিয়া ছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে পাঠক আরও দেখিতে পাইবেন যে কৃষ্ণদাসকে শম্ভুচন্দ্র কতদূর আন্তরিক ভাল বাসিতেন:—
"In every respect the choice is unexceptionable. The ablest and most experienced journatist as well as the ablest debater among the natives, perhaps in the empire, Babu Kristodas will be unquestionably the right man in the right place." পূর্ব্বে বলিয়াছি শম্ভুচন্দ্রের হৃদয় ভালবাসার উৎস ছিল। বন্ধুগণের জন্য তিনি অনেক সময় বিপজ্জনক কার্য্য করিতে ও কুণ্ঠিত হইতেন না।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জজ নরিসের বিচারের তীব্র সমালোচনা করিয়া বিপদে পড়িলে শম্ভুচন্দ্র এবং যোগেশচন্দ্র তাঁহার পক্ষ সমর্থন কয়িয়া অনেক লেখালিখি করেন। কারাবাসের সংবাদ পাইলে "রেইস" ব্ল্যাকবর্ডার দিয়া প্রকাশিত হইল। এই বিপৎকালে শম্ভুচন্দ্রের পরামর্শে যোগেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের জামিন হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় রাজেন্দ্র দত্তের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পুত্রের বিপদের সময় দত্ত বাবুরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্র এবং যোগেশচন্দ্র স্বয়ং আদালতে উপস্থিত থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা এবং সৎপরামর্শ দিতেন।

ইলবার্টবিলের আন্দোলনে কি ইংরাজি, কি দেশীয়, সকল সংবাদ পত্রই যোগ দিয়াছিলেন। "রেইসে" নবকুমার ঘোষ (ওরফে রামশর্ম্মা) অতি সুললিত উপহাসপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা বাহির করিতে লাগিলেন এবং শম্ভুচন্দ্র ধীর, গম্ভীর ভাবে বিলের পক্ষ সমর্থন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ প্রচার করেন। ইলবার্ট বিলের যে পরিণাম হইয়াছিল তাহা সকলেরই বিদিত আছেন।

এই বৎসরের শেষে কলিকাতা প্রদর্শনী শেষ হয় এবং তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তা মিষ্টার জুবেয়ার সাহেবকে অভিনন্দন এবং ডিনার দিবার জন্য ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র এক সভা আহুত করেন। সভায় ইংরাজগণের ভোজনের পর শম্ভুচন্দ্র পাইকপাড়ার রাজার পক্ষ হইতে জুবেয়ার সাহেবকে অভিনন্দন দেন এবং এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। সভায় অনেক গণ্যমান্য ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শম্ভুচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া বড়ই প্রীতহন। ছোটনাগপুরের তদানীন্তন কমিশনর গ্রিমম্‌লি সাহেব এই সভায় স্ক্রাইন সাহেবকে শম্ভুচন্দ্রের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন।

এই সকল ঘটনার পর মহারাজ বীরচন্দ্র শম্ভুচন্দ্রকে তাঁহার অঙ্গীকারানুযায়ী ত্রিপুরায় লইয়া যাইবার জন্য এক জন লোক প্রেরণ করেন। প্রতিশ্রুত ছিলেন বলিয়া শম্ভুচন্দ্র পুনরায় ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের জুনমাসে ত্রিপুরায় গমন করেন। যাইবার সময় স্থির করেন ত্রিপুরায় দুই এক মাস অবস্থান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন কিন্তু তাঁহাকে তথায় ছয়মাস কাল থাকিতে হয়। "রেইসের" পরিচালনের ভার যোগেশচন্দ্র, সারদাচরণ এবং কিশোরিমোহনের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন এবং নিজেও ত্রিপুরা হইতে প্রতি সপ্তাহে লিখিতেন। ত্রিপুরায় থাকিবার সময় লর্ডরিপনের কার্য্যকাল শেষ হয় এবং তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার জন্য কলিকাতায় সমারোহে সভা হইয়াছিল। ত্রিপুরার

মহারাজকে সভায় যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা হইতে পত্র প্রেরিত হইলে মহারাজ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। ত্রিপুরায় রাজকর্ম্মচারীগণ একদিন তজ্জন্য ছুটিপান এবং মহারাজ এক প্রকাণ্ড দরবার করিয়া লর্ড রিপনের কার্য্যকলাপের প্রশংসা করেন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপুরায় উক্ত দরবার হয়। মহারাজ স্বয়ং লাটসাহেবকে টেলিগ্রাম করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং দরবারের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী রূপে শম্ভুচন্দ্র লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে পত্র লিখিয়া আনুষঙ্গিক সকল বিষয় জ্ঞাপন করেন। ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে শম্ভুচন্দ্র ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রওনা হন। ইহাই তাঁহার শেষ ত্রিপুরা পরিত্যাগ। ত্রিপুরা ত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু ত্রিপুরার কার্য্য কলিকাতায় থাকিয়া চালাইতে লাগিলেন।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ঘোর রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ও শম্ভুচন্দ্র আর একটি হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই অব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার জানবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণির সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ইহলোক ত্যাগ করিলে কলিকাতা হাইকোর্টে উক্ত রাণীর সমস্ত বিষয় বিভাগের জন্য তাঁহার দৌহিত্রগণ আবেদন করিলে প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ সাহেব প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার Mr. W. C. Banarji. হাইকোর্টের রেজিষ্টার Mr. R. Belchambers এবং শম্ভুচন্দ্রকে উক্ত বিষয় বিভাগের জন্য কমিসনর নিযুক্ত করেন। শম্ভুচন্দ্র রাণী রাসমণিকে * বিলক্ষণ জানিতেন, সুতরাং এ কার্য্যে তাঁহার সহায়তা পাইয়া তাঁহার অপর দুইজন সহযোগী বিশেষ আহ্লাদিত হন। রাণী রাসমণি অতি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার স্বামীর জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজচন্দ্রের নিকটে এক লক্ষ টাকা ঋণ করেন। রাজচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় কিছুতেই ঐ টাকা আদায় করিতে পারেন নাই। রাজচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রভুত সম্পত্তির ম্যানেজার হইবার জন্য দ্বারকানাথ তাঁহার বিধবা পত্নী রাসমণির নিকটে প্রস্তাব করেন। সেই সময়ে কলিকাতার আরও অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ রাসমণির ম্যানেজারের পদ প্রার্থী হইয়াছিলেন। রাসমণির ভুমি সম্পত্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল, কাজেই স্বয়ং কার্য্য চালাইবেন মনস্থ করেন। দ্বারকানাথ উক্ত প্রস্তাব করিলে রাসমণি তাঁহার টাকা আদায় করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি দ্বারকানাথকে বলিয়া পাঠাইলেন যে দ্বারিকানাথের ন্যায় লোক পাইলে রাসমণি বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন কিন্তু এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে দ্বারকানাথকে তাঁহার ঋণ সমুদয় পরিশোধ করিতে হইবে, যদ্যপি এইরূপ না করিয়া দ্বারকানাথ তাঁহার ম্যানেজার হন তাহা হইলে লোকে মন্দ ভাবিতে পারে। এই প্রলোভনে মোহিত হইয়া ম্যানেজার হইবার আশায় দ্বারকানাথ ত্বরায় রাসমণির ঋণ শোধ করিলেন। চতুরতাপূর্ব্বক টাকা আদায় করিয়া রাসমণি দ্বারকানাথকে দুই একটি মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিয়া প্রত্যাখান করেন। এইরূপে

* রাণী রাসমণি জানবাজারের দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পিতরামের পুত্র রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী। রাসমণির চারি কন্যা, প্রথম পদ্মমণি দাসী, দ্বিতীয় কুমারী দাসী, তৃতীয়, করুণাময়ী দাসী, চতুর্থ, জগদম্বা দাসী। জননীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয়া, কুমারী দাসী যদুনাথ নামক এক পুত্র রাখিয়া এবং তৃতীয়া করুণাময়ী দাসী ভুপালচন্দ্র নামক এক পুত্র রাখিয়া স্বর্গলাভ করেন। রাসমণি ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণি দাসী এবং কনিষ্টা কন্যা জগদম্বা দাসী জননীর প্রভূত সম্পত্তির মালীক হন। কিছু দিন পরে পদ্মমণি তিন পুত্র, গণেশচন্দ্র, বলরাম এবং সীতানাথকে রাখিয়া মারা যান। কনিষ্ঠা জগদম্বা দাসী ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ত্রৈলোক্যনাথ নামক এক পুত্র রাখিয়া মারা যাইলে সমুদয় বিষয় রাসমণির দৌহিত্র দিগের মধ্যে বিভাগ হইবার জন্য কমিসনর নিযুক্ত হয়। Mr. W. C. Bonerjee. পদ্মমণির পুত্রগণের তরফে, শম্ভুচন্দ্র কুমারী দাসীর পুত্রের তরফে এবং Mr. R. Belchambers অন্যান্য দৌহিত্রগণের তরফে থাকিয়া বিষয় বিভাগ করেন। জানবাজারের এই দাস পরিবারকে সাধারণত লোকে 'মার' পরিবার বলে। মার শব্দের অর্থ বাঁশের বড় গোছা। এই পরিবারের স্থাপন কর্ত্তা পীরিতরাম বাঁশের ব্যবসায় করিয়া ইংরাজী আমলের প্রারম্ভে প্রভুত অর্থ অর্জ্জন করেন। বাঁশের বড় বড় গুচ্ছ নদীর জলে ভাসাইয়া আনিতেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে মার বলিত সেইজন্য তাঁহার নাম পীতরাম মার হয়। বাস্তবিক ইহাদের দাস পদবী। পিতরামের এক পুত্র রাজচন্দ্র দাস এক জন বিশেষ সদাশয় লোক ছিলেন। কলিকাতার গঙ্গার উপর বাবুঘাট, নিমতলার দাহ করিবার ঘাট তাঁহার অর্থে নির্ম্মিত হয়। এতদ্‌ব্যতীত অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার জামাতার মধ্যে মথুরমোহন বিশ্বাসও অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। মথুরমোহন প্রথমে রাজচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার কাল হইলে কনিষ্ঠা জগদম্বার পাণিগ্রহণ করেন। ভুপালচন্দ্র বিশ্বাস এবং ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

দ্বারকানাথ রাসমণির নিকট বিশেষরূপে অপ্রতিভ হন। রাসমণির ন্যায় বুদ্ধিমতী এবং সচ্চরিত্রা ভূম্যধিকারিণী আমাদের দেশে অতি বিরল। তিনি কতকাংশে রাণী ভবানীর ন্যায় পরোপকারিনী ছিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল।

দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য।

ভারতবর্ষ কৃষিমাতৃক দেশ, কৃষিই এদেশের প্রধান অবলম্বন। সর্ব্বদেশেই কৃষি কার্য্যের অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলন দৃষ্ট হয়। কিন্তু এদেশে উহাই একমাত্র জীবন রক্ষক। পুরাকালে কৃষি কার্য্যের অত্যন্ত গৌরব ছিল। কৃষি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ছিল; সমাজের এক শ্রেণী লোক কেবল কৃষি বিদ্যাতেই শিক্ষিত হইত। বৈদিক সময় আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাচীন আর্য্যগণ কৃষি কার্য্যের অতীব আদর করিতেন;—কৃষি কার্য্যের মঙ্গলোন্নতির জন্য আরাধ্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন (১)। অধিক কি সরস্বতী নদীর জলোচ্ছ্বাসে কৃষিক্ষেত্র সকল প্লাবিত হইয়া উর্ব্বরতা শক্তি প্রাপ্ত হইত বলিয়া প্রোক্ত নদীর স্তুতির জন্য যজ্ঞীয় মন্ত্র সকল রচিত হইত (২)। কবি যথার্থই বলিয়াছেন ঃ—"কৃষি-র্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ"। বাস্তবিক কৃষি-জাত দ্রব্য দ্বারা যাবতীয় জীবজন্তু জীবিত আছে।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই এদেশের একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় আধুনিক ভারত বাসীগণ কৃষি কার্যের সে গৌরব ভুলিয়াছ। এখন তাহারা পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত,—জ্ঞানোন্নতি সমাজোন্নতির জন্য বিশেষ ব্যস্ত। অল্পাহারে অনাহারে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, দারিদ্র্য দানবের দেশময় উদ্দাম নৃত্যে দেশ রসাতলে যাইতেছে, সেদিকে কাহারো ভ্রুক্ষেপও নাই।

প্রাচীন কালে কৃষি ও বাণিজ্যেই "লক্ষ্মীর বাস" ছিল, রাজ সেবা তখন "থচ মচ" বলিয়া উপেক্ষিত হইত। এদেশের লোক বাণিজ্য তত ভাল জানিত না—কিন্তু কৃষি দ্বারাই চিরদিন ভারত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল; তবে আজ ভারতের এ অধঃপাত কেন হইল? কর্ষিত ভূমির পরিমাণের সহিত লোকসংখ্যার অনুপাত বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা পরে দেখিব। কৃষি কার্য্যের উন্নতি অবনতির বিষয়ও পরে আলোচনা করিয়া দেখিব। সম্প্রতি দেশের শাসন প্রণালীর সহিত দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের অবশ্যম্ভাবিতাই বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইংরেজ শাসনের দোষদেঘাষণ করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। প্রত্যুত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা দিগের অত্যাচারে,—বর্গী, পিণ্ডারী প্রভৃতির উপদ্রবে দেশ এতই অরাজক ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল যে তৎকালে প্রবল প্রতাপ ইংরাজ রাজের হস্তে রাজ্য ভার ন্যস্তনাহইলে ভারতে সভ্যতার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত কি না সন্দেহ। কিন্তু হিন্দু মুসলমান রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে প্রজাবর্গের যেরূপ সুখ-সমৃদ্ধি ছিল ইংরাজ শাসনে যে তদপেক্ষা অধিক হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি দ্বারা দেশের লোকের সাংসারিক জীবনযাত্রা সুবিধাজনক হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে দেশ অন্নচিন্তায় জর্জ্জরিত সেদেশে ইহা সুখকর কেমন করিয়া বলিব; তাই বলিতেছিলাম ইংরাজ শাসনে দেশ নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে কৃষকেরা স্বীয় পরিশ্রমের ফল নিজে ভোগ করিতে পারিত। উৎপাদিত শস্যাংশ দ্বারা রাজস্ব পরিশোধ করিয়াও সচ্ছন্দে কৃষকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু এখন কৃষক কেবল রাজস্বের জন্যই ভূমিকর্ষণ করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের যে অত্যল্প স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে

(১) শুনংনঃ ফালা বিকৃষন্ত ভূমিং শুনং কীনাশ অভিষন্ত বাহৈঃ॥ শুনং পর্জ্জন্যো মধুনা পয়োভি শুনাসীরা শুন মস্মাসু ধত্তং॥ ঋগ্বেদ।

(২) পাবকানঃ সরস্বতী বাজেভি র্বাজিনীবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসুঃ। মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ঋগ্বেদ সংহিতা।

তদ্ব্যতীত অন্য স্থানে ভূমির কর এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে কৃষি কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ ও রাজস্ব প্রদান করিয়া যৎসামান্য যাহা অবশিষ্ট থাকে তদ্দ্বারা কৃষকের উদরান্ন সংস্থান হয় না। পক্ষান্তরে, হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের শাসন সময়ে দেশের উৎপন্ন দেশেই থাকিয়া যাইত। কঠোর 'হোম চার্জ্জ' কৃষকের গ্রাস কাড়িয়া লইত না,—সুদানের যুদ্ধ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভারতের ধন ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইত না, উচ্চ বেতন ভোগী রাজকর্ম্মচারীগণ ভারত হইতে ধনরাশি লইয়া স্বদেশে ভোগ করিবার জন্য ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিত না, বিদেশীয় বিলাস বস্তু দেশকে ছেলে ভুলাইয়া ব্যবসায় চালাইতে পারিত না, সভ্যতার হুজুগে দেশ উচ্ছন্নে যাইত না। অপিচ, রাজস্ব রূপে যে ধন রাজ কোষে প্রবেশ করিত, তাহাও প্রকারান্তরে প্রজা সাধা-রণের মধ্যে বিতরিত হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈদেশিক শাসনে দেশ ধনহীন হইয়া পড়িয়াছে। ধনহীনতাই দুর্ভিক্ষের মূলীভূত কারণ।

ভূমির উর্ব্বরতাশক্তির অল্পতাও দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। ভারতের আর সেদিন নাই। সেই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারতমাতা ক্রমশঃ শস্যহীনা হইয়া পড়িতেছেন। যোগ্যক্ষেত্রে উপযুক্ত শস্যোৎপাদন, ক্ষেত্রে সারসংযোগ, পর্য্যায়ক্রমে শস্যোৎপাদন এবং মধ্যে মধ্যে ভূমির বিশ্রাম এই চতুর্ব্বিধ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিকার্য্য করিলে ভূমির উর্ব্বরতা দীর্ঘকাল অব্যাহত রাখা যাইতে পারে। ক্ষেত্র-নির্ব্বাচন ও সারসংযোগ কার্য্যদ্বয় কিয়ৎপরিমাণে রসায়ন তত্ত্বের জ্ঞানসাপেক্ষ, অপরগুলি অভিজ্ঞতাজনিত উপদেশের অপেক্ষা করে। কিন্তু দেশের কৃষক ও শিক্ষক উভয়ই পরস্পর নিরপেক্ষ সুতরাং উল্লি-খিত নিয়মের ব্যভিচার ঘটিয়া যাইতেছে। একবিধ শস্য একই ক্ষেত্র হইতে পুনঃ পুনঃ উৎপাদিত হওয়ায় ক্ষেত্রের উপাদান সামগ্রীর ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। উপযুক্ত সার-প্রদত্ত না হওয়ায় তাহার আর সংস্কার হইতেছে না, অপিচ অনুপযুক্ত ভূমিতে অযোগ্য শস্যের চাষ করায় ভূমি ও শস্যের অপচয় সাধিত হইতেছে সুতরাং কবির সেই ভবিষ্যদ্বাণী—"শস্যহীনা হইবে মেদিনী" বর্ণে বর্ণে সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে। যে দেশের কৃষক মূর্খ—শিক্ষিত-গণ উদাসীন—সেদেশ ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে আশ্চর্য্য কি?

অস্মদ্দেশীয় কৃষিসাধন সামগ্রী গুলিও উপযুক্ত নহে। ভূমি উপযুক্তরূপে কর্ষিত না হইলে সন্তোষজনক শস্য উৎ-পন্ন হয় না, ইহা নিশ্চিত। বর্ত্তমান সময়ে দুইটী গোরুর সাহায্যে সামান্য লাঙ্গলদ্বারা কর্ষণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সামান্য কর্ষণে ভূমির দূষিতভাগ দূরী-ভূত এবং উপাদানাংশ বাহির হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিবৎসর শস্যোৎপত্তির জন্য ক্ষতিপূরণের কোন সুবন্দো-বস্ত হয় না। কিন্তু গভীর চাষ ব্যতীত প্রচুর ফসলের আশাও বিড়ম্বনা মাত্র। প্রাচীনকালে ভূমির উর্ব্বরতা প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও ভূমির গভীর চাষের ব্যবস্থা ছিল। ঋগ্বেদে উক্ত আছে বৈদিকসময়ে আটটী গরুর দ্বারাও ভূমিকর্ষণ হইত (১)। অশ্বদ্বারাও কখন কখন উক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহ হইত (২)। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দুইটীমাত্র গরুর দ্বারাই সাধারণতঃ চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত যত্নাভাবে ভারতের গোবংশ নির্ব্বংশ হইয়া যাই-তেছে। কৃষিকার্য্যের প্রধান সাধন বলিয়াই গোজাতি প্রাচীন হিন্দুর নিকট দেবভাবে পূজিত। কিন্তু পাশ্চাত্য আলোক-প্রাপ্ত ভারতে আর সে দিন নাই—এখন উহা অনে-কের মুখপ্রিয় তরকারীরূপে ব্যবহৃত, বড় জোর দয়ালু ব্যক্তির নিকট গো বেচারি বলিয়া কিঞ্চিৎ কৃপা পাইলেও পাইতে পারে।

আমাদের আর একটী প্রধান অভাব দেশে কৃষক নাই। আমরা যাহাদিগকে কৃষক বলি তাহারা প্রকৃত কৃষক নহে, শ্রমজীবী মজুর মাত্র। কৃষকের দায়িত্ব প্রচুর; কৃষক দেশের অন্নদাতা রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কতিপয় নগণ্য মজুরকে কৃষক আখ্যা দিয়া আমরা মহাভ্রমের পরিচয় দিয়া থাকি। যত দিন না সেই ভ্রমের নিরাসন হইতেছে, যতদিন না ভারতে শিক্ষিত ভদ্র বিষয় বিত্তসম্পন্ন কৃষক নির্ব্বাচন হইতেছে, যতদিন না নিরীহ নিরক্ষর শ্রমজীবী

(১) হলমষ্ট গবংধর্ম্ম্যং যড়গবং ব্যবসায়িনাং
চতুর্গবং নৃশংসনাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাং।
ঋগ্বেদ।

(২) ক্ষেত্রস্য পতিনাবয়ং হিতেনেব জয়ামসি
গামশ্বং পোষয়িত্বা সনোমৃলাতি দৃশে॥
ঋগ্বেদ

দিগকে কৃষিকার্য্যে শিক্ষা, সাহায্য ও সহানুভূতি দেওয়া হইতেছে, ততদিন প্রকৃত কৃষকের অভাব কিছুতেই ঘুচিবেনা। কিন্তু এদেশে শিক্ষিত ও সম্পন্ন কৃষকের আশা আকাশকুসুমবৎ অসম্ভব। এই কারণেই এদেশে কৃষির অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া যাইতেছে। ভূমির প্রকৃতি, জমির অবস্থা, মৃত্তিকার উপাদান, জলবায়ু ঋতু-ঘটিত কৃষিকার্য্যের জ্ঞান মূর্খ মজুর কোথা হইতে পাইবে? অধুনাতন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কৃয়িকার্য্যকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কৃষকদিগকে সুশিক্ষা সদুপদেশ দেওয়া দূরের কথা, তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করাও অপমানসূচক বলিয়া মনে করেন। আধুনিক ভদ্র সমাজ আপনাদিগকে পবিত্র আর্য্যবংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবেন না যে, পূজ্যপাদ আর্য্যগণ কৃষিকার্য্যের কিরূপ মর্য্যাদা করিতেন (১) রামায়ণ বর্ণিত সময়েও বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না (২)। শিক্ষিতগণের ত প্রবৃত্তি এইরূপ আবার দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে মূর্খ কৃষকেরাও শিক্ষিত লোকের উপদেশ লইতে অবহেলা ও ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অশিক্ষিত হৃদয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইহা স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষিতগণের উপেক্ষা কথনই সঙ্গত নহে।

ফরাশি দেশীয় পর হিতৈষী মহানুভব জন ফ্রেড্‌রিক বর্লিন্ দেশীয় দিগকে কৃষিকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষাদিবার নিমিত্ত অনেক উপদেশ দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে স্বীয় আবাস গৃহের নিকট এরূপ দুইটী ফলোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন যাহাদ্বারা সমস্ত ফরাশি রাজ্যের কৃষকগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। উক্ত উদ্যানের বৃক্ষের পুষ্টি, উন্নতি, সৌন্দর্য্য ও ফলোৎপত্তির প্রাচুর্য্য দৃষ্টে সকলেই ইহার নিগূঢ় কারণ জ্ঞাত হইবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তিনি এই সুযোগে কৃষক দিগকে শিক্ষিত এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। রোমীয় মহাত্মা সিন্‌সিনেট্‌স্ রোমের প্রজাতন্ত্র সভার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইয়াও কেবলমাত্র সাধারণের হিতকল্পে অবসর মত স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকার্য্য করিতেন। তাই বলিতে ছিলাম ভদ্রও শিক্ষিত লোক কৃষক না হইলে, কৃষক দিগকে সুশিক্ষিত করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি আশা সুদূরপরাহত।

পূর্ব্বোক্ত কারণ গুলি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে ভারতে ক্ষেত্র সকল ক্রমশ অনুর্ব্বর হইয়া যাইতেছে। তথাপি প্রতি বৎসর এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। বিদেশ রপ্তানি বাণিজ্যেরই নামান্তর, বাণিজ্য ব্যতীত অর্থোৎপাদন হয় না; সুতরাং বিদেশ রপ্তানি দেশের সৌভাগ্যের বিষয়। সমগ্র পৃথিবীর লোকের আহার যোগান সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু যেথানে নিজের থাকিবার স্থান নাই, সেখানে শঙ্করাকে শোয়ানের ইচ্ছা নিতান্ত উপহাসের বিষয় সন্দেহ নাই।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের এক প্রবলতম কারণ। বিশেষতঃ যে দেশে লোকাধিক্যের সহিত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি বা উপযুক্ত ধনাগমের উপায় উদ্ভাবিত না হয় সে দেশের অধঃপাত অবশ্যম্ভাবী। সমাজ নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, প্রত্যেক সমাজে বাল্যবিবাহ, বৈধব্য, অবিবাহ, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যাধিপীড়া প্রভৃতি প্রজা বৃদ্ধির উৎকট প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্বেও প্রতি ত্রিশ বৎসরে লোক সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়। প্রসিদ্ধ প্রফেসার এলেন্ টমসন বলেন "প্রত্যেক স্ত্রীলোকের ১২টী হইতে ২৫টী সন্তান প্রসবের ক্ষমতা আছে।" সুবিখ্যাত জেমস মিল নানাবিধ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া তারপর বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক মাত্রেরই অন্ততঃ ১০টী সন্তান প্রসবের ক্ষমতা আছে।" আমরাও সচরাচর দেখিতে পাই ৫।৭টী সন্তান প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই হইয়া থাকে। যদি একটী স্ত্রীলোকের পাঁচটী সন্তান হইল তবে সেই ৫টী সন্তানের কাল ক্রমে ন্যূনকল্পে ২৫টী সন্তান কেন হইবে না! সুতরাং ৩০ বৎসরে লোক সংখ্যা দ্বিগুণ পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ভূমির এরূপ গুণনাঙ্ক ক্রমে ফসল দান করিবার ক্ষমতা নাই। জমি বিশেষ

(১) See datta's History of civilization in ancient India.

(২) তত্রাসিৎ পিঙ্গলো গার্গ্য স্ত্রিজটো নাম বৈদ্বিজঃ।
ক্ষতবৃত্তির্ব্বনেনিত্যং ফালকুদ্দাল লাঙ্গলী॥
রামায়ণম্।

উর্ব্বর হইলেও একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিকফসল কথনই দিতে পারে না। মৃত্যু দ্বারা লোক সংখ্যার কিছু হ্রাস হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে লোকবৃদ্ধির কোন ক্ষতি হয় না। অপিচ ভারতবর্ষে বিদেশী বণিক, ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারী প্রভৃতি আগন্তুক ও ঔপনিবেশিক দ্বারা লোক সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং উৎপন্ন শস্য দ্বারা বর্দ্ধিত ভারতবাসীর আহার সংকুলান নিতান্ত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ও আহার্য্যের অল্পতা দ্বারা দেশে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় উৎপন্ন হয়। আমার স্মরণ হয় কিছুদিন পূর্ব্বে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয় প্রতিবাসী নামকপত্রে একটীপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে আবাদী জমির পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ দুর্ভিক্ষের মাত্রা দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। ইহার কারণ কি?" এই জিজ্ঞাসায় প্রশ্নকর্ত্তার চিন্তাশীলতা থাকিলেও প্রশ্নটিতে অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইতেছে। কেন না আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধিই একমাত্র দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় নহে। উহার অন্যান্য কারণ গুলি যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আর একটী কথা এই—পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী জমি এথন আবাদ হইতেছে সত্য—কিন্তু তাহা কি কেবল চা, নীল, রেসম প্রভৃতির জন্য নয়? ইক্ষু ও পাটের আবাদের জন্যও ভারতে কম শস্য হানি হইতেছে না। ভারতে শস্যের অবস্থা সচ্ছল না হইলে অন্য উৎপন্নের দ্বারা বা অন্য উৎপন্নের ব্যবসায় দ্বারা এদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতে পারে না। তাহা কেবল বিদেশীয় বণিকৃগণের কার্য্য সৌন্দর্য্য সাধন মাত্র।

"দারিদ্র্য দেষঃ গুণ রাশি নাশীঃ",—কবির এ উক্তি অতি সত্য। উল্লিখিত নানা কারণে দেশ ক্রমে ধনহীন হইয়া পড়িয়াছে। ধনহীনতাই দারিদ্র্যের নামান্তর, তাই বলিতেছিলাম দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দেশের দারিদ্র্য মোচন করা কর্ত্তব্য, যে দেশ সর্ব্বদা অন্ন চিন্তায় বিব্রত সে দেশের আবার উন্নতির সুযোগ বা সম্ভাবনা কোথায়? উদরে অন্ন থাকিলে প্রাণে স্ফূর্ত্তি আসে—নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। শূন্যোদরে দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা চলে না, ভূগর্ভে কি মহামূল্য রত্ন লুক্কায়িত আছে তাহার অন্বেষণে ইচ্ছা হয় না। শিল্প বাণিজ্যে হস্তপদ অগ্রসর হয় না।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক

প্রেমের আহ্বান।

এম্, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়া উষানাথ বাবু যখন আইন অধ্যয়নের জন্য কলিকাতা বহুবাজারের কোন একটি মেসে অবস্থান করিতেন সেই সময় তাঁহার করকণ্ডুতি রোগ ছিল সুতরাং তাহা নিবারণের জন্য ঘরের পয়সা ও মাথার মগজ ব্যয় করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে হইত। অনেক কাগজেই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন, কিন্তুএকথানির নিকটও ধন্যবাদ ও তাল্লিদপত্র ব্যতীত আর কিছুই পাইতেন না। তবে তাহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতি ছিল না। সময় ও অবসর যথেষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপরাসধারী' সুতরাং এরূপে সমস্ত গুলিরই একত্রে সদ্ব্যবহারের লোভ কেমন করিয়া সম্বরণ করা চলে। মধ্যে মধ্যে উষানাথ বাবুর প্রবন্ধের বেশ সুখ্যাতিও কাগজওয়ালারা, 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' উপলক্ষে করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। 'উল্লেখ যোগ্য' 'মন্দ নহে' ইত্যাদি লাভ করিলেই সে দিন মেসের বাসায় একটা ধুমকাণ্ড পড়িয়া যাইত এবং উষানাথের গুরুত্ব সে দিন সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত। যাহাহউক এসকল ব্যতীত উষানাথের আরও একটি আকর্ষণ ছিল ৫। ৭ খানি পত্রিকার লেখক হইলেও একথানি পত্রিকার প্রতিই তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দেখা যাইত। তাহার কারণও একাধিক! পত্রিকা থানির নাম 'অবলা' শুধু পত্রিকাই নহে, উহার সম্পাদনভার যাঁহার হস্তে ন্যস্ত তিনিও একটি বিদুষী অবলা;—তাঁহার নামটিও বেশ—কমলা! তিনি বিদুষী, তিন বিষয়ে অর্থাৎ ইংরেজী, সংস্কৃত ও পারসীতে এম, এ, বয়স আনুমানিক ৩৫ ও ৪০

এর মধ্যে কারণ তিনি তাঁহার শেষ এম, এ, পরীক্ষাই আজ প্রায় ১৫ বৎসর দিয়াছেন ক্যালেণ্ডার আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তিনি কুমারী এ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা; তৎপক্ষে কারণ আমাদের অপরিজ্ঞাত! উষানাথ বাবুরও অপরিজ্ঞাত! যদিও উষানাথ বাবু "কুমারী শ্রীমতী কমলা সম্পাদিতা অবলার" একজন মাননীয় লেখক তথাপি তাঁহার অদৃষ্টে সম্পাদিকা মহাশয়ার সন্দর্শন লাভ এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই; তাঁহার বাটীতে তিনি এ পর্য্যন্ত কখন যান নাই, অফিসেও না। সম্পাদিকা মহাশয়া কখনও তাঁহাকে স্বীয় হস্তলিপি-সম্বলিতা পত্রিকাদ্বারা অথচ একটি ছত্র দ্বারাও কখন আপ্যায়িত করিয়াছেন কি না তাহা আমরা শুনি নাই। তবে উষানাথ বাবুর অবলা সম্বন্ধে একটা পক্ষপাত দৃষ্ট হইবার হেতু কি? – অবলার অফিসের দ্বারবান বেশ সুকেশ ও সুবেশ সজ্জিত হইয়া অফিসের লিভারি ওয়ালা পরিচ্ছদ আঁটিয়া পাগড়ি ও চাপরাস্ পরিয়া তাঁর নিকট প্রবন্ধ লইতে আসে, প্রুফ্ দিতে আসে, প্রুফ্ ফেরত লইয়া যায়, বাদসাহী কায়দায় আদাব তস্লিম্ করে, রাস্তায় কখন দেখা হইলেও সে সাড়ে ষোল আনা মাত্রায় সেলাম অর্পণ করিতে ভুলে না— অথচ তার সর্ব্বদাই চাপ্কান, পাগড়ী ও চাপরাস্ আঁটা, চাপকানের বুকের উপর জরির কাজ করা অতি সুন্দর "দি অবলা" লেখা! সামান্য মাসিকপত্রিকার লেখকের পক্ষে পথে ঘাটে এরূপ সম্মানলাভ কি শোভনীয় নয়? তাই উষানাথের অবলার প্রতি একটু বেশ পক্ষপাত ছিল!

আজ রবিবার! বেলা নয়টা। উষানাথ মেসের একটি ছোট ঘরে নিজের কেওড়া কাঠের সনাতন তক্তপোষে জানালার ধারে বুকে একটি বালিশ দিয়া পশ্চিমমুখে উপুর হইয়া পড়িয়া আছেন। আশে পাশে কতকগুলি বই ও বাঁধা খাতা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! বিছানার আধ ময়লা চাদরখানি স্থানে স্থানে জড়সড় হইয়া আছে, স্থানে স্থানে উন্মুক্ত হইয়া তদন্তর্গত খেরুয়ার তোষকখানির পাটলিমা এক্ট করিতেছে। পাশে একখানি ছোট টেবল, ও তার কিছুদূরে পূর্ব্বদিকের দ্বারের অনেকটা কাছে একখানি লোহার চেয়ার! টেবিলের উপর একটা বাতিদান, আর বই, কাগজপত্র, ও কলমদানি। দেওয়ালে একটা ঝুলান আল্না। তাতে একটা গরম কোট, একটা মলিদাগলাবন্ধ, টুইলসার্ট, দু জোড়া মোজা আর থান দুই কোচান কাপড় আর তোয়ালে গামছা এবং টারকিস্ তোয়ালে! দেওয়ালের গায়ে গোলডেন্ বার্ডসাই কোম্পানীর ও আরও দু একটা কোম্পানীর রমণী মূর্ত্তি-ছবি আর রবিবর্ম্মার তদ্গদ চিত্তা এবং মোহিনীর ছবি। উত্তর দেওয়ালের গা আলমারীতে থানকতক ইংরাজি বই, আয়না, ব্রুস, জুতার কালি, সিরাপ ও পারিসের কেমিকেল ফুডের ৩। ৪টা শিশি, একটা বিস্কুটের বাক্স; চা পেয়ালা চামচ ইত্যাদি। টেবিলের তলায় একটি বিলাতী ডবললক্ কেবিন্ ষ্টীল ট্রঙ্ক। দেওয়ালের কোণে একখানি বিলাতী ছড়ি, ল্যাটিনারের জুতা ও পম্পসু।

উষানাথ বাবু ফাল্গুনের রৌদ্র পিঠে লাগাইয়া নিশ্চিন্তমনে অবলার জন্য গতকল্য যে প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিয়াছেন তাহাই দেখিতেছেন। ইতিমধ্যে কর্কশকণ্ঠ যতদূর মোলায়েম হইতে পারে সেইরূপ সুরে শব্দ আসিল "হুজুর!" শব্দেই পরিচয়! তবুও হুজুর একটু হুজুরি আওয়াজে বলিলেন "কোন হ্যায়!"

'তাবেদার হাজির সরকার'! উষানাথ বাবু জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিলেন 'কেও, দরওয়ান!" মস্তক নত করিয়া সেলাম করিয়া 'অবলার' দরওয়ান 'সেলাম হুজুর বলিয়া অভিবাদন করিল!' হুজুর সেলাম গ্রহণ করিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন "আও, আও,"। দরওয়ান পায়ের জুতা খুলিয়া রাখিয়া দ্বিতলে উঠিল এবং দোরস্ত আদব-কায়দার সহিত উষানাথের প্রকোষ্ঠের দ্বারে দাঁড়াইল। উষানাথ পরিধেয় সংযত করিয়া মুখ ফিরাইয়া দরওয়ানকে বলিলেন "কি খবর!"

'কাপি মাংতেছে।'

"কে মাংতা হ্যায়!" একটু সরলভাবে উষানাথের প্রশ্ন!

'এডিটার' মাইজি সাহেবা।'

উষা। আচ্ছা দারওয়ান, তোমারা পাশ হাম একঠো কথা জিজ্ঞাসা করতাহায় যে হামারা কাপির জন্য তোমারা এডিটার সাহেবা এত তাড়াতাড়ি কাঁহে করতাহ্যায়!

আউর সব লেখক তো হ্যায়, তাদের পাশ থেকে তোম্ কাপি নেই নিয়ে আস্তা হ্যায়?"

দরওয়ান বহুদিন কলিকাতায় আছে, অতএব উষানাথীয় হিন্দি সে বেশ বুঝিয়া লইল এবং স্বীয় বঙ্গভাষা ভাষণ-পটুতা প্রদর্শনে উষানাথকে চমকিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিল "আহা হুজুর, সেবাত আর কি বোলবে হাম। হুজুরের কাপি হামারা মাইজি সাহেবার যৈসা পসন্দ হোয় ঐসা আর কারোভি নয়! ক্যা কহেঁ হুজুরের খৎ এডিটারসাহেবা কেবল হরদম পড়েন আর বহুত-আচ্ছা তারিফ্ করেন! তাই জন্যি তো হুজুরের কাছে হামি তাঁবেদার হরদম হাজির!"

উষানাথ বলিলেন, হা, হা, বটে, হামারা লেখা সাহেবা হরদম্ পড়তাহায় এ্যাঁ! আচ্ছা, কভি কভি কুছু বোল্তাহায় না?

দ্বারবান ঘাড় নাড়িয়া কহিল "হাঁ, খুব বোলেন! বোলেন কি যে এমন খুস্‌খৎ খুব কম মেলে! যে মাসেমে হুজুরের কাপি যায় সে মাসেকা কাগজ নগদ-বিক্রী খুব যাস্তি হয়!

আজ তো মাইজি নে হাম্‌কো বোল্‌দিয়েহেঁ— কি একঠো কাপি তো আজ জরুর উন্‌সে লানা চাহি।"

উষানাথ একটু সগর্ব্ব-সন্তোষপূর্ণ নেত্রে দ্বারবানের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "বহুত আচ্ছা, এই দেখ হাম্‌তো কাপি তৈয়ার কোরে রাখা হায়, হাম্ অবলার ওয়াস্তে খুব পরিশ্রম করতাহায় তাতো দেখেই তোম্ বুজতে পারতাহায় কি বল?" এই বলিয়া কাপিটী বেশ করিয়া মুড়িয়া উপরে সুন্দর অক্ষরে লিখিলেন 'প্রেমের-আহ্বান'। এবং তার পর দরওয়ানের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন "তোমার এডিটার সাহেবাকে হামারা সেলাম দেও আর বলো যে এ কাপি হাম বহুত যত্ন কোরে লিখা হায়। এখন তাঁর পসন্দ হয় তো হামারা সব শ্রম সফল হোতাহায়।" দ্বারবান 'যো হুকুম সরকার' বলিয়া পুনরায় 'সেলাম হুজুর' করিল এবং ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া তার পর সিঁড়িতে আসিয়া নীচে নামিয়া গেল।

উষানাথও দেখিলেন নীচের চৌবাচ্চার কাছে বাসার ৮। ১০জন স্নান-কার্য্যে নিযুক্ত। সুতরাং জল বঞ্চিত হইবার ভয়ে অবলা-সংক্রান্ত-চিন্তা বিদায় দিয়া তাড়াতাড়ি একটু কেশরঞ্জন তৈল ঢালিয়া মাথায় ঘসিতে ঘসিতে তোয়ালে ও কাপড় কাঁধে ফেলিয়া ফটাফট চটিকা-ধ্বনি করিতে করিতে নীচে উপস্থিত হইলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে আজ কি গেল?"

উষানাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তা দেখতেই পাবে।"

"আরে শুনিই না হে!"

"না, না, আগে থেকে বোল্‌লে রস থাকে কই!"

দুই একজন একটু ঠাট্টা করিয়া বল্লেন ভায়া, 'অবলা'তে অত রসের ছড়াছড়ি কোরো না শেষে 'প্রবলা' হয়ে পড়তে আটক কি?"

উষানাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন "ছি!! ওসব কুরুচিপূর্ণ কথা বোলোনা! জান, একজন ভদ্র-কুমারী Girl তার সম্পাদিকা!" "Girl কি হে!" "আরে Grand-mother বল না!" ইত্যাদি ধ্বনি উত্থিত হইল! উশৃঙ্খল প্রকৃতির যুবকগণকে কার সাধ্য নিবারণ করে?

চৈত্রের অবলাতে 'প্রেমের আহ্বান' কবিতা বাহির হওয়ার পর সহরময় একটা হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়াগেল। কয়েকদিন পর্য্যন্ত ঘাটে, মাঠে, ট্রামে, গাড়ীতে, আফিসে, আদালতে কেবল 'প্রেমের আহ্বান' কেহ কেহ বলিতেছেন, অমন কবিতা আর এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কি শব্দচাতুর্য্য, কি রসমাধুর্য্য, কি কবিত্ব, কি লোক-চরিত্রাভিজ্ঞতা সর্ব্বাংশে উহা অতুলনীয়। প্রতিছত্রে মৌলিকত্ব! একজন বলিতে আর দশজন তাহাতে যোগ দিতেছেন কিন্তু হয়ত তাঁহাদের মধ্যে ৮জন উহা পড়েন নাই, আর দুইজন অন্যের নিকট শুনিয়াছেন।

অপর একদল বলিতেছেন এ অতি 'যাচ্ছেতাই' রকমের কবিতা। কি রুচি, কি রস, ইহার সবই বিকৃত। ভাবের অভাব সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত। উহার

অমুক অমুক লাইন রবিবাবুর কবিতা হইতে, অমুক অমুক লাইন মানকুমারীর কবিতা হইতে, অমুক লাইনটী নবীনবাবুর প্রভাস হইতে চুরি করা বলিলেই হয়। একজন বলিতে ৫০জন উহাতে সায় দিলেন, তাঁহাদের কেহই ঐ কবিতা পাঠ করেন নাই।

এইরূপে 'প্রেমের আহ্বানের' অনুকূল ও প্রতিকূল অত্যধিক প্রশংসা ও নিন্দায় অবলার বেজায় কাটতি হইয়া পড়িল। নগদ বিক্রয়ের মূল্য পূর্ব্বে ছিল ।০ চারি আনা মাত্র তাহা এক টাকা পর্য্যন্ত উঠাইয়াও কার্য্যাধ্যক্ষ আর কাগজ যোগাইতে পারিলেন না, দ্বিতীয়বার ছাপার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

এক চৈত্র কাপি নগদ বিক্রয় করিয়াই ৪।৫শত টাকা লাভ হইয়া পড়িল। তখনও বিক্রয় চলিতেছে।

উষানাথ বাবু—অর্থাৎ 'প্রেমের আহ্বানের' ভাগ্যবান্ লেখক মহাশয় অবলা-সম্পাদিকার c/o এ রাশি রাশি পত্র পাইতে লাগিলেন, তাহার কতকগুলি তাঁহার প্রশংসায় পূর্ণ, কতকগুলি বেহদ্দ গালাগালি!

যাহোক্ মেসের মধ্যে উষানাথ বাবু বেজায় জাঁকিয়া উঠিয়াছেন। মেসের বাবুগণ তাঁহাকে একেবারে মাথায় করিয়া নাচিতেছেন এবং 'প্রেমের-আহ্বানের' জয় জয় কার করিয়া মহা একটা feast এর আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছেন। পোলাও, মাংস, কারি, কাবাব, চপ, কঠলেট, দধি, মিষ্ট ইত্যাদিতে মহাধুম! সঙ্গে সঙ্গে গীত-বাদ্য, নৃত্য আদি কিছুই বাকি রহিল না।

বলা বাহুল্য উষানাথ এরূপক্ষেত্রে একটু বিশেষ প্রসন্ন এবং একটু গর্ব্বিত কিন্তু তবু তাঁর মনের কোণে একখানি অভিমানের মেঘ মধ্যে মধ্যে বিজলি চমক দিতেছিল! তাঁর প্রবন্ধের জন্য যাহার কাগজের এত কাটতি, যার নাম এত উজ্জ্বল, সেই কোমলা-সম্পাদিকা তো তার জন্য একটুও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন না—বেশী না—একটা ছত্র লিখিয়াও তো এ আনন্দটুকু—তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন না! এত রাত্রি জাগিয়া এত মূল্যবান মস্তিষ্ক খরচ করিয়া যে কবিতা অবলার জন্য পাঠাইলেন তার বিনিময়ে একটা কালির অক্ষরও কি উষানাথ পাইতে পারেন না? তোমাদের বৎসরের খরচ একসংখ্যার নগদ বিক্রয়ে উঠিয়া গেল, আর "যার তেলে কাছারী আলো তারে রাথ আঁধারে!" অতএব উষানাথ যদি অভিমান করিয়া থাকেন তবে সেটা তাঁর দোষ নহে। উষানাথ ভোজনাদির পর সারা রাত্রি এই কথা ভাবিলেন যতই ভাবিলেন ততই মন বেশী খারাপ হইতে লাগিল—ততই অভিমান গাঢ়তর হইতে লাগিল—শেষ এ অপমানের প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আলো জ্বালিলেন এবং কাগজ কলম লইয়া লিখিতে লাগিলেন।

একবার লিখিলেন আবার ছিঁড়িলেন, আবার একটু ভাবিয়া লিখিলেন, তাহাও মনোমত হইল না, আবার তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, পরে একটা পছন্দসই হইল বেঙ্গলী সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট তিনি অন্যের স্বাক্ষরে কলিকাতার সংবাদ দিতেছেন—

Honour to poet—We are glad to let our readers know that the rising poet Babu Usha Nath Banerjee M. A. Who has made a name by his Sublime poem Premer-abhan, (An adress of love) was honoured by his friends at—Bowbazer street with great feasts and festivities. But we are sorry to know that he has determined to severe his connection with the Abala, the Bengalee magazine which become the widest circulated journal through Babu Usha Nath's writings. We sympathise the Abala for the irreparable loss.

বঙ্গবাসী, হিতবাদী, ও বসুমতীতেও এই মর্ম্মে অন্যনাম স্বাক্ষরিত চিঠি লেখা হইল।

তার পর অবলা-সম্পাদিকার নিকটও বহু চিন্তার পর এক পত্র লিখা হইল—

Babu U. N. Banerjee regrets to inform the editor, the Abala, that he is unable to continue his humble connection with the paper any longer for reasons private and personal and it is hoped the editor will please excuse him for it.

যখন এই সব লেখা শেষ হইয়াছে তখন প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম কিরণ উষানাথের বাতির আলোকের সহিত সম্ভাষণ করিতে গৃহ-প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। উষানাথ তাড়াতাড়ি বাতি নিবাইয়া বাহিরে আসিলেন এবং মুখহাত ক্ষিপ্র হস্তে ধুইয়া চিঠিপত্র গুলি স্বয়ং বৌবাজার ডাক ঘরে দিয়া আসিলেন!

প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া উষানাথ যখন বাড়ীতে ফিরিলেন, তখন বেলা ৮॥০টা হইবে। আসিয়াই দেখিলেন দ্বারে অবলা আফিসের দরওয়ান্ রামলক্ষ্মণ সিং জি নবপোষাক-রাগ-রঞ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান! উষানাথ চমকিত হইলেন। দ্বারবান্ তাঁহাকে দেখিয়া আভূমি-চুম্বিত 'সেলাম হুজুর' করিল। অভিমানী উষানাথ গম্ভীরভাবে কহিলেন—"কি দারওয়ান্ জি ভাল আছ তো! কুছু কাম কাজ হ্যায় হামারা পাস্!"

দরওয়ান্ জি ঘাড় নাড়িয়া সাগ্রহে কহিল 'জী হাঁ! হুজুরকে কাপিরতো বড়া তারিফ্ হয়্যাছে, এই জনে মাইজি সাহেবা—

বাধা দিয়া উষানাথ বলিলেন "ফের কাপি চায়তা আউর কাপি হাম্ দেগা নাহি! বহুত কাম হায়!

দরওয়ান্ জি বলিলেন "নেহি-হুজুর কাপি নেহি মাঙ্গা হ্যায়, একঠো চিঠী আপনের লিয়ে দিয়েছেন, হামি লোক সাত বাজেছে এখানে বোসে আছি, হুজুর আসবেন বলে!" চমকিয়া উষানাথ বলিলেন "চিঠি? কাঁহা চিঠি? দরওয়ান্ চাপকানের পকেট হইতে সুন্দর রেশমী উজ্জ্বল রুমালে মোড়া বসরাই প্রস্ফুট-গোলাপ গন্ধামোদিত একটী পাতলা ছোট প্যাকেট বাবুর হাতে দিল। কম্পিত হস্তে উহা লইয়া তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়া উষানাথ ছুটিয়া উপরে গেলেন। উপরে গিয়া মনে হইল দরওয়ানকে কিছু বলা হয় নাই, মুখ বাহির করিয়া জানালা হইতে বলিলেন, দরওয়ান, ওখানে তুমি বৈঠ!' 'যো হুকুম সরকার' বলিয়া দ্বারবান্ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

উষানাথ স্বীয়কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল দুর দুর করিয়া কাঁপিতেছিল। কম্পিত-হস্তে পকেট হইতে সেই লোভনীয় বস্তু বাহির করিলেন, এবং তক্তপোষের উপর বসিয়া দশবার তাহার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন, দশবার তাহা খুলিতে গেলেন কিন্তু "সাধ্বস-খিন্ন-হস্ত" হইতে সে পত্র চৌকিতে পড়িয়া গেল। শেষে অনেক উদ্যমের পর 'সেফ্‌টিপিন' খসাইয়া ঊর্ণাবরণ উন্মোচন করিয়া একখানি গোলাপ-সিক্ত খাম বাহির করিলেন, উপরে লেখা আছে—'To the poet of প্রেমের-আহ্বান!'

উষানাথ কতবার নানাপ্রকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে হস্তাক্ষর দেখিতে লাগিলেন, দেখিয়া যেন নয়নের তৃপ্তি নাই, হৃদয়ের শান্তি নাই! এই অতৃপ্তি, এই অশান্তি লইয়া অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে খামের আবরণ উন্মোচন করিলেন।

গোলাপীরঙ্গের সুরঞ্জিত বর্ডার দেওয়া একখানি চিঠির কাগজ বক্ষে মুক্তার গাঁথনি অক্ষর-মালা লইয়া উঁকি মারিতে লাগিল।

ধীরে—অতি ধীরে অতি সাবধানে উষানাথ চিঠিখানি বাহির করিলেন। পাছে তাঁহার কঠিন করাঙ্গুলি-স্পর্শে কমলা কোমল-করলাঞ্ছিতা গোলাপী-লিপিকা ব্যথা পায়!

পুষ্পসার-গন্ধ-মণ্ডিত পত্রখানি লোভনীয় সামগ্রী বটে! উষানাথ পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন—

"হে প্রেম আহ্বান কবি, স্বরগ অমিয়া
ছানিয়া গড়েছ যেই কবিতার হার
'অবলা' হয়েছে ধন্যা গলায় পরিয়া
তারি বাসে আজ এত সমাদর তার।"
"ধর কবি লও তার পূর্ণ কৃতজ্ঞতা,
কি দিবে অবলা ক্ষুদ্রা আর প্রতিদান!
কবি নহে, নাহি জানে কাব্যের বারতা—
প্রাণে জাগে শুধু ওই 'প্রেমের-আহ্বান।'
উদ্বেলিত হৃদয়েতে তারি প্রতিধ্বনি,
আকুলে কবিরে করে সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ
উদার কবির হৃদি তাই মনে গণি—
ধন্য হবে এ কুটীর হ'লে পদার্পণ।"

কবি উষানাথ এ অপূর্ব্ব কাব্য-নিমন্ত্রণ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। এ কবিতার বৈদ্যুতিক-প্রবাহ তাঁহার "চোকের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল তাঁর প্রাণ।" তিনি

যেন তাঁহার 'প্রেমের-আহ্বান' মূর্ত্তিমান্ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন! বুক দুর দুর করিতে লাগিল— কেমন একটা কম্প তাঁহকে আশ্রয় করিল তিনি একেবারে তদ্গতাসক্ত-চিত্ত হইয়া বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইলেন। কতক্ষণ এভাবে ছিলেন, কি চিন্তা করিতে ছিলেন তাহা তিনিও হয়ত জানেন না। কতক্ষণ এভাবে থাকিতেন তাহাও বলা যায় না! দরওয়ান বেচারা অত কাব্য রস রসিক নহে। তাহার উদরের তাড়না বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে-ছিল সুতরাং সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "হুজুর মহারাজ, ক্যা জবাব দেঙ্গে? দিন তো বহুত চড়্ রাহা হ্যায়!"

উষানাথের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল। দরওয়ানকে এতক্ষণ বসাইয়া রাখা হইয়াছে একটু লজ্জা হইল! কমলা হয়ত কি মনে করিতেছেন সেটাও মনে আসিল! কিন্তু জবাব দেওয়াও তো মুস্কিল! অমন সুন্দর কাগজ খাম কোথায় পাইবেন? অগত্যা সাধারণ লিপির কাগজেই দুইছত্র লিখিলেন।

"কি পুলকে অবসন্ন মন
গ্রহণ করিল এই প্রীতি আমন্ত্রণ
সেকি কহিবার কথা!
উদ্বেলিত অবসন্ন মন
ভুলকরি অভিমান করেছে প্রেরণ
ক্ষম গো, ভুল গো সে ব্যথা।

খানিক সুগন্ধি এসেন্স তাতে ঢালিয়া দিলেন। দরওয়ান পত্র লইয়া সেলাম হুজুর করিয়া চলিয়া গেল।

সে দিন সান্ধ্য নিমন্ত্রণে গিয়া উষানাথ কি খাই-লেন, কি দেখিলেন, কি শুনিলেন তাহা আমরা জানি না।

মেসের বাবুগণের অশেষ পীড়াপীড়িতেও উষানাথ বিশেষ কিছুই বলেন নাই। সম্পাদিকার সহিত কিরূপ আলাপ হইল তাহাও প্রকাশ করেন নাই। কেবল আহারাদি ও সঙ্গীতাদির বিবরণ দ্বারাই তিনি তাহাদিগকে তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। তার পর উষানাথ প্রায়ই সম্পাদিকালয়ে গমন করিতেন এবং তথায় কোন কোন রবিবার দিনের বেলাও কাটাইয়া আসি-তেন। বন্ধুবগ বুঝিলেন 'প্রেমের-আহ্বান' সফল হই-য়াছে।

একদিন একবাবু দেখিলেন উষানাথ রীতিমত সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া বাহিরে যাইতেছেন। এ রোগটা উষানাথের কোন দিনই ছিল না, সুতরাং বন্ধু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন আরও যাহারা দেখিল তাহা-রাও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। শিবুখুড়ো জিজ্ঞাসা করিল "কিহে বাপু, আজ আবার একি বেশ?

উষানাথ একটু হাসিয়া বলিলেন 'একটু প্রয়োজন আছে খুড়ো, তাই!'

'প্রয়োজনটা কি ধুতি-চাদরে হয় না?' খুড়ার প্রশ্ন। 'হলে কি আর সাধকোরে এবেশ ধরি?' ভাইপোর উত্তর এবং প্রস্থান!

বন্ধুমহলে একটু কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল! তাঁহারা নানারূপ জল্পনা কল্পনার আশ্রয়-গ্রহণ করি-লেন কিন্তু কোনরূপ সামঞ্জস্য করিতে পারিলেন না!

আর একদিন দু প্রহর বেলায় উষানাথ নিরিবিলি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া আছে। দেখিয়া একজন বন্ধু ঔৎসুক্য বশতঃ তাঁহার দরজার ফাঁকে একটি চক্ষু সংলগ্ন-পূর্ব্বক কি দেখিলেন এবং একটু পরেই তাড়া-তাড়ি অন্যঘরে আসিয়া আর ৫জনকে বলিলেন যে "উষানাথ ঘরের মধ্যে সাহেবী পোষাক পরিয়া আয়-নার সামনে দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে দু পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতেছেন, পকেট ও প্যান্টপকেটে হাত প্রবেশ করিয়া বুক টান করিয়া এদিক ওদিকে ঘাড় ফিরা-ইতেছেন। আর আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন!"

দ্বারের নিকট ৫।৬জন জমা হইয়া সেদৃশ্য দেখিতে-গেল! তাহাদের মৃদু ও অস্পষ্ট হাস্যধ্বনি ক্রমেই বিদিত হইতে বেশী সময় আবশ্যক হইল না! উষানাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "এমন কোরে একজন gentleman এর paivacyতে intrude করা ভদ্র লোকের উচিত নয়। আমার roomএ I am at liberty to do whatever I please!"

বাবুবর্গের একজন একটু গরম মেজাজের ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন তুমি যে ঘরের মধ্যে সাহেবী-

কায়দার কস্রৎ ভাঁজচো এ আর কে জানে বাপু! আর ভাঁজচোই যদি তবে আর এত ঢাকাঢাকি কেন? অন্য সকলে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল! আর গোলযোগ না গড়ায়।

ইহার কিঞ্চিদধিক একমাস পর একদিন প্রকাশ পাইল উষানাথ আমেরিকা যাইতেছেন। লোক মুখে এ কথাও রটনা করিতে বিরত হইল না যে অবলা-সম্পাদিকা বিদুষী কমলার সহিত উষানাথের engage-ment হইয়াগিয়াছে। বিলাত ফেরত হইয়া আসিলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। মেসের বন্ধুবর্গ উষানাথকে ইহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন, উষানাথ হাসিলেন, সে যে কি আশা, কি উৎসাহের হাসি, যে দেখিল সেই বুঝিল 'প্রেমের আহ্বান।'

আসল কথাটাও তাহা ই! প্রেমের আহ্বানের নিমন্ত্র-ণের পর হইতেই কোন অদৃশ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উষা নাথের সম্পাদিকা সম্ভাষণ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। তার পর পূর্ব্ব রাগাদি সাধারণ ব্যাপারের উপলব্ধি করা হয়। কিন্তু কমলা বিদূষী, তিনি তিন বিষয়ে এম্, এ,! তার পর তাঁহার পিতাও মস্ত এক জন বিলাত ফেরত! অতএব বিলাত ফেরত গোত্র না হইলে তো একটা position জমে না! তাই উষানাথকে জানান হইয়াছে যে তিনি একবার বিলাতী জল হাওয়াতে দেহটা পবিত্র করিয়া আনিলেই তাঁহার কোমল কর কমলে কোমলা কান্তা কমলার কর পল্লব সমর্পণ করা হইবে! এহেন রত্ন অবশ্যই 'মৃগ্য'! উষানাথ এজন্য নিজের যা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল সেগুলি নানা অছিলায় বিক্রয় করিয়া কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন! বিলাত ফেরত হইয়া আসিলে আর তাহার অর্থের অনটন থাকিবে না কারণ কমলার পিতা মিঃ ভোজ (বসু কিন্তু তিনি লিখিতেন Bhose) বৈবাহিক যৌতুক স্বরূপে বহু সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ দিবেন। আর কমলাও হৃদয়ের সমস্ত প্রেম তাঁহাকে ঢালিয়া দিবেন এ আশা তো সুনিশ্চিত!

অতএব আশায় প্রলুব্ধ উষানাথ অনেক সুখস্বপ্ন দেখিতে থাকিবেন তাহা অসম্ভব কি?

যাহা হউক এক দিন শুভ মুহূর্ত্তে উষানাথ শ্রীমতী কমলার শ্রীমুখ স্মরণ করিতে করিতে অথবা তাঁহার বিদায় কালীন ম্লান মুখশ্রী দর্শনে সুখ দুঃখ মিশ্রিত হৃদয়ে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। বন্ধুবর্গ তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশনে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন! ট্রেণ ছাড়িল! ১ম শ্রেণীর গাড়ী হইতে একখানি মুখ প্লাটফর্ম্ম স্থিতা একটি রমণীর দিকে পুনঃ পুনঃ তাকাইতে লাগিল—হাতের রুমাল ঘন ঘন উড়িতে লাগিল—দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশাইয়া গেল।

দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে জগতে অশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। সুতরাং যদি কোনও স্থানে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

চৌরঙ্গীর একটি বাড়ীতে আজ সন্ধ্যাকালে মহা ধুম ধাম! আয়োজন, উদ্যোগ, গীত, বাদ্য, গাড়ী, ঘোঁড়া প্রভৃতিতে একেবারে হৈ, হৈ, রৈ, রৈ! লোক জনের জনতাও যথেষ্ট!

এই বাটীর সম্মুখে একখানি গাড়ী ঠিক সন্ধ্যার পরই আসিয়া লাগিল। একটি সাহেবী পোষাক পরিহিত যুবক গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন! যুবককে বিশেষ ব্যস্ত বলিয়া বোধ হইল। গাড়ী দাঁড়াইল দেখিয়া দ্বারের দ্বারবান্ গাড়ীর নিকটে আগন্তককে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিল—কিন্তু আসিয়াই একটু থমকিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল! যুবক বলিলেন "ক্যা, দরওয়ান্ জি পছান্তা হ্যায়!" দরওয়ান ধীরে ধীরে বলিল "জি হাঁ!" সে মুখ তুলিল না!

সন্দিগ্ধ যুবক ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল— "ক্যা সব কুশল? আজ ক্যা কুছু নেউতা হ্যায়?

দরওয়ান বলিল 'জি, হাঁ! আজ কমলি মাই কি সাদী হোতি হ্যায়!

"সাদী! ক্যা তুম্ পাগল হুয়া!"

মঙ্গল বাদ্য সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল!

চমকিয়া দরওয়ান বলিল "জি, সাদী হো গিয়া হ্যায়"

দরওয়ান চলিয়া গেল!

সদ্য বিলাত প্রত্যাগত উষানাথের আকাশ কুসুমো-দ্যান ধুলায় মিশাইয়া গেল! পৃথিবী যেন পদতল হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল! মাথা যেন টলিতে লাগিল! সমীপস্থ আলোক স্তম্ভাবলম্বনে তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

আবার ব্যাঙের মধুর স্বর নব দম্পতীর মঙ্গল আরতি বাজাইতে লাগিল! তাহার প্রত্যেক স্বর যেন সুতীক্ষ্ণ শেলবৎ উষানাথের হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল! সেখানে আর তিনি থাকিতে পারিলেন না।

তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া কোচ্ম্যান্কে বলিলেন "উইল্সন হোটেল।" গাড়ী চলিল!

একটি দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে উষানাথ বলিলেন—

Frailty, thy name is woman.

* * * *

পর দিবস প্রাতে উষানাথ ইংরাজি সংবাদ পত্রে পড়িলেন গত রজনীতে মহাসমারোহের সহিত চৌরঙ্গীর বাটীতে মিঃ ভোজের কন্যা কমলার সহিত মিঃ জি, আর, নাইডু এস্কোয়ারের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

উষানাথ তাড়াতাড়ি নিজের পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া একটি স্বর্ণাধারে সযত্ন রক্ষিত একখানি পত্র ও একটি কেশগুচ্ছ বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া তাহা ভস্ম করিয়া ফেলিলেন!

তাঁহার একটি দীর্ঘ শ্বাসে দগ্ধ কাগজ ও কেশের ছাই উড়িয়া গেল! কাগজখানিতে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে লেখা ছিল "প্রেমের আহ্বান।"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

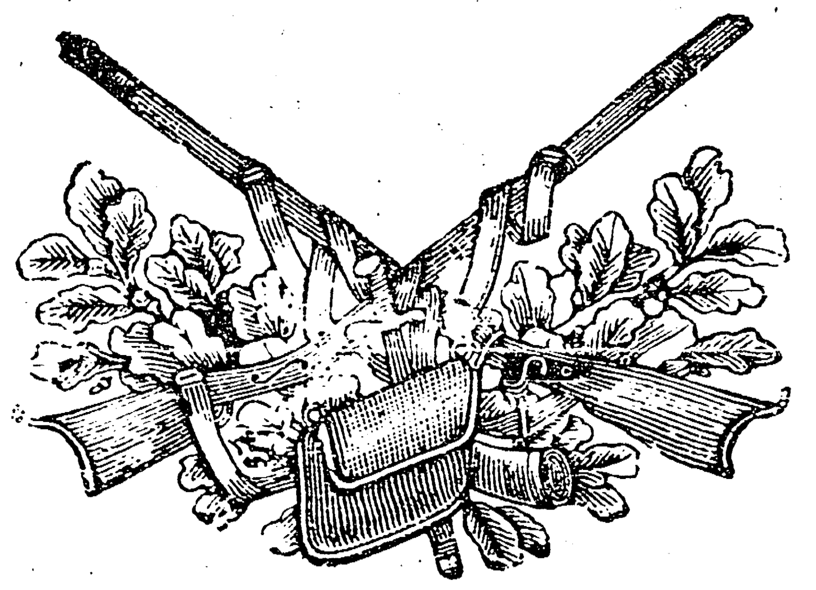

কাব্যের প্রকৃতি গত সাদৃশ্য।

১। কিরাতার্জ্জুনীয় ও শিশুপালবধ।—

মাঘ ভারবির পরবর্ত্তী কবি। কালিদাস ও ভারবির সময়ে ভারতে শৈবধর্ম্ম প্রবল ছিল। ভবভূতির সময় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম। মাঘের সময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রাবল্য লাভ করিতেছিল। কালিদাসের সমস্ত গ্রন্থেই শঙ্করের নামে মঙ্গলাচরণ আছে। কেবল পুষ্পবাণ বিলাসে কৃষ্ণের নাম আছে। কিন্তু পণ্ডিতদিগের অভিমত যে উহা আধুনিক পুস্তক, কালিদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। ভারবি মহাদেবের মহিমা প্রকাশের জন্য অষ্টাদশ সর্গে সমাপ্ত এক মহাকাব্য লিখিয়া ফেলিলেন। এবং মাঘ ও ভারবির দেখাদেখি কৃষ্ণ মহিমা প্রচারের জন্য বিংশ সর্গের এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। মাঘ যে ভারবির অনুকরণে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করিবার অনুকূলে এই বলা যায় যে, একজন জৈন কবিও উহাঁদের দৃষ্টান্তানুসরণে ভগবানের কীর্ত্তি গাহিয়া 'ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়' নামক কাব্য লিখিয়াছিলেন।

বৈদিক সময়ের পরবর্ত্তী সাহিত্য সকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সাহিত্যের প্রবীণত্বের সহিত তাহার ভাষা ক্রমশ কঠিন, অনুপ্রাস-বহুল, দীর্ঘশব্দচ্ছটা সংযুক্ত হইতেছিল। প্রবীণত্বের সহিত অলঙ্কার-প্রিয়তা বাড়িয়া উঠিতেছিল। সামান্য মনোযোগেই অনুভূত হয় যে শূদ্রক, কালিদাস ও ভবভূতির রচনা সরল ও ভাব প্রধান। ভারবির ভাষা অপেক্ষাকৃত জটিল এবং তাহাতে কষ্টকল্পনা ও শব্দাড়ম্বর অনেক স্থলে ভাবকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। মাঘের কাব্যে এই জটিলতা যেন তাহার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

মাঘ যে কেবল ভারবির অনুকরণে স্বীয় ইষ্টদেব কৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন ও কাব্য দীর্ঘতর করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন এমন নহে। ভারবিরই ছন্দে মাঘ গ্রন্থ আরম্ভ করেন এবং উভয় কাব্যের প্রথম শ্লোক একই 'শ্রিয়ঃ' শব্দে আরম্ভ হইয়াছে—

"শ্রিয়ঃ কুরূণামধিপস্য পালনীং প্রজাসু বৃত্তিং যমযুঙ্ক্ত বেদিতুম্"। (কিরাত, ১ম স, ১ম শ্লো।)

"শ্রিয় পতিঃ শ্রীমতি শাসিতুং জগজ্জগন্নিবাসো বসুদেব সদ্মনি।" (মাঘ, ১ম স, ১ম শ্লো।)।

এবং প্রত্যেক সর্গ শেষে কিরাতে 'লক্ষ্মী' শব্দ ও শিশুপালে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

যে অনুকারী সে অনুকৃতকে উল্লঙ্ঘন করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট হয়। ভারবি মালিনী, রথোদ্ধতা, শার্দ্দূল বিক্রীড়িত প্রভৃতি নানা কঠিন ছন্দের সমষ্টিতে এক সর্গ লিখিয়াছেন, মাঘ তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য ইহার এক এক দুরূহ ছন্দে একাধিক সর্গ রচনা করিয়াছেন। শব্দ ব্যবহার চাতুর্য্যে ও ছন্দ বৈচিত্র্যেও মাঘ তাঁহার আদর্শকে অতিক্রম করিয়াছেন। অনেক উপমা ও ভাব ভারবি হইতে গ্রহণ করিয়া মাঘ তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন মাত্র। 'কবীশ্বর' নামে খ্যাত হইবার একটা দুর্দ্দম স্পৃহা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল, এই জন্য তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধ কবি ভারবির প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন।

এমন কি উপাখ্যানাংশেও উভয় কাব্যের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। কিরাতের প্রথম সর্গে যুধিষ্ঠির ও কিরাতের কথোপকথন, এবং শিশুপালে নারদ ও কৃষ্ণের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ের দ্বিতীয় সর্গ রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডায় পূর্ণ; উভয়েরই বক্তব্য যে যুদ্ধ স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। পাণ্ডব কর্ত্তৃক ব্যাসমুনির সৎকার কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নারদের সৎকারের আদর্শ হইয়া ছিল। ব্যাসমুনির রূপ বর্ণন ও নারদের রূপবর্ণন প্রায়শ তুল্য। চতুর্থ সর্গে পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য বর্ণনাবসরে উভয়েই যমক ও দ্বন্দ্ব নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। অর্জ্জুনের ইন্দ্রকিল যাত্রা, ঋতুবর্ণন, ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতির অনুরূপে কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ গমন, রৈবতক বর্ণন, ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কিরাতভৃত্যের দৌত্য সাত্যকির দৌত্যের আদর্শ হইয়াছে। বলরাম চরিত্র ভীমের ও উদ্ধব চরিত্র যুধিষ্টিরের অনুরূপ করিয়া গঠিত হইয়াছে। বনেচরের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কৃষ্ণের সহিত শিশুপালের যুদ্ধের সাদৃশ্য রক্ষিত হইয়াছে। উভয়ত্র বর্ণনা চাতুর্য্য, নানা ছন্দ সমাবেশ, বহুবিধ অলঙ্কার ব্যবহার, অনুপ্রাস ও যমক বাহুল্য এবং চিন্তাশীলতার অপ্রগাঢ়তা সমভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে স্বতঃই বিশ্বাস করাইয়া দেয় যে এক অন্যের অনুকরণ।

অনেকে মনে করেন, মাঘ একটা কল্পিত নাম, কবির প্রকৃত নাম নহে। ভারবি অর্থে 'জ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ সূর্য্য,' মাঘ অর্থে শীতকাল রবিকিরণঘাতী। ইহা সমর্থন জন্য উদ্ভট কবির "তাবদ্ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ" এবং রাজশেখরের—

"কৃৎস্ন প্রবোধকৃদ্বাণী, ভারবেরিব ভারবেঃ।
মাঘেনেব চ মাঘেন কম্পঃ কস্য ন জায়তে"॥

শ্লোক উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এই অনুমান কতদূর সত্য জানি না, তবে মাঘ যেরূপ কোমর বাঁধিয়া ভারবির বিপক্ষে লাগিয়া ভারবির অনুকরণে ভারবিকে পরাজিত করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, তাহাতে উপরোক্ত অনুমান ও বিশ্বাস করিতে অপ্রবৃত্তি হয় না।

২। মেঘদূত ও উত্তররাম চরিত।—

ভবভূতি কালিদাসের অন্ততপক্ষে এক শতাব্দী পরের কবি। যখন ভবভূতি লেখনী ধারণ করেন, তখন কালিদাসের যশোভাতি সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভবভূতি স্বরচিত মহাবীর চরিত নাটকে বলিয়াছেন—

"আদিকবি বাল্মীকি—
—তাঁহারি রচনা যেই
রঘুপতি চরিত পাবন;
সেই চরিতের মাঝে,—আমি যে গো ভক্ত তাঁর—
সুখে চরে আমারো বচন।"—

এই মহাবীরচরিত নাটকে রামের পূর্ব্ব চরিত বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরচরিত এই পূর্ব্ব চরিতেরই পরবর্ত্তী ঘটনা। মহাবীর চরিত নাটক অপেক্ষা উত্তররামচরিত নাটক বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ভবভূতি বোধহয় কিয়ৎ পরিমাণে কালিদাসের নিকটে ঋণী আছেন।

মল্লিনাথ বলেন যে, রামায়ণে রামচন্দ্র হনুমানদ্বারা সীতার নিকট যে বার্ত্তা পাঠাইয়াছিলেন সেই বর্ণনা স্মরণ করিয়াই কালিদাস মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন। এবং আমাদের বোধহয় যে এই মেঘদূত পড়িয়াই রামের

উত্তর চরিত বর্ণনা করিবার বাসনা ভবভূতির প্রবল হইয়াছিল।

প্রভুর দ্বারা অভিশপ্ত যক্ষকে কালিদাস বহুদেশ থাকিতে ও রামগিরিতে নির্ব্বাসিত দেখাইয়াছেন। যক্ষ কামী, সে প্রিয়াসঙ্গানুরক্তির আতিশয্য বশত কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া প্রিয়ার বিরহ ভোগ করিতে দণ্ডিত হইয়াছিল। যক্ষের দেশ অলকাতে বিরহতাপ ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডবিধি প্রচলিত ছিল না। কারণ অলকায় সুখের মেলা, প্রণয়ের হাট। কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া যক্ষ এই জন্যই কেবল বিরহ ভোগে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই বিরহ তীব্র ও উগ্র করিবার জন্য রামের প্রিয়ামিলন বিশ্রব্ধ-সুখ-সাক্ষী রামগিরিতে যক্ষের নির্ব্বাসন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যে রামগিরির প্রত্যেক নদী জানকীর স্নানে পবিত্র, যেথানকার প্রত্যেক স্নিগ্ধচ্ছায়াতরু, প্রত্যেক উপল ও আশ্রম রামসীতার মিলন সুখ সাক্ষী রূপে বর্ত্তমান, সেইখানেই যক্ষ প্রেরিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় যক্ষ রামের প্রিয়া সহবাসে ব্যয়িত চৌদ্দ বৎসরের বনবাস তাহার নিজের এক বৎসরের নির্ব্বাসন অপেক্ষা শ্লাঘ্য মনে করিয়াছিল। প্রতি ক্ষণে রামের প্রিয়ামিলন সুখচ্ছবি বিরহকাতর কামী যক্ষের মানস-পটে অনল রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। চিত্রকূট পর্ব্বত বর্ণনা কালে যক্ষের প্রথমেই মনে পড়িয়াছিল "বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতি-পদৈর অঙ্কিতং মেখলাসু;" মেঘ যৎকালে যক্ষপত্নীকে যক্ষের সংবাদ দিতেছে, তৎকালে "পবনতনয়ং (বীক্ষ্য) মৈথিলীবোন্মুখী সা"।

ভবভূতি দেখিলেন যে পরের বিশ্রব্ধ সুখসাক্ষী প্রদেশে যদি বিরহ এতাদৃশ তীব্রভাব ধারণ করে, তবে নিজের অতীত সুখসাক্ষী প্রদেশে যাইলে বিরহ কি পর্য্যন্ত না উগ্র হইবে। এই চিন্তা হইতেই রামচরিত ভক্ত ভবভূতি রামের উত্তর চরিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ছায়া (তৃতীয়) অঙ্ক বিশেষ ভাবে এই জন্যই কল্পিত।

যক্ষ কামী তাহার পক্ষে এক বৎসরের বিরহই যথেষ্ট কষ্টের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু 'হৃদয়ের প্রবলতা অথচ সংযমের দৃঢ়তা, ভাবে অপরিমেয় অথচ কর্ম্মে নিয়মিত ইহাই রাম'। এই জন্য কর্ম্মী রামকে ব্যাকুল করিতে দীর্ঘ একযুগের সীতা বিরহ কল্পিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র কর্ত্তব্য চালিত হইয়া পঞ্চবটীতে উপস্থিত। এখানে যতক্ষণ তাঁহার কর্ত্তব্য অসমাপ্ত ছিল, ততক্ষণ তাঁহার কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। কর্ত্তব্য শেষ করিয়া যখন রামের চিত্ত লঘু, তখন তিনি পঞ্চবটীর জনস্থান দেখিয়া পূর্ব্ব সুখস্মৃতিতে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সীতাস্নেহরূপিনী বাসন্তী সীতার বনবাস কালীন প্রিয় বস্তু ও স্থান গুলি রামকে স্মরণ করাইয়া বড় ব্যথা দিতে লাগিল। রামের ভ্রম হইতে লাগিল যেন সীতা তাঁহার কাছে রহিয়াছেন। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য ভুদেব বাবুর বিবিধ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ ভ্রম যক্ষেরও যথেষ্ট হইত। সে শিলাগাত্রে প্রিয়া প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া সত্যভ্রম করিত। স্বপ্নে "বাঁধিতে প্রিয়ারে গাঢ় আলিঙ্গনে, বাঁধে সে বুকেতে বায়ুর থর"! মিহগিরি হইতে যে স্নিগ্ধ বায়ু তাহার গাত্র স্পর্শ করে সে তাহাকে প্রিয়ার দেহস্পর্শকারী বিবেচনা করিয়া আলিঙ্গন করিতে যায়।

মেঘ প্রথমে যক্ষের নিকট 'বপ্রক্রীড়া পরিণতগজ' রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। তৎপরে যখন সে যক্ষপত্নীর নিকট প্রথম উপস্থিত হইবে তখন 'কলভতনুতা' গ্রহণ করিবার উপদেশ পাইয়াছিল। রামের নিকট ছায়াময়ী সীতার সংপ্রবেশও একটি করিশাবক কে উপলক্ষ করিয়া ঘটিয়াছিল।

ময়ূরের নর্ত্তন লীলা, বিরহ কাতরা সুন্দরী বর্ণনা প্রভৃতি আরো দুই একটি সামান্য বিষয়ে মেঘদূত ও উত্তর চরিতের মধ্যে সাম্য লক্ষিত হয়। পূজ্যপাদ ভুদেব বাবুর পুস্তকে তাহারও আভাস দৃষ্ট হইবে।

৩। **শকুন্তলা ও উত্তরচরিত।**—উত্তর চরিতের বীজ যদি মেঘদূতে থাকিয়া থাকে, ভবভূতি নাটকের আদর্শ রূপে শকুন্তলাকেই সম্মুখে রাখিয়াছিলেন বোধ হয়।

শকুন্তলা রাজার পত্নী হইয়াও বৃথা ভয়ে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, গুপ্তপ্রণয় সর্ব্বদাই অভিশপ্ত, রাজা ও সাহস করিয়া গোপনপরিণয় স্বীকার করিতে পারেন না। এবং তাহা না পারাতেই নিরপরাধিনী মহিষী পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। সীতা স্বামীর নিকট সাধ্বী বলিয়া বিশ্বস্ত থাকিলেও লোকাপবাদ তাঁহাকে বনবাসিনী করিয়াছিল। শকুন্তলা কণ্ব মুনির আশ্রমে পালিতা মাত্র, কণ্ব দুহিতা নহেন; সীতা জনকপালিতা বলিয়া জানকী।

শকুন্তলা ও সীতা উভয়েই গর্ভাবস্থায় পরিত্যক্তা। অপবাদ মণ্ডিত শিশুর জনক হইবার লজ্জা হইতে মুক্ত হইবার জন্যই উভয় রাজা স্ব স্ব মহিষীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শকুন্তলা যখন নিরুদ্দেশ তখন রাজা দুষ্মন্ত সমস্ত ঘটনাটাকে ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই ব্যাপারটা 'স্বপ্নো নু মায়ানু মতিভ্রমো নু'। ইহাই রামের সীতা বিভ্রমের অঙ্কুর।

শকুন্তলার "ক্ষাম ক্ষাম কপোলং ইত্যাদি"ও

"বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈক বেণিঃ।
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি"॥

শ্লোকদ্বয়, উত্তরচরিতের

"পরিপাণ্ডু দুর্ব্বল কপোল সুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীক মাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী"॥

এবং

"কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনং
হৃদয় কুসুম শোষী দারুণো দীর্ঘ শোকঃ।
গ্লপয়তিপরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরদিজ ইব ঘর্ম্মঃ কেতকীগর্ভ পত্রম্"॥

শ্লোকদ্বয়ের আদর্শ হইয়াছিল কি না ইহার বিচার বাহুল্য।

উভয় নাটকেই অজ্ঞাত পুত্রের সহিত মিলন ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্র ভবভূতি নিজ আদর্শ অপেক্ষা উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হইলেও, দুষ্মন্তের পুত্রমিলন সৌন্দর্য্য অতিক্রান্ত হয় নাই।

উভয় নাটকেরই শিশুগণের পিতার সহিত প্রথম পরিচয় বীর ভাবে। অজ্ঞাত পুত্রের ক্ষত্রভাব উভয়ত্রই পিতার বক্ষে পুলক সঞ্চার করিয়াছে। সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়ার পর উভয় নাটকীয় ক্ষত্রভাবাপন্ন শিশু বিনয়ে কেমন নম্র, কেমন মধুর। পিতা উভয়ত্রই স্নেহশীতল।

শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরা তিরস্করিণী বিদ্যা বলে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্তের চিত্তাপ অবগত হইতেছেন। মিশ্রকেশী স্বীকার করিয়াছেন,'শরীরভূতা মে শকুন্তলা'। সীতা দেবীও মিশ্রকেশীর ন্যায় ছায়াময়ী হইয়া স্বয়ং স্বামীর অনুতাপ শ্রবণ করিতেছেন। "স্বামীর অবিচলিত প্রগাঢ় প্রেমের, তদীয় দুষ্কৃতি নিবন্ধন প্রকৃত অনুতাপের এবং লোকলজ্জা নিবারক তাদৃশ কোন প্রকাশ্য ব্যবহারের নিদর্শন ব্যতিরেকে পরিত্যক্তা স্ত্রী, ঈষন্মাত্র আত্মগৌরব সত্ত্বে, পরিত্যাগকারী স্বামীকে পুনর্গ্রহণে সম্মতা হইতে পারেন না। সাধ্বীদিগের হৃদয়ে আত্মগৌরব অতি প্রবলভাবেই বিরাজ করে। তাঁহারা যতই কোমলা, শীতলা, আত্মবিসর্জ্জনে প্রবণা ও আত্মবিলোপে সক্ষম হউন, তাঁহাদিগের সাধ্বীতাটিই জলন্ত হুতাশন স্বরূপ *"। এই কথাটি উভয় কবিই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন †।

ইহা ভিন্ন আরো বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়া কালিদাসের নিকট ভবভূতির ঋণ ঘোষণা করিয়া দেয়। তবে, ইংরাজ কবি সম্বন্ধে যেরূপ খ্যাতি আছে যে whatever he borrowed, he borrowed to better it, ভবভূতি সম্বন্ধেও তাহা সম্পূর্ণ রূপে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৪। **রত্নাবলী।**—রত্নাবলী সংস্কৃত সাহিত্যের রত্ন সদৃশ। কিন্তু ইহা বহু কবিরাজেন্দ্রের ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত রত্নাবলী।

রত্নাবলী যে কালিদাসের সকল নাটকগুলি হইতেই সাহায্য প্রাপ্ত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অধিকন্তু অন্যান্য কবিরও ঋণ ইহার পত্রে স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

এই নাটিকার উপাখ্যানাংশ সংক্ষেপতঃ এইঃ—বৎসরাজের সহিত বিবাহ দিবার জন্য সিংহলরাজকুমারী সিংহলরাজের অমাত্য বসুভূতীর সহিত বৎসদেশে আনীত হইতেছিলেন। যান ভগ্ন হওয়ায় রাজকন্যা বিচ্ছিন্ন হইয়া কূলপ্রাপ্ত হন। বৎসরাজের অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে এক লাবণিকের নিকট প্রাপ্ত হইয়া পরিচারিকা রূপে রাণীকে প্রদান করেন। সাগরপ্রাপ্তা রাজকন্যা তদবধি সাগরিকা আখ্যা প্রাপ্ত হন। যথারীতি রাজা ও সাগরিকার চিত্তবিনিময়; রাণীর নিকট ধরা পড়া;

* ভুদেব বাবুর উত্তরচরিত সমালোচনা।

† সেক্সপীয়রের Winter's Tale নামক নাটকেই ঠিক এইরূপ একটি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

রাণীর ক্রোধ ও রাজার অনুনয়; সাগরিকার শৃঙ্খলাবরোধ ও রাজা কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার। তৎপরে বসুভূতি ও কঞ্চুকী বাভ্রব্য কর্ত্তৃক রত্নমালাভিজ্ঞানে রাজকন্যার পরিচয় ও অবশেষে রাজার সহিত বিবাহ।

কালিদাসকৃত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের উপাখ্যানভাগও প্রায় এইরূপঃ—মাধবসেনের অমাত্য সুমতি রাজভগিনী মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের সহিত বিবাহিত করিবার জন্য মালবিকাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন এবং বণিকদলে প্রবিষ্ট হন। পথে দস্যুকর্ত্তৃক সুমতি হত এবং মালবিকা অগ্নিমিত্রের সামন্ত সেনাপতি বীরসেনের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। বীরসেন ইঁহাকে রাজ্ঞী ধারিণীর পরিচারিকা রূপে প্রেরণ করেন, রাজা একদিন চিত্রগতা মালবিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন। রাজ্ঞী ধারিণী মালবিকাকে সযত্নে রাজচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে যত্নবতী হইলেন। রাজ্ঞীর যত্ন ব্যর্থ হইল; রাজার সহিত তাঁহার মিলন ঘটে। কিন্তু সে সাক্ষাৎ অবিঘ্ন হয় নাই, রাজা রাণীর নিকট ধরা পড়েন। সুতরাং রাণীর ক্রোধ ও রাজার অনুনয়। রাণীকর্ত্তৃক মালবিকার শৃঙ্খলাবরোধ এবং রাজার দ্বারা মুক্তিলাভ। অবশেষে মালবিকার ভ্রাতৃরাজ্যের দুইজন শিল্পকারিণী ও সুমতি অমাত্যের পরিব্রাজিকা বেশধারিণী ভগিনীকর্ত্তৃক মালবিকার যথার্থ পরিচয় বিবৃতি ও রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকেও রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীকে দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। একদিন উদ্যানে একখানি ভূর্জ্জপত্রলিখিত চিঠির দ্বারা উভয়ের মিলন সংঘটিত হয়। পত্র রাণীর নিকট ধরা পড়ে। তৎপরে যথারীতি ক্রোধ ও বিনয়।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে রত্নাবলীর উপাখ্যানের মূল কথাসরিৎসাগর ও দিব্যাবদান গ্রন্থে। উক্ত ঘটনা সত্যমূলক। কিন্তু আমাদের উহা কবিকল্পনা বলিয়াই বোধ হয়। মোটামুটি সাদৃশ্য দেখা হইল। এক্ষণে সূক্ষ্মসাদৃশ্য দেখা যাক।

(১) মালবিকাগ্নিমিত্র ও রত্নাবলী।—উভয় নাটকেরই সঙ্কেতস্থান প্রমোদবন। উভয়নাটকের তৃতীয়াঙ্কে রাজা নায়িকামিলিত অবস্থায় ধরাপড়িয়া রাণীর চরণপতিত হইয়া ক্ষমা চাহিয়াছেন। রাণী ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বিদূষক রাজা বেচারাকে তখনো ধূলায় মাথা লুটাইতে দেখিয়া বলিতেছেন—

বিদূ। উট্‌ঠেহি অকিদপ্পোসাদোসি (উত্তিষ্ঠ, অকৃতপ্রসাদোহসি)।

রাজা। (উত্থায়েরাবতীমপশ্যন্) তৎকথং গতৈব প্রিয়া?

(মালবিকাগ্নিমিত্র ৩য় অঙ্ক।)

বিদূ। ভোঃ উট্‌ঠেহি। গতা সা বাসবদত্তা দেবী তা কীস এথ্ অরণ্ণরুদিদং করেসি? (ভোঃ উত্তিষ্ঠ। গতা সা বাসবদত্তা দেবী। তৎকস্মাৎ অত্র অরণ্যরুদিতং করোসি?)

রাজা। (মুখমুন্নময্য) কথমকৃত্বৈব প্রসাদং গতা দেবী?

রত্নাবলী, ৩য় অঙ্ক।

এই তৃতীয়াঙ্কের ঘটনা, কথোপকথন ও ভাষার সমস্ত চমৎকার। চতুর্থ অঙ্কে ইরাবতীর রাজার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য পুনরাগমন ও সঙ্কেতস্থানে নায়িকামিলিত রাজদর্শন। পঞ্চমাঙ্কে যুদ্ধ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মালবিকার যথার্থ পরিচয় প্রাপ্তি, রত্নাবলীতে বাসবদত্তার মার্জ্জনাভিক্ষা ও রাজাকে পুনর্মিলিত দর্শন এবং যুদ্ধজয়ের সঙ্গেসঙ্গে রত্নাবলীর যথার্থ পরিচয় প্রাপ্তি যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে সদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। উভয় নাটকের নায়িকা ঈর্ষ্যাপরায়ণা রাণী কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা ও রাজা কর্ত্তৃক মুক্তা হইয়াছেন।

(২) বিক্রমোর্ব্বশী ও রত্নাবলী :—বিক্রমোর্ব্বশীর দ্বিতীয় অঙ্কের সহিত রত্নাবলীর তৃতীয়াঙ্কের যথেষ্ট সমতা লক্ষিত হয়। পুরূরবা ঔশীনরীর নিকট ধরা পড়িয়াও নিজের দোষ স্বীকার করিতেছেন না, ইহাতে রাণী বলিতেছেন "নাস্তি প্রভবতোঽপরাধঃ; অহমেবাপরাদ্ধা যা প্রতিকূলদর্শনা ভূত্বা অগ্রতো ভবামি।'

বিক্রমোর্ব্বশী ২য় অঙ্ক।

সেইরূপ অবস্থায় দেবী বাসবদত্তা বলিতেছেন, "নন্থ প্রথম সঙ্গমে বিঘ্নং কুর্ব্বত্যা ময়ৈবতস্যাপরাদ্ধং নার্য্যপুত্রেণ।'

রত্নাবলী ৩য় অঙ্ক।

তৎপরে "স্থানে ইয়ং হি দেবীশব্দেনোচ্চার্য্যতে।" (বিক্রমোর্ব্বশী ৩ অঙ্ক) এবং 'স্থানে দেবীশব্দমুদ্বহসি' (রত্নাবলী ৪ অঙ্ক) প্রভৃতি বাক্যপংক্তি এত সমাকার যে উহা দৈবের প্রতি আরোপ করা যায় না।

(৩) শকুন্তলা ও রত্নাবলী।—শকুন্তলার মাতৃদত্ত নাম কি জানা নাই। পক্ষীদিগের দ্বারা পালিতা বলিয়া তিনি কণ্বমুনি হইতে শকুন্তলা নাম পাইয়াছিলেন। রত্নাবলীর ও আসল নাম কি আমরা জানি না; সাগরে প্রাপ্ত বলিয়া তিনি সাগরিকা এবং রত্নমালাভিজ্ঞানে পরিচিতা বলিয়া রত্নাবলী।

অভিজ্ঞানে পরিচয় প্রাপ্তি উভয় নাটকেরই বর্ণনীয় বিষয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রত্নাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন "এই নাটিকার বর্ণিত নায়ক-নায়িকার প্রণয়-বিলাস-চিত্রে কতকটা কালিদাসের শকুন্তলার ছায়া উপলব্ধি হয়।" শকুন্তলায় রাজা এবং রত্নাবলীতে সাগরিকা অভিপ্সীত-জনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। মদন-মহোৎসবের সময়েই উভয় নাটকের নায়ক-নায়িকার সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুল, এই দৃশ্যে উভয় নাটকের কথোপকথনের ভাব ও ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

(৪) কর্পূরমঞ্জরী ও রত্নাবলী।— রত্নাবলীর কতকগুলি দৃশ্য ও তাহাদের ভাষা এবং রাজশেখরকৃত প্রাকৃতভাষায় লিখিত কর্পূর-মঞ্জরী নামক নাটকের কয়েকটী দৃশ্য ও তাহাদের ভাষা প্রায় এক প্রকার।

(ক) প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। ঐন্দ্রজালিক আপনার ক্ষমতা দেখাইবার জন্য রাজাজ্ঞার প্রার্থী হইলে, রাজা একটী সুন্দরী কন্যা উপস্থিত করিতে বলিলেন।

(খ) কর্পূর-মঞ্জরী যথার্থভাবে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে ঘনসার-মঞ্জরী নামে কথিত ছিলেন। রাণী রাজার সহিত স্বয়ং কর্পূরমঞ্জরীর বিবাহ দিলেন কারণ মঞ্জরীর স্বামী সার্ব্বভৌম রাজা হইবেন এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছিল।

(গ) কদলীবনে রাজা বিদূষকের সহিত নায়িকার বিরহে বিলাপ করিতেছেন ও বিদূষক তাহার শ্লেষপূর্ণ উত্তর দিতেছেন।

(ঘ) বসন্তোৎসব, আশোকদোহদ প্রভৃতির বর্ণনা।

(ঙ) কর্পূরমঞ্জরী নাটকের যাদুকর ভৈরবানন্দ বলিতেছে—"আমি চন্দ্রকে ভূতলে অবতারিত করিতে পারি। মধ্যাকাশে সূর্য্যগতি স্থগিত করিতে সক্ষম। যক্ষ-সুর-সিদ্ধগণের স্ত্রী-পরিজন নিকটে আনিয়া দেখাইতে সমর্থ। ভগবান জানেন আমি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি।"

রত্নাবলীর যাদুকর সম্বরসিদ্ধি বলিতেছে—

"ধরায় শশাঙ্ক কিংবা ব্যোমে গিরিরাজ,
সলিলে অনল কিংবা মধ্যাহ্নেতে সাঁঝ,
বলুন কি ঘটাব, বলুন মহারাজ।
যা কিছু হৃদয়ে বাঞ্ছা দেখিবারে আজ
এখনি আনিয়া দিব মন্ত্রের প্রভাবে
হরিহর ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ,
সিদ্ধবিদ্যাধর আদি সুরবধূ সাথে।"

(চ) রত্নাবলীর রাজা উদয়ন শ্রীপর্ব্বতের শ্রীখণ্ডদাসের নিকট হইতে অকাল-পুষ্পোদ্গমের সাধন শিক্ষা করিয়াছিলেন। কর্পূরমঞ্জরীর ভৈরবানন্দও এই বিদ্যায় শিক্ষিত।

(ছ) কবিসময়-প্রসিদ্ধি (সুন্দরীর পদতাড়ন ব্যতীত অশোক ও মুখ-মদিরা ব্যতিরেকে বকুল পুষ্পিত হয় না ইহাই কবিপ্রসিদ্ধি) উভয় নাটকেই তুল্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সন্ধ্যা বর্ণনারও ভাব ও ভাষা উভয় নাটকে প্রায় সমান।

এই সমস্ত প্রধান একতা ব্যতীত বহু-নাটক কাব্য প্রভৃতির সহিত রত্নাবলীর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সমতা লক্ষিত হয়, তাহার কতক সংক্ষেপে এস্থলে লিখিত হইতেছে।

(১) দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ।"
(রত্নাবলী ১ম অঙ্ক)।

দ্বীপোপগীতগুণমপি সমুপার্জ্জিত রত্নরাশিসারমপি।
পোতং পবন ইব বিধিঃ পুরুষমকাণ্ডে নিপাতয়তি॥"
(হর্ষচরিত ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস)।

(২) কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ (রত্নাবলী ১ম অঙ্ক)।
সেবাং লাঘবকারিণীং কৃতধিয়ঃ স্থানে শ্ববৃত্তিং বিদুঃ
(মৃচ্ছকটিক)

অস্মাকান্ত প্রতিদিনমিয়ং সাদয়ন্তী প্রতিষ্ঠাং।
সেবাকাকুঃ পরিণতিরভুৎ স্ত্রীষু কষ্টোঽবিকারঃ॥
(বিক্রমোর্ব্বশী ৩য় অঙ্ক)

(৩) কুসুমসুকুমারমূর্ত্তির্দধতী নিয়মেন তনুতরং মধ্যম্।
আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা চাপযষ্টিরিব॥
(রত্নাবলী ১ম অঙ্ক)
উদয়গিরি তটান্তরিতমিয়ং প্রাচ সূচয়তি দিঙ্
নিশানাথম্।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী॥
বসনে পরিধূসরে বসানানিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ

প্রভৃতি শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতের শ্লোক প্রবন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৪) বালপ্রবালবিটপিপ্রভবা লতেব (রত্নাবলী ১ম অঙ্ক)
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব (কুমার সম্ভব ৩য় সর্গ)

(৫) সাগরিকার বাসবদত্তার ছদ্মবেশধারণানুরূপ ব্যাপার মালতীমাধব, মহাবীরচরিত, মুদ্রারাক্ষস ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা নামক পুস্তক সকলে আছে, কৌতূহলী পাঠক জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর নাটকানুবাদ দেখিলে সহজেই পাইবেন।

(৬) কণ্ঠাশ্লেষসমাসাক্ত তস্যাঃ প্রভ্রষ্টযানয়া।
তূল্যাবস্থা সখীবেয়ং তনুরাশ্বাস্যতে মম॥
(রত্নাবলী ৪র্থ অঙ্ক)
তব সুচরিতমঙ্গুলীয় নূনং প্রতনু মমেব বিভাব্যতে ফলেন।
অরুণনখমনোরমাসু তস্যাশ্চ্যুতমসি লব্ধপদং
যদঙ্গুলীষু॥
(শকুন্তলা ৬ষ্ঠ অঙ্ক)।

(৭) অভিজ্ঞান শকুন্তলার কঞ্চুকী বেত্রহস্তা (৫ম-অঙ্ক); রত্নাবলীর কঞ্চুকীও বেত্রহস্তা। কঞ্চুকীর বেত্রগ্রহণ পদপরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়।

(৮) রাজা। (দক্ষিণবাহুস্পন্দং নিরূপ্য) এতদবস্থস্য মম কুত এতৎ ফলম্। (রত্নাবলী ৪র্থ অঙ্ক)।
রাজা। (প্রবিশ্য নিমিত্তং সূচয়ন্)
শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য ?”
শকুন্তলা ১ম অঙ্ক।

(৯) স্বপ্নে মতিভ্রমতি কি ত্বিদমিন্দ্রজালম্ ?
(রত্নাবলী ৪র্থ অঙ্ক)
স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমোনু ? ইত্যাদি (শকুন্তলা ৬ষ্ঠ অঙ্ক)

কেবল রত্নাবলীই যে অন্যকবির অনুকরণ করিয়াছে তাহা নহে। রত্নাবলীরও অনুকারকের অভাব নাই। এতৎ সম্বন্ধে বিজিজ্ঞাসু পাঠক ভুদেব বাবুর বিবিধ প্রবন্ধের ৭৯ পৃষ্ঠায় ইহার পরিচয় পাইবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাহাড়ী বাবা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তার পর ঠাকুর দাদা বাড়ী আসিলেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার রান্না হয়েছে ?”

গৃহিণী কর্ত্তার ভাবগতিক দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া কহিল—“তোমার এরই মধ্যে ক্ষুধা পেয়েছে ? সন্ধ্যাহ্নিকই হয়েছে, এখনও স্নানত বাকি আছে। আজ কি স্নান কর্‌বে না ?”

কর্ত্তা কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—“এই কি তোমার আমার কথার উত্তর হলো ? আমি কোথা জিজ্ঞাসা কর্‌নু রান্না হয়েছে, তুমি তার উত্তর দিলে কি না ক্ষুধা—সন্ধ্যাহ্নিক—স্নান। আমার সে সকল আজ আর কিছুই হচ্ছে না যতক্ষণ না তুমি একটি কাজ কর!”

গৃহিণী যেন এবার একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—“কি কাজটা বল না ?”

কর্ত্তা। একবার মহামায়ার মায়ের কাছে যাও দেখি। আমাদের অতুলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে কি না একবার জেনে এস দেখি। আর দেখ, পার যদি মহামায়ার মনের ভাবটা একবার জেন। অতুলের সঙ্গে বিয়ে হলে, তার মনের মতন বর হয় কি না সেটাও জেনে এসো।

গৃহিণী। তা আস্‌বো এখনই ত নয়।

কর্ত্তা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—“এখনই নয় কি রকম! এখনই যেতে হবে।

গৃহিণী। রাঁধ্‌তে—রাঁধ্‌তেই ? আমি উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছি।

কর্ত্তা। তা উনুনে হাঁড়ি চাপালে কি আর নামান্ যায় না ?

গৃহিণী। তোমার এত তাড়াতাড়ি কিসের ? বলি—আজই ত আর বিয়ে হচ্ছে না ?

কর্ত্তা। তা না হ’ক—একটা স্থির যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না।

গৃহিণী। তবে তুমিই নিজে যাওনা কেন ?

কর্ত্তা। আমি গেলে যদি সে কাজ হতো, তবে এতক্ষণ বাড়ী এসে তোমার সঙ্গে বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে, এতক্ষণ কাজের কথা জেনে ফিরে আস্‌তে পার্‌তুম। আমার সঙ্গে কি মহামায়ার মা কথা কয়, যে আমি গিয়ে তার মনের ভাব জেনে আস্‌বো ? আর সে বাড়ীতে অন্য কেউ পুরুষও নেই। থাক্‌বার মধ্যে আছে সেই পাহাড়ে মাগী। সে মাগীর সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, সে মাগীর জন্য আমারত ওবাড়ীতে যেতেই ভয় করে। ঠিক যেন একটা ডাল কুত্তা বাড়ীর দরজা গোড়ায় বেঁধে রেখে দিয়েছে।

গৃহিণী। তা এমন উৎকণ্ঠার সময় কেন ? খাওয়া দাওয়ার পর আমিই যাবো।

কর্ত্তা। তুমি সে কথা জেনে না এলে আজত আমার খাওয়া দাওয়া কিছুই হবে না। আরে মাগী তোর খাওয়া দাওয়াটাই কি বড় হলো ?

এইবার গৃহিণী একটু ক্রোধভরে কহিলেন—“তুমি ‘মাগী—মাগী’ করোনা বল্‌ছি।”

কর্ত্তা তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—“তুমি মাগী নয়ত কি পুরুষ ?”

গৃহিণী। আমি কি বল্‌ছি—আমি পুরুষ। তোমার মুখে কি ভাল কথা নেই ?

কর্ত্তা। ও বুঝিছি। মাগী বল্‌লে বয়েসটা কিছু হয়ে পড়ে বটে। তোমার মতনব-যুবতীকে মাগী বলাটা আমার অন্যায় হয়েছে। সুন্দরী—আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

গৃহিণী। অত ঠাট্টা কেন গো তোমার চেয়ে আমার বয়েসত কম ?

কর্ত্তা। দেখ, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কুলীনের ঘরেই ‘বর বড় কি কনে বড়’—এই কথাটা খাটে। যাক সে কথা—এখন আমার কথার কি বল ? তুমি মহামায়ার মায়ের কাছে যাবে কি না ?

গৃহিণী। আমি কি যেতে চাচ্ছি না ?—রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে কি করে যাই বল।

কর্ত্তা। আচ্ছা আমি তোমার হয়ে রাঁধ্‌ছি—তুমি যাও।

গৃহিণী। তোমায় রাঁধ্‌তে হবে না। আমি ভাতের ফেনটা গেলেই যাচ্ছি। এসে রাঁধ্‌বো। তুমি গঙ্গাস্নানে যাবে ত ?

কর্ত্তা। তুমি কথাটা জেনে না এলে, আমি আজ আর স্নান কর্‌ছি না।

গৃহিণী। আমি কত বেলায় আস্‌বো, তার পর তুমি গঙ্গা স্নানে যাবে ?

কর্ত্তা। আজ আর নাই বা গঙ্গা স্নানে গেলুম। এই শুভ কর্ম্মটা স্থির কর্‌তে পাল্লে, ঘরে বসেই যে আমার গঙ্গাস্নানের ফল হবে।

গৃহিণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রন্ধনশালায় চলিয়া গেলেন। সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া মহামায়াদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বিমলা সে সময় পূজা আহ্নিকে ব্যস্ত ছিলেন। সেই কারণ কমলাকে মহামায়াই অভ্যর্থনা করিল। কমলা মহামায়াকে এক নিভৃত গৃহে লইয়া গেল। প্রথমে কমলা তাহার জননীর কথাই জিজ্ঞাসা করিল। তার পর অন্যান্য দুই চারিটা বাজে কথার পর কমলা আসল কথা পাড়িল। বলিল—“দেখ্ মহামায়া, তোর ঠাকুর দাদা, তোর একটা ভাল সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে। তারা জয়নগরের জমিদার—খুব বড় লোক। ছেলেটিও দেখ্‌তে কার্ত্তিকের মতন। তোর সে বর পছন্দ হবে ত ?”

কমলার কথা শুনিয়া মহামায়ার মুখখানি শুকাইয়া গেল। বিষণ্ণ মুখে মহামায়া কহিল—“আমিত বিয়ে কর্‌বো না।”

কমলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—“সে কিলো—বিয়ে কর্‌বি না কি ? তুই যে তোর মায়ের এক মেয়ে, তুই চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বি কি করে ? মহামায়া উত্তর

করিল—"পাহাড়ী বাবা বলেছেন—আমায় বিয়ে কর্‌তে নেই।"

কমলা। আর যদি অতুলের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করি ?

মহামায়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া রহিল। কমলার এ কথার আর কোন উত্তর দিল না। কমলা বলিতে লাগিল—"দেখ্ মহামায়া, তোর দাদা অতুলের সঙ্গেই তোর বিয়ের সম্বন্ধ করেছে। আজ সকালে আমাদের বাড়ী এসেছিল। তোর দাদাকে দিয়ে সে তার মামাকে তোকে বিয়ে কর্‌বার কথা জানিয়েছিল। তার মামার মত হয়েছে। এখন তোদের মত হলেই সে বিয়ে হয়। আমি সেই কথাই জান্‌তে এসেছি। তোর মত আছেত ?

মহামায়ার মস্তক ক্রমেই অধিকতর অবনত হইয়া আসিতে লাগিল। তার পর কমলা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—মহামায়ার মস্তকতলস্থ ভূমি অশ্রুসিক্ত হইয়াছে এবং তখনও তাহার চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া অশ্রু পতন হইতেছে! এই সময় বিমলা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। মহামায়া জননীকে দেখিয়া আর সে স্থানে রহিল না, ছুটিয়া সে গৃহ হইতে পলায়ন করিল। মহামায়া আর সে মহামায়া নাই।

বিমলা কমলাকে দেখিয়া বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিল। অন্যান্য দুই চারি কথার পর, কমলা কহিল—"দেখ মহামায়ার মা, তোমার মেয়ের বিয়ের কি কর্‌ছ বল ?"

বিমলা উত্তর করিল—"আমি আর কি কর্‌বো বল। ঠাকুরপোর উপর ভার দিয়েছি, তিনিই যা হয় কর্‌বেন।

কমলা। কেন—তোমার ঠাকুরপোর ঘরেইত ছেলে রয়েছে। দুর্গাদাসের ভাগিনেয় অতুলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও না ?

বিমলা। আমার কি তেমন অদৃষ্ট হবে মা ? অতুলত সোনার ছেলে, যার খুব ভাগ্য ভাল, সেই অমন ছেলে জামাই করবে।

কমলা। তবে অতুলকে মেয়ে দিতে তোমার খুব মত আছে ?

বিমলা। সে কথা কি একবার করে বল্‌তে মা।

কমলা। তবে এই মাসেই তোমার মেয়ের সঙ্গে অতুলের বিয়ে হবে। আমাদের কর্ত্তা সে ভার নিয়েছেন। তুমি বিয়ের উদ্যোগ কর।

এই কথা বলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। বিমলা আনন্দে অধীর হইয়া কমলার পদধূলি গ্রহণ করিল। কমলা গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিল—লোহিয়া গোপনে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে। কমলাকে দেখিয়া লোহিয়া প্রথমে একটু থতমত খাইল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সে ভাব গোপন করিল। লোহিয়া পশ্চাৎ চলিল। বাড়ীর বাহিরে আসিয়া কমলাকে কহিল—মহামায়ার সাধি হামি না হোতে দেবে।"

কমলা বিস্মিত নেত্রে পশ্চাতে একবার লোহিয়ার দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল—"এ মাগী বলে কিগো।"

লোহিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—"হামি দেখ্‌বে—তোমাকে দেখ্‌বে, আর তোমার কর্ত্তাকে বি দেখ্‌বে। হুঁসিয়ার—খুব হুঁসিয়ার থাক্‌বে।"

যে ভাবে লোহিয়া এই কয়েকটি কথা কহিল, তাহাতে কমলার মনে বড়ই ভয় হইল। কমলা তখন ভয়ে আরো দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় পথি মধ্যে রামচন্দ্রের সহিত লোহিয়ার সাক্ষাৎ হইল। তখন লোহিয়া আর কমলার পশ্চাৎ অনুসরণ না করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এই অবসরে কমলা চলিয়া গেল। রামচন্দ্রও লোহিয়ারই অনুসন্ধানে চলিয়াছিল, পথের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় সেও আর অগ্রসর হইল না। রামচন্দ্র লোহিয়াকে কহিল—"লোহিয়া, পাহাড়ী বাবা তোমায় একটা কথা স্মরণ করে দিতে বলেছেন।"

লোহিয়া আগ্রহের সহিত কহিল—"সে কি কথা আছেরে রামচন্দ্র ?"

রামচন্দ্র উত্তর করিল..."মৃত্যুবাণ।"

লোহিয়া বিস্ফারিত নেত্রে দন্তে দন্ত ঘর্ষিত করিতে করিতে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে কহিল—"মৃত্যুবাণ!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পর দিন সন্ধ্যার সময় অতুলের সহিত অনুকূলচন্দ্রের নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। অনুকূল কহিলেন—"অতুল, তুমি ভৈরব ঠাকুর দাদাকে মুরুব্বী ধরে, যা

কর্‌ছ, আমি সে সব জান্‌তে পেরেছি। তোমার কি মৃত্যুভয় নাই ?"

অতুলচন্দ্র উত্তর করিলেন—"জান্‌তে যদি পেরে থাক, তবে ভালই হয়েছে। আর মৃত্যু ভয় নাই যা বল্‌ছো, এতে মহামায়ার প্রতি আমার অসীম ভালবাসাই প্রকাশ পাচ্ছে। ভরসা করি এ সকল জেনে শুনে আর তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না।"

অনুকূল। তোমায় আমি বুদ্ধিমান বলে জান্‌তুম, কিন্তু তোমার এইরূপ কথা শুনে আমার এখন মনে হচ্ছে, তোমার মতন নির্ব্বোধ আর এ পৃথিবীতে নাই। নিজের মৃত্যু ভয় কর না ? ক্ষুদ্র পতঙ্গ হয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ ?

অতুল। আমি মহামায়াকে না পেলে এ প্রাণই যখন রাখ্‌বো না, তখন আর মৃত্যুভয় কেন কর্‌বো ? মহামায়া এক দিনের জন্য আমার হলে, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌তে পার্‌বো।

অনুকূল। তুমিত হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌লে, কিন্তু তার পর সেই হতভাগিনীর দশা কি হবে—সে কথা কি একবার ভেবেছ ? নিজের এক দিনের সুখের জন্য যাকে ভালবাস বল্‌ছো, চিরজীবনের জন্য তাকেই দুঃখিনী কর্‌বে ? এই কি তোমার ভালবাসা ? এর নাম ভালবাসা না স্বার্থপরতা ?

অতুল। দেখ অনুকূল, তুমি যখন আমার ভালবাসার এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী, তখন তোমার মুখে এ সকল কথা ভাল দেখায় না। তুমি মুখে আমার প্রতি ভালবাসা দেখাচ্ছ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেবল নিজের ভাল খুঁজছ। পাহাড়ী বাবার কথায় আমি যখন কিছুমাত্র বিশ্বাস করিনা তখন তুমি মিছামিছি কেন এ সকল কও ? আমার মঙ্গলের জন্যে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন ? আমি সব বুঝি—আমি সব জানি।

এমন সময় সেই গৃহের বাহিরে প্রতিধ্বনি হইল—"মৃত্যুবাণ—আমার মৃত্যুবাণ কোথায় গেল!" এ যে স্বয়ং কর্ত্তা দুর্গাদাস বাবুর কণ্ঠস্বর। অতুল ও অনুকূলচন্দ্র উভয়েই সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল! সে প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতে দুর্গাদাস সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিয়াই উভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অতুল, অনুকূল, তোমরা আমার মৃত্যুবাণ কোথায়, জান ?

উভয়েই পরস্পরের মুখ চাওয়া চাই করিতে লাগিলেন—কর্ত্তার প্রশ্নের কেহই কোন উত্তর দিতে পারিল না। দুর্গাদাস অধীর হইয়া পুনরায় কহিলেন—আমার মৃত্যুবাণ কোথায় উত্তর দাও।"

এই কথা বলিয়াই দুর্গাদাস প্রথমে সতৃষ্ণ নয়নে একবার অনুকূলের প্রতি চাহিলেন। অনুকূলচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"আমি জানি না।"

তার পর মুহূর্ত্তেই অতুলচন্দ্রের দিকে চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ অতুলচন্দ্র বিস্মিত স্বরে কহিলেন—"আপনার মৃত্যুবাণ!"

উন্মত্তভাবে দুর্গাদাস উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমারই মৃত্যুবাণই বটে, কারণ সে অস্ত্র না পেলে আমি আমার প্রাণই রাখ্‌বো না।

অনুকূল। যেখানে ছিল সেখানে নাই ?

দুর্গাদাস। না।

অনুকূল। তবে কেউ নিশ্চয়ই চুরি করেছে।

দুর্গা। সে দিন পাহাড়ী বাবা আমার কাছে সেটি ভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু আমি দিই নাই।

এই সময় অতুলচন্দ্রের মুখ হইতে হঠাৎ বহির্গত হইল—তবে এ সেই পাহাড়ী বাবার কাজ।"

সে কথা শুনিয়া অনুকূলচন্দ্র কহিলেন—"অসম্ভব।"

দুর্গাদাস কাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া বাড়ীর সমস্ত ভৃত্যকে ডাকাইলেন এবং প্রত্যেককে মৃত্যুবাণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই কিন্তু উত্তর করিল যে তাহারা সে অস্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তখন তিনি কহিলেন—"আমি কালও সে অস্ত্র দেওয়ালে দেখেছি, সুতরাং কাল চুরি যায় নাই—আজই চুরি গিয়েছে। তোমরা আজ পাহাড়ী বাবাকে এ বাড়ীতে কেহ আস্‌তে দেখেছ কি ?"

প্রত্যেকেই উত্তর করিল—"সেই এক দিন মাত্র তাঁকে এ বাড়ীতে আস্‌তে দেখেছি, আজ তাঁকে এ বাড়ীতে দেখি নাই।"

তখন অনুকূলচন্দ্র কহিলেন—"পাহাড়ী বাবা সাধু লোক, তাঁর নামে এরূপ বদনাম দেওয়া বড়ই অন্যায়।

অতুলচন্দ্র এইবার কহিলেন—"পাহাড়ী বাবা নিজে যদি চুরি না করে থাকেন, তবে কাহার দ্বারা সেটি নিশ্চয়ই হস্তগত করেছেন।"

অনুকূল। তার প্রমাণ কি?

অতুল। পাহাড়ী বাবা যখন অস্ত্রটি ভিক্ষা চেয়েছিলেন তখন সে জিনিষ নিশ্চয়ই তাঁর আবশ্যক আছে। অন্য কারু সে জিনিষে যে আবশ্যক আছে—এ কথাত আমার মনে বিশ্বাস হয় না। এত অস্ত্র ঐ ঘরে থাকৃতে কেবল সেই অস্ত্রটি চুরি যাবে কেন? নিজে চুরি না কর্লেও অন্য লোকে তারই জন্য চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।"

দুর্গাদাস বাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে সে লোক? আজ বাহিরের লোককে আমাদের বাড়ী এসেছিল তোমরা কেউ জান?"

কেহ আর সে কথার উত্তর দিল না সকলেই বিষণ্ণ মনে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। শেষে অতুলচন্দ্র কহিলেন—"লোহিয়া আজ আমাদের বাড়ী এসেছিল নয়?"

তখন এক জন ভৃত্য উত্তর করিল—"হাঁ, আজ সন্ধ্যার সময় তাকে এ বাড়ীতে আমি দেখেছি।"

অতুল। এ তবে তারই কাজ।

অনুকূল। সে কোন্ দিন না আসে? সেত প্রায় প্রত্যহই আসে।

অতুল। আমার বিশ্বাস—তারই দ্বারা পাহাড়ী বাবা সে মৃত্যুবাণ চুরি করেছে।

অনুকূল। আচ্ছা, সে এ বাড়ীতেই এসেছিল। কাকা বাবুর বৈঠকখানায় কেউ তাকে যেতে দেখেছ কি? সে ঐ ঘরে কেন যাবে?

তখন সে প্রশ্নের আর কেহ কোন উত্তর দিল না। দুর্গাদাস বাবু কহিলেন—"কে চুরি করেছে—সে কথা চক্ষে না দেখ্‌লে বলা যায় না। কিন্তু তোমাদের সকলকেই বল্‌ছি,—সে মৃত্যুবাণ আমার নাই। পুলিশে সংবাদ দিলে এখনই সকলকে ধরে টানাটানি কর্‌বে, অথচ ফল কিছুই হবে না। যে সে মৃত্যুবাণের সন্ধান আমায় এনে দিতে পার্‌বে, আমি তাকে যথেষ্ট পুরস্কার কর্‌বো।"

এই কথা বলিয়া দুর্গাদাস সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। ভৃত্যেরাও যে যাহার কার্য্যে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কেবল অতুল ও অনুকূল সেই গৃহে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। দুই জনেই একটা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। শেষে অনুকূলচন্দ্র কহিলেন—"সাবধান—অতুল খুব সাবধান!" অনুকূলচন্দ্রের এই কথায় অতুলের হৃদয় গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। শঙ্কিত হৃদয়ে অতুল অনুকূলের মুখ পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল!

ক্রমশঃ—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কবিতা-গুচ্ছ।

বর্ষায় কোকিল।

কেন তুমি ডাকিলে কোকিল!
জলদে আকাশ ঢাকা,
মেদিনী কাদায় মাখা,
মলিনা প্রকৃতি— সদা চোখেতে সলিল
কোন সুখে ডাকিলে কোকিল!
বিমুক্ত আকুল কেশ,
দিগ্বধূ মলিন বেশ,
নীরব প্রকৃতি যেন পরাণ শিথিল!
নাই সে জ্যোছনা হাসি,
নাই সে কুসুম রাশি,
বিরহিনী বধূ যেন ক্ষীণ তিল তিল!
কেন তুমি ডাকিলে কোকিল।
সে সুখ নাহিরে আর,
বিষাদ মেঘের ভার,
ঘিরিছে সে আলো মাখা, হৃদয় তাহার।
ঝরে গেছে ফুল রাশি
শুকায়েছে ফুল্ল হাসি
বহেনা সুরভি স্নিগ্ধ মলয় অনিল!
কেন তবে ডাক আর অকালে কোকিল!

শ্রীহিরণ্ময়ী গুপ্তা।

রাখি পূর্ণিমা।

আজি এই শ্রাবণের পূর্ণিমা নিশীথে,
কে তুমি গো বীরবালা বসিয়ে বিরলে,
গাহিছ জীবন-গাথা স্বর্ণ-বীণা সাথে;
ঝ'রিছে নয়নে লোর অম্বরে চাহিয়ে!
কি বিষাদে আজি তব হৃদি বিষাদিত,
এমনি জ্যোছনা রাতে এমনি সময়ে,
হৃদয়-বল্লভ করে পূর্ণিমা তিথিতে
বেঁধেছিলে কি গো বালা সুবর্ণের রাখি?
সেই স্মৃতি সেই কথা পশিয়ে পরাণে
করিছে আকুল কিগো হৃদয় তোমার?
তোমার জীবন-সখা অনন্ত শয়নে,
শুয়েছেন কিগো দেবী চিরদিন তরে?

শ্রীহরিহর শেঠ।

শুভ দৃষ্টি।

তখনো হাসিত হেন মধুর যামিনী,
ছিল কত পরিমল কুসুম-অধরে,
তখনো মলয় মন্দ অলস গমনে
দাড়াইত মৃদু হাসি নিকুঞ্জ-দুয়ারে।
তরল সুবর্ণসম বিমল চাঁদিনী
ছড়াত পূর্ণিমা; আজ ছড়ায় যেমন,
তখনো বসন্ত-সখা কল-কণ্ঠধ্বনি—
মুখরিত নিশি দিন শ্যাম-কুঞ্জবন;
ধরণী বিচিত্র হেন;— প্রকৃতি সজীব,
কখনো ভাবিনি মনে, বুঝিনি তখন
এই মর্ত্ত্যভূমি কভু হইবে ত্রিদিব
বক্ষে ধরি চির-লক্ষ্য কনক-নন্দন,
অয়ি যাদুকরি, আজ কোন মন্ত্র-গুণে—
জাগালে বিশ্বের শোভা আমার নয়নে?

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

যাপান বীরের যুদ্ধ যাত্রা

যাও বীর বীরসাজে, বীর দাপে চলি,
বিনাশ শত্রুর দর্প,—দৈব বলে বলী,
যে বেশে চলিলে বীর, সে বেশে আবার,
ফিরিয়ে আসিও ঘরে, আশীষ আমার।
স্বদেশের তরে যারা উৎসর্গে জীবন,
মহাপুণ্যবান তারা দেশের ভূষণ।
জন্মিলে মরিতে হবে বিধির নিয়ম,
বীর ধর্ম্ম পালি মর, স্পর্শিবেনা যম;
স্বর্গ ধামে যাবে চলি যশস্বী হইয়া,
স্বদেশের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া।
স্বদেশের স্বাধীনতা অমূল্য রতন
রহিবে অটল তাহে নিজ পরিজন
রহিবে স্বাধীন মুক্ত, পৃথিবী মাঝারে;
তাই তুচ্ছ এজীবন কহিনু তোমারে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত।

শেষ।

সঙ্গীত গিয়াছে থেমে রেশ আছে কানে,
কল্পনা টুটিয়া গেছে জাগে ব্যথা প্রাণে,
বসন্ত চলিয়া গেছে নাহি কুহুতান,
হৃদয়ে উঠিছে প্রিয়ে শুধু হাহা গান।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মিত্র।

সমালোচনা।

কয়েকখানি পত্র—শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রণীত। ২৫নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট জয়ন্তী প্রেসে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৶০ আনা। আমরা অনেকদিন এই সুন্দর পুস্তকখানি সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু অবসর অভাবে এ পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। ইহাতে আমাদের ললনাকুলের একান্ত উপযোগী গুণনিচয়ের শিক্ষা ও উপদেশ দান শতাধিক পৃষ্ঠায় এমন সরল ও সরসভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে গ্রন্থকর্ত্তাকে ধন্যবাদ না করিয়া পারা যায় না। একান্নবর্ত্তী পরিবার হিন্দু সমাজের অস্থি মজ্জা! কিন্তু যদি সুখশান্তি না থাকে তবে সে পরিবার বড়ই অসুখের কারণ হইয়া থাকে।

যদু বাবু বিশেষ অনুধাবন, পর্য্যবেক্ষণ, ও ভূয়োদর্শন দ্বারা এই সুখশান্তির অন্তরায় গুলি বিশেষরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং স্ত্রীর নিকট স্বামীর পত্রচ্ছলে সেই সব দোষ গুলি যাহাতে দূর হইতে পারে এবং পরিবার মধ্যে স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয় তাহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষার আবশ্যকতা, তাহাদের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষার বিরোধী হওয়ার কারণ, তাহা নিবারণের উপায়, লজ্জা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণাবলীর সংসারে আবশ্যকতা, কিরূপে তাহার উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়, সতী রমণীর কর্ত্তব্য, পরিবারস্থ প্রত্যেক লোকের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কি কৌশলে তাহাদিগকে বশীভূত রাখা যায় ও তাহাদিগকে উন্নত করিতে পারা যায়, শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত, আয় ব্যয়ের হিসাব বুঝিয়া চলা, অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ ইত্যাদি রমণীর কল্যাণকর অশেষবিধ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে এবং অতি সরল ভাষায় ও বিস্তৃত ভাবে লিখিত হওয়াতে বালিকারাও ইহা অতি সহজে বুঝিতে পারিবে ও এতদনুসারে চলিতে চেষ্টা করিতে পারিবে।

প্রতীচ্য-প্রতিভা।—প্রতীচ্য-প্রতিভা বা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ভারত মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১৲এক টাকা। গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। স্বর্গীয়া-মহারাণী-ভিক্টোরিয়ার জীবন-চরিত ভারতবাসীর বড় আদরের জিনিষ। এস্থলে লেখকের লিপি-চাতুর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাইলাম না। তবে বিষয়-গৌরবে পুস্তকখানি সমাদরের যোগ্য। কয়েকখানি চিত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছবিগুলি এরূপ বিকৃতভাবে মুদ্রিত করা অপেক্ষা না দেওয়াই উচিত ছিল।

সঙ্গীত-পুস্পাঞ্জলি— শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত নানাবিষয়িণী গীতিমালা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ২।১টি গান আমাদের বেশ ভাল লাগিল। স্থানে স্থানে লেখকের ভাবুকতা ও রচনা-কৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কুসুম-চরিত।—হাজারিবাগ জিলা-স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা পরলোকগতা কুসুমকুমারীর ক্ষুদ্র জীবন-চরিত প্রসন্নবাবু কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে রচিত। ঢাকা আশুতোষ-যন্ত্রে মুদ্রিত। কুসুম দেব-বালার ন্যায় সার্দ্ধ-চতুর্দ্দস-বর্ষ ব্যাপী জীবনে যে যে সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছিল যেরূপ অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রাণতার পরিচয় দিয়াছিল তাহা নিতান্তই বিস্ময়োৎপাদক। গ্রন্থকার তাহাই ধারাবাহিক-রূপে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। কুসুম-চরিতে অনেকেরই অনেক জানিবার এবং শিখিবার বিষয় আছে। কুসুমের কবিতার পাদ-পূরণের ক্ষমতা বড়ই প্রশংসার্হ। স্থানাভাব বশতঃ আমরা উহা উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া দুঃখিত। পুস্তকখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

পারিবারিক জীবন।—শ্রীমতি প্রসন্নতারা গুপ্ত প্রণীত, কুন্তলীন প্রেসে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত সুন্দর বিলাতি বাঁধাই মূল্য ১॥০ টাকা। প্রবীন ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সহিত। গ্রন্থকর্ত্রী একজন পাকা গৃহিণী, সুতরাং পারিবারিক জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় গুলির সমালোচনা তাঁহার দ্বারা সুন্দররূপেই হইতে পারে। এক্ষেত্রে হইয়াছে ও তাহাই। যোগ্যহস্তেই উপযুক্ত ভার ন্যস্ত হইয়াছে। আজ কাল অনেক বিদুষী মহিলা কবিতা পুস্তক লিখিতেছেন, কিন্তু পারিবারিক জীবণের গ্রন্থকর্ত্রী যে কবিতা পুস্তক না লিখিয়া এই সারবান্ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এজন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হা। বিষয় সমুহের যথা থ সমাবেশ ও ধারাবাহিক আলোচনায় গ্রন্থকর্ত্রীর ভুয়োদর্শন এবং সংসারিক অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দুই এক স্থলে আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও এ পুস্তক খানি যে সুন্দর হইয়াছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ইহার বহুল প্রচার সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি—১। আলিরাজা ও ২। সৈয়দ মর্ত্তুজা। প্রাচিন সাহিত্যের প্রচার যত হয় ততই ভাল। এই দুই মুশলমান কবির পদাবলী ভাব-সম্ভারে এবং লালিত্যে বিশেষ গৌরবান্বিত। বিখ্যাত সাহিত্য সেবী মৌলবী আবদুল করিম কর্ত্তৃক কবিদ্বয়ের জীবনী এবং শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকসহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। আলিরাজার মূল্য ।৵ ও সৈয়দ মর্ত্তুজার মূল্য চারি আনা। কলিকাতা গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়। প্রাচিন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ইহা সমাদৃত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

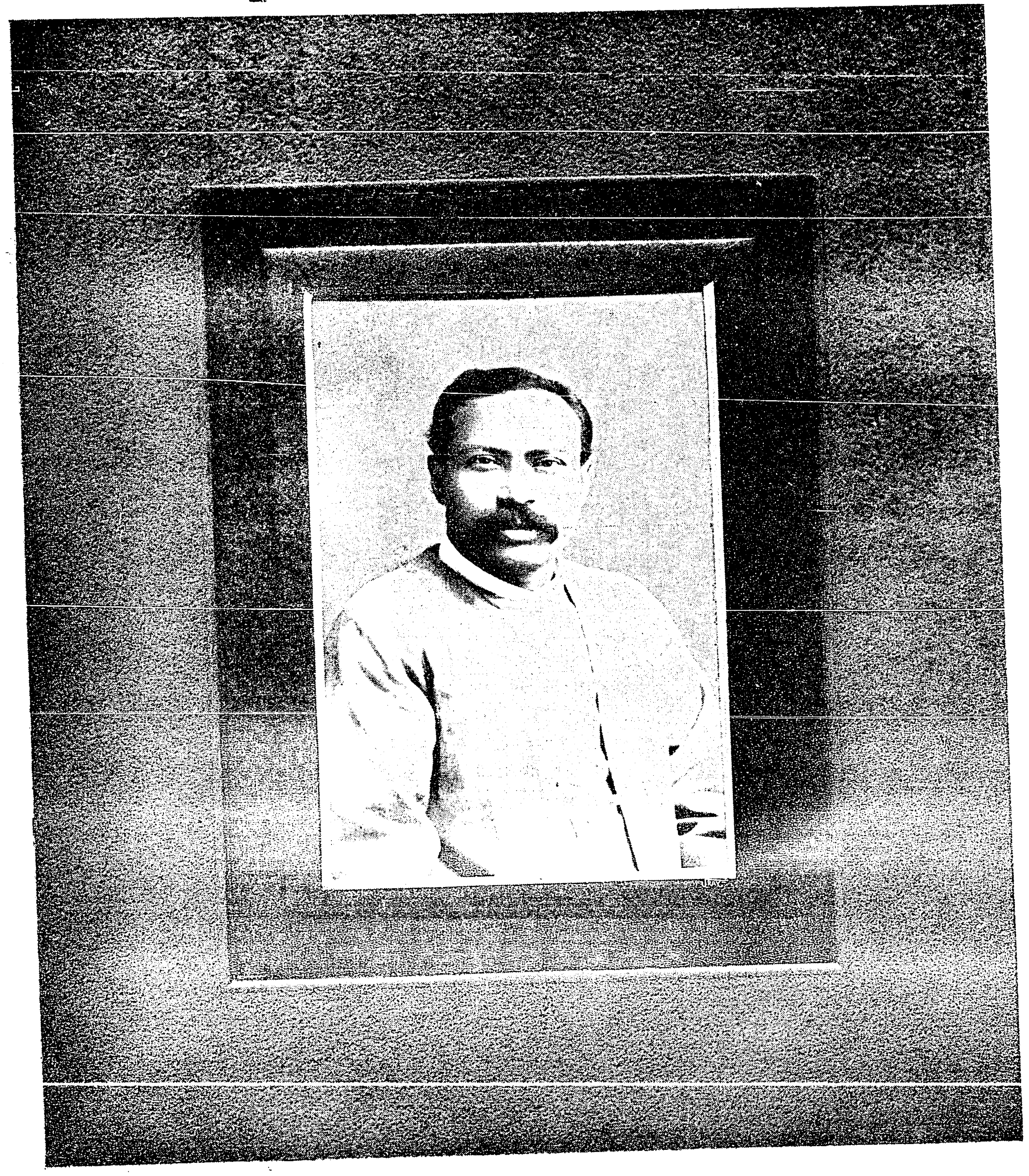

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই।

৭ম ভাগ। ভাদ্র, ১৩১১। ৫ম সংখ্যা।

স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরমাসে মহামতি লর্ডরিপণ ভারত ত্যাগ করেন। ১৫ই তারিখে কলিকাতায় মহাসমারোহ উপস্থিত হয়। পথের দুই ধার পুষ্প এবং আলোকমালায় শোভিত এবং মহাসমারোহে লর্ড রিপণকে কলিকাতা হইতে বিদায় দেওয়া হয়। এই সমারোহ অনেক ইংরাজের মর্ম্মে আঘাত প্রদান করে, ইহার কারণ রিপণের এদেশীয়দিগের প্রতি সহানুভূতিসূচক ব্যবহার। লর্ড ডফারিণ আসিয়া নূতন লাট হইলেন। এই বৎসরে কৃষ্ণদাসপাল এবং কেশবচন্দ্র সেন স্বর্গারোহণ করেন। "হিন্দুপেট্রিয়ট" পরোক্ষভাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ক্রমে হীনাবস্থায় পরিণত হইতে লাগিল। এই অব্দের শেষে শম্ভুচন্দ্র ত্রিপুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত "রেইস" সম্পাদন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। লর্ড ডফারিণ যেমন প্রবীণ এবং কৃতবিদ্য তেমনি গুণগ্রাহী এবং অনুসন্ধিৎসু। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ওয়ালেস সাহেবও প্রভুর ন্যায় যোগ্যব্যক্তি; এই মণিকাঞ্চনের সংযোগে ইল্‌বার্টবিলকৃত দেশীয় এবং বিদেশীয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্যরূপ ব্যাধি জন্মিয়াছিল তাহার কতকটা উপশম হইল। ক্রমে ক্রমে "রেইসের" সুসম্পাদনের সংবাদ লাট ডফারিণের নিকট পৌঁছিল। চুম্বক যেমন লোহকে আকর্ষণ করে লর্ড ডফারিণও "রেইসের" সম্পাদককে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এক সঙ্গে মিলিত হইতে কয়েক বৎসর গত হয়। কিরূপে তাহা সংসাধিত হয় তাহা পরে বলা যাইবে।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দের শেষে তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়। লর্ড ডফারিণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মদেশের রাজা থিবকে বন্দী করেন এবং সমস্ত উত্তর-ব্রহ্মদেশ ইংরাজরাজের করতলগত হয়। এদিকে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইল। দেশমধ্যে মহা-আন্দোলন উপস্থিত হইল। সংবাদ পত্রে প্রতিদিন লর্ড ডফারিণ এবং ব্রহ্মদেশ লইয়া তীব্র প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত

হইতে লাগিল। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের জানুয়ারীর প্রারম্ভে লর্ড ডফারিণ থিবকে বন্দী করিয়া তাঁহার সহিত কলিকাতায় পৌঁছিলেন। শম্ভুচন্দ্র ব্রহ্মসমর সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লর্ড ডফারিণ বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং শম্ভুচন্দ্রের প্রতি বিশেষরূপ অনুরক্ত হন।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ষ্টেট্স্ম্যান সংবাদ পত্রের ভূতপূর্ব্ব-সম্পাদক প্রাতস্মরণীয় রবার্টনাইট সাহেব বর্দ্ধমান রাজ-জমিদারীর ম্যানেজার বার্গমিলার সাহেবের এবং রাজা বন-বিহারী কর্পূরের বিরুদ্ধে অর্থ তস্রুফের অভিযোগ আনিয়া কয়েকটি তীব্র প্রবন্ধ স্বীয় পত্রিকায় প্রকাশ করেন। মিলার সাহেব নাইট সাহেবকে মানহানির অভিযোগে অভিযুক্ত করিলেন। রাজা বনবিহারীও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। শম্ভুচন্দ্র এবং যোগেশচন্দ্র উভয়ই নাইট সাহেবের বিশেষ বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন এবং তাঁহার জামিন হইলেন। পরিশেষে মোকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ হইল। কিন্তু এই মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকিতেই মিলার সাহেবের মৃত্যু ঘটিল। শম্ভুচন্দ্র এবং স্ক্রাইন সাহেব শেষে মধ্যস্থ হইয়া এ মোকদ্দমা মিটাইয়া দিলেন। নাইট সাহেব তজ্জন্য শম্ভুচন্দ্রের নিকট বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞ ছিলেন। বন্ধুবর্গকে বিপদে পতিত দেখিলে শম্ভুচন্দ্র নিজের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন এবং যথোচিত তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। এই পরম দয়ালু ব্রাহ্মণ পুত্র নীরবে করুণাজাল বিস্তার করিয়া অনেক ব্যক্তির হিত সাধনে সদাই রত থাকিতেন, কিন্তু কখনও তজ্জন্য প্রত্যুপকার আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। কখন কাহাকেও জানিতে দিতেন না যে তিনি ব্যক্তি বিশেষের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি শম্ভুচন্দ্রকে দেব-চরিত্র রাজেন্দ্র দত্ত এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ সোদর স্নেহে এবংভালবাসায় আপনাদিগের পরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বোধ হয় এক মাতৃগর্ভজাত ভ্রাতৃবর্গ মধ্যে এতদূর ভালবাসা ও বিশ্বাস অতি বিরল।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। টাউনহলে বৈঠক বসে এবং কংগ্রেসের কার্য্য শেষ হইলে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হইতে এক ডেপুটেসন বড়লাট লর্ড ডফারিণের নিকট প্রেরিত হইবে স্থিরীকৃত হয়। এই ডেপুটেসনে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যগণ ব্যতীত অন্যান্য সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ যাহাতে যোগ দেন তজ্জন্য চেষ্টা করা হইল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া শম্ভুচন্দ্রকে ডিপুটেসনে যোগ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি স্বীকার করিলেন। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, ৺মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন যথা সময়ে লর্ড ডফারিণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। ফণী মণি পাইলে যেরূপ হর্ষান্বিত হয় লর্ড ডফারিণ শম্ভুচন্দ্রকে পাইয়া সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন। শম্ভুচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "I am longing for your acquaintance so long ; you are really a gifted man. অতি বিনয়ের সহিত শম্ভুচন্দ্র লর্ড ডফারিণকে আপ্যায়িত করিলেন। এই ডেপুটেসনের সময় আরও তুইটি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ এস্থানে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনকে লাটের সমীপে ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক বলিয়া উপস্থিত করা হইলে লর্ড ডফারিণ কিঞ্চিৎ রাগভরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে আপনার কাগজে প্রত্যহ সংবাদ পত্রের মুখ-বন্ধ করিবার জন্য লাটের গুপ্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে লিখিতেছেন তদ্বিষয়ে আপনি কোথা হইতে খবর পাইলেন?" প্রবীণ ও বিচক্ষণ ডফারিণের এই কথা শুনিয়া ডেপুটেসনের সভ্যগণ নিস্তব্ধভাবে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মিরার সম্পাদক অতি ধীর ও গম্ভীরভাবে বলিলেন "I have seen the document." ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে অনল যেরূপ জ্বলিয়া উঠে, নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া লর্ড ডফারিণও সেইরূপ আকার ধারণ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন "Is not the drawer of the Viceroy safe?" তখন ডেপুটেসনের সভ্যগণের অবস্থা কিরূপ তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সকলেই কম্পিত কলেবরে নির্বাক হইয়া রহিলেন। বহুদর্শী লর্ড ডফারিণকে একটু অপ্রকৃতস্থ দেখিয়া মিলিটারী সেক্রেটারী মধ্যে পড়িয়া সামলাইয়া লইলেন এবং অন্যান্য সভ্যগণকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে বলিলেন। নরেন্দ্র বাবুর সহিত তাঁহার আর কোন কথা হয় নাই। আর একটি

ঘটনা এই। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে লাট সমীপে উপস্থিত করা হইলে লর্ড ডফারিণ তাঁহার সাহেবী পরিচ্ছদ দেখিয়া উপহাস আরম্ভ করেন। শম্ভুচন্দ্র নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহার দেশীয়পোষাক দেখাইয়া লর্ড ডফারিণ মনোমোহন বাবুকে বলিলেন "যখন আপনাদের এতদূর সুন্দর দেশীয় পরিচ্ছদ রহিয়াছে তখন আপনি আমাদের ন্যায় হ্যাটকোট পরেন কেন, ইহাতে আপনাদিগকে বড়ই কদাকার দেখায়।" মনোমোহন বাবু ইহার কোন উত্তর না দিয়া ডেপুটেসনের অন্যান্য সভ্যগণ লাটভবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই চলিয়া আসেন।

ডেপুটেসনের কার্য্য শেষ হইলে এবং অন্যান্য সভ্যগণ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে লর্ড ডফারিণ শম্ভুচন্দ্রকে অন্যগৃহে লইয়া গিয়া অনেক কথাবার্ত্তার পর বিদায় দেন। লর্ড ডফরিণের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে এই ঘটনার পর হইতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে লাট-ভবনে যাইতে হইত। লর্ড ডফারিণের সহিত সখ্যস্থাপন হইল বটে কিন্তু ইহাতে দেশের অনেক ব্যক্তির অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। স্বদেশ-হিতৈষিতার ভাণ করিয়া স্বার্থ সিদ্ধির চূড়ান্ত-উপায়-উদ্ভাবনকারীগণ যখন দেখিল যে এই মণি-কাঞ্চনের সংযোগে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তখন সেই পরশ্রী-কাতর, দেশের পরমশত্রুগণ গোপনে শম্ভুচন্দ্রের দ্রোহিতা সাধনে কৃতসংকল্প হইল। পরোক্ষে কার্য্যহন্তারক হইলেও এই শ্রেণীর লোকগুলি শম্ভুচন্দ্রের প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী ছিল। কারণ তাহারা জানিত যে শম্ভুচন্দ্রের দ্বারা অনেক তুঃসাধ্য কার্য্য অনায়াসসাধ্য হইতে পারে। ইহার একটী উদাহরণ নিম্নে দিলাম। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে ৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে কারেন্সি আফিসের ছুটী রদ হয়। কেরাণী মহলে ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত হইল। সংবাদপত্রে দেশ-হিতৈষীদলের তীব্র-শ্লেষপূর্ণ প্রবন্ধাদি উপর্য্যুপরি প্রকাশিত হইতে লাগিল। কেরাণীরা ভাবিয়াছিল যে ইহাতেই লাট সাহেবের আসন টলিবে এবং তাহারা ছুটি পাইবে। দিন ক্রমে ক্রমে গত হইতে লাগিল, পূজার ছুটি আগতপ্রায় অথচ সরকারের হুকুম রদ হইল না। সংবাদপত্রের আন্দোলন বৃথা হইল দেখিয়া কেরাণীদিগের মধ্যে একজন প্রবীণ ব্যক্তি শম্ভুচন্দ্রের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। পরের তুঃখ দেখিলে শম্ভুচন্দ্র একেবারে গলিয়া যাইতেন। তৎক্ষণাৎ স্বীয়-ব্যয়ে বড়লাট সাহেবের নিকট ৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে কেরাণীরা যাহাতে অবসর পায় তজ্জন্য তারে সংবাদ পাঠাইলেন এবং তদানীন্তন কন্ট্রোলার জেলারল এট্‌কিন্‌সন সাহেবকে এতদ্-সম্বন্ধে পত্র লিখিলেন। বড়লাট সিমলা হইতে তারে এট্‌কিন্‌সন সাহেবকে কেরাণীগণকে ছুটি দিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং শম্ভুচন্দ্রকে জানাইলেন। কেরাণীরা শম্ভুচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সানন্দে গৃহে গমন করিল। এই দৃষ্টান্ত হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন শম্ভুচন্দ্রের পরহিতার্থে কত ইচ্ছা ছিল এবং ক্ষমতা ছিল বলিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া কতলোকের হিত-সাধন করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত তাঁহার চরিত্র বর্ণনা সময়ে উল্লেখ করিব। এই অব্দের শেষে তাঁহার বন্ধু লর্ড ডফারিণ ভারত ত্যাগ করেন এবং লর্ড ল্যান্‌স-ডাউন আসিয়া ভারত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। লর্ড ডফারিণের ন্যায় লর্ড ল্যান্‌সডাউন ও কলিকাতায় আসিবা-মাত্র শম্ভুচন্দ্রের সহিত সখ্য স্থাপন করেন।

খৃঃ ১৮৯০ অব্দে স্বর্গীয় যুবরাজ এল্‌বার্ট-ভিক্টর কলিকাতায় আসেন। প্রথমে এই স্থির হয় যে, তাঁহার অবতরণের সময় কেবল কুচবিহারের মহারাজা, মুর্শিদাবাদের নবাব এবং পাথুরিয়াঘাটার মহারাজকে যুবরাজের নিকট উপস্থিত করা হইবে। এই মন্তব্যে নোটিফিকেশন বাহির হয়। কলিকাতায় এই উপলক্ষে অনেক রাজা-মহারাজার সমাগম হইয়াছিল। উক্ত নোটিফিকেশন বাহির হইলে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজ শম্ভুচন্দ্রের নিকট আসিয়া উক্ত নোটিফিকেশনের বিরুদ্ধে বড়লাটসাহেবের নিকট আপত্তি করিয়া পত্র লিখিতে বলিলেন এবং যাহাতে তাঁহারা যুবরাজের অবতরণের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন তজ্জন্য অনুরোধ করিতে বলেন। বড়লাট তখন কলিকাতায়ই ছিলেন, শম্ভুচন্দ্র পত্রপ্রেরণ করিয়া প্রত্যুত্তরে জানিলেন যে, উক্ত মহারাজদ্বয় এবং বেতিয়া, ডুমরাওন, গিধোড়, হাতুয়া প্রভৃতির রাজা-মহারাজগণ সকলেই যুবরাজের অবতরণের

সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। ভিজিয়ানা গ্রামের ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজ উক্ত সংবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া শম্ভুচন্দ্রকে ধন্যবাদ করেন। যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া শম্ভুচন্দ্রের বিশেষ ঠাণ্ডা লাগে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে মাসাবধি শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। তাঁহার বন্ধু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সুচিকিৎসায় তিনি সে যাত্রা মৃত্যু-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। যখন এই কঠিন পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন সেই সময় তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়বন্ধু মহাত্মা রবার্ট-নাইট ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত-বন্ধুর জীবনী-সম্বন্ধে শম্ভুচন্দ্র বিশেষরূপে জানিতেন, সুতরাং নিজে মৃত-বন্ধুর জীবনী লিখিতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্য-স্থানীয় বাবু সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেশ-চন্দ্র দত্ত দ্বারা নাইটের এক জীবন-চরিত রচনা করাইয়া "রেইসে" প্রকাশ করেন।

কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য-লাভ করিয়া শম্ভু-চন্দ্রকে এক বিষম বিপদে পড়িতে হয়। এই বৎসরের মধ্যভাগে বাবু দীননাথ মল্লিক স্বর্গারোহণ করেন। দীননাথকে শম্ভুচন্দ্র বিশেষরূপে জানিতেন, এমন কি, এক সময়ে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দও বিদ্যমান ছিল। দীননাথের মৃত্যু-উপলক্ষে শম্ভুচন্দ্র স্বীয় পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে প্রশংসা ও নিন্দা জড়িত থাকায় দীননাথের পুত্রগণ কতিপয় ঈর্ষা-পরবশ-পরশ্রী-কাতরলোকের প্ররোচনায় শম্ভু-চন্দ্রের বিরুদ্ধে মান-হানির অভিযোগ আনয়ন করেন। শম্ভুচন্দ্রকে বিপন্ন করিবার জন্য নানাস্থানে বৈঠক বসিতে লাগিল। অনেক কপট-বন্ধু এই বিবাদ আপোসে মিটাইবার জন্য শম্ভুচন্দ্রকে পরামর্শ দিতে লাগিল কিন্তু শম্ভুচন্দ্র এই সকল লোকের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে, তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য; বাতাবর্ত্ত যেরূপ অচলের কিছুই করিতে পারে না, এই শত্রুতাও শম্ভুচন্দ্রকে কোনরূপ ব্যাকুলিত করিতে পারে নাই। দুই একজন মাত্র লোক যথার্থ বন্ধুর কাজ করিতে চেষ্টা পান। জমিদারী পঞ্চায়তের সম্পাদক ৺সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী এই বিবাদ যাহাতে আপোসে মিটিয়া যায় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি শম্ভুচন্দ্রকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলে শম্ভুচন্দ্র যোগেশচন্দ্রকে তাঁহার সহিত পাথুরিয়া-ঘাটার বড়তরফের মহারাজের নিকট প্রেরণ করেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন দীননাথের পুত্রগণের পক্ষে পরামর্শদাতা ছিলেন। যোগেশচন্দ্র মহারাজের নিকট যাইলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। মহারাজ বলিয়াছিলেন যে শম্ভুচন্দ্র যদ্যপি তাঁহার নিকট একবার আসেন তাহা হইলে বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া যায়। কিন্তু শম্ভুচন্দ্র তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে এটা কেবল কৌশল মাত্র। কাজেই মহারাজ শম্ভুচন্দ্রের দর্শন পাইলেন না এবং মোকদ্দমাও আপোসে নিষ্পত্তি হইল না।

পুলিসকোর্ট হইতে মোকদ্দমা হাইকোর্টের দায়রায় যায়। সেখানে বাদীর পক্ষে ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেলারেল উড্রফ্ সাহেব এবং প্রতিবাদীর পক্ষে মিঃ ডব্লু, সি, ব্যানার্জী * কৌনসুলী ছিলেন।

বিচারপতি উইলসন দায়রায় বসেন। ৺দীননাথ মল্লিকের এক পুত্র বিচারালয়ে হলফ করিয়া শম্ভুচন্দ্র যাহা তাঁহার পিতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাহা মিথ্যা বলিলে শম্ভুচন্দ্র দীননাথের পুত্রের কথা সত্য বলিয়া এবং স্বকীয় কথা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিলেন। বিচারপতি উইলসন শম্ভুচন্দ্রের ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া মানহানির মোকদ্দমা শেষ করেন। শম্ভুচন্দ্রকে কেবলমাত্র অর্থদণ্ড করিয়া খালাস দেওয়া হইল দেখিয়া তাঁহার শত্রুগণ অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া শম্ভুচন্দ্র আর এক বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দের নববর্ষ উপলক্ষে শম্ভুচন্দ্রকে উপাধি-ভূষণে-শোভিত করিবার জন্য বড়লাটের ইচ্ছা হয়। তখন আমাদের ছোটলাট ছিলেন সার ষ্টুয়ার্ট বেলীসাহেব। বড়লাটের অভিপ্রায় ছোটলাট জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার চিফ্ সেক্রেটারী সার্ জন্ এডগার সাহেবকে উক্ত উপাধি প্রদান বিষয়ে শম্ভুচন্দ্রের মত জানিবার জন্য আজ্ঞা দেন। ছোটলাট এবং তাঁহার চিফ্সেক্রেটারী উভয়ই শম্ভুচন্দ্রের সহিত বিশেষ

* বাড়ুর্য্যে সাহেব শম্ভুচন্দ্রকে গুরুজী বলিয়া ডাকিতেন। এই মোকদ্দমায় তিনি তাঁহার নিকট হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ করেননাই।

পরিচিত ছিলেন। সার জন এডগার তখন বেঙ্গল ক্লবে থাকিতেন। ৺জগদ্ধাত্রী পূজার পূর্ব্ব দিনে এড্গার সাহেব শম্ভুচন্দ্রকে তাঁহার সহিত বেঙ্গল ক্লবে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শম্ভুচন্দ্র এড্গার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে এডগারসাহেব তাঁহাকে জানাইলেন যে লাটসাহেব তাঁহাকে একত্রে "রায় বাহাদুর এবং C. I. E." উভয় উপাধি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। শম্ভুচন্দ্র অতি বিনয়ের সহিত এড্গার সাহেবকে বলেন যে, লাটসাহেব যেন তাঁহাকে এরূপ উপাধি-ব্যাধি দ্বারা কষ্ট না দেন। অনেক আগ্রহ প্রকাশ করিলেও শম্ভুচন্দ্র রাজি হইলেন না দেখিয়া এডগার সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে কিরূপ সম্মান শম্ভুচন্দ্রের মনোমত বলিয়া তিনি বড় লাটসাহেবের নিকট জানাইবেন। ইহার উত্তরে শম্ভুচন্দ্র বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ সকল অবৈতনিক কার্য্য করিতে তিনি রাজি আছেন। ইহার ফলে লর্ড ল্যান্স্ডাউন শম্ভুচন্দ্রকে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো এবং কলিকাতার অনারারি প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন।

এই অব্দের শেষে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। ফুলমণির কথা এখনও অনেকের মনে জাগরিত আছে। হতভাগিনী তাহার নরাধম স্বামী কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক উপভোগিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তদীয় আত্মীয়বর্গ তাহার স্বামী হরিমাইতিকে বালিকাবধ-অভিযোগে অভিযুক্ত করে। বয়ঃপ্রাপ্তি-সত্ত্বেও শারীরিক উন্নতির অল্পতাহেতু ফুলমণি তাহার স্বামীর সহিত সহবাসে অক্ষমা ছিল, কাজেই হরি মাইতি অভিযুক্ত হইলেও আইনে দণ্ডের যথাযথ বিধান না থাকায় বিচারপতি তাহার গুরু পাপের লঘু দণ্ড বিধান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু যাহাতে এই নৃশংস-অপরাধী বিশেষরূপে দণ্ডিত হয় তজ্জন্য বিচারপতি উইলসন সাহেব গবর্ণমেণ্টকে আইন পরিবর্ত্তনের জন্য পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন আইন-সচিব সার এনড্রুস্কোবল (Sir Andrew Scoble) বড়লাট বাহাদুরের অভিমতে সহবাস-সম্মতি আইনের পাণ্ডুলিপি লাটসভায় পেশ করেন। প্রচলিত আইনানুসারে দশম-বৎসর-বয়স্কা বালিকার সহিত সহবাস আইন সম্মত ছিল। এখন ইহা রদ করিয়া প্রস্তাব হইল যে, দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা বালিকার সহিত সহবাস আইন সম্মত এবং তৎপূর্ব্বে সহবাস-জনিত-দোষে যদ্যপি কোন বালিকার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার স্বামীকে নর-হত্যাকারীর ন্যায় দণ্ডিত হইতে হইবে। আইনের উদ্দেশ্য অতিমহৎ হইলেও এরূপ প্রস্তাব হইবামাত্র হিন্দুসমাজে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। সংবাদপত্রের স্তম্ভে আইনের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় 'প্রতিবাদসভা হইতে লাগিল। পথে, মাঠে, ঘাটে 'সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে' বলিয়া ভীষণ চীৎকার হইতে লাগিল। বিরাট সভা, গভীর বক্তৃতা, উপহাস, কটুকাটব্য এবং নানারূপ উক্তি দ্বারা আইনের প্রতিবাদ হইতে লাগিল।

এইরূপ তুমুল আন্দোলনের সময়ে মস্তক ঠিক রাখিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক যথার্থপক্ষ অবলম্বন করা বিশেষরূপ কঠিন হইয়া পড়ে। একদিকে হিন্দুরমণীর করুণ-আর্ত্তনাদ অপর দিকে আইনের পক্ষে সারগর্ভ যুক্তি যুগপৎ শম্ভুচন্দ্রকে প্রথমে কিঞ্চিৎ বিচলিত করিয়াছিল। প্রথমে তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই, কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত। পরে অনেক চিন্তা করিয়া তিনি আইনের পক্ষসমর্থন করেন। দেশশুদ্ধ লোক আইনের বিপক্ষে, দুচারিজন মাত্র কেবল আইনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্র সমর্থনকারীদিগের অগ্রণী হইলেন। ইঁহাদের একটি সভা স্থাপিত হইল এবং আইনের সমর্থন করিয়া লাটসাহেবের নিকট আবেদন প্রেরণ করা স্থির হইল। উপর্য্যুপরি দুইখানি আবেদন আইনের সপক্ষে প্রেরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রীয়-প্রমাণ-যুক্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ 'রেইস্-এণ্ড-রাইয়তে' প্রকাশিত হয়। ইহা ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের লিখিত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ন কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় রচিত সহবাস সম্মতির আইনের অনুকূল যুক্তি সকল ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ইহার ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্ট বহন করিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্রকে আইনের পক্ষ-

পাতী দেখিয়া দেশের অনেক রাজা মহারাজও তদনুরূপ কার্য্য করেন। ভাওয়ালের মৃত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, ভিজিয়ানাগ্রামের মৃত মহারাজা প্রভৃতি অনেকেই নূতন আইন সমর্থন করেন। লাট সভায় ৺সার রমেশচন্দ্র মিত্র ব্যতীত সকলেই আইনের সপক্ষে কার্য্য করেন। আইন পাশ হইবার দিন ৺সার রমেশচন্দ্র মিত্র লাট সভায় উপস্থিত হন নাই, সুতরাং আইন সর্ব্ববাদি-সম্মত হইয়া পাশ হইল।

আইনের সপক্ষে কার্য্য করিতে যাইয়া শম্ভুচন্দ্রকে অনেক আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। এই কারণ বশতঃ তাঁহার সংবাদপত্রের গ্রাহকসংখ্যার অনেক হ্রাস হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও তিনি একদিনের জন্যও কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই। বোধহয় সিপাহীবিদ্রোহের পর এরূপ আন্দোলন আমাদের দেশে আর হয় নাই। অন্য কোন দেশে এরূপ উত্তেজনা উপস্থিত হইলে বিদ্রোহে পরিণত হইত, কিন্তু এখানে ততদূর হইতে পারে নাই। আইন প্রস্তাবক Sir Andrew Scoble সাহেব কিন্তু বিশেষ ভীত হইয়া ছিলেন। তিনি এই আন্দোলনের সময় বাটীর বাহিরে যাইতেন না, এমন কি লোকজন সাক্ষাৎ করিতে আসিলে অতিসন্তর্পণে দেখা করিতেন। আইনের সপক্ষদিগকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছে বলিয়া গুজব উঠিয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র যথা সময়ে তদ্বিষয় পুলিস কমিশনর বাহাদুরকে জ্ঞাত করান। ডিটেক্‌টিভ্ বিভাগের উপর গোপন অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু সৌভাগ্যের ফলে কোন হত্যাকার্য্য ঘটে নাই। আইন যথাসময়ে পাশ হইল কিন্তু আইনের বিরুদ্ধপক্ষদিগের উপর পুলিসের চক্ষু অনবরত ঘুরিতে লাগিল। তাহার ফলে "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের পরিচালকগণের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এবং লাঞ্ছনা। এই স্মরণীয় মোকর্দ্দমার সহিত বর্ত্তমান প্রস্তাবের কোন সংস্রব না থাকায় তাহার উল্লেখ করিতেবিরত হইলাম।

ক্রমশঃ—

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল।

আবুল ফজল লিখিত ভারতবৃত্তান্ত।

ফৈজি ও আবুলফজল, সম্রাট আকবরের সভার দুইটী উজ্জ্বলরত্ন। ফৈজি সংস্কৃতভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে মানুষকে পরগুণদর্শনে অন্ধ করে। ফৈজি ও আবুল-ফজলের ধর্ম্মজনিত-গোঁড়ামি ছিল না। আবুল ফজল হিন্দুস্থান ও হিন্দুজাতির সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা পাঠক-বর্গের সমীপে তাহা উপস্থিত করিলাম।

হিন্দুস্থানের পূর্ব্বদক্ষিণে সমুদ্র। পূর্ব্বদিকে মালাকা, মলক্‌স্, সুমাত্রা ও অন্যান্য বহুসংখ্যক দ্বীপ। উত্তর দিকে হিমালয়পর্ব্বত। হিমালয়ের এক অংশ হিন্দুস্থানের উত্তরসীমা, অপর অংশ ইরান্ ও তুরাণের অন্তর্গত। এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সর্ব্বত্রই সুজল ও সুফল। এই সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই বায়ু স্বাস্থ্যকর ও নাতিশীতোষ্ণ; ইহার অধিবাসিগণ শান্ত-প্রকৃতিক। সর্ব্বত্রই লোকের বাস; সর্ব্বত্রই সমৃদ্ধি-সম্পন্ননগর। বর্ষাকাল অতি মনোহর ও এত স্বাস্থ্য-প্রদ যে, বৃদ্ধকেও যুবার ন্যায় উৎসাহ ও শক্তি প্রদান করে।

এই সাম্রাজ্যের প্রধান অধিবাসী হিন্দু। হিন্দুরা সভ্যভব্য, ধার্ম্মিক, বিদেশীয়গণের প্রতি ভদ্রতা-সম্পন্ন, হৃষ্ট-চিত্ত, জ্ঞান-পিপাসু, ক্লেশ-সহিষ্ণু, বিচার-প্রিয়, কর্ম্মপটু, শান্তি-পরায়ণ, কৃতজ্ঞ, সত্যানুরাগী ও বিশ্বাসী। বিপদের সময় হিন্দুদের এই সকল গুণ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। হিন্দুরা সমর-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে জানে না। ঘোড়া যাহাতে তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন না করে, তাহার জন্য পলায়নোন্মুখ অশ্বের জঙ্ঘার শিরা কাটিয়া দেয়। হিন্দুরা শিক্ষকদিগকে অত্যন্ত সম্মান করে ও ঈশ্বরের-কার্য্যে সন্তুষ্ট-চিত্তে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বে এই জাতির আপামর সাধারণের সুদৃঢ় বিশ্বাস। যদিও তাহারা প্রতিমূর্ত্তিকে অসাধারণ সম্মান করে, তথাপি তাহাদিগকে প্রকৃত পৌত্তলিক বলা যায় না। অজ্ঞলোকে

না জানিয়া তাহাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া থাকে। আবুলফজল বলিতেছেন, "আমি সর্ব্বদাই বহু শিক্ষিত, ধার্ম্মিক ও অকপট হিন্দুর সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, তাঁহারা মনে করেন যে, দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে মন নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। প্রতিমূর্ত্তি দেবতা নহে।"

হিন্দুরা উপাসনার সময় সূর্য্য হইতে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকে। পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করেন না, ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণু পালন, ও মহাদেব জগতের সংহার করেন, সাধারণতঃ হিন্দুজাতির এইরূপ বিশ্বাস। অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই ত্রিবিধ আকার গ্রহণ করিয়া জগতে আবির্ভূত হন। খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদও এইরূপ। একসম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবতা মনুষ্য মাত্র। পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাবের জন্য তাঁহারা মানবাতীত ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। হিন্দুরা মনে করে সৃষ্টির আদি নাই। একসম্প্রদায় বলেন যে, উহার নাশ আছে। এটী একটি অদ্ভুত ব্যবস্থা যে, কেহ ব্রাহ্মণ হইতে চাহিলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেনা, ব্রাহ্মণও অন্য জাতি হইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে দাসত্ব-প্রথা নাই। যুদ্ধে যাইবার সময় আপনাদের স্ত্রীলোকদিগকে একস্থানে আনিয়া রাখে। তাহাদের চারিপার্শ্বে দাহ্য-বস্তুর স্তূপ সাজাইয়া একজন নির্দ্দয় লোককে বলিয়া যায় যে, যদি যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে যেন, এই বস্তুর স্তূপে আগুন দেওয়া হয়। এইরূপে তাহারা নারীগণের সতীত্ব ও সম্মান রক্ষা করে। কত শত-সহস্র নির্দ্দোষ-প্রাণী, এই নিষ্ঠুর প্রথায় ভস্মীভূত হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা নাই।

অপরিচিত শরণাগতের জন্যও হিন্দুরা আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ-দ্বারা যুদ্ধের ভাগ্য-নির্ণীত হইত, এখন সে প্রণালী পরিত্যক্ত হইয়াছে।

হিন্দুস্থানের অধিকাংশ ভূমি কৃষিকার্য্যের উপযোগী। এই সাম্রাজ্যে হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ও লৌহের আকর আছে। এ রাজ্যে সুগন্ধিবৃক্ষের অভাব নাই। নানারূপ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এই সাম্রাজ্যে যেমন হাতী পাওয়া যায় অন্যদেশে তেমন পাওয়া যায় না। আরবের ন্যায় সুন্দর ঘোড়া পাওয়া যায়। এদেশের ষণ্ডগুলি অতি সুন্দর। এদেশের দোষ এই যে, শীতল জল মিলে না, আঙ্গুরের চাষ হয় না। কার্পেট শিল্প নাই। এদেশের লোক উট পালে না। সম্রাট এই সকল দোষ শোধনের চেষ্টায় আছেন। সোরা দিয়া কিরূপে জল পরিষ্কৃত ও শীতল করিতে হয় অনেক লোককে তাহা শিখাইয়াছেন। আঙ্গুরের চাষ শিখাইবার জন্য, ইরাণ ও তুরাণ হইতে অনেক সুশিক্ষিত মালী আনাইয়াছেন। উত্তরের পর্ব্বত হইতে বরফ আনাইতেছেন। উষ্ট্রের উন্নতি ও প্রাচুর্য্যের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার যত্নে কার্পেট শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি-সাধিত হইয়াছে।

সৃষ্টি সম্বন্ধে হিন্দুদের আঠারটী মত আছে, তন্মধ্যে তিনটী প্রধান মত বলা যাইতেছে।

প্রথম মত—পরমেশ্বর মনুষ্যের আকার ধারণ করিলেন। এই মনুষ্যাকৃতির ব্রহ্মা নাম হইল। ব্রহ্মার চারি মানস পুত্র হইল, যথা সিংহ (সনক), সান্দেন্ (সনন্দ) সনৎকুমার ও সনাতন। ব্রহ্মা, তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেননা। ইহাতে ব্রহ্মার ক্রোধোদয় হইল। ব্রহ্মার ললাট হইতে মহাদেবের উদ্ভব হইল। তাঁহাকেও সৃষ্টি কার্য্যের অনুপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর অপর দশ জনের সৃষ্টি করিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মার শরীর হইতে এক পুরুষ ও এক নারীর উদ্ভব হইল। পুরুষের নাম মনু ও নারীর নাম শতরূকা (শতরূপা) হইল। ইহাঁরাই মনুষ্যজাতির আদি পিতা ও আদি মাতা।

দ্বিতীয় মত—পরমেশ্বর আপনাকে নারীরূপে প্রকাশিত করিলেন। এই নারীরূপের মহালছমী (মহালক্ষ্মী) নাম হইল। মহালক্ষ্মী হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্ভব হইল। মহালক্ষ্মীর যখন সৃষ্টি কার্য্যে অভিলাষ হইল, তখন তিনি তমোগুণের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তমোগুণের সহ মিলিত হইয়া মহাকালী নাম ধারণ

করিলেন। মহালক্ষ্মী সত্ত্বগুণের সহ মিলিত হইয়া সরস্বতী হইলেন। মহালক্ষ্মী হইতে শ্রী, ত্রয়ী ও সাবিত্রীর জন্ম হইল। মহাকালী হইতে মহাবিদ্যার উদ্ভব হয়। সরস্বতী হইতে বিষ্ণু ও গৌরীর উৎপত্তি হয়। মহালক্ষ্মীর ইচ্ছানুসারে ত্রয়ী ব্রহ্মার, গৌরী মহাদেবের ও শ্রী বিষ্ণুর ভার্য্যা হইলেন। ব্রহ্মা ও ত্রয়ীর সংস্রবে একটী অণ্ডের উৎপত্তি হইল, মহাদেব তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। ঊর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ হইতে দেব দৈত্যাদির, নিম্নার্দ্ধ ভাগ হইতে মনুষ্যাদি জীব ও উদ্ভিদের উদ্ভব হইল।

তৃতীয় মত—সূর্য্য-সিদ্ধান্তে এই মতটী লিখিত হইয়াছে। মন্ত্রিপ্রবর বলিয়াছেন এই গ্রন্থ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে, সৃষ্টি-রহস্য জানিবার জন্য ময়দৈত্য সহস্র বৎসর তপস্যা করেন। সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন। ময় তাঁহার নিকট সৃষ্টিরহস্য পরিজ্ঞানের অভিলাষ করেন। সূর্য্য, তাঁহাকে বলিয়া যান যে, তুমি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমাকে চিন্তা করিলে আমি উপস্থিত হইয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব। ময় তাহাই করিলেন। সূর্য্য উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমুদয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। সূর্য্য সিদ্ধান্তে ময়ের প্রশ্ন ও সূর্য্যের উত্তর সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে, সূর্য্য হইতে সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্য, ঐশ্বরিক তেজের প্রতিনিধি। পরমেশ্বর, যে গোলকটীর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিজের আলোক প্রদান করেন, তাহাই সূর্য্য। সূর্য্য হইতে দ্বাদশ রাশির সৃষ্টি হয়। দ্বাদশ রাশি হইতে চারি বেদের উদ্ভব হয়। অনন্তর চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি সমুদায়ই সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইল। আকাশ হইতে গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

আবুল ফজল সৃষ্টি সম্বন্ধে আঠারটী মতের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের পুরাণের সংখ্যাও আঠার। প্রত্যেক পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে সমুদায় পুরাণ এক মতাবলম্বী নয়। এমন গুরুতর বিষয়ে কোনকালে কোন দেশে মনীষিগণ এক মতাবলম্বী হন নাই। কখনও যে হইবেন, এমন সম্ভাবনা নাই। নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে মিলে নাই বলিয়া তিনি যে, এই সকল মতের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করেন নাই, তাহা আকবরের সভাসদের উপযুক্তই হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

তাণ্ডব পঞ্চক।

(১)

অঙ্গে বিভূতি অজিন-বসন—
হেরগো সৃষ্টি মণ্ডপে—
চৌদিকে লয়ে ভূত প্রেতগণ
ভৈরব নাচে তাণ্ডবে।
গম্ভীর গুরু ডমরু বাজিছে,
শিরে দোলে ফণী উল্লসি,
আঘাতি পটহ নন্দী গাহিছে
বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী।

(২)

গ্রহ জ্যোতিষ্ক দ্বাদশ সূর্য্য
ঊর্দ্ধ গগনে স্তম্ভিত ;
ভীষণ ঝটিকা, নিনাদে তূর্য্য ;
শৈল সিন্ধু কম্পিত।
পাতাল করিয়া গরলে দগ্ধ
বাসুকি উঠিল নিশ্বসি।
ত্রিভুবনে ওঠে গভীর বাদ্য,—
জয় জয় হর সন্ন্যাসী।

(৩)

অন্তের ত্রাসে অন্তক ভীত,
চমকি উঠিল ইন্দ্র ;
দেবতাবর্গ সবে শঙ্কিত,
ভুলিল রক্ষামন্ত্র।
সম্বর খেলা, শঙ্কর শিব!
উচ্চরে বাণী বিন্যাসি' :
সংহার-রূপ সংহর ভব!—
বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী

(৪)

স্তোত্র বচনে বাজে বাদিত্র
গরজি অধিক গরবে ;
দ্বিগুণিত ভূত ফণীর নৃত্য
ভীম তাণ্ডব-পরবে।
জটায় গঙ্গা তুলিল তুফান,
পড়ে তরঙ্গ উচ্ছ্বসি ;
ত্রিশূল ঘুরিল উজলি বিমান ;
জয় জয় হর সন্ন্যাসী।

(৫)

নিত্য তোমারি নৃত্য হেরিয়া—
তোমারি চরণ প্রান্তে
অসীম সৃষ্টি চলিছে ঘুরিয়া,
শূন্যপথে অনন্তে।
ঝটিকা মথিয়া মঙ্গল গীতি
উঠিছে ; শুনিছে বিশ্বাসী।
জয় জয় শিব বিশ্বমূরতি
বোম্ ব্যোম্ হর সন্ন্যাসী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

একখানি পুরাতন দলিল।

প্রাচীনকালের কথা শুনিতে বা জানিতে মানব মাত্রেরই মনে স্বতঃই একটা বাসনা জন্মিয়া থাকে। আর বিষয়টি যদ্যপি প্রয়োজনীয় হয় তাহা হইলে সেই বাসনার পরিবর্ত্তে ঔৎসুক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। বাঙ্গলা ভাষার মহারথী বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাবর্গের পূর্ব্বে অর্থাৎ শতবৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার ও সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, বাঙ্গালীর সামাজিক রীতি নীতি, আচার-ব্যবহার, চরিত্র-প্রকৃতি, দেশের অবস্থা প্রভৃতি কি প্রকার ছিল তাহা জানিতে স্বভাবতঃই মনোমধ্যে কৌতূহল উদ্দীপিত

হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত সকল বিষয়ের একত্র সমাবেশ ও বিশদ বর্ণনাপূর্ণ ইতিহাস বাঙ্গলায় বিরল। সেইকারণে প্রাচীন লিপি, শিলা লিপি ও পুরাতন দলিলাদি তৎকালীন ইতিহাসের কোন কোন বিষয়ের কতক পরিমাণে উপাদান সংগ্রহার্থ আমাদের সাহায্য করে।

লেখকের বাটীতে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত দীর্ঘায়তনের একখানি পুরাতন দলিল আছে, তাহা হইতে পাঠক পাঠিকাগণকে তৎকালীন ভাষা ও অপর কোন কোন বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দলিলের বিবরণ।

উক্ত দলিলখানি বাঙ্গলা ১২১৮ সালের ২৯এভাদ্র লিখিত হইয়াছে। ইহার আকার সাধারণ কোষ্ঠীর ন্যায়। লম্বে প্রায় ২৬ ফিট্ এবং চওড়ায় এক ফুটের কিছু কম। ত্রয়োদশ খানি দুই ফিট্ দীর্ঘায়তনের কাগজ সংযুক্ত করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল কাগজ বিলাতি প্রস্তুত, উহার মধ্যে জলের অক্ষরে লেখা আছে S. wise and patch এবং ইঙ্গরাজিতে ১৮০৬। প্রতি কাগজের সংযোগস্থলের উভয়পার্শ্বে একটি করিয়া সুস্পষ্ট গোলাকৃতি এম্বস্ট করা মোহর আছে। উহার একটিতে উর্দ্দু, বাঙ্গলা ও হিন্দিতে 'কাগজ আদালত দেওয়ানি' এবং ইংরাজিতে Stamp Office লেখা আছে ; আর অপরটিতে উর্দ্দুতে 'খাজনা সম্বন্ধীয়' বাঙ্গলা ও হিন্দিতে 'খাজানা আমরা' এবং ইংরাজিতে "Treasury" লেখা আছে। এই দুইটি ভিন্ন পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় ঠিক সংযোগ স্থলের উপর একটি করিয়া কালিতে ছাপা ডিম্বাকারের মোহর করা আছে। এই মোহরগুলির নির্ম্মাতা ও ছাপার কালির মাহাত্ম্যে উহা এতই অস্পষ্ট যে কোন মতে ভালরূপ বুঝিতে পারা যায় না। বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে বাঙ্গলায় 'মোহর আদালত দেওয়ানি চুঁচুড়া ও ফরাশডাঙ্গা ও———সন ১৮০৮——' লেখা আছে ; ফরাশডাঙ্গার পর এবং ১৮০৮এর পর কি লেখা আছে তাহা কিছুতেই বোধগম্য হইলনা। উর্দ্দু ভাষায় যাহা লেখা আছে তাহাও বড়ই অস্পষ্ট। দলিলের প্রথমে ও শেষে সেখ সৈয়দরাজি নামক সেরেস্তাদারের উর্দ্দূতে

দস্তখত আছে। এবং প্রথমে ইংরাজিতে Filed 13th Sept 1811 Signed. G. Forbes Judge লেখা আছে।

এক্ষণে উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শতবর্ষ পূর্ব্বে যখন ভারতে পাশ্চাত্য প্রভাব শিশু অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তখনও আধুনিক সময়ের মত বিলাতি কাগজ, বিলাতি কেতা প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছিল। তৎকালেও চন্দননগর ফরাশি শাসনাধীন থাকিলেও এখনকার ন্যায় আদালতে ফরাশি ভাষা অধিক ব্যবহৃত হইত না এবং চুঁচূড়া ফরাশডাঙ্গার সহিত কোন বিষয় সংলিপ্ত ছিল। মোহর দৃষ্টে ও সমস্ত দলিলখানি পাঠে অবগত হওয়া যায়, চন্দননগরকে তখন কেবল ফরাশডাঙ্গা বলিত।

দলিলের আয়তন যে প্রকার দীর্ঘ তাহাতে তাহার সমুদয় তুলিয়া দেখাইতে পারি তাদৃশ স্থান 'প্রদীপে' নাই, সুতরাং সে আশা না রাখিয়া সংক্ষেপতঃ তাহার বিষয় ও বিবরণ লিখিতেছি, নিতান্ত আবশ্যক মত কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিব।

দলিল লেখকের নাম শ্রীবিশ্বনাথ বসু। ইনি তৎকালীন ফরাশি কোম্পানির আমিন ছিলেন। দলিলের লেখা আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ,—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

"মহামহিম শ্রীযুক্ত সহর ফরাশডাঙ্গার—
জজ সাহেব বরাবরেষু।"—

"কৈফিয়ত রোয়দাদ শ্রীবিশ্বনাথ বসু আমিন মতায়নে আদালতে দেওয়ানি সহর ফরাশডাঙ্গা ১৮২৬ নম্বরে ফৈরাদি জগমোহন শরকার আশামি রামপ্রসাদ সরকার এ মোকদ্দমা ফৈরাদির দরখাস্ত মতে ডিকরি জারি কারণ আমাকে আমিনি কার্য্য মকরর করিয়া সহর হইতে আমার পর এক কেতা পরআনা ছাদর হয়—তাহার মজম্মন এই।*—"

তৎপরে আমিনের প্রতি আদালতের হুকুম নামার নকল, ডিক্রির খোলসা, সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিভক্ত করিয়া দিবার হুকুম, ফরিয়াদি জগমোহন সরকারের দাবির ফর্দ্দ, আসামিদের জবাব, আমিনের তদারক, সম্পত্তির বিস্তারিত তালিকা প্রভৃতি পর পর বিশদরূপে লেখা আছে।

জগমোহন সরকারের পিতা ৺রামকানাই সরকার চন্দননগরের তৎকালীন একজন ধনী ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। উক্ত সরকারদের যে স্থানে বাটী ছিল এবং অদ্যাপিও যাহার অতি সামান্য অংশ মাত্র অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, সেই স্থানকে আজিও সরকার-পাড়া বলে। তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে ভাগীরথি-তীরে একটি স্নানের ঘাট অদ্যাপি জীর্ণভাবে বর্ত্তমান আছে, তাহাকে লোকে 'কানাই সরকারের ঘাট' বলিয়া থাকে। দলিল হইতে সংক্ষেপে সরকারদিগের সংসারের কতিপয় বৎসরের আয়-ব্যয়, পূজা-পার্ব্বণ, দান-খয়রাৎ, আসবাব পত্র প্রভৃতির অনেক কথা ও আনুষঙ্গিক বিবিধ বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রথমে দলিলের ভাষার কথা বলিয়া পরে ঐ সকল বিষয় বলিব। এই সুযোগে বলিয়া রাখি, উল্লিখিত সরকারদিগের সহিত লেখকের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার পিতামহ উহাদের কোন জমি খরিদ সূত্রে দলিলখানি প্রাপ্ত হন।

দলিলের ভাষা।

বাঙ্গলা ভাষার বয়ঃক্রমের হিসাবে একশত বৎসরকাল নিতান্ত অল্প না হইলেও কথিত দলিলখানির ভাষায় এমন কিছু অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা বুঝিবার অভাবে মোটামুটি অর্থবোধের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে। যে সকল কথার অর্থ বোধগম্য হইল না, বিবেচনা হয় তাহার কতকগুলি বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গলা ভাষায় অপ্রচলিত, তৎকালীন মুসলমান ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ এবং অবশিষ্ট গুলি সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ। সে সময়ের ভাষার ব্যাকরণ বা একটা প্রচলিতপদ্ধতিহীনতার পরিচায়ক। পাঠকের সম্যক অবগতির জন্য নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েক স্থান হইতে কিছু অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কেবলমাত্র পাঠের অসুবিধা নিবারণার্থ একত্র সংলগ্ন শব্দগুলি সাধ্যমত পৃথক করিয়া দিব।

* উদ্ধৃতাংশমধ্যে কোন পরিবর্ত্তন করি নাই, কেবল যে যে অক্ষর বা যুক্তাক্ষরগুলি ঠিক আধুনিকভাবে লেখা নাই বা থাকিলেও আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই অথচ সেগুলি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বোধ হয় নাই, মুদ্রণের সুবিধার্থে সেগুলি ঠিক করিয়া দিলাম মাত্র। ভবিষ্যতেও এইরূপ উদ্ধৃত হইবে। লেখক।

ক—"পরে ইহার সেজো ভাইকে বড় ভাই কাজ দিয়াছিলেন ফরাশীষ কোম্পানির দরুণ আপনার নাম করিয়া ইহাতে এই সেজো ভাই যদি কখন বাটীছাড়া হইয়াছে কোন আড়ঙ্গে জাইতে কিন্তু ইনিও মকরর ঐ পৈত্রিক বাটীতে রহিয়াছেন উহার স্ত্রি উহার পরিবার ষুঙ্গা (১) ইস্তক নাগাইদ এহার বিভাহের খরচ উহার বড় ভাই করিয়াছে"—

খ—"পরে ইঙ্গরাজি ১৭৮৭ সালে চারি ভাই একত্র হইয়া একটা কণ্ট্রাক্ট কারবার ফরাশি কোম্পানির সহিত করে কাপড় দিবার কারণ এই অবধি এই তিন ছোট ভাই কবুল করে যে আমরা এক গ্রস্তে এক শাজায় দৌলতের মধ্যে বড় ভাএর সহিত আছি কিন্তু ওষ্টীকরে আর কহে যে ইহার পূর্ব্বে এক ভাই আলাদা আলাদা কারবার করিয়াছি আপন আপন নিজের ইহার ভাগ দিতে চাহে না বড় ভায়ের আসল ওয়ারিশকে ইঙ্গরাজি ১৭৮৭ সালের পূর্ব্ব"—

গ—"এই চারি ভায়ের পৈত্রিক যে কিছু আছে তাহার চারি হিশ্বার এক হিশ্বা বড় ভ্রাতশ্পুত্র পাইবেক অধিক পাইবেক না এই ব্যবস্তা সাস্ত্রানুসারে লিখিলাম শাহেব। গৌর করিবেন ইতি শহি করেন শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাবাগিশ ভট্টাচার্য্য"—

ঘ—"তাহাতে পরওয়ানার হুকুম মাফিক ডিগরিতে সাধারণ জায়দাদ স্থাবর ও অস্থাবর কোন নিবারিজ না থাকাতে ফৈরাদিকে সন ১২১৬ সাল তাং মাঘ রুবকারিতে কহা গেল ডিকরি আহুজাই তোমার দাবির ফর্দ্দ দাখিল করহ ৯ ফাল্গুন। রুবকারিতে স্থাবর দাবির ফর্দ্দ দাখিল করে—তাহার মজম্মন এই।"—

ঙ—"লিখিতং শ্রীরামশুন্দর সরকার এই মোং কলিকাতার বাশা বাটীর বাহিরের কুটরি ভাড়া সন ২ যেমত২ পাইয়াছি তাহার জমা খরচের ফর্দ্দ দাখিল করিতেছি ইহাতে তফাৎ নাই ফৈরাদি মজঙ্গর তফাৎ বাহির করিতে পারেন তাহার হিশ্বা পাইবেন আর সাধারণের খরচ যে হইয়াছে তাহার ফর্দ্দ পশ্চাৎ দাখিল করিব ইতি সন ১২১৭ সাল তাং ৭ই বৈশাখ।"—

চ—"ঐ জায়দাদ জামিন ও এমারত ও ভদ্রাসন বাটী ও আর আর ও গয়রহ ও বাগান ও পূষ্কন্তিদিগর পৈত্রিক সাফস্বিরাম সরকারের নামের সহর ফরাশডাঙ্গার ও গয়রহ আসামি—জায়দাদ রকম নাম করণ।"—

যে যে অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা তিন শ্রেণীর লোকের লেখা ক, খ, ঘ ও চ চিহ্নিত অংশ একজন আদালতের উচ্চ কর্ম্মচারী অর্থাৎ আমিনের লেখা; গ এক জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের লেখা এবং ঙ একজন ধনবান গৃহস্থের লেখা। উক্ত লেখার মধ্যে 'আড়ঙ্গে' 'মকরর,' 'ষুঙ্গা' 'শাজায়' 'ওষ্টীকরে' 'গৌর,' 'জায়দাদ,' 'রূবকারিতে" 'আহুজাই,' 'মজঙ্গর,' 'হিস্যা,' 'মজম্মন' 'গয়রহ'—এই কয়টি কথার মধ্যে শাজায় অর্থে বাটীতে, ওষ্টীবার অর্থে স্বীকার করে, হিস্যা অর্থে অংশ এবং মজম্মন অর্থে বিশেষ বিবরণ বুঝাইতেছে। অবশিষ্ট কয়টি কথার অর্থ ঠিক করিতে পারা যায় না। 'রূবকারিতে' এই শব্দটি সর্ব্বত্রই যেখানে কোন একটি তারিখের উল্লেখ আছে তাহার পশ্চাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই বোধ হয় উহার অর্থ তারিখ। সমস্ত দলিল খানির ভিতরে 'ওয়াশিল' 'হকিকত' 'জাবেদা' 'ছাদর' প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ঐরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল শব্দ উর্দ্দূ বা অন্য কোন ভাষার কি না জানি না। এক্ষণে ভাষা মধ্যে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। (১)

ঐ প্রকার অবোধ্য শব্দগুলির ন্যায় আরও এমন বিস্তর শব্দ দৃষ্টিগোচর হয়, যাহা এখনকার ভাষায় প্রচলিত না থাকিলেও সামান্য চেষ্টাতেই অর্থ বুঝিতে পারা যায়। যেমন বিভাই (বিবাহ) পূষ্কন্তি (পুষ্করিণী) নিবারিজ, ওঙ্কা, গ্রস্ত (গৃহস্থ) প্রতক (পৃথক) ইত্যাদি লেখা মধ্যে বর্ণাশুদ্ধির সংখ্যা এত অধিক যে উহা দেখিয়া মনে হয়,

(১) "ষুঙ্গা" শব্দটী বোধ হয় শুদ্ধা,—শুদ্ধ (সমেত) শব্দের অপভ্রংশ। প্র, সং

(১) উল্লিখিত শব্দগুলির অধিকাংশই উর্দ্দু, পারসী ও তাহার অপভ্রংশ। এখনও জমিদারসেরেস্তায়, দলিলে উহাদের ভুরি প্রচলন আছে। প্রাচীনলেখা পড়ার দোষেও অনেকস্থানে অর্থপ্রতীতি হয় নাই। যথা 'মজঙ্গর'—শব্দটী কিন্তু মজকুর। পূর্ব্বে 'কু' অক্ষরটী 'ঙ্গ' এই ভাবে লিখিত হইত। মজকুর শব্দের অর্থ গণ,—সমূহ। আড়ঙ্গ—হাট—বাজার।—জায়দাদ—সম্পত্তি। মকরর—নিযুক্ত। গয়রহ—প্রভৃতি। জাবেদা—যথার্থ। ছাদর—জারি। ইত্যাদি প্র, সং।

তখন কোন শব্দের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বানান নির্দ্ধারিত ছিল না। যাঁহার যাহা মনে হইত তিনি তাহাই লিখিতেন। দলিলের লিখিত সমস্ত বর্ণাশুদ্ধিগুলি তুলিয়া দিলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বাড়িয়া যায়। সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও পণ্ডিত লোকের লেখাও ঐরূপ দোষপূর্ণ। বিদ্যাবাগীশ উপাধিধারী কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ৭।৮ ছত্রের মধ্যে ব্যবস্থা, ভ্রাতষ্পুত্র, শাস্ত্র,ভট্টাচার্য্য, বাগীশ প্রভৃতি আট নয়টি অশুদ্ধ শব্দ লিখিয়াছেন।

যুক্তাক্ষরগুলি অনেক স্থলে বুঝিতে পারা যায় না, এবং অধিকাংশই প্রায় এক প্রকারের। কু, দ্দ, জ্ঞ, ক্ক, দ্ধ, এই পাঁচটি যুক্তাক্ষর সকল স্থানেই একই প্রকারের লেখা আছে। তাহাদের আকার অনেকটা ঊর্দ্ধাংশবিহীন ঙ্গ কারের ন্যায়।

কোন কোন ব্যবসাদারি বাঙ্গলা খাতায় যেরূপ 'ণ' মত 'ল' দেখিতে পাওয়া যায়, ল অক্ষরটি দলিলের সর্ব্বত্রই সেই আকারে লিখিত আছে; এবং অনুস্বার 'ং' এরূপ না লিখিয়া তৎস্থানে কেবল একটি ক্ষুদ্রাকৃতির বিন্দুমাত্র আছে। সর্ব্বোপরি লিখিত দুর্গানাম ভিন্ন অপর সকল স্থানেই দণ্ড হ্রস্ব উ স্থানে 'দ্ব' লেখা আছে। উপস্থিত সময়েও আমি ঐরূপ লিখিতে দেখিয়াছি। কেবল কদাচিৎ দুই একটি পূর্ণচ্ছেদ ভিন্ন, প্রায় অন্য কোন প্রকার ছেদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি অল্প সংখ্যক হইলেও তখন হইতেই ভাষা মধ্যে গ্লাস্, লণ্ঠন, গিল্টি, কোম্পানি, ইস্কোয়ার (square) রিপোর্ট প্রভৃতি ইংরাজি কথার প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে। দলিলের লেখা কিছু বড় বড়, অস্পষ্ট নহে; কিন্তু প্রত্যেক শব্দগুলি এত ঘনভাবে লিখিত যে অনেক স্থলে কোন্ অক্ষরটি কোন্ শব্দের তাহা বুঝিতে পারা কঠিন হইয়া উঠে।

অন্যান্য কথা।

সংক্ষেপতঃ দলিলের লেখা এবং ভাষার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল, এতদ্ভিন্ন উহা হইতে অন্যান্য যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ হইতে পারে, নিম্নে তাহার কয়েকটি লিখিত হইবে। লিখিত সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা ও ব্যবসায়াদির কথা পাঠে সরকার মহাশয়দিগকে ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তৎকালে তাঁহাদের যে প্রকার খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল শুনা যায়, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে ধনশালী জমিদারের ভাগ্যে তাদৃশ নাম ও প্রসিদ্ধি লাভ ঘটে না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে অর্থের মূল্য এখনকার তুলনায় তখন অনেক অধিক ছিল।

ফরিয়াদি জগমোহন সরকারের পিতা ও খুড়া প্রভৃতি ১৭৮৭ সালে ফরাশিষ কোম্পানীর যাবতীয় বস্ত্র সংগ্রহের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিলেন। ইহা হইতে কতকটা অনুমিত হয় যে, ইউরোপীয় বস্ত্রাদির আমদানি তখনও আরম্ভ হয় নাই বা হইলেও অতি সামান্য পরিমাণে হইত।

অস্থাবর সম্পত্তির তালিকায় টিপাই, কেদারা, মেজ প্রভৃতির নাম দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়েও ঐ সকল আসবাব ব্যবহৃত হইত। তালিকা মধ্যে 'কাদাত' 'লাল কিরশাজ' 'গডা' 'যুজনি' 'কেণ্টব' এই পাঁচটি দ্রব্যের নাম দেখিয়া উহা যে কি দ্রব্য তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সোনা ও রূপার গিল্টি চামর ও শামাদানের উল্লেখ দেখিয়া তখনও গিল্টির ব্যবহার হইত বুঝিতে পারা যায়।

তখনকার দিনে যাবতীয় দ্রব্যাদির স্থলভ মূল্য বশতঃ ও অন্যান্য বিবিধ কারণে অনেক অল্পব্যয়ে লোকের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। দলিল হইতে তখনকার কোন কোন দ্রব্যের মূল্যের এবং ক্রিয়াকলাপের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের ব্যয়, লোক জনের বেতন, জমির মূল্য প্রভৃতির একটা স্থূল অনুমান করা যাইতে পারে। উক্ত সরকার মহাশয়দিগের সময়ে চন্দননগরে তাঁহাদিগের মত ধনী এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বোধ হয় অল্পই ছিল। কিন্তু তাহাদের কতিপয় পূজা, শ্রাদ্ধাদির খরচের হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের অপেক্ষা আর্থিক বিষয়ে অনেকাংশে হীনসম্মান গৃহস্থের সেই সেই বিষয়ে ব্যয় অনেক অধিক হইয়া থাকে, অথচ তাহাতেও সেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ ঘটে না। বাঙ্গলা ১১৯৯ সাল হইতে ১২১৬ সাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সংসারের অনেক বিষয়ের খরচের হিসাব লিখিত আছে। সংসার খরচ বৎসরে কত টাকা হইত তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। ১২৫৲ হইতে ১৭৫৲ টাকা মাসিক ব্যয় হইত এইরূপ কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। দ্বারবানের বেতন ১২০২

সাল হইতে ১২১৭ সাল পর্য্যন্ত মোট ৫৭০৲ টাকা খরচ লেখা আছে। তাহা হইলে মাসিক বেতন ৩৲ টাকা ছিল। দ্বারবানের মাহিনা মাসিক ৩৲ টাকা হইলে দাস দাসীর মাহিনা ২৲ টাকার অধিক ছিল বলিয়া মনে হয় না। ১২০২ সাল হইতে ১২১৬ সাল পর্য্যন্ত ৺দোলযাত্রা, রথযাত্রা, জন্মযাত্রা ও গাজনের খরচ মোট ১৬১৬৷৷০ অর্থাৎ গড়ে বাৎসরিক ১০৮৲ টাকা উক্ত চারিটি পর্ব্বোপলক্ষে ব্যয়িত হইত। আধুনিক সময়ে চন্দননগরের ন্যায় সহরে একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কোন একটি মাত্র পূজা করিলেও তাহার ব্যয় উহা অপেক্ষা কম হয় না। জন্মযাত্রা নামে কোন পূজা পার্ব্বণ অধুনা প্রচলিত নাই। জন্মাষ্টমী বা জন্মতিথির উৎসবকে তৎকালে সম্ভবতঃ জন্মযাত্রা বলিত।

১১১৯ সালে স্বনাম প্রসিদ্ধ রামকানাই সরকারের শ্রাদ্ধের সমুদয় ব্যয়ের সংখ্যা মোট ২৯২৭৬৫ টাকা। এই সামান্য লেখক, বিশ পঁচিশ সহস্র টাকা ব্যয়ের শ্রাদ্ধ চারি পাঁচটি দেখিয়াছে এবং এই স্থানেই কোন ধনী ব্যক্তির পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা ব্যয়ের শ্রাদ্ধের কথা শুনিয়াছে। এতৎপ্রদেশে তাহাদের মান সম্ভ্রমের কথা এখনও কখন কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শতবর্ষ পরে তাঁহাদিগের নাম কাহারও নিকট বিদিত থাকিবে কি না সন্দেহ।

চাউলের মূল্য তখন কত ছিল তাহা ঠিক জানিতে না পারা যাইলেও, এখনকার তুলনায় অতি অল্পই ছিল বুঝিতে পারা যায়। একস্থানে দলিল কর্ত্তাদের ব্যবসায়ার্থে তেরহাজার মণ চাউল খরিদের উল্লেখ আছে। ঐ চাউলের মূল্য ও বাজে খরচ ১৭০৭৯৷৷৵ টাকা লেখা আছে। এই বাজে খরচ অর্থে চাউল খরিদের অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ কি অন্য প্রকারের খরচ ৫০০০৲ টাকা ধরিলেও চাউলের মূল্য প্রতি মণ ১৲ কিঞ্চিদধিক টাকা হিসাবে দর হয়। এই অনুমান কতদূর নির্ভুল তাহা জানি না। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে চাউলের মণ এক টাকারও কম ছিল। চন্দননগরে এক্ষণে ৮২৷৷৵০ বিরাশি তোলা দশ আনা ওজনকে একসের বলে। তখন ওজন কিপ্রকার ছিল জানিনা।

দলিলে তখনকার সময়ের চন্দননগরের ও কলিকাতার কয়েক দফা জমির মূল্য, বাটী ভাড়া প্রভৃতির হিসাব ও অপর কোন কোন বিষয় দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, কলিকাতা তখন অভ্যুদয়ের পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু চন্দননগরের অবস্থা তখন হইতে ক্রমশঃ হীন হইতে থাকিলেও কলিকাতার অপেক্ষা উন্নত ছিল। তখন দশ বিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তি-গ্রাম সকলের ধনবান্ লোক সমূহ বাণিজ্যার্থ কলিকাতায় গমন করিত। বাটির ভাড়া কলিকাতার অপেক্ষা বেশী ছিল। লেখা আছে কলিকাতার মেছুয়াবাজারের একটি প্রকাণ্ড বালাখানা বাটীর বাহিরের চারিটি ঘরের ১২০১ সাল হইতে ১২১৬ সাল পর্য্যন্ত ১৬ বৎসরের ভাড়া মোট ১১৭২৸৵ টাকা অর্থাৎ মাসিক ভাড়া ৬৲ টাকার কিছু অধিক। স্থতরাং প্রত্যেক ঘরের ভাড়া গড়ে ১৷৷০ টাকা মাত্র। চন্দন নগরের ২টা বড় ও ৪টা ছোট গুদাম ঘরের ভাড়া ১৭ বৎসরের মোট ৫৭৩৫৲ টাকা, অর্থাৎ এক একটি গুদাম গড়ে ৪৷৷০ টাকার কিছু অধিক ভাড়া। এক্ষণে ঐ স্থানের একটি গুদামের ভাড়া উহার অর্দ্ধেকের অপেক্ষাও অল্প। পূর্ব্বোল্লিখিত কলিকাতার বাটীর সহিত ৩টি নূতন ঘর প্রস্তুত করণের খরচ ১২৯।১০ এবং ১২০০ সালে চন্দননগরে ৪টী গুদামঘর প্রস্তুত করণের খরচ ৯৭৯৲ টাকা লেখা আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় তখনকার দিনে গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণাদির মূল্য ও মজুরদিগের মজুরির মূল্য অনেক কম ছিল। চন্দন নগরে জমির মূল্য এখনকার অপেক্ষা তখন ন্যূন ছিল না। ৫১ কাঠা জমির মূল্য ৭৭৫৲ টাকা লেখা আছে। এই সকল বিষয় দেখিয়া মনে হয় শ্রীরামপুর, হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দন নগর প্রভৃতি স্থান সমূহের তৎকালীন অবস্থা কলিকাতার অপেক্ষা হীন ছিলনা বরং উন্নত ছিল। যদিও দলিল মধ্যে চন্দন নগরের ভিন্ন অন্য কোন স্থানের বিশেষ কোন কথা লেখা নাই, তথাপি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের অবস্থা যে কতকটা একভাবই ছিল এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় নহে।

সমুদয় দলিলখানি হইতে দেশীয় বস্ত্রের মূল্য, আদালতের খরচ, স্থদের হার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক বিষয়সংগ্রহ হইতে পারে, বাহুল্য ভয়ে সে সকল আর লিখিবার চেষ্টা করিলাম না। পরিশেষে নিবেদন দলিল বা আদালত সংক্রান্ত লেখার ভাষা সাধারণ বাঙ্গলা ভাষার

সহিত কিছু পৃথক। দলিলের ভাষা দেখিয়া তৎসময়ের ভাষার আলোচনা বা বিচার করা বোধ হয় বিধেয় নহে। আমিও এক্ষেত্রে তাহা করি নাই, কেবল উহাতে যে প্রকার ভাষা দেখিয়াছি পাঠকবর্গকে তাহা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। তখনকার দিনে সিক্কা টাকা প্রচলিত ছিল, সে টাকার মূল্য কোম্পানীর টাকা অপেক্ষা কিছু অধিক। এই প্রবন্ধমধ্যে যে টাকার উলেখ আছে উহা সম্ভবতঃ সিক্কা টাকা নহে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

তাম্রলিপ্তি বা বর্ত্তমান তমলুকের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণ।

অধুনাতন সভ্যজগতে প্রাচীন সাম্রাজ্য সকলের ইতিবৃত্ত ও তৎসংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাহার না স্বদেশীয় প্রাচীন সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিতে ও জানিতে ইচ্ছা হয়? এক্ষণে এই সমস্ত বিষয়ের যথাযথ বিবরণ ইতিহাস পাঠ না করিলে আমরা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে পারি না। কিন্তু, ভারতবর্ষীয় যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে ঐতিহাসিক গ্রন্থই বিরল। তজ্জন্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান করিতে হইলে অনেক শ্রম স্বীকার করিতে হয়। বেদ, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে অনেকাংশে ভারতবর্ষের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। বণিক ও ভিন্নদেশীয় অন্যান্য ভ্রমণকারীগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠেও ইতিবৃত্তানুসন্ধান-পথ অপেক্ষাকৃত সুগম ও সুপ্রশস্ত হইয়া আসে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে কেহই ভারতবর্ষের কোন প্রকৃত ইতিহাস লিখিয়া যান নাই বলিলেই হয়। তাঁহারা যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্তই কবিতায় লিখিত। সেই সমস্ত কবিতায় তাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণে কিছুমাত্র যত্নবান্ হন নাই। বরং তাহাতে সরস কবিতাবলী লিখিবার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া জগৎ বিমুগ্ধ করিয়াছেন। সেই সমস্ত কবিতাবলীর সুমধুর সৌরভ দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের মধুর ঝঙ্কারে মন-প্রাণ বিমোহিত করিতে পারে, সে কথা সত্য; কিন্তু, তাহাতে আমাদের ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণে কিছুমাত্র সহায়তা করে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহই ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। কাজেকাজেই আমাদিগকে ভিন্নদেশীয় ঐতিহাসিকগণের বিবরণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, এদিকে বাস্তব পক্ষে, এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। দুই একজন বিদেশীয় ঐতিহাসিকের হস্তে ভারতবর্ষের ইতিহাস স্থানে স্থানে এরূপ রঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়াছে যে, তাহা হইতে প্রকৃত সত্যনির্দ্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার অনেকস্থলে তাঁহারা সত্যসংগোপন করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফল এই হইয়াছে যে সাধারণে বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু, তাই বলিয়াই যে বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কোন নিরপেক্ষ লেখক নাই তাহাও কখন বলা যাইতে পারে না। যে সকল মহানুভব লেখক সত্যনিষ্ঠা ও উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাঁহারা এতদ্দেশীয় সকলেরই ধন্যবাদ ও সম্মানের পাত্র। কোন সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা তদ্দেশবাসী জনসমূহের বিদ্যা, ধর্ম্ম, জ্ঞান, প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট গুণাবলীর বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তরকালে অতি দুর্ল্লভ ও অত্যুন্নত গৌরবপদে অধিরোহণ করেন; কিন্তু, কালক্রমে তাঁহারা সেই গৌরবপদ হইতে বিচ্যুত হন। এক্ষণে ভারতবর্ষ মহাশ্মশান— "মহাকালের মহারঙ্গভূমি!" শত শত নগরী ধুলিচুম্বন করিয়াছে, শত শত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হইয়া গিয়াছে বহু রাজ্য-বিপ্লব-ঝড় ভারতের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে তথাপি আজও ভারত বর্ত্তমান! এত উত্থান-পতন, এত বিপ্লব সহ্য করিয়াও ভারত আজপর্য্যন্ত বর্ত্তমান। প্রাচীন কালের পর হইতে এপর্য্যন্ত ভারত নিজ দুঃখগীতি সেই এক করুণস্বরে গাহিয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত! পুরাকালের কোন ইতিহাস নাই যে ভারতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। বহুদিন পূর্ব্বে কোন গ্রীক কবি ভারতের দুঃখে কাতর হইয়া যে করুণগীতি গাহিয়া গিয়াছেন তাহা যথার্থই সত্য :—

"The Niobe of nations! There she stands,
Childless and crownless, in her voiceless wœ;
An empty win within her withered hands,
Whose holy dust was scattered long ago.

* * *

The Ocean hath its chart, the stars their map,
And knowledge spreads them in her ample lap,
But Ind' is as a desert, where we steer
Stumbling O'er recollections!"

বাণিজ্যদ্বারা ভারতবর্ষের বহুনগরী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই সকল নগরীর মধ্যে তমলুক বা তাম্রলিপ্তী অন্যতম এবং ইহাই বোধ হয় সর্ব্বাগ্রগণ্য। বহুকাল পূর্ব্বে তাম্রলিপ্তী বৌদ্ধদিগের বাসস্থান ছিল এবং তৎকালে বহুসংখ্যক বৌদ্ধমঠ বক্ষে ধারণ করিয়া ইহা ভারতে এক গৌরবান্বিত পদ অধিকার করিয়াছিল। সেই সময়ে বৌদ্ধ যাজকগণের ধর্ম্মসূত্রগানে এই নগরী প্রতিধ্বনিত হইত ও ঘরে ঘরে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা হইত। কিন্তু, হায়! এক্ষণে সেই সমস্ত পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির কোন চিহ্নই এখানে পরিলক্ষিত হয় না; ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!

স্থান নির্দ্দেশ ও সীমাদি।

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে তাম্রলিপ্তী নামে এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। অনন্তনীল জলরাশি কল-কল-নিনাদে উত্তাল-তরঙ্গ তুলিয়া সেই রাজ্যের কূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সেই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য এক্ষণে একটী ক্ষুদ্র উপনগরে পরিণত হইয়াছে এবং উহা এক্ষণে তমলুক নামে খ্যাত। এক্ষণে আর সেই সমুদ্র নাই, সেই উত্তাল তরঙ্গমালাও নাই ও সেই কল-কল-নিনাদও নাই। তৎপরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রকায় রূপনারায়ণ নদ ইহার পদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমুদ্র তমলুকের কূলপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা এক্ষণে এস্থান হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। ক্রমে ক্রমে পলি পড়িয়া নূতন ভূমিতে পরিণত হওয়ায় সমুদ্র অনেকটা বুজিয়া গিয়াছে এবং সমুদ্রতট তাম্রলিপ্তী নগর হইতে এত দূরে পড়িয়াছে।

তমলুক পুরাকালে বহু নামে অভিহিত হইত; যথা— তমোলিপ্তী,[১] তমোলিপ্ত,[২] তাম্রলিপ্ত,[৩] তাম্রলিপ্তী,[৪] তামলিপ্তং, তামলিপ্তী, তমালিকা,[৫] দামলিপ্তং তমালিনী[৬]।

আবার জে, ডব্‌লিউ ম্যাক্রিণ্ডেল্ সাহেবের "Ancient India, as described by Megasthenes and Arrian" নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে :—

"—In the writings of the Buddhists of Ceylon, the name appears as Tamolitti, coresponding to Tamluk of the present day." (৭)

ইহাতে জানা যাইতেছে যে তমোলিতী নামেও বর্ত্তমান তমলুক অভিহিত হইত। কোন কোন বণিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার নাম তম্মোলিতি বলিয়াও লিখিত হইয়াছে।[৮]

তাম্রলিপ্তী, দামলিপ্ত প্রভৃতি নামের অপভ্রংশে যে তমলুক নাম হইয়াছে সে বিষয়ে বহুল প্রমাণ আছে। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে তমোলিপ্ত ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থ আধুনিক তমলুক বলিয়া[৯], পণ্ডিতপ্রবর সংস্কৃত ভাষাবিৎ উইল্‌সন্ সাহেবের "Sanskrit English Dictionary"তেও তমালিকা, তমোলিপ্তী, তামলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থ বর্ত্তমান তমলুক বা Modern Tamluk বলিয়া[১০] ও বাচস্পত্য নামক পুস্তকে তমালিকা, তমালিনী ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লিখিত আছে।[১১] এতদ্ভিন্ন মহাত্মা রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "সচিত্র

১। ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ! ২। ইতি শব্দরত্নাবলীঃ।
৩। ইতি মহাভারতম্। ৪। ইতি ভারত কোষঃ
৫। ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ। ৬। ইতি হেমচন্দ্রঃ।

(৭) Vide Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, edited by J. W. Maccrindle. M. A. P. 138.

(৮) Vide S. Beal's Si-Qu-Ki," Vol II P. 200.

(৯) শব্দকল্পদ্রুমঃ, পুনঃপ্রকাশিত, ১৪২৩ ও ১৪৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(১০) Vide Sanskrit and English Dictionary by H. H. Wilson P. P. 382, 383, 387 and 422.

(১১) বাচস্পত্য, ৩২৪০ ও ৩২৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি
৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

KUNTALINE PRESS.

চতুর্থ ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি
৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

(১)

একটী সাধারণ লোকের জীবন এবং একটী স্বাধীন রাজার জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে ও বিভিন্ন আদর্শে গঠিত। সাধারণ লোকের জীবন সমাজের কঠোর শাসনে ন্যূনাধিক পরিমাণে সুসংযত, সুমার্জ্জিত ও কৃত্রিম ভাবাপন্ন। এক জন স্বাধীন রাজার জীবনে সংযমের অপেক্ষা উদ্দাম-স্ফূর্ত্তি বেশী, কারুকার্য্য অপেক্ষা কাঠিন্য অধিক, সভ্যতা অপেক্ষা স্বাভাবিকতা বেশী। সে জীবনে অভাব অতি অল্প, সমাজের প্রভাব ততোধিক অল্পতর। পার্ব্বত্য শাল তরুর ন্যায় উহা বিকট বিশাল ও অশোভন হইলেও উহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রকৃতির করচিহ্ন বর্ত্তমান। পার্ব্বত্য নদীর উপলখণ্ডের ন্যায় সেই জীবনের কোণ-কণিকাগুলি অক্ষত ও সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে আমাদের জীবনে সেগুলি চতুষ্পার্শ্বস্থিত পদার্থ সমূহের ঘর্ষণে মর্দ্দনে আঘাতে ব্যাঘাতে শাসনে লাঞ্ছনায় এত দূর ক্ষয়প্রাপ্ত যে, আমরা শালগ্রাম-শিলার ন্যায় নিরীহ সুডৌল ও সুগঠিত। ঘড়ী দেখাইবার ছলে কেহ আমাদের কর্ণ মর্দ্দন করিলে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে মাথার উপরের দিকে চাহিয়া, অধিক পরিমাণে নিজের উদরের দিকে চাহিয়া, এবং অধিকতর পরিমাণে স্বকীয় আশ্রিত দ্বি-সপ্ত সংখ্যক বুভুক্ষু মুখের দিকে চাহিয়া সহিষ্ণুতার সহিত সেই গোলাপী হস্তপ্রদত্ত তিক্ত জিলিপি-খানা গলাধঃ করিয়া থাকি; অন্তরে দ্বিতীয় পাণ্ডবের মত হইলেও বাহিরে যুধিষ্ঠিরের বেশে বাহির হই। ফলতঃ আমরা অষ্টপ্রহরই মুখস পরিয়া আছি; এবং ইদানীং আমাদের মুখ ও মুখস সর্ব্বপ্রকার দলাদলি পরিত্যাগ করিয়া এমনি মাখামাখি ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে, এখন কোন্‌টী কে, তাহা চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। বোধ হয় কার্য্যতঃ আমাদের দেহ রাজ্যের উপরে মুখ অপেক্ষা মুখসের দাবীই বেশী। রাজনৈতিক ও সামাজিক অধীনতা

"Tamralipti—country lying to the westward of the Hughly river, from Burdwan and Kalna on the north".(১৮)

অর্থাৎ যে ভূভাগ হুগলী নদীর পশ্চিম দিক হইতে উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা পর্যান্ত বিস্তৃত তাহাই তাম্রলিপ্তী দেশ।

এক্ষণে তাম্রলিপ্তীর তিনদিকের সীমা পাওয়া গেল। ক্যানিংহাম্ সাহেবের কথানুসারে ইহার পূর্ব্বে হুগলী নদী ও উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা জেলা তাহা সপ্রমাণিত হইতেছে। আরও আমরা জানি যে ইহার দক্ষিণে সমুদ্র ছিল।

"Journel of the Royal Asiatic Society of Bengal" নামক পত্রিকাতেও ইহা যে সমুদ্র কূলে অবস্থিত ছিল তাহা লিখিত আছে ঃ—

'Tamralipta being on the sea at the mouth of the Ganges, and corresponding with it in appelation, is always considered to be connected with the modern Tamluk." (১৯)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "কলিঙ্গের সীমা নিরূপণ" নামক প্রবন্ধে প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে "কলিঙ্গ রাজ্য বর্ত্তমান তমোলুকের সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।" (২০)

এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে তাম্রলিপ্তীর পূর্ব্বে হুগলী নদী, উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা, পশ্চিমে কলিঙ্গদেশ ও দক্ষিণে সমুদ্র ছিল। "Documents Geographiques" নামক পুস্তকে তাম্রলিপ্তী রাজ্যের পরিধির বিষয় লিখিত রহিয়াছে ঃ—

The kingdom of Tamluk was then about two hundred and fifty miles in circumference." (২১)

(১৮) Vide General Cunningham's "Ancient Geography of India." P. 504.

(১৯) Vide Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol V., P, 135.

(২০) জন্মভূমি, প্রথম খণ্ড, ৪৪৮ পৃঃ দেখ।

(২১) Vide Documents Geographiques, P. 450.

কিন্তু আমাদের মাননীয় স্বদেশবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই মহোদয় বলেন ঃ—

"The country (U. Tamralipti) was 300 miles in circuit. (২২)

যাহাই হউক পূর্ব্বে যে তাম্রলিপ্তী বিস্তৃত রাজ্য ছিল সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তী গঙ্গানদীর মোহনার নিকট সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে সেই মোহনায় পলি পড়িয়া চর হয়। সেই চর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া প্রায় ৫০।৬০ মাইল সমুদ্র বুজিয়া গিয়া ইহাকে একটী "আন্তর্দ্দেশিক নগর" inland town করিয়া ফেলিয়াছে। এখনও সময়ে সময়ে নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িলে মৃত্তিকা মধ্যে প্রাচীন কালের মুদ্রা, অলঙ্কার এবং ভগ্নপোতাদির অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন সংস্কৃতজ্ঞ কবি লিখিয়াছেন ঃ—

"তাম্রলিপ্তো প্রদেশশ্চ বণিকস্য নিবাসভূঃ।
দ্বাদশ যোজনৈর্যুক্তঃ রূপনদ্যাঃ সমীপতঃ॥"

বিশ্বকোষে উপরের শ্লোকের অর্থ এইরূপভাবে করা হইয়াছে ঃ—

"বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্ত প্রদেশ ১২যোজন বিস্তৃত ও রূপা অথবা রূপনারায়ণ নদের নিকট অবস্থিত।"২৩

রাজগণ ও তাঁহাদের বিবরণ।

তাম্রলিপ্তীতে কোন্ বংশীয় রাজগণ সর্ব্বপ্রথম রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং কোন্ মহাত্মা এখানকার প্রথম রাজা ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ বহু পূর্ব্বে ইহা কোন ক্ষত্রিয় রাজার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং তিনি এখানে আধিপত্য করিতেন। সর্ব্বশুদ্ধ এখানে তিন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম ময়ূর বংশীয় রাজগণ, তৎপরে রায় বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয়) রাজগণ এবং ইহার অব্যবহিত পরে কৈবর্ত্ত বংশীয় রাজগণের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও এখানকার ভূস্বামী।

(২২) Vide History of civilization in Ancient India, by R. C. Dutt, C. I. E. Vol. III. P. 105.

(২৩) ইতি বিশ্বকোষঃ, ৬৯০ পৃঃ দেখ

ময়ূর বংশীয় রাজা মোটে চারিজন ছিলেন, যথা—(১) ময়ূরধ্বজ, (২) তাম্রধ্বজ, (৩) হংসধ্বজ, ও (৪) গরুড়ধ্বজ। এই চারিজন ক্রমান্বয়ে এই স্থলের রাজা হন। বোধহয় ইঁহারা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। অন্ততঃ ইঁহাদের নাম দেখিয়া সেইরূপ অনুমিত হয়। ইঁহাদের পরেই রায়বংশীয় রাজগণের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ময়ূরবংশীয় রাজা গড়ুরধ্বজের পরেই (৫) বিদ্যাধর রায় রাজা হন। এখানকার রাজবাটীতে যে বংশতালিকা আছে তৎদৃষ্টে দেখা যায় যে বিদ্যাধর রায় ময়ূরবংশোদ্ভব এবং বর্ত্তমান রাজাও সেই বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। এক্ষণে ইহা সত্য কি না দেখা যাউক।

পঞ্চম রাজা বিদ্যাধর রায়ের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই স্থলের রাজা হন ঃ—

(৬) নীলকণ্ঠ রায়।
(৭) জগদীশ রায়।
(৮) চন্দ্রশেখর রায়।
(৯) বীরকিশোর রায়।
(১০) গোবিন্দদেব রায়।
(১১) যাদবেন্দ্র রায়।
(১২) হরিদেব রায়।
(১৩) বিশ্বেশ্বর রায়।
(১৪) নৃসিংহ রায়।
(১৫) শম্ভুচন্দ্র রায়।
(১৬) দীপচন্দ্র রায়।
(১৭) দিব্যসিংহ রায়।
(১৮) বীরভদ্র রায়।
(১৯) লক্ষ্মণসেন রায়।
(২০) রামচন্দ্র রায়।
(২১) পদ্মলোচন রায়।
(২২) কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
(২৩) গোলকনারায়ণ রায়।
(২৪) বলিনারায়ণ রায়।
(২৫) কৌশিকনারায়ণ রায়।
(২৬) অজিতনারায়ণ রায়।
(২৭) কৃষ্ণকিশোর রায়।
(২৮) চন্দ্রার্ক রায়।
(২৯) মৌক্তিকিশোর রায়।
(৩০) মার্কণ্ডকিশোর রায়।
(৩১) ইন্দ্রমণি রায়।
(৩২) সুধন্বা রায়।
(৩৩) মৃগয়া দেই। (রাণী)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ময়ূরধ্বজ প্রভৃতি চারিজন রাজাকে মাত্র অনেকে ময়ূরবংশীয় বলিয়া বলেন; এবং ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তাঁহাদের নামগুলি প্রাচীনকালের নাম। পঞ্চম রাজার নাম বিদ্যাধর রায়, ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম। সুতরাং ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে ময়ূরবংশের লোপ হইলে এই রায় উপাধিধারী (গঙ্গাবংশীয়) রাজগণ এখানে রাজত্ব করেন। সপ্তত্রিংশ রাজার নাম কালুভুঞ্যা; ইহা সম্পূর্ণ অনার্য্য নাম। ইঁহার পূর্ব্বে অপর কোন রাজার এইরূপ অনার্য্য নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে ইনি কৈবর্ত্ত বংশীয়। ইনিও রায় উপাধি ধারণ করেন। বোধ হয় নিজ বংশের উচ্চতা প্রমাণ করিবার জন্যই ইনি এইরূপ করেন। কালুভুঞ্যার পর ধাঙ্গড় ভুঞ্যা, ভাঙ্গড়ভুঞ্যা প্রভৃতি অনার্য্য নামীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করেন। ইঁহারাও রায় উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাদের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী ও বংশধরেরাও সেই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। যাহাই হউক ইঁহারা এবং ইঁহাদের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ যে কৈবর্ত্ত এবং ইহাদের কাহারও সঙ্গে যে ময়ূরবংশীয় রাজগণের কোনও সম্বন্ধ নাই তাহা নিশ্চিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় "নব্যভারতে" "তমোলুকের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে এইখানকার রাজগণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"* * প্রথম চারিজন রাজার নাম প্রাচীন নাম—অর্থাৎ মহাভারতীয় কালের নাম ও তৎপরের বিদ্যাধর প্রভৃতি নামগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, গরুড়ধ্বজের পরে তদ্বংশের লোপ হওয়ায় এই রায়বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয়?) রাজগণ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। সপ্তত্রিংশরাজার নাম কালুভুঞ্যা। ইনিই প্রথম কৈবর্ত্ত রাজা। কেন না—ইঁহার পূর্ব্বে

এরূপ একটীও অনার্য্য নাম কোন রাজার দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং ইহার পরে ধাঙ্গড় ভুঞ্যা, ভাঙ্গড়ভুঞ্যা প্রভৃতি নাম দৃষ্টিগোচর হয়। যাহা হউক, আর্য্যবংশীয় রাজাদিগের লোপ হইলে সমুদ্র-গামী-জাতীয় লোকেরা ক্রমে আপনাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি করিয়া এই কালুভুঞ্যাকে রাজা করেন। কালুভুঞ্যা উড়িষ্যা হইতে আসেন এবং স্বীয় সমভিব্যাহারে জ্ঞাতি কুটুম্ব চারিশত ঘর আনিয়া তাঁহাদিগকে ভূম্যাদি দিয়া এখানে বাস করান। ইঁহাদের আচার, ব্যবহার ও ভাষার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব্বে উড়িষ্যার সহিত যে ইঁহাদের বিশেষ সংশ্রব ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও কতকগুলি উৎকল ভাষার ভাব (idiom) প্রচলিত আছে। ইহাদের পদবী দেখিলে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে উৎকলবাসী ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে; যথা—মহাপাত্র, বিহারা বা বেরা, জানা, মাহান্তি বা মাইতি, পট্টনাএক, সামন্ত, সাঁতরা ইত্যাদি। এসমস্তই উড়িয়া পদবী।"

কিন্তু ইহারই কিছু পরে শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখেন যে "রাজা ময়ূরধ্বজ হইতে সুধন্বা রায় পর্য্যন্ত যে ৩২জন রাজার নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের অব্যবহিত পিতা পুত্র সম্বন্ধ। * * * এই বত্রিশজন রাজাই ময়ূরবংশীয়। ৩৩শ রাজ্ঞী মৃগয়া দেই ময়ূরবংশের সর্ব্বশেষ কন্যা। ইনি সুধন্বা রায়ের ভগিনী। জমিনভঞ্জ রায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহারই গর্ভে ৩৪শ সংখ্যক রাজা রায় ভানুরায় জন্মগ্রহণ করেন। অতএব রাজ্য এখন ময়ূরবংশের দৌহিত্রবংশে গেল। নিম্নের বংশাবলী দৃষ্টে বর্ত্তমান তমলুক রাজবংশধরগণ কোন্ বংশোদ্ভব প্রতীয়মান হইবে।" (২৪)

(৩৩) রাণী মৃগয়া দেই।
(কুঙর জমিনভঞ্জ রায় স্বামী)
(৩৪) রায় ভানুরায়।—ময়ূরবংশের দৌহিত্রবংশ।
(৩৫) লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
(৩৬) চন্দ্রা দেই। (নিঃশঙ্ক রায় স্বামী)
(৩৭) কালুভুঞ্যা রায়।—ঐ প্রদৌহিত্রবংশ।
(৩৮) ধাঙ্গড়ভুঞ্যা রায়।
(৩৯) মুরারিভুঞ্যা রায়।
(৪০) হরবাবভুঞ্যা রায়।
(৪১) ভাঙ্গড়ভুঞ্যা রায়।
(৮১০ সালে পরলোক গত, অর্থাৎ ১৪০৩ খৃঃ অঃ)
(৪২) ধিতাইভুঞ্যা রায়।
(৮৬১ সাল পর্য্যন্ত)
(৪৩) জগন্নাথভুঞ্যা রায়।
(৯০১ সাল পর্য্যন্ত)
(৪৪) যদুনাথভুঞ্যা রায়।
(৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত)
(৪৫) রামভুঞ্যা রায়।
(৯৭০ সাল পর্য্যন্ত)

ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার প্রতিবাদকারী সুদর্শন বাবু ইঁহাদের দুই জনের মতামত ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে, ত্রৈলোক্য বাবুর কথাই (অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজা ও তাঁহার পূর্ব্বরুষগণ যে কৈবর্ত্ত সেই কথা) সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরও যখন দেখা যায় যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবও বলেন যে ময়ূরবংশের লোপ হইলে কৈবর্ত্তগণ এই স্থলে প্রধান হইয়া রাজ্য স্থাপন করেন, তখন ত্রৈলোক্য বাবুর কথা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আরও বর্ত্তমান রাজা ও তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বের আচার ব্যবহার কৈবর্ত্তগণের অনুরূপ। হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

"The sea going castes asserted their supremacy, and on the extinction of the peacock dynasty placed a line of Kaibarttas on the throne." (২৫)

এক্ষণে "Sea going caste" বলিতে হণ্টার সাহেব যে কৈবর্ত্তগণকে বুঝিতেছেন তাহা তাঁহার "Antiquities of Orissa" নামক পুস্তক পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়।

পরন্তু ইং ১৮৯১ সালের মেদিনীপুর জেলার Census Report পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ময়ূরবংশের লোপ হইলে কৈবর্ত্তগণ প্রবল হইয়া এখানে রাজা হন,

(২৪) নব্যভারত, সপ্তদশখণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা দেখ।

(২৫) Vide Antiquities of Orissa by Sir W. W. Hunter L. L. D; K. C. S. I. vol I, P. 310.

তাঁহাদেরই বংশধর বর্ত্তমান রাজা। District Census Reportএ এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

27. The Kaibarttas are probably an offshoot of a race or tribe whose original seat was in the up country. They say that their ancestors lived on the banks of the Saraju or Gogri, in Oudh, and there is still a caste in that part of the country known by the name of Kanra, the descendants of those, whom their fore-fathers left behind them, when they migrated southwards. When the fore-fathers of the present Kaibarttas migrated from their original home on the bank of the Saraju, their route probably lay along the eastern limit of the tableland in central India, and tradition assigns their first appearance in the district of Midnapore to Sakabda 822. They were led by fine chiefs who established as many seperate chieftaincies in the district :—

1. Tamralipta or Tamluk.
2. Balisita.
3. Turka.
4. Sujamutha.
5. Kutabpur. (২৬)

উপরের প্রমাণাদি দর্শনে বর্ত্তমান রাজা ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা যে কৈবর্ত্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এবং ইহা নিশ্চিত বোধ হয় যে ইহাঁরা ময়ূরবংশোদ্ভব নহেন। ময়ূরবংশের লোপ পাইলে রায়-বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয়?) রাজগণের এখানে রাজত্ব আরম্ভ হয়। ময়ূরবংশের লোপ হইবার অব্যবহিত পরেই কৈবর্ত্তগণের রাজত্ব আরম্ভ হয় ইহা হণ্টার সাহেবের বিবরণ ও Census Roport পাঠে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং রায়বংশীয় রাজগণও কৈবর্ত্ত ছিলেন বোধ হয়।

পূর্ব্বে পঞ্চ-চত্বারিংশৎ রাজা রামভুঞ্যা রায়ের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার সময় হইতেই রাজ্যের অধোগতির সূত্রপাত হয়। রাম ভুঞ্যা রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনেক-গুলি পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজ্যভাগ করিয়া লইয়া ছোট ছোট তালুকে পরিণত করিলেন। রাজ্যেরও অবনতি আরম্ভ হইল। নিম্নের বংশ তালিকা দৃষ্টে রাজ্য কি ভাবে ভাগ হইয়াছিল বুঝা যাইবে।

- (৪৫) রামভুঞ্যা রায়। (৯৭০ সালে পরলোকগত)
  - (৪৬) শ্রীমন্ত রায়। (জমিদারীর ৮৴৹ আনা অংশ প্রাপ্ত হন্।)
    - (৪৮) কেশব রায়। (৴৹ অংশ; মোগল বাদ্‌শাহাকে কর দিতে অক্ষম হওয়ায় ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে পদচ্যুত হন।)
    - শ্যামচন্দ্র রায়। (৴১০ অংশ)
    - মনোহর রায়। (৴১০ অংশ)
      - গম্ভীর রায়। (।৴১০ অংশ)
        - প্রতাপনারায়ণ। (১১৪৬ সালে নিঃসন্তান পরলোকগত।)
    - (৪৯) হরি রায়। (৴১০ অংশ) কেশবের পর রাজা হইয়া ১৬৫৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।)
      - (৫০) রামরায়। (॥৵১০ অংশ)
        - (৫১) নরনারায়ণ। (১৭৩৭ খৃঃ অব্দে সমস্ত জমিদারী প্রাপ্ত হন।)
    - অনন্ত রায়। (৴১০ অংশ)
    - রূপ রায়। (৴১০ অংশ)
    - দুর্গাদাস রায়। (৴১০ অংশ)
  - (৪৭) ত্রিলোচন রায়। (জমিদারীর ।৹ আনা অংশ প্রাপ্ত হন; নিঃসন্তান মৃত।)

(২৬) Vide District Census Report of the District of Midnapore, for the year 1891, P. 4,

- (৫১) নরনারায়ণ।
  - (৫২) কৃপানারায়ণ জ্যেষ্ঠ। (ছোটরাণীর পুত্র, ১৭৫২ খৃঃ অব্দে পরলোকগত।)
  - (৫৩) কমলানারায়ণ কনিষ্ঠ। (বড় রাণীর পুত্র, কৃপানারায়ণের মৃত্যুর পর রাজা হন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।)
    - (৫৪) আনন্দনারায়ণ (পোষ্য) (প্রথমে ॥৴৹ জমিদারী প্রাপ্ত হন; ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে সমস্ত জমিদারীর মালিক হন।)
      - রুদ্রনারায়ণ। (পোষ্য।) (১৮৬৭ খৃঃ অব্দে মৃত) (বড় রাণীর গৃহীত)
        - মহেন্দ্রনারায়ণ (পোষ্য) (বর্ত্তমান।)
      - শ্রীনারায়ণ (পোষ্য) (বড় রাণীর গৃহীত)
      - (৫৫) লক্ষ্মীনারায়ণ পোষ্য (ছোট রাণীর গৃহীত, ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে মৃত।)
        - উপেন্দ্রনারায়ণ। (১৮৬০ খৃঃ অব্দে নিঃসন্তান মৃত।)
        - (৫৬) নরেন্দ্রনারায়ণ। (১৮০৮ খৃঃ অব্দে মৃত।)
          - (৫৭) সুরেন্দ্রনারায়ণ (পোষ্য) (বর্ত্তমান।)

অষ্ট-চত্বারিংশৎ রাজা কেশব রায় মোগল বাদসাহকে নিয়মমত কর দিতে পারিতেন না বলিয়া ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে রাজ্যচ্যুত হন ও তদীয় ভ্রাতা হরিরায় তৎপদে অভিষিক্ত হন। হরি রায় ১৬৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জমিদারী দুইভাগে বিভক্ত হয়। সাড়ে দশ আনা ভাগ তৎপুত্র আর সাড়ে পাঁচ আনা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গম্ভীর রায় (মনোহর রায়ের পুত্র) প্রাপ্ত হন। অবশেষে ১৭৩৭ খৃঃঅব্দে নরনারায়ণই সমস্ত জমিদারী প্রাপ্ত হন। ইঁহার দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কৃপানারায়ণ রাজা হইয়া ১৭৫২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমলনারায়ণ রাজা হন। ইনি ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মোগল গবর্ণমেণ্টকে যথারীতি কর দিতে অক্ষম হওয়ায় রাজ্যচ্যুত হন এবং খোজা মির্জা দেদার আলিবেগ তৎ পদে অধিষ্ঠিত হন ও নবাব উপাধি ধারণ করিয়া এক বৎসর মাত্র জমিদারী ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বর্ত্তমান রাজবাটীর পশ্চিম পার্শ্বে এখনও তাঁহার কবর দেখা যায়। প্রতি বৎসর মহরমের সময় স্থানীয় মুসলমানগণ তথায় তাজিয়া (গোঁয়ারা) লইয়া নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করে। পূর্ব্বে অতি বৃষ্টি হইলে চতুঃপার্শ্বের পরগণা হইতে জল আসিয়া তমলুক ভাসাইয়া দিত; তাহাতে বহু অনিষ্ট হইত। তজ্জন্য নবাব সাহেব তমলুকের পশ্চিম সীমায় একটী প্রকাণ্ড বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া দেন। অদ্যাপি সেই বাঁধ "খোজার বাঁধ" বলিয়া পরিচিত।

ক্রমশঃ—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মিত্র।

বিপন্ন।

(১)

ক্ষুদ্র এক বাঁধিয়া কুটীর
জীবনের সৈকত বেলায়,
লভি সঙ্গ কোমল ঊর্ম্মির,
ছিনু ব্যস্ত আপন খেলায়।

উষার সুরভি সমীরণ
সেধে এসে করিত সম্ভাষ,
প্রদোষের অরুণ কিরণ
জাগাইত নব নব আশ।

নিশীথের খচিত গগন
হাসিত রে মম গৃহোপরি,
দূরে থাকি পাপিয়া সুস্বন
বরষিত অমিয়-লহরী।

(২)

কোথা হ'তে জলদ ভীষণ
লইয়া ঝটিকা-সহচরী
বেগে আসি দিল দরশন,
শান্তি গেল আর্ত্তনাদ করি।

কোথা সেই অরুণ কিরণ,
কোথা আজি আশা জীবনের ?
কোথা সেই খচিত গগন,
কোথা আজি সুধা বিহগের ?

মোর সহ ক্ষুদ্র কুঁড়েখানি
ফেলে দিল তরঙ্গের কোলে,
কি প্রতাপ আজি সে ঊর্ম্মির !
কি বিষম প্রাণ আজি দোলে !

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মল-বিশোধনী-পুষ্করিণী।

(SEPTIC TANK).

সংপ্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বিষ্ঠা ও মূত্র বিশোধন করিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ যন্ত্র-গৃহের নাম মল-বিশোধনী-পুষ্করিণী। "অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি" এই বচন স্মরণ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন বিষ্ঠা কখনও বিশোধিত হইতে পারে না। কিন্তু আপাততঃ যাহা অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় বিজ্ঞান তাহাও সাধন করিতে পারে। কলিকাতার সান্নিধ্যে ভাগিরথীর উভয় তীরে পাটের কল, কাগজের কল, অস্থির কল প্রভৃতি অনেক কল কারখানা আছে। ঐ সকল কলে প্রতিদিন বহু সহস্র শ্রমজীবী কার্য্য করে। তত্রত্য মিউনিসিপালিটী ঐ সকল লোকের বিষ্ঠা ও মূত্র নিকাশের সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। তজ্জন্য গত দুই তিন বৎসর গবর্ণমেণ্ট ও কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত উক্ত বিষয়ে চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বঙ্গের লেপ্‌টনাণ্টগবর্ণর মজফরপুর মিউনিসিপালিটীকে একটী মল-বিশোধনী-পুষ্করিণী নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা ও নৈহাটী এতদুভয়ের মধ্যে ভাগীরথীর উভয় তীরে অনেক মল-বিশোধনী-পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকল পুষ্করিণীতে বিষ্ঠা ও মূত্র সুসংস্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ জলে পরিণত হয়, এবং সেই জল পয়ঃ-প্রণালী দ্বারা ভাগীরথীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত রিষড়া প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ আবেদন করেন—মল-বিশোধনী-পুষ্করিণীর জল ভাগীরথীতে পড়িতে দেওয়া বিধেয় নহে। তদনুসারে লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণর মল-বিশোধনী-পুষ্করিণীর জল ভাগীরথীতে পড়িতে দেওয়া উচিত কি না—তৎসম্বন্ধে সেনিটারী বোর্ডের মত জিজ্ঞাসা করেন। উক্ত বোর্ড সহসা কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া গবর্ণমেণ্টকে কতিপয় প্রশ্নের সদুত্তর নির্দ্ধারণ

করিবার জন্য লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণর গত ২০শে এপ্রিল তারিখে একটী বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটির সভ্যগণের নাম, যথা—

মিঃ ব্রাউন (Colonel S. H. Browne, C. I. E. Inspector-General of Civil Hospitals)।

মাননীয় হর্ণ (Honble Mr. D. B. Horn-Secretary to the Govt. Of Bengal, Public Works Department)।

মেজর ক্লার্কসন (Major F. C. Clarkson, I. M. S. Sanitary Commissioner, Bengal).

মাননীয় শিরীষ (Honble Mr. L. P. Shirres, I. C. S., Secretary to the Govt. of Bengal, Municipal Department).

উক্ত কমিটি উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য বঙ্গের অনেক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, মাননীয় সেরিফ নলিন বিহারী সরকার প্রভৃতি সাক্ষ্য দিয়াছেন। গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে পাঁচ জন পণ্ডিতের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। পণ্ডিতগণের নাম, যথা—

কলিকাতার

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এম্ এ।

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ।

নবদ্বীপের—

পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন।

মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন।

উল্লিখিত পণ্ডিতগণের নিকট কমিটি যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং উহাঁরা যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইলঃ—

কমিটি—মল বিশোধনী পুষ্করিণীর জল গঙ্গায় নিক্ষেপ করা যায় কি না ?

পণ্ডিতগণ—না।

কমিটি—কি দোষ হয় ?

পণ্ডিতগণ—অমেধ্যসংস্পৃষ্ট জলদ্বারা স্নান, পান, রন্ধন, সন্ধ্যা ইত্যাদি করা যায় না।

কমিটি - গঙ্গা কি কখনও অপবিত্রা হইতে পারেন ?

পণ্ডিতগণ—গঙ্গা দ্বিবিধা—দেবতারূপিনী ও জলরূপিনী। দেবতাত্মিকা গঙ্গা কখনই অপবিত্রা হন না, কিন্তু গঙ্গার জল অপবিত্র হইতে পারে।

কমিটি—দেবতাত্মিকা গঙ্গা অপবিত্রা না হইলেই ত ধর্ম্ম রক্ষা পাইল। জল যাহাতে অবিশুদ্ধ ও অব্যবহার্য্য না হয় তাহা অবশ্য আমরা দেখিব।

কমিটি—গঙ্গায় শবদাহ ও অস্থি বিসর্জ্জন করা হয় কি না ?

পণ্ডিতগণ—হয়।

কমিটি—যদি তাহাতে গঙ্গার জল নষ্ট না হয়, তাহা হইলে মল-বিশোধনী-পুষ্করিণীর জলের সহ সংযোগেই বা উহা কিরূপে নষ্ট হইবে ?

পণ্ডিতগণ—পূর্ব্বোক্তটী শাস্ত্রের বিধি আছে, কিন্তু শেষোক্তটী শাস্ত্রের বিধি নাই।

কমিটি—অমেধ্য জলে সন্ধ্যা করিলে কি তাহা নিস্ফল হয় ?

পণ্ডিতগণ—হাঁ।

কমিটি—গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা করিবার সময়ে আপনারা কি গঙ্গার জল পরীক্ষা করিয়া থাকেন ?

পণ্ডিতগণ—না। অজ্ঞানপূর্ব্বক অর্থাৎ না জানিয়া অমেধ্য জলে সন্ধ্যা করিলে উহা নিস্ফল হয় না।

কমিটি—আপনাদের শাস্ত্রে আছে—"নদী বেগেন শুধ্যতি।" গঙ্গায় বেশ স্রোতঃ আছে। সুতরাং গঙ্গার জল ত স্বয়ংই শুদ্ধ হয়।

পণ্ডিতগণ—কঠিন অমেধ্য-বস্তু স্রোতস্বতী নদীতে নিক্ষিপ্ত হইলে উহার জল নষ্ট হয় না। কিন্তু তরল অমেধ্য-বস্তু নদীতে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা জলকে দূষিত করে।

এইরূপ কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর কমিটি পণ্ডিত মহাশয়গণকে পাথেয় প্রদান করতঃ উহাঁদিগকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে কমিটি পণ্ডিত মহাশয়গণকে বলেন—"যদি মল-বিশোধনী-পুষ্করিণী সম্বন্ধে আপনাদের অপর কোন মন্তব্য থাকে প্রকাশ করুন।" তদনুসারে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় মল-বিশোধনী-পুষ্করিণী সম্বন্ধে স্বরচিত একটী ইংরেজী প্রবন্ধ কমিটির হস্তে

অর্পণ করেন। কমিটি বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন ও পরস্পর বলেন—

"That's very good; he has studied the subject very carefully."

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা ও নৈহাটীর মধ্যে কতিপয় কলে মল-বিশোধন-প্রণালী স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বেদ, প্রাচীন স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, নব্যস্মৃতি, বৌদ্ধ পিটক ইত্যাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন মল-বিশোধনী-পুষ্করিণীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে লোকের মর্ম্মহানি ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে। তিনি হিন্দু দর্শনের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন মল-বিশোধনী-পুষ্করিণীর জলে কঠিন দ্রব্য অর্থাৎ পার্থিব পরমাণু বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় উহা স্নান ও পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাঁহার মতে মল বিশোধনী জল ভূমিতে নিক্ষেপ করা উচিত। ইহাতে জলীয় বিষ্ঠা শীঘ্রই বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষিত্যাদি ভূতে মিশিয়া যাইবে। ভূমি ও বিশেষ উর্ব্বরা হইবে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে মফস্বল মিউনিসিপালিটীতে মল-বিশোধনী-পুষ্করিণী প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন মফস্বল মিউনিসিপালিটীর অধীনে প্রচুর ভূমি থাকা প্রয়োজন। বিষ্ঠাদি সার প্রদান করিয়া ঐ ভূমি হইতে নানাপ্রকার ফলমূল উৎপাদন করা যাইতে পারে। উহা মিউনিসিপেলিটীর একটী আয়ের উপায় হইবে। মিউনিসিপালিটী এইরূপে কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

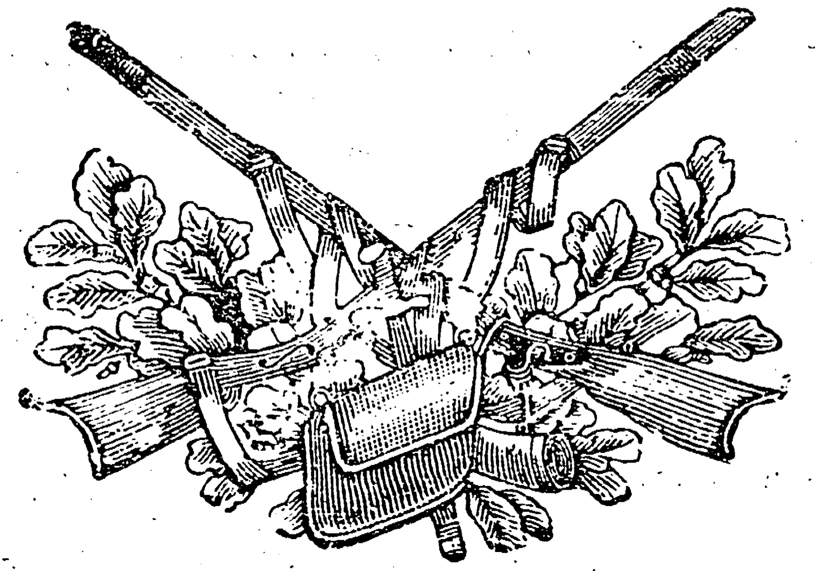

রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই।

"Surat chandra *hardy son*
Of soft Bengal, whose wonderous store
Of Buddhist and Tebetan lore
A place in fame's bright page has won,
Friend of the Tashu Lama's line,
Whose eyes have seen, the gleaming shrine
Of holy Lassa, came to show
The wonders of the land of snow."
—A lay of Lachen.

কলম্যান মেকলে শরৎচন্দ্রকে 'hardy son of soft Bengal' বলিয়াছেন, প্রকৃতই শরৎচন্দ্রের ন্যায় সহিষ্ণুতা, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও পর্য্যটন-পিপাসা বাঙ্গালীর মধ্যে কেন ভারতবাসীর মধ্যেও বিরল। তিনি উচ্চ হিন্দুকুলে জন্মিয়া, বাঙ্গালীসুলভ কোমল দেহ ধারণ করিয়া, কিরূপে হিমালয়ের ভীষণ তুষারাচ্ছন্ন বক্ষ অতিক্রম করিয়া দেবভূমি 'লাসায়' উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা শুনিলে হৃদয় হর্ষ ও বিস্ময়ে যুগপৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। যে 'লাসা' জনসাধারণের ভক্তির ও কল্পনার বস্তু ছিল, উদাসীনের প্রবল তীর্থ দর্শনলালসা, পর্য্যটকের দারুণ আবিষ্করণ ঈপ্সাও যাহার নামে ভীত ও সঙ্কুচিত হইত; ইংরাজ মিসনারীগণের সর্ব্বত্রগামী ভীতিময় কলুষিত পদও যাহার পবিত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে সাহসী হয় নাই, সেই দুর্গম, অজ্ঞাত তুষার-ধবলিত, স্বর্ণ-কিরীটিনী লাসায় ভারতবাসী শরৎচন্দ্রই প্রথমে প্রবেশ লাভ করেন। তাঁহার প্রত্যাগমন হইতেই 'লাসার' কাহিনী ভারতবাসীর ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শ্রবণগোচর হইয়াছে। শরৎচন্দ্র দেবভূমি (লাসা) হইতে রিক্ত হস্তে ফিরেন নাই, তিনি বহুকাল লুপ্ত পুরাতন দুইশত সংস্কৃত ও তিব্বতীয় পুস্তক তথা হইতে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর হস্তে যে অমূল্য রত্নাবলী দান করিয়াছেন তাহা চিরদিন তাঁহার নাম অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

পাশ্চাত্য পর্য্যটকবৃন্দ অজ্ঞাত দেশে উপস্থিত হইয়া তথাকার, আচার-ব্যবহার ও রাজনীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন; সেখানে কোনরূপ মিশন পাঠাইতে পারা যায় কিনা তাহাও অনুধাবন করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বন্ধু বান্ধবাদির জন্য তথাকার পুষ্পলতা পত্রাদি লইয়া আসেন। শরচ্চন্দ্র তাঁহাদের ন্যায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দ্রষ্টব্য স্থানের প্রতিকৃতি লইয়াছেন, অধিকন্তু তথাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নরাজি পুস্তকাবলী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি 'লাসার' সর্ব্বপ্রথম পর্য্যটক বলিয়া সভ্য জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন ইহাতে ভারতবাসী মাত্রেই সুখী; কিন্তু লুপ্ত ও অপ্রকাশিত মহামূল্য গ্রন্থরাশি আনয়নের জন্যই তাঁহারা শরচ্চন্দ্রের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমরা অদ্য উক্ত মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদীপের পাঠক পাঠিকাবৃন্দকে উপহার দিতেছি।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকৃতির প্রিয় রঙ্গভূমি চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী চক্রশালার আলমপুর নামক গ্রামে বৈদ্যবংশে শরচ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ধনী ছিলেন না সত্য, কিন্তু গ্রামে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। শরচ্চন্দ্রের চারি সহোদর, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অল্পদিন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শরচ্চন্দ্র পিতার মধ্যম পুত্র, ইহাঁর তৃতীয় সহোদর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ, এক্ষণে রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। রঘুবংশের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়া তিনিও যশস্বী ও বঙ্গসাহিত্যে পরিচিত হইয়াছেন।

কবি Wordsworth বলিয়াছেন:—"The child is the father of the man" আমাদেরও একটা কথা আছে "উঠ্‌তি মূল পত্তনে চেনা যায়" শরচ্চন্দ্রে শিশুকাল হইতেই ভাবী মহত্ত্বের চিহ্ন দেখা দিয়াছিল। চট্টগ্রামের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখর গুলিই শরচ্চন্দ্রের প্রিয়স্থান ছিল। যে শিখরে কেহ কখনো উঠিত না কিম্বা উঠিতে সাহস করিত না তাহাতে উঠিতেই শরচ্চন্দ্রের অধিক আগ্রহ প্রকাশ পাইত। সহজ সাধ্য কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিত না; যাহা দুষ্কর যাহা কষ্টসাধ্য তাহাই তাঁহার প্রিয় তাহাই তাঁহার ভক্তির দ্রব্য ছিল। ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মৎস্য জল স্রোতে দেহ ভাসাইয়া দেয়, কিন্তু বৃহৎ মৎস্য স্রোতের বিপরীত দিকে উঠিতে ভালবাসে, লহরীর বেগ সহ্য করিতেই তাহার ভাল লাগে, মনুষ্যের পক্ষেও ঠিক তাহাই; দুর্ব্বল, চরিত্রবল-বিহীন, ব্যক্তি বাধা সহিতে অক্ষম; বিঘ্নের মূর্ত্তি দেখিলেই সে অবসন্ন হয়; কিন্তু উত্তম ব্যক্তি শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিতেই ভাল বাসেন। বিপদের সহিত সংগ্রামই তাঁহার জীবনের বৈচিত্র্য তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য। শরচ্চন্দ্রের এ গুণ শিশুকাল হইতেই ছিল। বাল্য কালের তাঁহার দুএকটী কার্য্য দেখিয়া একজন ইংরাজ তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন "আপনার এ পুত্র কালে একজন মহৎ ব্যক্তি হইবে।" বিদেশীর এ কথা নিষ্ফল হয় নাই।

শরৎচন্দ্র প্রথমে গ্রামস্থ পাঠশালায় বাঙ্গলা-ভাষা অধ্যয়ন করেন পরে চট্টগ্রামে ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি ছাত্র জীবনে অতিশয় মনোযোগী ও মেধাবী বলিয়া সকল শিক্ষকেরই প্রিয় ছিলেন। চট্টগ্রাম হইতে এন্‌ট্রান্স পাস করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ্-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। এফ্-এ পাস করিয়া, উক্ত কলেজের ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগে ভর্ত্তি হন। যখন তিনি ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন সেই সময়ে পীড়া হইয়া তাঁহার শরীর অতি দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। ডাক্তারের উপদেশানুযায়ী তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জিলিং যাইতে বাধ্য হন। তথায় অবস্থিতি কালে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে তিনি C. B. Clarke সাহেবের আজ্ঞা অনুসারে নবস্থাপিত 'ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের' প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট সাহেব শরচ্চন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তিনিও উক্ত কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য শরচ্চন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন।

কার্য্য-গ্রহণ করিয়া শরচ্চন্দ্র 'ভুটিয়া স্কুলের তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষক লামা 'উগেন গিয়াৎসু'র নিকট উক্ত ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন নূতন পথে ধাবিত হইল, বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক পড়িতে পড়িতে, তাঁহার হৃদয় লামার ও টাসিলাম্‌পোর মঠ ও পুস্তকালয় দেখিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। শরচ্চন্দ্র তিব্বতীয় ভাষায় কথা-বার্ত্তা কহিবার জন্য সিকিমবাসী ছাত্রগণের সহিত বিশেষভাবে মিশিতে আরম্ভ করিলেন। লাসাদর্শনই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল।

শরচ্চন্দ্র ছাত্রজীবন হইতেই হিমালয়ের কথা শুনিতে, —হিমালয় সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। হিমালয় চিরকালই আমাদের ভালবাসার ও কল্পনার বস্তু। তাহার সহিত আমাদের কত সত্য, কত অসত্য, কত ভয়ঙ্কর, কত মনোরম কাহিনী জড়িত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হিমালয়েই আমাদের স্বর্গ, হিমালয়েই অপ্সর কিন্নরের বাস, হিমালয়ের মধ্যেই নীলোৎপল-প্রসবি-মানস-সরোবর এবং ইহার নিকটেই কালিদাসের কল্পনাপুরী অলকা। হিমালয়ের নাম করিলেই আমাদের সেই পার্ব্বতী, সেই মেনকা, সেই সমুদয় আগমনী-চিত্র মানস নয়নে ভাসিয়া উঠে। হিন্দু শরৎচন্দ্রের মনে যে অল্প বয়সেই হিমালয় দর্শন ইচ্ছা জন্মিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দার্জিলিংএ হিমালয়ের শান্তগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া শরচ্চন্দ্রের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, তাহার গুপ্ত কক্ষে কি রত্ন আছে দেখিবার জন্য মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তিনি কেবল উপযুক্ত অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে লামা উগেন গিয়াৎস্থু যখন টাসিলাম্পো মঠে গমন করেন তখন শরচ্চন্দ্র বলিলেন "আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক টাসিলাম্পোর মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হইতে আমার প্রবেশানুমতি আনিতে পারেন তাহা হইলে একবার আমি পবিত্র মঠে যাইয়া কিছুদিন অবস্থিতি করি এবং পূত টাসিলাম্পো দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।" যথা সময়ে লামা ফিরিয়া আসিলেন, এবং সেই সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হইতে অনুমতিপত্র ও নিমন্ত্রণলিপি শরৎচন্দ্রের জন্য আনয়ন করিলেন। মন্ত্রী মহোদয় হৃষ্ট চিত্তে পবিত্র ভারতভূমির অধিবাসীর প্রার্থনা অনুমোদন করিয়াছেন এবং পাছে তথাকার লোকে কোনরূপ সন্দেহ করে সেই জন্য শরচ্চন্দ্রের নাম টাসিলাম্পোর মঠের ছাত্রগণের তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, লামা শরচ্চন্দ্রকে তাহাও জানাইলেন।

১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে শরৎচন্দ্র উগেন গিয়াৎস্থুর সহিত টাসিলাম্পো যাত্রা করিলেন, সঙ্গে রহিল তাঁহার প্রিয় ভৃত্য ফুরচুং। অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর, রজতশুভ্র উপত্যকা ভূমি, এবং মনোহর নির্ঝরমালা দেখিতে দেখিতে, স্থল কমলিনী ও উইলোর দল মথিত করিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। ভীষণ তুষারাবলীর মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে শীতে তাঁহার হস্তস্থিত লাগাম খসিয়া পড়িতে লাগিল তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই শরচ্চন্দ্র চলিয়াছেন। পদে পদে বিপদরাশি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি পুণ্যক্ষেত্র টাসিলাম্পোতে পঁহুছিলেন। শরচ্চন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই তীব্বতীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে শিখিয়াছিলেন এবং নানা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কাজেই তাঁহাকে মন্ত্রী মহোদয়ের সহিত মিশিতে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। মন্ত্রী শরচ্চন্দ্রের অগাধ জ্ঞান, অমায়িকতা ও সুমিষ্টালাপে বিশেষ প্রীত হইলেন। তাঁহার মুখে পাশ্চাত্য সভ্যতার কথা শুনিয়া বিমোহিত হইলেন। কিসে শরচ্চন্দ্রের সুখশান্তি বিধান করিবেন, কিসে তাঁহাকে অধিক দিন তথায় রাখিতে পারিবেন তাহারি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁহার গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে এবং প্রতিদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশের সমুদয় গ্রাম পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। কত অজ্ঞাত অপরিচিত সুন্দর সুন্দর গ্রাম তাঁহার নয়নগোচর হইল। শরচ্চন্দ্রের চিরবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু তিনি সেখানে অধিক দিন থাকিতে পাইলেন না। বিশেষ কার্য্যবশতঃ তাঁহাকে দার্জিলিং ফিরিতে হইল। ছয়মাস পরে শরচ্চন্দ্র দাজিলিংএ ফিরিলেন কিন্তু তাঁহার পর্য্যটন পিপাসা বিন্দুমাত্রও উপশমিত হইল না।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে টাসিলাম্পোর মন্ত্রীর নিমন্ত্রণ অনুযায়ী শরচ্চন্দ্র পুনরায় তথায় যাত্রা করিলেন, তিনি একবৎসরমাত্র দার্জিলিংএ ছিলেন। এই সময়ে তিনি তিব্বতীয় ভাষার আরও নানাবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবার তাঁহার যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য লাসা দর্শন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও তাঁহার সঙ্গে লামা উগেন গিয়াৎস্থু ও ফুরচুংও চলিলেন। কিন্তু টাসিলাম্পোতে পৌঁছিয়াই শরচ্চন্দ্র লাসা যাত্রার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। উগেন গিয়াৎস্থু অনেক নিষেধ করিলেন কিন্তু এবার শরচ্চন্দ্র কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না; লাসা দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। লামা ও ফুরচুং ফিরিয়া আসিলেন শরচ্চন্দ্র তাঁহাদিগকে নয়নজলে বিদায় দিলেন। মন্ত্রীমহোদয় তাঁহাকে কোন

পরিচিত লোকের সহিত লাসা পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন।

যথা সময়ে শরচ্চন্দ্র কয়েকজন যাত্রীর সহিত লাসা অভিমুখে রওনা হইলেন। শীত ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল, পথ দুর্গম হইতে অতিদুর্গম হইতে লাগিল তথাপি শরচ্চন্দ্র অটল, পথে কাশি ও প্রবল জ্বরে শরচ্চন্দ্র আক্রান্ত হইলেন তবু তিনি ফিরিতে অসম্মত—"যদি জীবন যায় এই পবিত্র হিমালয় বক্ষেই যাইবে তথাপি ফিরিব না" ইহাই তাঁহার দৃঢ় সংকল্প। ক্রমে ক্রমে পীড়া আরোগ্য হইল শরচ্চন্দ্র আবার চলিতে লাগিলেন, পথে লোকচক্ষুর অন্তরালস্থিত কত গ্রাম, কত নগর, কত নদী তাঁহার নয়নপথে পড়িতে লাগিল। এই সময়েই তিনি সুপ্রসিদ্ধ পলটী হ্রদ (Lake Palti) দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এ হ্রদ আর কোন পর্য্যটকের নয়নগোচর হয় নাই। তিনি ক্রফ্‌ট্‌ সাহেবের বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া এ হ্রদটীর নাম 'Croft Yamdo' (Yamdo অর্থে হ্রদ) দিয়াছেন।

উক্ত হ্রদের নিকট দুইদিন থাকিয়া শরচ্চন্দ্র পুনরায় পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন, ডংচি, গিয়াংসি প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নগর অতিক্রম করিয়া তিনি অবশেষে লাসার নিকটবর্ত্তী হইলেন। কবি বলিয়াছেন "ক্লেশঃ ফলেন হি পুনঃ নবতাং বিধত্তে"। দূর হইতে লাসার মন্দিররাজির ও মঠের চূড়া দেখিয়া তাঁহার হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠিল, তাঁহার চিরদিনের বাঞ্ছিতকে আজ চক্ষুর সম্মুখে পাইয়া তাহার দারুণ পথশ্রম অন্তর্হিত হইল। তিনি লাসায় পৌঁছিলেন।

ডালাই লামা ও তত্রত্য জনসাধারণ তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। শরচ্চন্দ্র দুইমাসকাল লাসায় থাকিয়া তথাকার দর্শনীয় বস্তু দেখিয়া ও আচার ব্যবহার প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। টাসিলাম্‌পো হইতে যাত্রাকালে তিনি এক 'Lacham' লাচাম্ (ভদ্রমহিলার) সঙ্গ পাইয়াছিলেন। উক্ত লাচাম শরচ্চন্দ্রকে যেরূপ যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই তাঁহার মহত্ত্বব্যঞ্জক। শরচ্চন্দ্র এখনও বলেন 'সেই পুণ্যাত্মা ভদ্রমহিলার কৃপাতেই আমার লাসা দর্শন হইয়াছে।'

শরচ্চন্দ্র ভৌগলিক ও রাজকীয় নানা তথ্য লইয়া দার্জিলিংএ ফিরিলেন। ভারতগভর্ণমেণ্ট তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিছু দিন গোপন করিয়া রাখেন। পরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উহা সাধারণে প্রকাশিত হয়। Contemporay Review ও Ninteenth Century পত্রিকায় পরে উহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে Royal Geographical Society হইতে Rockhill সাহেব উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজে পুস্তকখানি বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র উহার মূল্য স্বরূপ কেবলমাত্র ১৫০০ টাকা পাইয়াছেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র মাননীয় কল্‌ম্যান মেকলেকে 'লাচান উপত্যকা' লইয়া যান এবং পরে State Secretaryর আজ্ঞানুযায়ী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের শাসন প্রণালী অবগত হইবার জন্য 'পিকিন' যাত্রা করেন। শরৎচন্দ্র বিদেশে প্রায়ই লামার সাজে থাকিতেন, সেখানে সকলে তাঁহাকে "Kache Lama" বলিয়া সম্বোধন করিত। পিকিনে শরচ্চন্দ্র সমস্ত লামাগণের প্রিয় হইয়া উঠেন, পিকিনস্থ যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে আদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় চীন মন্ত্রী লিহাং চাং মহোদয়ের সহিতও তাঁহার আলাপ হয়।

পিকিন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শরচ্চন্দ্রকে গভর্ণমেণ্ট রায় বাহাদুর ও সি, আই, ই উপাধিদানে সম্মানিত করিলেন। তাঁহার পর্য্যটনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুদূর প্রতীচ্য ভূমি হইতে Royal Society তাঁহাকে ভৌগলিক আবিষ্কারের জন্য "Back Primium' উপহার দিলেন। শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে London Times লিখিয়াছেন।

The Pandit Sarat Chandra Das has made two eminently successful journeys into Tibet. On the last occasion in 1882 the learned Pandit worked himself into the good graces of the most important personages in Tibet and was admitted to the audience of Dalai Lama himself. The Pandit's narrative is written in a simple,natural and graphic style more like that of Defoe than of our contemporary Literateurs. Sarat Chandra was welcomed everywhere as a

pilgrim from India and was worshipped for his Buddhist learning."

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লাসায় একটী মিশন পাঠাইবার কথা হইয়াছিল যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হইত তাহা হইলে শরচ্চন্দ্রই "Colonel Young Husband'এর পদে যাইতেন কিন্তু তখন সে কল্পনা গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শরচ্চন্দ্র এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কোলাহলহীন গৃহে জীবন যাপন করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ১২৫০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করিয়াছেন, তাহাতেই শরচ্চন্দ্র কৃতজ্ঞ। শরচ্চন্দ্র Assistant Inspector of Schools এবং Tibetan translator to the Government এই দুঘটী কার্য্য প্রশংসার সহিত করিয়াছেন। এক্ষণে পেনসেন লইয়াও তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই। তিনি তিব্বতীয় ভাষার পুস্তকাবলী প্রকাশ ও অনুবাদ করিতেছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি Buddhist Text-book Society নাম দিয়া একটী সভা স্থাপন করেন। উক্ত সভার পত্রিকায় এবং Asiatic Societyর পত্রিকায় অনেকগুলি পুরাতন পুঁথি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। কবি ক্ষেমেন্দ্রের "অবদান কল্পলতা" নামক বহুমূল্য গ্রন্থখানি তাঁহার দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি একখানি সুবৃহৎ ইংরাজী ও তিব্বতীয় (Tibetan and English) অভিধান সংকলন করিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্টই উক্ত পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে শরচ্চন্দ্রের যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শরচ্চন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধটী শেষ করিব। শরৎচন্দ্রের চরিত্র ও হৃদয় শরচ্চন্দ্রের ন্যায়ই নির্ম্মল, তাঁহার সরলতা তাঁহার মিষ্টালাপ যে শুনিয়াছে যে দেখিয়াছে সেই মোহিত হইয়াছে। তিনি বাহ্যাড়ম্বর ভাল বাসেন না, তাঁহার বেশ ভূষা অতি সামান্য। ৺ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় তিনি নির্জ্জন জীবনই ভাল বাসেন। তিনি ঘোর ঈশ্বরবিশ্বাসী, কি পর্ব্বতশিখরে, কি গৃহকক্ষে তিনি সর্ব্বত্রই সেই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন তন্নিমিত্তই কখনও নিমেষের জন্য তিনি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নাই। তিনি কিরূপে বিশ হাজার ফিট উচ্চ তুষারময় শিখরদেশে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন "হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ঈশ্বরে গাঢ় বিশ্বাস থাকিলে কোন কার্য্যই অসাধ্য নয়।"

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা।

আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা বঙ্গদেশে আসিবার আজ্ঞা পাইয়া আপনাকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিলেন, একটু সন্তুষ্টও হইলেন, কারণ তাঁহার অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বেই ভোজপুরের অবাধ্য জমিদারগণকে বশীভূত করিবার জন্য তাঁহার অনেক সেনা ও অর্থক্ষয় হইয়াছিল। এখনও তাঁহাদিগের সহিত সকল বন্দোবস্ত ঠিক হয় নাই, সৈন্যদিগের বাকী বেতন পর্য্যন্ত চুকাইয়া দেওয়া হয় নাই সকলই অব্যবস্থিত, এরূপ অবস্থায় কিরূপে তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবেন, রাজ্যরক্ষার ভারই বা কাহাকে দেন, নূতন অভিযানের আয়োজনই বা কিরূপে হয়, এই সকল চেষ্টায় তাঁহাকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তুলিল। যে পিতৃব্য হইতে তাঁহাদিগের পারিবারিক শ্রীসমৃদ্ধির সূত্রপাত, যিনি তাঁহাদের সুখসৌভাগ্যের ভিত্তিভূত, যাঁহার দ্বারা বংশ উজ্জ্বল, কুল পবিত্র সেই পিতৃব্যের অসময়ে আশ্রিতের ন্যায় কাজ না করিলেও প্রত্যবায় আছে, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি সহর আজিমাবাদের উপকণ্ঠে যে জাফরখাঁর উদ্যানবাটিকা ছিল, তাহাতে উপস্থিত হইলেন, এবং হেদায়ৎ আলি খাঁ প্রমুখ বন্ধুবান্ধবকে তথায় আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্যতাবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন, হেদয়ৎ আলি অনেকটা সাহস ও উৎসাহ দিয়া বলিলেন আপৎকালে অস্থির হইলে চলিবে না, যে কোন উপায়েই বঙ্গদেশাভিযানে তৎপর হইতে হইবে। তাহার জন্য চিন্তিত হইবার কারণ নাই আমি আপনাদের বংশের চিরানুগত, আমার শক্তি সামর্থ্যে যাহা কুলাইবে,

তাহার বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইবে না, আমার মস্তক আপনাদের নিকট বিকাইয়া আছে। আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনার কিছু মাত্র উপকার হয়, তাহাতে কুণ্ঠিত নহি, প্রত্যুত তাহাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিব।

হেদায়ৎ আলির পরামর্শে সকলই ঠিক হইল। নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র জৈন উদ্দিন খাঁ হেদায়ৎ আলির উপর রাজ্য রক্ষার ভার দিয়া পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং ছয় হাজার পদাতিক সমভিব্যাহারে শুভদিনে শুভক্ষণে বাঙ্গালা দেশে যাত্রা করিলেন, অন্যান্য সেনাপতিগণের মধ্যে মেদি নেশার খাঁ এবং আবদুল আলি খাঁও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, জৈন উদ্দিন যথাকালে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে সসৈন্যে সমাগত দেখিয়া নবাবের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার সাহস ও উৎসাহ দ্বিগুণিত হইল, শরীর ও মনে প্রভূত বল সঞ্চিত হইল; তিনি আপনার সৈন্যসংখ্যা অনেক বাড়াইয়া লইলেন, এবং বর্ষার শেষে শত্রু-সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিপুলা বঙ্গীয় বাহিনী কাটোয়ার পূর্ব্বপারবর্ত্তী সুরধুনী তীরে সমাবিষ্ট হইল। সে দিকে মারহাট্টা সেনারও সংস্থিতি ছিল; তাহারাও সশস্ত্র যুদ্ধার্থ সজ্জিত। অষ্টাহ কাল উভয় পক্ষই নিরুপদ্রবে কাটাইলেন তাহার পরে মীর হবির গঙ্গাবক্ষে একখানি তরণী বাহির করিল, তাহাতে কতকগুলি সশস্ত্র সৈন্য আর কয়েকটী কামান ছিল সেই রণতরী খানি গঙ্গাজলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কৌশলে আপন সেনাগণকে গঙ্গার পশ্চিম পারে আনিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কাটোয়ার পূর্ব্বদিকে প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী প্রবল বেগে প্রবাহিত; এবং উত্তরে অজয় উভয়ের সঙ্গম স্থল বেশী দূরবর্ত্তী নহে। কাটোয়ার দক্ষিণ দিকে নবাবসৈন্যের নদী উত্তরণ সুবিধাজনক নহে, এবং উত্তর দিক দিয়া আসিতে হইলেও দুইটী জলস্রোত পার হইতে হয় তাহাও নিতান্ত সহজ নহে। অতএব নবাব স্থির করিলেন যে গভীর নিশীথে ভাগীরথীবক্ষে একটী নৌসেতু গ্রথিত করিয়া তাহারই কিয়দংশ ভাসাইয়া অপরের মুখে আনিতে হইবে, এবং তাহারই দ্বারা একবারে দুইটী নদীই উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে চলিবে না। কার্য্যকালে—তাহাই হইয়াছিল। ঘোরা যামিনী যোগে মারহাট্টা সৈন্য গভীর নিদ্রায় চৈতন্যশূন্য, প্রকৃতি নীরব নিস্পন্দ, আকাশে তারকাপুঞ্জ নবাবের ক্ষিপ্রকারিতা ও চাতুরী দেখিয়া যেন মিট মিট করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, সেই মৃদু আলোকে নবাব আলিবর্দ্দি নৌসেতু গ্রন্থনে তাহার উপর আপনার সশস্ত্র সৈন্যগণকে তুলিয়া কতকগুলি নৌকাকে যেমন অজয়ের মুখে ভাসাইয়া আনিবেন, অমনি দুই তিন খানি নৌকা শৃঙ্খলচ্যুত হইয়া গঙ্গার প্রবল স্রোতে জলমগ্ন হইল—তাহাতে প্রায় দেড় হাজার সৈন্য নদীগর্ভে জীবন হারাইল, কেহ কেহ অনুমান করেন তাহাদের সংখ্যা আরও অধিক। যাহাই হউক যখন প্রায় তিন হাজার নবাবসৈন্য পশ্চিম পারে পঁহুছিয়াছিল তখন ঊষার আলোক পূর্ব্বাকাশের অন্ধকার দূর করিল, ক্রমে নক্ষত্রের সংখ্যা কমিয়া আসিতে লাগিল কিন্তু তখনও নবাব স্বয়ং নদী পার হইতে পারেন নাই। যে সকল সেনাপতি গঙ্গার পশ্চিমপারে পঁহুছিয়াছিলেন, তাঁহারা স্থির করিলেন, অতঃপর নবাবের অপেক্ষা করা চলেনা, শত্রুপক্ষ সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে, না পারিলে সুফলের আশা থাকিবে না। তখনও মারহাট্টা সৈন্য শান্তির সুকোমল অঙ্কে শিশুর ন্যায় নিদ্রা যাইতেছিল। ভোরের পক্ষী ডাকিয়া উঠিল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে গভীর গর্জ্জনে যবনের আগ্নেয়াস্ত্র হইতে প্রভাতকালীন সূর্য্যলোকের ন্যায় গোলা ছুটিতে লাগিল, নবাবসৈন্য মারহাট্টা সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু মেলিয়া তাহারা দেখিল শমনসদৃশ শত্রুসৈন্য সম্মুখীন—মারহাট্টাসেনা দুর্দ্দান্ত হইলেও মনে মনে নবাবকে ভয় করিত, কামানের শব্দে নবাবের আগমন স্থির করিয়া তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল, নবাবসৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল—যাইতে যাইতে শত্রুসৈন্যের যাহাকে পাইল তাহাকেই হত্যা করিতে লাগিল, ঝটিকামুখে কদলীতরুর ন্যায়—মারহাট্টা সৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল, অচিরকাল মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় সেনার শবরাশিতে প্রান্তর ভূমি পূর্ণ হইয়া গেল। কিছুদূর পলাইয়া মারহাট্টা সৈন্য যখন ফিরিয়া দেখিল যে নবাব-সৈন্য তাহাদের অপেক্ষা অনেক কম, তখন তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল—যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহাদের উদ্যোগ অচিরেই

লয় পাইল। এই সময় মধ্যে নবাব আপন সৈন্যসহ গঙ্গাপার হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে তিনি পূরোবর্ত্তী সেনার সহিত মিলিত হইলেন, তখন আর মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য তিষ্ঠিতে পারিল না পূর্ব্ববৎ পশ্চিমাভিমুখ হইয়া পলাইতে লাগিল, আর ফিরিল না। নবাব সৈন্যমধ্যে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। আলিবর্দ্দি খাঁ আহ্লাদে অষ্টধা হইয়া উৎসাহবাক্যে আস্ফালন আরম্ভ করিলেন—সেনাপতিগণকে ও সৈনিক সকলকে ধন্যবাদ দ্বারা উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিলেন।

মারহাট্টা সেনাপতি পরাভূত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন—নবাব আপন সেনাপতি ও সৈনিকগণকে একদিন বিশ্রাম করিতে অবকাশ দিলেন। জলনিমজ্জনে যে সকল মুসলমান সৈনিক প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহার যাহার শব পাওয়া গিয়াছিল তাহাদের সদ্গতির জন্য নবাব সুবন্দোবস্ত করিলেন, ইস্লাম ধর্ম্মানুসারে সেই সকল শবের সৎকার হইল। এই মারহাট্টা-বিজয় খৃঃ ১৭৪৮ সালের ঘটনা।

অতঃপর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত স্বাধিকৃত দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশ প্রতিগমনের সংকল্প করিলেন। নবাবও ছাড়িবার লোক নহেন—তিনিও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে ছাড়িলেন না,—মারহাট্টা সেনাপতি সুপথ কুপথ না বিবেচনা করিয়া ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে দুর্গম অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, পথ খুজিয়া না পাইয়া তাঁহাকে বিষম বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল। সেই বনভূমি মধ্যে কণ্টকময় গুল্ম এবং লতাজড়িত ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপ সমূহের তলভূমি যারপরনাই দুরতিক্রম্য—মধ্যে মধ্যে শার্দ্দূলভল্লুকাদি শ্বাপদ জন্তুর ভীষণ দৃশ্য এবং দূর হইতে অজগরগণের বিকটমুখব্যাদন দেখিয়া ভীতি জন্মিল—অগ্রসরে অনাসক্তি হইল—পশ্চাদ্ভাগেও প্রবল শত্রুর আক্রমণাশঙ্কা উভয়ই তুল্য, আপনার অনুচর কয়েক জন সেনাপতি ও কতকগুলি সৈনিক ব্যতীত বিপুলা মহারাষ্ট্রীয় বাহিনীর অবশিষ্ট কে কোথায়, তাহাও স্থিরীকৃত হইল না, বিষম দুর্ভাবনা আসিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ অধিকার করিল। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পদে পদে প্রাণের আশঙ্কা—এইরূপ বিপত্তির সময় তিনি বিকটদর্শন তীরধনুর্দ্ধারী কয়েক জন অরণ্যচারী পুরুষের দর্শন পাইয়া তাহাদের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পথপ্রদর্শনে বনের বাহিরে আনিতেছিল এমন সময় মীর হবিবের সাক্ষাৎকার লাভে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া পলায়নের পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা জানাইলে সে তাঁহাকে বিষ্ণুপুরের বনে ফিরাইয়া আনিল—আলোকানিলশূন্য বনভূমির বাহিরে আসিয়া ভাস্কর পণ্ডিত আপনাকে যেন মাতৃগর্ভ-বিনিঃসৃত মনে করিয়া মীর হবিবের সহিত বিদায় সম্ভাষণ ব্যতিরেকেই চন্দ্রকোণার সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্য দিয়া মেদিনীপুরের দিকে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু শত্রুর অপরিসীম সহিষ্ণুতা দর্শনে তিনি চকিত ও বিস্মিত হইয়া কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়বৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মেদিনীপুরে উপস্থিত হইয়া তিনি আপনাকে শত্রুকবল-মুক্ত বিবেচনা করিয়া জাতীয়াভ্যাস বশতঃ উপদ্রব আরম্ভ করিতে না করিতে আলিবর্দ্দি খাঁ সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন—দুঃখের বিষয় তাঁহার মেদিনীপুরাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই উড়িষ্যার ডেপুটী গবর্ণরের সেনাপতি সা—মসম মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। নবাবের আগমনে ভাস্করের মনে কাটোয়ার পরাভব ক্লেশ পুনরুদিত হইল,—তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে বালেশ্বর বন্দরে পলাইয়াও জুড়াইতে পারিলেন না—শত্রু পশ্চাৎ পরিত্যাগ করে নাই—তখন এতই নিকটবর্ত্তী যে মারহাট্টা সেনাপতির আর পলাইবার পথ নাই, অগত্যা তাঁহাকে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইতে হইল। সুবর্ণরেখা-তীরে মুসলমান-মারহাট্টায় তুমুল সংগ্রাম—তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য বিধ্বস্ত ও বলহীন হইয়া পড়িল, ভাস্কর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সুকৌশলে সরিয়া পড়িলেন, নবাব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিল্কাতীর পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া যখন দেখিলেন ভাস্কর বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইয়া কয়েক দিন মধ্যে কটকে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি মারহাট্টাপরাজয়ের মহোৎসবে কয়েক দিন অতিবাহিত করিবার কালে সা মসুমের শোকার্ত্ত পরিজনবর্গের সান্ত্বনা সাধন করিলেন এবং তাঁহার শূন্য সিংহাসনে সেনাপতি মুস্তফা খাঁর পিতৃব্য মহম্মদ নেবি খাঁকে স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে তিন সহস্র সেনার অধিনায়কত্বে সম্মানিত করিলেন। সৈনিক কার্য্যে আবদুল নেবির

যেমন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল, শাসন কার্য্যে তদনুরূপ পারদর্শিতা না থাকায় তিনি রাজা জানকী রায়ের পুত্র দুর্ল্লভ রামকে তাঁহার সহকারিত্বে নিযুক্ত করিলেন।

নবাব কটকে থাকিতে থাকিতেই সংবাদ পাইলেন যে দিল্লীর সম্রাটের নিয়োগানুসারে অযোধ্যার সেনাপতি আজিমাবাদে আসিয়া তত্রত্য প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত বিরোধ বাধাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অতএব তিনি কটকে অধিক কাল বিলম্ব করিতে না পারিয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে বর্দ্ধমানে আসিয়া সংবাদ পাইলেন যে দিল্লীর সম্রাটের আজ্ঞা পাইয়া আবদুল মনসুর খাঁ আজিমাবাদ হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াছেন, অতএব উদ্বেগের কারণ রহিল না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাষ্ট্রাধিপতি বালাজী রাওয়ের বঙ্গদেশে আসিবার কথা শুনিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

এই সময় মধ্যে ভাস্কর পণ্ডিতের পরাভব ও পলায়ন বার্ত্তা সম্রাটের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। তিনি এই সংবাদে যে কত দূর আহ্লাদিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত—কারণ তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা অনেকেরই নিকট অজেয় প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের উপদ্রবে সমগ্র ভারতভূমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা সম্মুখ সংগ্রাম অপেক্ষা সমধিক লুণ্ঠনপ্রিয় ছিলেন—তবে লুণ্ঠন উপলক্ষে যেখানে সম্মুখ সংগ্রাম অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত,সেইখানেই তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত তাঁহাদের উপায়ান্তর ছিল না—সম্রাট আলিবর্দ্দি খাঁর উপর পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হেসাম-উলুমুলুক বা সাম্রাজ্যের তরবারি এই মহাসম্মানসূচক উপাধির সহিত একখানি হীরকখচিত তরবারি ও উষ্ণীষ ও বহুবিধ মূল্যবান উপহার এবং আপনার পরিধেয় বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। এই পুরস্কার ব্যাপারের সহিত নবাবের ভ্রাতুস্পুত্রগণকে ও সেনাপতি মুস্তফা খাঁ ও আতাউল্লা খাঁকে সমুচিত পুরস্কার এবং সম্মানিত উপাধিতে উৎসাহিত করিবারও ত্রুটী করেন নাই।

মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ শুনিলেন যে মহারাষ্ট্রাধিপতি বালাজী রাও বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তৎকালে ভাগলপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, নবাব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভার্থ তথায় যাত্রা করিলেন—গঙ্গাতীরে মারহাট্টা ভূপতির শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, নবাব তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎকারে তাঁহাকে বিলক্ষণ আপ্যায়িত করিলেন। বালাজী রাও যে শান্তভাবে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা নহে—পথিমধ্যে তিনি নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, জাতীয়াভ্যাস বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। যে যে জমিদার তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিতে না পারিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগেরই সর্ব্বনাশ করিবার পক্ষে ত্রুটী করেন নাই—তাঁহাদিগকেই সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ক্ষান্ত কোথায়, তাঁহাদিগের প্রকৃতিপুঞ্জকেও পথের ভিখারী করিয়া আসিয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্গদেশে আসিয়া তিনি বিশেষ কোন অত্যাচারের কাজ করেন নাই।

এই সময়ে বিরারপতি রঘুজী ভোঁসলাও সসৈন্যে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন, বালাজী রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎকালে নবাব তাঁহাকে কতকগুলি বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া রঘুজী ভোঁসলার অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিলে মহারাষ্ট্রাধিপতি অত্যধিক চৌথের দাবি করিয়া বসিলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের দূরীকরণ সাধনে তাঁহার যথেষ্ট বলক্ষয় হইয়াছে, সৈন্যগণ এখনও সমরক্লেশ বিমুক্ত হইতে পারে নাই—অগত্যা অসঙ্গত চৌথের দাবি মিটাইতে তাঁহাকে বাধ্য হইতে হইল। চৌথের দাবি মিটাইয়া নবাব রঘুজীর উপদ্রব নিবারণের প্রস্তাব করিলেন। এই সময়ে রঘুজী বর্দ্ধমান ও কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তিনি নবাবের সহিত বালাজী রাওয়ের সন্ধির সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন, এতদুভয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে পরাভব নিশ্চিত বুঝিয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না—এই প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি দ্বারা এক হৃদ্বিদারিণী ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও অদ্যাপি সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। প্রবাদ এই যে এরূপ ঘটনা বিরল নহে, বর্গীর হাঙ্গামাকালে অনেকই ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহার কিম্বদন্তী প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সমভাবে সজীব ছিল, প্রাচীন ও প্রাচীনাগণের অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত, তাহা কোন মতে উপেক্ষার বিষয় নহে।

বর্গী কখন শান্তভাবে পথ চলিত না। বিনা লুণ্ঠনে গ্রামপল্লী ফেলিয়া যাইত না। বায়ড়া পরগণার কোন একটী গণ্ড গ্রামে এক জন নিরপত্য জমিদারদম্পতি বাস করিতেন। জমিদার তখন জরাগ্রস্ত—তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গ্রামে সংক্রামকরূপে বিসূচিকা রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া বহুসংখ্যক নরনারী বালক বৃদ্ধ যুবার জীবনহানি করে—তদুপলক্ষে তাঁহার তিনটী উপযুক্ত পুত্র, দুইটী কন্যা ও সহধর্ম্মিণী কালের করালগ্রাসে পতিত হয়—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-জমিদারের আপনার বলিতে কেহই রহিল না, তিনি আপনার বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তীর্থবাসে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন—কিন্তু প্রতিবাসী বন্ধুবান্ধবদিগের অনুরোধে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে নূতন সংসারের পত্তন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। গ্রামের সকলে মিলিয়া গৃহশূন্য জমিদারকে গৃহী করিল, তিনি বৈরাগ্য অবলম্বনের আয়োজন করিতে ছিলেন দশ জনের অনুরোধে তাঁহাকে সংসারানুরাগী হইতে হইল। পরম রূপলাবণ্যবতী বয়োধিকা একটী সৎব্রাহ্মণের কন্যা মিলিল তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া তিনি শেষ দশায় নূতন সংসারের ভিত্তিপাত করিলেন। বার্দ্ধক্যে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর রূপ গুণের চিত্তাকর্ষিণী শক্তির অতিরিক্ত একটা বশীকরণী শক্তি থাকে—কেহ কেহ বলেন—সেটা বার্দ্ধক্যের দোষে, কেহ বলেন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হারাধনের স্থান পরিপূরণ করে বলিয়া—এইরূপ নানা জনের নানা কথা, তাহার মীমাংসা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—তবে আমরা সংক্ষেপে বলিয়া রাখি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-জমিদার তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর প্রতি অসাধারণ অনুরক্ত ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ দোষারোপ করা যায় না—প্রথম পক্ষের যে কোন যুবকেও এরূপ পত্নীর পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারেন না। ব্রাহ্মণীকে দেখিতে পরমাসুন্দরী, হাজারের মধ্যে তেমন একটীও মিলিবার নহে। শাস্ত্রে পদ্মিনী স্ত্রীর যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহার সে সকলের একটীরও অভাব ছিল না—কমলকুসুমের সার না মাখিলেও তাঁহার গাত্রে পদ্মগন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইত, এই সকলের উপর যারপর নাই পতিপ্রাণা ছিলেন, পতিকে তিনি দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, বার্দ্ধক্যে জমিদার-ব্রাহ্মণ জরাগ্রস্ত হইলে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বিগ্রহের ন্যায় সেবা করিতেন—সেরূপ সেবা ভৃত্য বা ভৃত্যানীর দ্বারা হইবার নহে, স্বামীকে তিনি তিলার্দ্ধের জন্য দৃষ্টি অন্তরাল করিতেন না—সর্ব্বদাই নিকটে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন, বৃদ্ধ জমিদার তাঁহার দ্বিরাগমনের পরই বুঝিয়াছিলেন তিনি কোন অংশে তাঁহার উপযুক্ত পতি নহেন, পত্নীর অসাধারণ আনুগত্য ও প্রীতিভক্তি দেখিয়া বড়ই কুণ্ঠিত হইতেন, দশ দিনের এক দিন তিনি ব্রাহ্মণীকে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে তাঁহার অপাঙ্গ বহিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু তাঁহার পীনোন্নত বক্ষঃস্থল আর্দ্র করে—তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন—ও সকল কথায় আমার অপরাধ হয়,—"

জমি। আমি সে কথা বলিতেছি না—তোমার এ সাধ সুখ দীর্ঘস্থায়ী হইবে না, আমার জরা উপস্থিত, আমি আর কতদিন বাঁচিব।

জ, পত্নী। সে কথা কে বলিতে পারে—তোমার অপেক্ষাও বৃদ্ধের বংশরক্ষা হইয়াছে, পুত্র কন্যায় ঘর ভরিয়া গিয়াছে।

যেদিন রাত্রিতে স্ত্রী-পুরুষে ঐসকল কথা হইল, সেই রাত্রির অবসান-সময়ে "বর্গি বর্গি" শব্দে গ্রাম পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে পঙ্গপালের ন্যায় বর্গি আসিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল—গ্রামবাসিগণ আপনাদের বৃদ্ধ পিতা, মাতা, ধনসম্পত্তি ফেলিয়া গ্রাম শূন্য করিয়া এবং মাঠ পার হইয়া গ্রামান্তরে পলায়ন করিল—তখনও পূর্ব্বদিক ফরসা হয় নাই—ভোরের পাখী ডাকে নাই। বৃদ্ধ জমিদারের ঘুম ভাঙ্গিল, সেকালে পল্লীগ্রামে পাকা ঘরের এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না—সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাড়ীর বাহিরে দুই একটী পাকা মন্দির থাকিত, তাহাতে বিষ্ণু-শিলা বা শিবলিঙ্গ বা তদ্রূপ কোন দেবতার বিগ্রহ বই আর কিছু থাকিত না। তবে দস্যুর ভয়ে সেই সকল মন্দিরে এক একটি গুপ্ত সিঁড়ী থাকিত, তদ্দ্বারা মন্দির-চূড়ায় উঠিয়া লুকাইয়া থাকা যাইত—এবং পারিবারিক সঞ্চিত অর্থও তাহাতে রক্ষিত হইত। বৃদ্ধ জমিদারের বাড়ীতেও তদ্রূপ একটী বিষ্ণুমন্দির ছিল—আপৎকাল উপস্থিত দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষে সেই মন্দিরের শিরোদেশে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় বর্গীর দল আসিয়া তাঁহাদিগকে

ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া লুক্কায়িত অর্থের জন্য যথেষ্ট পীড়ন করিল। বৃদ্ধ একটী পয়সা লুকাইলেন না, যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, সমস্তই বর্গীর হাতে তুলিয়া দিয়া আপনাদের দুইজনের জীবন ভিক্ষা করিলেন—বর্গী অধিক উপদ্রব অত্যাচার না করিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীকে লইয়া প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর আর্ত্তনাদে বনের পশু, গাছের পাখীও কাঁদিল—নির্দ্দয় বর্গীর মন কিছুতেই গলিল না, দেখিতে দেখিতে গ্রাম নীরব, কে কোথায় চলিয়া গেল—সকল ঘরেরই দরজা ভাঙ্গা, কপাট খোলা, বাক্স পেঁটরা ছড়ান—কোন কোন বাড়ী ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল দেয় এমন কেহই নাই। জমিদার-পত্নী অচেতনাবস্থায় একটা অশ্বপৃষ্ঠে আবদ্ধ, বর্গীরা অগত্যা বাহিরের রাস্তা ধরিয়া পশ্চিমমুখে চলিল, রাস্তার দুইধারে যে সকল গ্রাম ছিল, সে সকলগুলির যথেষ্ট দুর্দ্দশা করিল, সমস্তদিনের পর গড়মান্দারণের অদূরবর্ত্তী হাজিপুরের এক বৃহৎ আম্রকাননে রাত্রিকালের জন্য মহারাষ্ট্রীয় সেনার শিবির সংস্থাপিত হইল। পশ্চিমদিকের আকাশ অন্ধকারময় করিয়া নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উঠিল—দেখিতে দেখিতে মহাড়ম্বরে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, প্রবলঝঞ্ঝাবাত, বিদ্যুৎস্ফূরণ সহকারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল—অনশন-উপবাসকাতরা জমিদারপত্নী ভূমি শয্যায় পতিতা, এই সময়মধ্যে মারহাট্টা সেনাপতি তাঁহাকে দেখিবার জন্য দুই তিনবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই—বায়ু প্রবাহ ও বারিবর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে শ্রুতিবিদারী বজ্রধ্বনিতে, সকলেরই হৃৎপিণ্ড মধ্যে শোণিতপ্রবাহ প্রবলবেগে বহিতে লাগিল—সকলেই চিরজীবীর নাম জপিতে লাগিল—ইন্দ্রের অশনি তাহা মানিল না, সমগ্র কাননের অভ্যন্তরে অগ্নিস্তূপের আকারে পতিত হইল—দুইটী পটমণ্ডপ জ্বলিয়া উঠিল—মারহাট্টা সেনাপতির হৃদয় কাঁপিতে লাগিল—কিয়ৎকাল মধ্যেই পটমণ্ডপের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, সেনাপতি অনুসন্ধান লইয়া জানিলেন, অশনিপাতে চারিজনের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। একজন অধীন সেনাপতি, অপর তিনজন পদাতিক- অপহৃতা জমিদার পত্নীর উপর পাহারা দিতেছিল। এই আকস্মিক বিপৎপাতকালে মহারাষ্ট্র শিবিরে সকলেই কিয়ৎকালের জন্য অব্যবস্থিত হইয়াছিল, সেই অবকাশে শার্দ্দুল কবলিত কুরঙ্গিনী (জমিদার পত্নী) ঊর্দ্ধশ্বাসে আম্রকানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকালের পর তাঁহার অনুসন্ধান হইলে প্রকাশ পাইল, বনের বিহঙ্গিনী শিকল কাটিয়া পলায়ন করিয়াছে—কেহ কেহ তাঁহার অনুসন্ধানে উদ্যত হইল—কিন্তু সেনাপতি কি জানি, কি বুঝিয়া তাহাতে সম্মতি দিলেন না। পরদিন সায়ংকালে জমিদারপত্নী আপনার সুখশান্তির নিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া বিরহবিধুর দয়িতের দুরবস্থার অপনয়ন করিলেন।

ঐ ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতে মহারাষ্ট্রশিবিরে আর একটী সামান্যাকারের দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কাটোয়া হইতে আসিবার পথে দামোদরতীরবর্ত্তী মদনমোহনপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ অতি প্রত্যূষে দামোদরে মুখহাত ধুইতে গিয়াছিলেন। তিনি বর্গীর দৃষ্টিগোচর হইলে তাঁহাকে ধরিয়া মাথায় এক বৃহৎ মোট চাপাইয়া দিয়া বর্গীরা সাত আটদিন হইল ঘুরাইয়া বেড়াইতেছিল। ব্রাহ্মণ একটু কুটিল বুদ্ধি ধরিতেন—এই সাত আটদিনের মধ্যেই বর্গীর সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি বর্গীর "চৌকা" দিতেন, তরকারি বানাইতেন—সিদ্ধি ঘুটিয়া দিতেন। এই ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে তিনি তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ টাকাকড়ি কোথায় থাকিত জানিতেন। তিনি যে শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, বজ্রপতন ব্যাপার তাহার অতি নিকটেই ঘটিয়াছিল। শিবিরবাসী সকলকেই ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া ব্রাহ্মণ একটি মুদ্রার তোড়া মাথায় করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন। সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি লইয়া তিনি নিরাপদে স্বদেশে ফিরিতে পারিয়াছিলেন, গ্রামে আসিয়া একটী বৃহৎ বিষ্ণু মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

ভাস্কর পণ্ডিতের এবারের যাত্রাটা বড় মন্দ—ঝড় বৃষ্টির পরদিন তিনি হাজিপুর হইতে উঠিয়া মেদিনীপুর যাইবার পথে নবাব সৈন্যদ্বারা অনুসৃত ও পরাজিত হইয়া মেদিনীপুরে গিয়া কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিবার কালে প্রভু বালাজী রাওয়ের স্বদেশ প্রত্যাগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ইহা খৃঃ ১৭৪১ অব্দের ঘটনা।

এই বৎসর বর্ষার শেষে আলি কেরোয়লি নামে জনৈক দাক্ষিণাত্যবাসী মুসলমান সেনাপতিকে সহায় করিয়া বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বর্গী ভাস্করপণ্ডিত পুনরায় বঙ্গদেশে উপস্থিত হয়েন। নবাব আলিবর্দ্দিখাঁ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, বঙ্গদেশের সুবাদারী পাইয়া অবধি তিনি শান্তিসুখে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তিনি অবসন্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, মহারাষ্ট্র সেনাপতির উপদ্রব নিবারণের জন্য সম্মুখ সংগ্রামে তাঁহার বড় একটা প্রবৃত্তি জন্মিল না, কিন্তু এরূপ একাগ্রচিত্ত, দুর্দ্দম শত্রুর নির্য্যাতন নিতান্ত আবশ্যক। প্রজাপালনের ভার ও শাসনদণ্ড হাতে লইয়া এই সকল বিষয়ে ঔদাসিন্য অবলম্বনও কাপুরুষের কাজ। তবে, এরূপ একটা উপায় চিন্তা করিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে আর জ্বালাতন হইতে না হয়। অতএব কৌশলে কাজ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সেনাপতি মুস্তফা খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মুস্তফা খাঁ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ বিগ্রহে অবসন্ন প্রায়—অবসর লইয়া কিছুদিনের জন্য শান্তি-ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত, তাঁহার সৈন্যগণও তদবস্থ, সকলেই যুদ্ধশ্রান্ত ও নিরুদ্যম। নবাবের আহ্বান—অগত্যা তিনি তাঁহার সমীপস্থ হইয়া আজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, নবাব তাঁহাকে আপন পার্শ্বে আসন দিয়া বসাইলেন পরে বলিলেন—"মুস্তফা খাঁ, তুমি আমার বল বুদ্ধি ভরসা, আমার বয়স হইয়াছে, যুদ্ধ বিগ্রহ আর বড় ভাল লাগে না—অথচ দুর্বৃত্ত মারহাট্টা দস্যুকে দমন না করিলেও চলিতেছে না, যদি তুমি কোন কৌশলে ভাস্করের নিধন সাধন করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।"

মুস্তফা খাঁ লোকটা বেশ চালাক চতুর, কুটিল কৌশল-পটু—নবাবের প্রস্তাব বিলক্ষণ বিপজ্জনক হইলেও আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তৃত্বের লোভ পরিহার করা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর নহে। মুস্তফা নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই সময়ে ভাস্কর কাটোয়ার নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন—তাহাকে কোন কৌশলে আপন আয়ত্তে আনয়ন করিয়া পশ্চাৎ ইষ্টসিদ্ধি করেন ইহাই স্থির হইল। মুস্তফা আপন বিশ্বস্ত ব্যক্তিদ্বারা ভাস্করের নিকট একটা স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে ভাস্কর তাহাতে সম্মতি প্রদর্শন করিলেন। নবাবও তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিতে যে প্রস্তুত তাহা দেখাইবার জন্য মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে মানকরা নামক স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপিত করিলেন এবং মন্ত্রী জানকীরামকে সঙ্গে দিয়া মুস্তফা খাঁকে ভাস্করের নিকট পাঠাইলেন—তাঁহারা কথোপকথনে ভাস্করের চিত্তাকর্ষণ করিলেন—তিনি যারপর নাই আপ্যায়িত হইয়া সন্ধির প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করিলে মুস্তফা এরূপ বাক্জাল বিস্তারে নবাবের সাক্ষাৎকারে সন্ধিপত্র লেখা-পড়া ও স্বাক্ষরিত হইবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিলেন যে, ভাস্করের মন উঠিল, তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিতে পারিলেন না, তবে এইমাত্র প্রস্তাব করিলেন যে এ কথা কতদূর সত্য ও নির্ভরযোগ্য তাহা জানিবার জন্য তাঁহার একমাত্র বিশ্বস্ত সেনাপতি আলিভা কেরোয়ালকে তাঁহাদের সঙ্গে নবাবের নিকট পাঠাইবেন। নবাব-দূত তাহাতে অসম্মতির বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রদর্শন না করিয়া বরং আগ্রহই প্রকাশ করিলেন, আলিভার যাইবার দিন স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে আলিভা-আলিবর্দ্দি দর্শনে যাত্রা করিলেন—সঙ্গে জানকীরাম ও মুস্তফা খাঁ। পথি-মধ্যে তাঁহারা আলিভার প্রতি এরূপ সদাচরণ করিয়া-ছিলেন যে, তাঁহার মনে ছায়ামাত্রাবশিষ্ট যে সন্দেহটুকু ছিল তাহাও দুর হইল। নবাবের শিবিরসমীপে উপস্থিত হইয়া আলিভা যে অভ্যর্থনার আয়োজন দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিস্মিত হইতে হইয়াছিল—তিনি মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সার্থক মনে করিলেন, আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিয়া লইলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ একজন অতি বড় রাজনীতিকুশল ব্যক্তি ছিলেন—হৃদয়ে হলাহল লইয়া মুখে মধু বর্ষণ করিবার কৌশল তাঁহার ন্যায় অতি অল্প লোকেই জানিত। তিনি আদর অভ্যর্থনায় আলিভাকে আকাশের অতি উচ্চে উঠাইয়া দিলেন—আলিভা ভাবিলেন আলিবর্দ্দি খাঁর মত মিষ্টভাষী ব্যক্তি সংসারে অতি বিরল। নবাব যখন সদালাপের লহরী তুলিয়া অমিয়বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তখন আলিভা তাঁহাকে বিনয় ও শিষ্টাচারের অবতার না মনে করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অথবা কোন প্যায়গম্বরই বা হইবেন,

এরূপ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করিয়া যদি কোনরূপে বিপন্ন হইতে হয়, তাহাও শ্লাঘার বিষয় মনে করিতে হইবে। এরূপ ব্যক্তি কখন সত্যের অপলাপ করিতে পারেন না। যথাকালে আলিভা আপন শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া নবাবের সদালাপ শিষ্টাচারের কথা মহারাষ্ট্র সেনাপতিকে সমস্তই অবগত করিলেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

দূরে।

কেবল দুর হতে দেখিতে ভাল শুধু
ক্ষণিক ধরণীর সুষমা,
বারিধি বারি যেন তুলিলে কর পুটে
থাকে না যায় চলি নীলিমা।
যাহারে কাছে পাই তাহারে করি হেলা
দেখিনে তার মধু-মাধুরী,
দূরেতে গেছে যাহা, তাহারি তরে কাঁদি
মানব হৃদে একি চাতুরী!
নয়ন কাছে সদা বিরাজে যে কুসুম
তাহারে দেখিনাক চাহিয়া,
পাপিয়া গৃহ দ্বারে ডাকি না পায় সারা
থামে বিদায়-গীতি গাহিয়া;
হৃদয় মূঢ় হায় কেবল দূরে চায়
নিকটে আছে কি যে দেখে না,
দীপের কাছে শুধু আঁধার পড়ে থাকে
আলোক রেখা সেথা পশে না।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পাহাড়ী বাবা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনার পর প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। এই সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে অতুলচন্দ্রের সহিত মহামায়ার বিবাহ যে গোপনে গোপনে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, সে সংবাদ অতুলচন্দ্র জানিতেন, সুতরাং তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা ছিল না। আর অনু-কূলচন্দ্রের নিকটও এ সংবাদ গোপন ছিল না। উভয়েরই সংবাদদাতা সেই ভৈরব ঠাকুরদাদা। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কেহ এখন আর বিমলার কাছে যাইতেন না। একজন যাইতেন না লজ্জায়, অপর জন যাইতেন না রাগে, গায়ের জ্বালায়। তবে পাহাড়ী বাবা মধ্যে মধ্যে সে বাড়ীতে যাইতেন। যেন কোন কথা তিনি জানিতে পারেন নাই—এইভাবে যাইতেন। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ণেই তিনি সেই ভাবেই গিয়াছিলেন। প্রথমেই মহামায়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এখন পাহাড়ীবাবাকে দেখিলে মহামায়া আর পূর্ব্বের ন্যায় আহ্লাদিত হয় না, বরং ভয়ে একবারে জড়সড় হইয়া পড়ে। আর তার প্রাণের ভিতরেও কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করে। এখন পাহাড়ীবাবাকে দেখিয়া মহামায়ার প্রফুল্ল মুখখানি অকস্মাৎ শুকাইয়া গেল যেন বায়ুভরে হঠাৎ একখানা কালমেঘ দৌড়িয়া আসিয়া আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিল। পাহাড়ীবাবা মহামায়ার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"মহামায়া, আমায় দেখিলেই তোমার মুখখানি শুকিয়ে যায় কেন?"

কোন কথা গোপন না করিয়া মহামায়া কহিল—"তোমায় দেখলেই আমার প্রাণের ভিতর কেমন ভয় হয় পাহাড়ীবাবা?"

পাহাড়ী। পূর্ব্বে কি এমন হ'তো?

মহামায়া। না—যখন সেখানে থাকতাম, তখনও

এমন হতো না, বরং তোমায় দেখিলে অহ্লাদ হতো। তোমার চাহনি আমার আদৌ ভাল লাগে না। তুমি আর আমার দিকে অমন ক'রে চেয়-নি পাহাড়ীবাবা।

পাহাড়ী। দেখ মহামায়া, তোমায় যে না দেখ্‌লে আমার বড়ই কষ্ট হয়, তাই সেখানকার সব ফেলে তোমার জন্যেই এখানে এসেছি। তোমায় যখন দেখ্‌বো বোলেই এসেছি, তখন তোমার দিকে না চেয়ে থাক্‌তে পারবো কি করে? চক্ষু বুজে কি দেখা যায় মহামায়া?

মহামায়া। তবে তুমি আর আমায় দেখ্‌তে এসো না পাহাড়ীবাবা।

পাহাড়ী। ছি! অমন কথা কি বোল্‌তে আছে মহামায়া?

এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে কহিল—"হুঁসিয়ার খুব হুঁসিয়ার—মহামায়া!"

উভয়ে সচকিতে চাহিয়া দেখিল—পশ্চাতে লোহিয়া! লোহিয়া আরো কহিল—"মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বে।"

পাহাড়ীবাবা লোহিয়াকে কি ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু লোহিয়া সে ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কহিল—"মহামায়া আর হামাদের কথা শুনবে না—কারণ মহামায়ার সাদি হোবে পাহাড়ীবাবা। তোমায় জানাবে না—হামায় বোলবে না—সাদি হোবে।"

পাহাড়ী বাবার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল—"আমি জীবিত থাকতে নয় লোহিয়া।"

মহামায়ার মস্তকে যেন বিনা মেঘে এক ভীষণ বজ্রাঘাত হইল। বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় মহামায়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল! পাহাড়ীবাবা পুনর্ব্বার লোহিয়াকে প্রশ্ন করিলেন—"কার সঙ্গে বিয়ে হবে লোহিয়া?"

লোহিয়া। অতুলের সঙ্গে সাদি হোবে।

পাহাড়ী। কবে হবে লোহিয়া!

লোহিয়া। হামি সব শুনেছে—কাল হোবে।

তখন বিস্ফারিত-সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি মহামায়ার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া পাহাড়ীবাবা কহিলেন—"কথনই না—কথনই না।"

একেবারে নিশ্চল ও স্থির প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ মহামায়া দণ্ডায়মান রহিল। লোহিয়ার কাণে কাণে কি কথা বলিয়াই পাহাড়ীবাবা তখন তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। বাড়ীর বাহিরে আসিয়া একবার আকাশের পানে চাহিলেন। দেখিলেন—পশ্চিমদিকে অল্প অল্প কাল মেঘ দেখা দিয়াছে। দ্রুতগতিতে তখন একবারে দুর্গাদাসের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। সম্মুখে গাড়ি-বারান্দার নিম্নে দুর্গাদাস বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, সুতরাং তাঁহাকে আর বাড়ীর মধ্যে যাইতে হইল না। দুর্গাদাস হঠাৎ পাহাড়ীবাবাকে দেখিয়া কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। এমন কি প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। পাহাড়ীবাবা সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য না করিয়া দুর্গাদাসকে কহিলেন—"আপনি কয়েক দিন আমার অনুসন্ধান করিতেছেন কেন দুর্গাদাস বাবু?"

প্রশ্নের কিছুক্ষণ পরে দুর্গাদাস বাবু উত্তর করিলেন—"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বলে।"

পাহাড়ী। কি কথা বলুন।

দুর্গাদাস। আমার সেই মৃত্যু-বাণটি হারিয়ে গিয়েছে—সেই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো বলে।

পাহাড়ী। তোমার মৃত্যু-বাণের বিষয় আমি কি জানি? সেই একদিন তোমার বাড়ীতে সেটিকে দেখেছিলুম তার পর আমি আর তাহা দেখিও নাই। তোমার কাছ থেকে আমি সেটি ভিক্ষা চেয়েছিলুম, তুমি আমায় ভিক্ষা দাও নাই। তত্রাচ তোমার সে জিনিষটী হারিয়ে গেছে শুনে বড়ই দুঃখিত হলেম।

দুর্গাদাস। আজ্ঞে সত্য কথা বলতে হলে—হারায় নাই চুরি গিয়েছে।

পাহাড়ী। কে চুরি করেছে।

দুর্গাদাস। কাকেও চুরি করতে স্বচক্ষে দেখি নাই—তবে কেমন করে বল্‌বো?

পাহাড়ী। কারু উপর সন্দেহ হয়?

দুর্গাদাস। আজ্ঞে, সত্য কথা বল্‌বো?

পাহাড়ী। সত্য কথাই বলবে। আমি কখন মিথ্যা কথা শুনতে চাই না।

দুর্গাদাস। তবে শুনুন। আমার দুই জনের উপর সন্দেহ হয়ে ছিল। একজন আপনি, আর অপর জন

আপনারই শিষ্যা লোহিয়া। এখন আপনি যখন বলছেন—সেই একদিন ব্যতীত আপনি সে জিনিষ আর চক্ষেও দেখেন নাই, তখন লোহিয়ার উপরই আমার সন্দেহ রয়ে গেল।

পাহাড়ী। এ দেশে এত লোক থাকতে কেবল আমাদের দুজনের উপর সন্দেহ হলো কেন?

দুর্গাদাস। আপনারা দুজন ব্যতীত তার ব্যবহার আর কেহ জানে না, সুতরাং আর কেউ সে জিনিষ চুরি করবে না।

পাহাড়ী। তোমার ভাগিনেয় অতুলচন্দ্রই কি তোমার মনে এ সন্দেহ জন্মিয়ে দিয়েছে?

দুর্গাদাস। আজ্ঞে না। তবে সে আপনার উপর বড় সন্তুষ্ট নয়।

পাহাড়ী। তার কারণ পরে টের পাবেন। আমি তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আর কোন কথা আছে কি?

দুর্গাদাস। আজ্ঞে, না—প্রণাম হই।

দুর্গাদাস প্রণাম করিলেন। পাহাড়ী বাবা ধীরে ধীরে আপনার গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে পুনর্ব্বার একবার আকাশের পানে চাহিলেন। দেখিলেন—পশ্চিমাকাশের সেই অল্প অল্প কাল মেঘ, ক্রমেই আয়তনে বৃদ্ধি হইতেছে।

এদিকে পাহাড়ী বাবা চলিয়া যাইতে না যাইতে অতুলচন্দ্রকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে দেখিয়া দুর্গাদাস তাঁহার পিছু ডাকিলেন—"অতুল কোথায় যাও?"

অতুলচন্দ্র উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে, একবার কালীঘাটের দিকে যাবো।"

দুর্গাদাস সে কথা শুনিয়া যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তায় আবার আকাশে মেঘও দেখা দিয়েছে এ সময় নাই বা গেলে?"

অতুল। আজ্ঞে, এরূপ অসময়ে যাবার বিশেষ কারণ আছে। পাহাড়ী বাবা কেন এসেছিল মামা?

দুর্গাদাস। তিনি যে মৃত্যুবাণ চুরি করেন নাই—সেই কথা বলতে।

অতুল। আপনার কি সে কথা বিশ্বাস হয়েছে?

দুর্গাদাস। সম্পূর্ণ নহে।

অতুল। তবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুন—পাহাড়ীবাবা সে মৃত্যুবাণ চুরি করে নাই।

দুর্গাদাস। তবে কে করলে?

অতুল। আমি কতক কতক জান্‌তে পেরেছি। আজ রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে, কাল আপনাকে সে সকল কথা বলবো। আমি এই অসময়ে সেই সন্ধানেই চলেছি।

দুর্গাদাস। আচ্ছা, অনুকূল কোথায়?

অতুল। অনুকূল কলিকাতা গিয়েছে।

দুর্গাদাস। আজ ফিরে আস্‌বে তো?

অতুল। ঠিক্ নাই।

দুর্গাদাস। তবে তুমি শীঘ্র এসো আমি তোমার অপেক্ষায় রইলুম—তুমি এলে, একত্রে আহার করবো।

অতুলচন্দ্র—দ্রুতগতিতে বাহির হইলেন, আর অকাশে অমনি গুড়্ গুড়্ শব্দে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কেবল মেঘগর্জ্জন নহে, সঙ্গে সঙ্গে করাল কাল মেঘখণ্ড সকল আকাশে ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা ছুটোছুটি করিয়া কখন আয়তনে বৃদ্ধি পাইতেছে, কখন বা পুনরায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সে বর্দ্ধিত আয়তন আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। আকাশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইল। তথায় চন্দ্র বা নক্ষত্রের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গেল না কেবল আঁধার কেবল অন্ধকার। তখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চিকিমিকি বিদ্যুৎ চলিতে লাগিল, আর থাকিয়া থাকিয়া আকাশ জুড়িয়া চকচকে বিদ্যুতের ছটা আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অমনি ভীষণ বজ্রনাদের ঘটা। সে কড়কড় নাদে প্রাণীমাত্রেই শঙ্কিত। তার পর মুষলধারে বৃষ্টি। কেবল বৃষ্টি নয়—সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় চকচকানি ও আকাশ জুড়িয়া ঝক্‌ঝকানিও চলিতেছিল। সেই ঝক্‌ঝকানি আর সঙ্গে সঙ্গেই অমনি পূর্ব্বের ন্যায় কড়কড়ানি। কান যেন একবারে ঝালাপালা! একি প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ নাকি?

দুর্গাদাস বাবু তখনও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। সদর দরজায় দাঁড়াইয়া প্রকৃতির এই ভীষণ

ক্রোধ-মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন, আর এই দুর্য্যোগে অতুলচন্দ্র না জানি কত কষ্ট পাইতেছে, সেই কথাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে সে মূষলধারে বৃষ্টি থামিয়া গেল, কিন্তু তথনও সেই বিজলীর খেলা ও মেঘের গর্জ্জন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল এমন সময় অদূরে একটা বিকট "উঃ প্রাণ যায়" চীৎকার তাঁহার কর্ণে গিয়া প্রবেশ করিল! কি সর্ব্বনাশ! এ চীৎকার তাঁহার ভাগিনেয় অতুলচন্দ্রেরই কণ্ঠস্বর নয়? দুর্গাদাসের প্রাণ একবারে আকুল হইয়া উঠিল।

আর ত কোন সাড়াশব্দ নাই! দুর্গাদাস তথাপি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সম্মুখের রাস্তা দিয়া যে দিক হইতে চীৎকার আসিয়াছে, সেই দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। কিছু দূর গিয়া রাস্তার উপর এক মনুষ্যমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন। অন্ধকারে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ চমকিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে এক ভীষণ বজ্রাঘাৎ হইল। তিনি সেইখান হইতে চীৎকার করিয়া একজন ভৃত্যকে আলো আনিতে কহিলেন। ভৃত্য আলো আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই আলোকে মূর্ত্তির পরীক্ষা হইল—জীবনের কোন চিহ্নই নাই। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত হইল—এ মূর্ত্তি অন্য কাহারো নহে—এ মূর্ত্তি অতুলচন্দ্রের!

কি ভয়ঙ্কর সে পরীক্ষার ফল! প্রভু ও ভৃত্য কাহারো মুখে একটিও কথা নাই! উভয়ের মধ্যে কেহই তখন নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য কহিল—"অতুল বাবুর কি হয়েছে কর্ত্তা বাবু?"

কর্ত্তাবাবু সে প্রশ্নের আর কোন উতর দিতে পারিলেন না। তখন উভয়ে ধরাধরি করিয়া সে দেহ বাড়ীর মধ্যে আনিলেন। এই সময় অপর একজন ভৃত্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস তাহাকে কহিলেন "তুই দৌড়ে গিয়ে বিনোদ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়।"

ভৃত্য কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া একবারে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার বাবু আসিয়া পৌঁছিল। তিনি সে দেহ পরীক্ষা করিয়া জীবিতের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং সে মৃতদেহের আর কি চিকিৎসা করিবেন? তখন কিসে মৃত্যু হইয়াছে—সেই সিদ্ধান্ত করিবার জন্য ডাক্তার বাবুকে অনুরোধ করা হইল। বজ্রাঘাতে যে মৃত্যু হয় নাই সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই ছিল না। এখন সর্পাঘাতে মৃত্যু কি কোন হৃদ্‌রোগে মৃত্যু ডাক্তার বাবু সেই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শবদেহ পরীক্ষা করিতে গিয়া ডাক্তার বাবু সে দেহের ডানহস্তের তালুর মধ্যস্থলে রক্তের ধারা দেখিতে পাইলেন। বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যেন সূচাগ্রে ছিদ্র স্থান হইতে এই সূক্ষ্ম রক্তধারা বহির্গত হইয়াছে। তখন সর্পাঘাত বলিয়া প্রথমেই তাঁহার সন্দেহ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি কহিলেন—"এরূপ স্থলে সর্পাঘাতের কোন সম্ভাবনা আমার মনে হয় না, সুতরাং এ মৃত্যু—বড়ই সন্দেহজনক ব'লে আমার মনে হচ্ছে।"

তখন দুর্গাদাস বাবু কহিলেন "আমার মনে আর কোন সন্দেহই নাই। ডাক্তার বাবু, এ মৃত্যু নয়—খুন!"

ডাক্তার বাবু একবারে শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন "খুন!—এ খুন কে করলে?"

দুর্গাদাস বাবু উত্তর করিলেন—"যে আমার বৈঠকখানা থেকে মৃত্যু-বাণ চুরি করেছে—সেই এ খুন করেছে।"

এই বলিয়াই তিনি মৃত্যুবাণের বিষয় ডাক্তার বাবুকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন ডাক্তার বাবু কহিলেন—"সেইরূপ কোন বিষাক্ত অস্ত্রেই মৃত্যু সম্ভব।"

তখন দুর্গাদাস বাবু একজন ভৃত্যকে কহিলেন—"তুই দৌড়ে গিয়ে ভৈরব মামাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

অল্পক্ষণ পরেই ঘোষাল মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়াই কাঁদিয়া আকুল—ব্রাহ্মণ একবারে স্ত্রীলোকের ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কান্না আরম্ভ করিলেন। সুতরাং যে কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ডাকা হইল, তাঁহার দ্বারা সে কার্য্যের আর কিছুই হইল না। তখন দুর্গাদাস বাবু ডাক্তার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া পুলিসে সংবাদ দিলেন। ভবানীপুর থানার ইন্‌স্পেক্টার বাবু আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন জমাদার আর দুই জন পাহাড়াওলাও আসিল। তখন পুলিশ-তদারকের ধূম পড়িয়া গেল, বাড়ী পাড়ার লোকে পরিপূর্ণ হইল। পুলিশ তাঁহাদের মধ্যে কাহার কাহার এজাহার লইলেন।

বাড়ীর কর্ত্তা ও ভৃত্যদ্বয়েরও এজাহার গ্রহণ করা হইল, কিন্তু আসল কার্য্যের আর কিছুই হইল না।

অতুলচন্দ্র সকলেরই প্রিয় ছিলেন, সুতরাং যে এই আকস্মিক শোকাবহ মৃত্যুর কথা শুনিল, সে-ই রাত্রিকাল হইলেও দৌড়িয়ে আসিল। আর তখন দুর্য্যোগও সম্পূর্ণরূপে থামিয়া গিয়াছিল, সুতরাং দুর্গাদাসের গৃহ-দ্বারে ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি দেখা গেল। পুলিশ খুনের কোন কিনারা করিতে না পারিয়া সেই জনতার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। প্রতিবাসী ও বাড়ীর লোকের এজাহারের পর, ইন্‌স্পেক্টার বাবু সেই রাত্রেই লাস চালান দিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই রাত্রেই যাহাতে লাস চালান দেওয়া না হয়, সেইজন্য দুর্গাদাস বাবু তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। এই সূত্রে মৃত্যুবাণ চুরির ব্যাপার এবং মৃত্যুবাণ দ্বারাই যে অতুলচন্দ্রের খুন হইয়াছে, সে কথাও তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলা হইল। তখন খুনের একটা সূত্র পাওয়া গেল ভাবিয়া মনে মনে ইন্‌স্পেক্টার বাবু বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। আর যে ব্যক্তি সেই মৃত্যুবাণ চুরি করিয়াছে, সেই এই খুনের আসামী—এ বিশ্বাসও তাঁহার মনে দৃঢ়রূপে স্থান পাইল। তখন কাহার প্রতি সন্দেহ হয়, ইন্‌স্পেক্টার বাবু সেই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তরে দুর্গাদাস বলিতে বাধ্য হইলেন—"আমার দুই ব্যক্তির উপর এ সন্দেহ হয়।"

ইন্। কে কে সেই দুই ব্যক্তি?

দুর্গা। এক পাহাড়ীবাবা আর অপর জন লোহিয়া।

ইন্। কি পাহাড়ীবাবা! যে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ কেওড়াতলার শ্মসানে থাকে?

দুর্গা। হাঁ।

ইন্। সম্ভব নয়—আর লোহিয়া কে?

এমন সময় "হামি লোহিয়া আছে।" বলিয়া স্বয়ং লোহিয়া সেই গৃহের মধ্য প্রবেশ করিল। ইন্‌স্পেক্টার বাবু একবার তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দুর্গাদাস বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। দুর্গাদাস বাবু ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে কি ইঙ্গিত করিলেন। সে ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে পারিয়া ইন্‌স্পেক্টার বাবু লোহিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম লোহিয়া?"

লোহিয়া। হাঁ—আমার নাম লোহিয়া আছে।

ইন্। তুমি এ বাড়ী থেকে মৃত্যুবাণ চুরি করে নিয়ে গেছ?

লোহিয়া। হামি কুছু চুরি করে নে।

ইন্। তুমি এ খুনের কিছু জান?

লোহিয়া। হামি কুছু জানে নে।

তখন ইন্‌স্পেক্টার বাবু দুর্গাদাস বাবুকে ইংরাজীতে কহিলেন—"এ স্ত্রীলোকের দ্বারা এ খুন হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না—তাহলে এ সময় এখানে আস্‌বে কেন?"

দুর্গাদাস বাবু ইংরাজীতেই উত্তর করিলেন—"কেন আসিয়াছে একবার জিজ্ঞাসা করুন না।"

সে কথা জিজ্ঞাসা করায় লোহিয়া উত্তর করিল—"হামার মাজী, হামায় ভেজেছে। মাজী খবর মাংয়িছে।"

তখন মাজী যে কে এবং তাঁহারই কন্যার সহিত যে মৃত অতুলচন্দ্রের আগামী কল্য গোপনে বিবাহ হইত সে কথাও ইন্‌স্পেক্টার বাবুকে বলা হইল। আর কোন কু-অভিপ্রায় সিদ্ধির মানসে পাহাড়ীবাবা এবং তাহারই শিষ্যা এই লোহিয়া যে এই বিবাহের বিরোধী—এই সূত্রে সে সকল কথাও ইন্‌স্পেক্টার বাবুর অবিদিত রহিল না। সর্ব্বশেষে দুর্গাদাস বাবু কহিলেন—"পাহাড়ীবাবার রামচন্দ্র ব'লে আর একজন চেলা আছে, সে চুরি বা খুন না করুক তবু এ সম্বন্ধে কতক কতক জানে বলে আমার বিশ্বাস।"

ইন্‌স্পেক্টার বাবু এই সমস্ত কথাই লিখিয়া লইলেন। কোন কথাই বাদ দিলেন না। এই সকল কার্য্য শেষ করিতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সুতরাং আর অধিক বিলম্ব না করিয়া ইন্‌স্পেক্টার বাবু একখানা খাটিয়ার উপর লাসকে শোয়াইয়া দিয়া নীচের একটা ঘরের মধ্যে রাখিলেন। সেই ঘরের মধ্যে বাড়ীর পাচক ব্রাহ্মণ শ্যামাচরণ রহিল, আর ঘরের দরজার নিকট একজন পুলিষ পাহারা নিযুক্ত করিলেন। রাত্রের জন্য এইরূপে বন্দোবস্ত করিয়া তিনি সদলে থানায় চলিয়া গেলেন।

তখন একে একে অন্যান্য সকল প্রতিবাসী ও আত্মীয় গৃহে চলিয়া গেলেন। কেবল রহিলেন এক

ঘোষাল মহাশয়। কাহারো বাড়ী বিপদ-আপদ হইলে ঘোষাল মহাশয় সে বাড়ী আর ছাড়িতে চান না। দুর্গাদাস বাবু কহিলেন—"মামা, তুমি ঘরে যাবে না?"

ঘোষাল মহাশয় উত্তর করিলেন—"না বাবা রাত্রি অনেক হয়েছে, তোমার মামী এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে, আর এত রাত্রে ডাকাডাকি করে তাকে বিরক্ত করবো না। আমি তোমার কাছেই থাক্‌বো।"

কিন্তু এদিকে তাঁহার স্ত্রী 'কমলা' যে তাঁহার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিবে, না হয় শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিবে—এ কথা জানিয়াও তিনি গোপন করিলেন। সে রাত্রে দুই জনের কেহই শয়ন করিলেন না—নীচেরই একটা গৃহে বসিয়া কেবল হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। তবে দুর্গাদাসের চক্ষে বিন্দুমাত্র অশ্রু-পতনের চিহ্ন ছিল না, আর ঘোষাল মহাশয়ের চক্ষে দরদর-ধারায় অজস্র অশ্রু বিগলিত হইতেছিল। এই-রূপে রাত্রি প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল। তিনটার পর অনুকূলচন্দ্র আসিয়া পৌঁছিল। তিনিও আসিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং এ রাত্রে তিনি কাহার নিকট এই দুঃখ-সংবাদ পাইলেন, সে সম্বন্ধে আর কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল না। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থির হইয়া অনুকূলচন্দ্র অতুলের মৃতদেহ একবার দেখিতে চাহিলেন। তখন তিন জনেই সেই ঘরের দিকে চলিলেন। সে ঘরের নিকটে গিয়া দেখিলেন—পুলিষ-প্রহরী নাসিকাধ্বনি করিতেছে, আর ঘর অন্ধকার! একটা মৃতদেহ যখন ঘরের মধ্যে রহিয়াছে, তখন সে গৃহ অন্ধকার থাকা কোন ক্রমেই উচিত হয় না—এ কথা তৎক্ষণাৎ তিন জনের মনেই উদয় হইল। একজন ভৃত্যকে আলো আনিতে আজ্ঞা করা হইল। ভৃত্য আলো লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিন জনেই একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ কি! খাটিয়া শূন্য—ঘরে লাস নাই।"

ক্রমশঃ—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থের প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা।

আত্মজীবনচরিত।—স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত, ভারত-মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই, মূল্য দুই টাকা। স্বর্গীয় দেওয়ান-জীর দিক্‌পাল সদৃশ সুযোগ্য কৃতিসন্তানগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নবদ্বীপের রাজবংশ বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় বলিয়া সর্ব্বত্র বিশেষরূপে সমাদৃত ও সম্মানিত। নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ; সুতরাং তাঁহার জীবন-চরিত বর্ণনকালে নদীয়ার রাজবংশের ইতিবৃত্ত স্বতঃই আসিয়া পড়িয়াছে। দেওয়ান মহাশয়ের মনোহর আত্ম-চরিত বর্ণনার সহিত রাজবংশের গৌরবান্বিত ইতিবৃত্তের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব-গ্রন্থ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রতি পত্র বিবিধ জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ে পূর্ণ, তদুপরি ভাষা ও ভাবের লালিত্যে, বর্ণনার মনোহারিত্বে এবং বিষয় গৌরবে এই আত্মজীবনচরিত বঙ্গসাহিত্যের মহামূল্য অলঙ্কার স্বরূপ, ইহা এক কথায় নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। ৭৫ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলার রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈষয়িক এবং শিক্ষা প্রভৃতি বহুতর বিষয়ের বিশদ-বর্ণনায় এই বৃহৎ গ্রন্থ পূর্ণ। তাহার সম্যক আলোচনা করা এই সংকীর্ণ স্থানে সম্ভবপর নহে, আমরা ইহা পাঠ করিয়া পরম প্রীতি এবং জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

গ্রন্থকারের সুযোগ্য সন্তানগণ স্বর্গীয় জনকের এই বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন, এজন্য তাঁহারা আমাদেরও ধন্যবাদার্হ। পরিশেষে বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন অসার নাটক নভেল ত্যাগ করিয়া এই উপাদেয় এবং শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থখানি যত্নের সহিত পাঠ করেন, ইহাতে তাঁহাদের সময় ও অর্থ বৃথা ব্যয়িত হইবে না।

৭ম ভাগ। | মাঘ, ১৩১১। | ১০ম সংখ্যা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"Not in the camp his victory lies,
Nor triamph in the market place.
He is his nation's sacrifice,
To turn the judgment from his race."

পতিত স্বদেশবাসিগণকে উদ্ধার করিতে যুগে যুগে এক এক মহাত্মার অবির্ভাব হয়, তাঁহারা সমাজের গতি নূতন পথে পরিচালিত করিয়া আপনাদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া যান, অধঃপতিত জাতি যখন মোহান্ধ হইয়া স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, জ্ঞানীর উপদেশ ও সতর্কবাণী যখন তাহাদের ভ্রান্ত শ্রবণপথে প্রবেশ করে না, যখন তাহারা উন্নতির আলোক ও ধর্ম্মের মহীয়সী শক্তি অনুভব করিতে অক্ষম হয় তখনই এক এক মহাত্মার আবশ্যক। তাঁহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া শত বাধা শত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শত উপহাস শত বিদ্রূপ সহ্য করিয়া সমাজকে সুপথ প্রদর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মাগণের পক্ষেও এই কথাটি সম্যক প্রযুজ্য, তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণের নিকট সময় সময় যথোচিত সম্মান ও ভক্তি না পাইলেও তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জীবনী-শক্তি যেন বর্দ্ধিত হয়, মৃত্যু তাঁহাদিগকে অমর ও অজেয় করিয়া তুলে। তাঁহাদের অমানুষী শক্তি চিতাভস্মের সহিত বিলীন হয় না, জাহ্নবী-সলিল সে তেজ প্রতিরোধ করিতে পারে না, মিশর দেশীয় সিলিকস্ পক্ষীর দেহভাগ হইতে যেমন নূতন মহাবল পক্ষী উদ্ভূত হইত, সেইরূপ ঐ সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের চিতাভস্ম হইতেও এক নবীন শক্তির অভ্যুত্থান হয়, তাহার তেজ অজেয় ও অমর। সমাজ সেই শক্তির প্রভাবে আপনার অভাব বুঝিতে পারে এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অনন্তের দিকে ধাবমান হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মাগণের মধ্যে একজন, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, তাঁহার দেবোপম নির্ম্মল চরিত এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম-প্রবণ হৃদয় তাঁহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।

বিগত ৬ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে বেলা অপরাহ্ণ প্রায় দুইটার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ISSUE(S) MISSING

মহাশয় অষ্টাশী বৎসর আট মাস বয়সে তাঁহার যোড়াশাঁকোস্থ ভবনে সজ্ঞানে বেদমন্ত্রাদি শ্রবণ করিতে করিতে নশ্বরদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল যখন তিনি পার্ক ষ্ট্রীটে বাসাবাটী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার যোড়াশাঁকোস্থ গৃহে প্রত্যাগমণ করেন, তখন বলিয়াছিলেন "আমি যেখানে জন্মিয়াছি, সেইখানেই মরিব।" তাঁহার দেহধারণ ও দেহবর্জ্জন, এ উভয়ই একপ্রকার স্বর্গীয় ব্যাপার, বলিতে হইবেক। উহা বহুল আশ্চর্য্যঘটনাপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সৎসাহস, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, আধ্যাত্মিক মহত্ব ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা ও প্রচার এবং প্রকৃত মহত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা মানবমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব এবং মহাশিক্ষাপ্রদ ব্যাপার বলিতে হইবেক। মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এরূপ আদর্শ এ যুগে অতি বিরল।

কর্ম্মজীবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একজন কর্ম্মযোগী ছিলেন, তাহা যাঁহারা তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ এবং বহু-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্ম্মীদিগের মধ্যে যে কেহ তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছিলেন, তিনিই বলিতেন "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ এবং বিষয়কর্ম্মক্ষেত্রে একজন সুদক্ষ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি।" যেখানে বড় বড় বিষয়ী ও কর্ম্মীদের বুদ্ধি খাটিত না সেখানে তিনি সহজ সরল ভাবে এমন সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়া বলিয়া দিতেন যে, সকলেই তাহা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া যাইত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দেবোপম পবিত্র চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা এক বিশেষ উল্লেখ যোগ্য এবং সাধারণের শিক্ষনীয় বিষয়। যে গুণে মানবের মানবত্ব সাফল্য হয় যাহা না থাকিলে মানুষে এবং পশুতে প্রভেদ থাকে না, মানব চরিত্রের সেই একমাত্র বাঞ্ছনীয় বিষয়—সত্যের প্রতি সমাদর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে এত অধিক ছিল যে তাহা সচরাচর প্রায় দেখা যায় না, তিনি স্বীয় জীবনে যে অদ্ভুদ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সকলেরই অনুকরণীয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এস্থলে অতি সংক্ষেপে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এক সময়ে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ, বৈষয়িক গোলযোগে কিছু ঋণী হইয়া পড়েন, পরে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে তিনি বিশেষ বিব্রত হইলে তাঁহার কোন পরামর্শদাতা অসদুপায় অবলম্বনে উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চনা করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি সত্যের প্রতি সমাদর করিতে এতই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, অতি ঘৃণার সহিত পরামর্শদাতার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি যাহা সত্য বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার বিবেক তাঁহাকে সত্যের যে দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইয়া দিত তিনি আত্মীয় স্বজন, এমন এমন কি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও সেই সত্যের অপলাপ করিতেন না, তাঁহার জীবনে এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

আমরা তাঁহার ধর্ম্ম এবং কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আর অধিক কি বর্ণনা করিব? তাঁহার "আত্মজীবন" গ্রন্থখানি যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন তাহা এক শাস্ত্রবিশেষ। আর তাঁহার অতি প্রিয় পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' (যাহার বয়স এক্ষণে প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলে জানা যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিরূপ সুনিপুণভাবে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম আলোচনা ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্গ ভাষার বর্ত্তমানে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূল কারণই এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ইহা সাহিত্যসেবীদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। তবে কেহ যদি ঐ মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবনের সম্যক্ কার্য্যাবলী জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি যেন পাঠ করেন:—

১। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ—উপনিষদ ও প্রাচীন ঋষিদিগের অন্যান্য শাস্ত্রাদি হইতে সঙ্কলিত ও তাহার সুন্দর বাঙ্গালা অর্থ এবং গভীর জ্ঞানপূর্ণ-তাৎপর্য সহ প্রকাশিত।

২। "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান"—উপনিষদের শ্লোকাবলম্বনে ও প্রাচীন ঋষিদের ধর্ম্মভাব গ্রহণে চমৎকার ব্যাখ্যা।

৩। "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস"—ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে উপদেশ এবং পরকালে স্বর্গ নরক মুক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

৪। "তত্ত্ববিদ্যা"—দার্শনিক বিচারে আত্মজ্ঞান বিষয়ে সুন্দর পুস্তিকা।

৫। "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি"—সৃষ্টি এবং ধর্ম্ম বিষয়ে মহর্ষির উপদেশ হইতে সঙ্কলিত পুস্তক।

৬। "পরলোক ও মুক্তি"—অতি সংক্ষেপে পারত্রিক ও মুক্তি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ হইতে রচিত গ্রন্থ।

৭। "শ্রীমন্মহর্ষির আত্মজীবনী।"

কুন্তলা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আহারাদি করিতে রাত্রি অনেক হইল। তৎপরে অতিথি বন্ধুর সহিত আলাপ আপ্যায়নে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কালীপ্রসাদ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কালীপ্রসাদ বড় স্ত্রৈণ হইয়া উঠিয়াছেন। পাড়ার মেয়েরা, গ্রামের ছেলেরা, বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত কাণাকাণি করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল 'বাবু বড়ই বৌএর অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন। বৌকে ছাড়িয়া একতিল কোথাও তিষ্ঠিতে পারেন না।' কথাটা নিতান্ত অসার বা অসত্য নহে। কালীপ্রসাদের পক্ষে জগৎ এখন কুন্তলাময়। ভোজনে কুন্তলা, ভ্রমণে কুন্তলা, শয়নে কুন্তলা,—হায়! হায়! স্বপনেও সেই কুন্তলা। কুন্তলা ছাড়া জগতে আর কি আছে? কুন্তলা ব্যতীত সংসারে সার সত্য আর কি আছে—আর সজীবই বা কি হইতে পারে? কুন্তলা কালীপ্রসাদের আত্মা, দেহ, মন, প্রাণ সকলই একেবারে দখল করিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া বসিয়া আছে।

বৃদ্ধা গৃহিণী তাহা দেখিলেন—বুঝিলেন। মনে মনে আনন্দিত হইলেন—ভাবিলেন, তরুণমতি যুবকসন্তান আর কোনও মতেই বিগড়াইবে না। তবে প্রাণের মধ্যে একটু আশঙ্কার ছায়াও যে না পড়িল তাহা নহে। ভয়ে মাতা ভাবিলেন "ছেলে পাছে বধূর মোহে পড়িয়া স্বীয় সংসারধর্ম্ম ভুলিয়া যায়—বিষয় কর্ম্মে আলস্য ঔদাস্য করে।" মনে মনে কহিলেন "লোকে যাহা বলে তাহা ত নিতান্ত মিথ্যা ভ্রম নয়। ছেলে অতি প্রত্যুষে লোকজন উঠিবার পূর্ব্বে বধূকে লইয়া বাটীসংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করে, বধূকে সম্মুখে বসাইয়া আহার করে বধূকে পার্শ্বে বসাইয়া বই পড়ে। তবে কার্য্য করিবে কখন বিষয় আশয় দেখিবেই বা কিরূপে? কিন্তু ভাবনার কথা নয় কি? আর ভাবনার কথা হইলে উপায়ই বা কি?"

কালীপ্রসাদ, বন্ধু বেণী বাবুকে কহিলেন "তবে তুমি এখন বিশ্রাম কর ভাই!"

কলিকাতাবাসী চতুর যুবক বেণী বাবু, কালীপ্রসাদের ব্যগ্রতা, ব্যস্ততা অনেকক্ষণ হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কালীপ্রসাদের বর্ত্তমান বিশ্রাম প্রস্তাব শুনিয়া তিনি আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। বেণী বাবুর হাসি দেখিয়া কালীপ্রসাদ বুঝিলেন। কারণ দোষী ব্যক্তি পরের চক্ষুকে অত্যধিক পরিমাণে তীব্র তীক্ষ্ণ মনে করিয়া থাকে। বেণী বাবুর হাসির অর্থ বুঝিয়া কালীপ্রসাদ কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা অর্দ্ধস্ফুট ভাষে কহিলেন "তোমার বোধ হয় এখনও ঘুম পায় নাই। তোমরা কলিকাতার লোক। তোমরা একপ্রকার নিশাচর।"

বেণী বাবু যেমন চতুর তেমনই সুরসিক। সুরসিক রসাভাসের সুবিধা সুযোগ পাইলে সহজে তাহা পরিত্যাগ করে না। তাহার উপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া ছাড়ে না। বেণী বাবু কহিলেন তোমরা সাঁজ ঘুমানো পাড়াগেঁয়ে। তোমাদের ঘুম সন্ধ্যার আগে সুরু হয়। এই বলিয়া বেণী বাবু বন্ধুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা না করিয়া, একেবারে সটান শুইয়া পড়িলেন। কহিলেন—"আলোটা চক্ষের সামনে হইতে সরাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

ভৃত্য আসিয়া আলোক সরাইয়া দিল। কালীপ্রসাদ ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বীয় কক্ষে গমন করিলেন।

স্বামীর বিলম্ব দেখিয়া, কুন্তলা অনেকক্ষণ এ পাশ ও পাশ করিয়া কাটাইল। পরে কৃত্রিম নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া রহিল।

কালীপ্রসাদ আসিয়া, কুন্তলাকে অনেক ডাকাডাকি করিলেন। স্বাভাবিক নিদ্রা সহজে ভাঙ্গে। কৃত্রিম নিদ্রা ভাঙ্গিতে অনেক বিলম্ব ঘটে।

কালীপ্রসাদ প্রথমে কত ডাকিলেন। 'কুন্তলা,' 'কুন্ত,' 'কুন্তী'—আদরে, অভিমানে, বেদনায়, দুইবার—তিনবার বারবার কতবার ডাকিলেন, কুন্তলা যে দেশেও নাই। কালীপ্রসাদ অভিমানে—অনুরাগে অপর পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া শুইলেন। খানিকক্ষণ নীরবে শুইয়া রহিয়া কালীপ্রসাদ আবার উঠিলেন। শয্যায় কি ফুটিতে লাগিল। গায়ে কি প্রাণে ফুটিতে লাগিল, কালীপ্রসাদ তাহা বুঝিলেন না।

কালীপ্রসাদ মনে মনে রাগিলেন। রাগভরে কুন্তলার অধর দংশন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—'কুনো' 'কুনো,—কুন্তলা এইবার আর নীরবে অসার হইয়া রহিতে পারিল না। হাসিয়া ফেলিল। প্রকৃত নিদ্রাভঙ্গের ভাব করিয়া উঠিয়া বসিল।

কালীপ্রসাদ মনে মনে কহিলেন 'কে বলে কুন্তলা সরলা অবোধ বালিকা। কুন্তলা বড় কুটিলা দুষ্ট মেয়ে।' প্রকৃত পক্ষে কুন্তলা যে কেমন মেয়ে—কুন্তলা সরলা কি কুটিলা—কুন্তলা শান্তময়ী কি চঞ্চলা—কুন্তলা বুদ্ধিহীনা কি বুদ্ধিমতী—তাহা কালীপ্রসাদের প্রেমমুগ্ধ প্রাণ অনেক সময় বুঝিতে পারিত না। তবে কালীপ্রসাদের আত্মহারা অন্তরাত্মা জানিত যে, সে কুন্তলার হাতে কলের পুতুল। সে পুতুল হইয়া রহিতে কালীপ্রসাদের প্রাণ সুখী ব্যতীত কখনও দুঃখিত হইত না। কেন হইত না—পরের হাতে খেলার পুতুল হইতে—পরের হাতে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী হইতে কেন কালীপ্রসাদের প্রাণ—দুঃখিত না হইয়া সুখী হইত, তাহা কালীপ্রসাদ বুঝিতেন না—যেন জানিয়াও জানিতেনও না—জানিতে পারিতেন না—অথবা জানিতে চাহিতেন না। বড় সুখের সে সময়। জীবনের এই সময় বড় সুখস্বপ্নের সময়। এ স্বপ্ন মদিরা এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া জগতের জ্বালা ভুগিতে কে জাগিতে চায়?

কুন্তলা বসিয়া কহিল "এত দেরি হইল!" কুন্তলার মুখের কথা শুনিয়া, কালীপ্রসাদের প্রাণে ঘোর অভিমান জন্মিল। এই বার কালীপ্রসাদের পালা। তিনি নীরবে অভিমানের ভাণ করিয়া রহিলেন।

কুন্তলা দুই মৃণালভুজে আবেষ্টন করিরা, পতির গলদেশ ধারণ করিল। কহিল "মহাভারত পড়িবে বলিয়াছিলে। এখন পড়িবে কি?"

কালীপ্রসাদ বিগলিত কণ্ঠে কহিলেন 'রাত্রি অনেক হইয়াছে।'

কুন্তলা ঈর্ষাভরে কহিল 'কেন হইল?'

কালী।—জানইত বেণী বাবু আসিয়াছেন।

কুন্তলা।—বেণী বাবুকে এতক্ষণ বসাইয়া জাগাইয়া রাখিবার প্রয়োজন?

সম্রাজ্ঞীর অনুজ্ঞা ভাবে কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল—কালীপ্রসাদ নীরবে রহিলেন। কুন্তলা মনে মনে হাসিল। পতিকে এমন করায়ত্ত করিতে পারিলে কোন তরুণী ভার্য্যা সুখী না হয়—কোন্ সতী আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে না করে?

নবীন দম্পতির প্রেম আলাপনে, প্রণয় কলহে, সুখের রজনী বিগতপ্রায় হইল। যামিনীর চতুর্থ যামে উভয়ে নিদ্রিতা হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হরদিয়া খুব গুলজার নগর বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরদিয়ার নিকটে অনেক সাহেব কারবারী আসিয়াছে। তাহারা অনেকগুলি কয়লার কুঠি স্থাপন করিয়া ধুমধামের উত্তরোল উচ্ছ্বাস তুলিয়াছে। চারি পার্শ্বে ষ্টীমকলের 'হুসহুস' শব্দ, হাপড়ের 'হুম' 'হুম' আওয়াজে কান পাতা দায়। আকাশ ষ্টীম ইঞ্জিনের ধূমে সর্ব্বক্ষণ আঁধারময়। সাহেবদের কুঠির অনেক কর্ম্মচারী, লোকজন প্রান্তর ছাড়িয়া হরদিয়ার গ্রাম্যসীমায় বাস করিয়া রহিয়াছে।

এইরূপ লোকজনের সমাগম হওয়ায় হরদিয়া এক নগর বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরদিয়ায় এক ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইল। অনেকগুলি কুঠির কর্ম্মচারী সে বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠাতা হইলেন। আর তাহার প্রধান নেতা পরিচালক পৃষ্ঠপোষক হইলেন বিদ্যানুরাগী কালীপ্রসাদ বাবু।

কালীপ্রসাদের ধনসম্পদের অবস্থা, এই সময়ে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে উন্নত হইতে লাগিল। যে সকল ভূমি তাঁহার পিতা হরদিয়ার প্রান্তরে ক্রয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে কয়লার আবির্ভাবে, তাহাদের

আয় প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অনেক সাহেব সুবা আসিয়া বহুমূল্যে বেশী হারের খাজানায় সে সকল জমা করিয়া লইতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদের ধনভাণ্ডার অল্পকালে উছলিয়া উঠিল। কালীপ্রসাদ মনে করিলেন—'কুন্তলা কমলা। কুন্তলার আগমনে তাঁহার বাসভবন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে।'

হরদিয়া ধনের চক্র দেখিয়া, বাহির হইতে বহু ধনমুগ্ধ সংগ্রাহক জুটিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে এক চক্রভেদকারী ব্যাধ আসিয়া উপস্থিত হইল। কাশী রায় সে ব্যাধদলের সর্দ্দার। কাশী রায় জহরৎ ও বস্ত্র-ব্যবসায়ী বেশে হরদিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে কালীপ্রসাদের ছায়ায় আসিয়া আঁটিয়া বসিবার উদ্যোগ উপক্রম করিতে লাগিল। তাহার সে উদ্যোগ অল্পদিনেই সাফল্য লাভ করিল।

কালীপ্রসাদ, পিতার ব্যবসায় বুদ্ধির বড় একটা অংশ পান নাই। তিনি ব্যবসা বুঝিতেন না। ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীর ছল চাতুরীও সমঝাইতে পারিতেন না। সহজেই কাশী রায়ের বাক্যে প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুগ্ধ হইবার আরও একটা কারণ ছিল। সে কারণ টুকু তাঁহার নিজস্ব। কুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে কিছুতেই তৃপ্তি জন্মিত না! কুন্তলা তাঁহার চক্ষে 'নিতুই নব।' কুন্তলাকে কি সাজে সাজাইবেন—কি বেশে দেখিবেন—কোথায় কিরূপে রাখিবেন—কালীপ্রসাদ ইহা অনেক সময় স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেন না। একবার ভাবিতেন কুন্তলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই ভাল—তাহাতে অকৃত্রিমতার ছটা দিলে সে বনদেবতার অপভ্রংশ ঘটিবে। আবার ভাবিতেন কুন্তলাকে সুবর্ণ মুক্তায় সজ্জিত করিলে সোনায় সোহাগা পড়িবে—মণিকাঞ্চনের শুভযোগ সুসংযোগ ঘটিবে। তাই যখন মনে করিতেন তখনই কাশী রায়ের নিকট মণি মুক্তার হার বলয় আদি ভূষণ এবং মূল্যবান পট্টবস্ত্রাদি ক্রয় করিতেন। এই প্রকারে কালীপ্রসাদের নিকটে কাশী রায়ের গতিবিধির সূত্রপাত হইল। কিছু দিনে সে সূত্র বিলক্ষণ পরিপক্ক হইয়া উঠিল।

এক দিন কাশীরায় কালীপ্রসাদের বৈঠকখানায় বাবুর নিকট বসিয়া নানাদেশ বিদেশের গল্প করিতেছে, এমন সময় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক জনৈক তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাহিরে ঘোড়া হইতে নামিলেন। বৈঠকখানায় আসিয়া, কালীপ্রসাদকে নমস্কার করিলেন। কালীপ্রসাদ প্রতিনমস্কার করিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার আদর-অভ্যর্থনা করিলেন।

আগন্তুক কহিলেন "আপনি আমায় জানেন না। আমি এই জেলার স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক। আমার নাম শ্রীহরিকিশোর গোস্বামী। আমার নিবাস রামপুর।

কালীপ্রসাদ বিনীতভাবে কহিলেন "আজ্ঞে হাঁ। আপনার নাম শুনিয়াছি। তবে আপনার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই।"

হরিকিশোর মস্তক অবনত করিয়া, অত্যধিক পরিমাণে কুণ্ঠিত ও বিনীত হইয়া কহিলেন "সৌভাগ্য আমারই। আপনার ন্যায় চরিত্রবান সুশিক্ষিত মহাত্মার সহিত আলাপ পরিচয় হওয়া, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে অতি মহৎ সর্ব্বোচ্চ পদবীতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষেও মহাশ্লাঘা ও গৌরবের বিষয়। আমি অনেক দিন হইতে অনেক স্থানে অনেক লোকের মুখে আপনার মহত্ত্বের গুণগান শুনিয়া আসিতেছি। অনেক দিন হইতে ভাবিতেছিলাম আপনার সহিত আলাপ পরিচয়ের সুবিধা—সুযোগ কবে কিরূপে ঘটিবে। আমার সৌভাগ্যক্রমে, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি আমাকে এই দিকে 'ট্রান্সফার' করিয়াছেন। তাই অনেক কালের সঞ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষা সফল হইল।"

কালীপ্রসাদ সরল শিষ্ট ব্যক্তি। কথার বাণিজ্য তিনি বড় বুঝেন না জানেন না। এত কথার তিনি কি উত্তর দিবেন কিছুই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অতি সঙ্কুচিতভাবে মস্তক চুলকাইতে লাগিলেন। হরিকিশোর বাবুর আলাপনে তিনি যে বিশেষ আপ্যায়িত আহ্লাদিত হইয়াছেন, তাঁহার চক্ষের ও মুখের ভাব ভঙ্গিতে তাহাই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হরিকিশোর বাবুর সমাদর সন্তুষ্টির উদ্দেশে কালীপ্রসাদ তাঁহার ভোজনের জন্য প্রচুর আয়োজন করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। শিষ্টাচারসম্মত ক্ষণকালের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

হরিকিশোর বাবু তখন বৈঠকখানার চারিদিকে শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি কাশী

রায়ের প্রতি পতিত হইল। ঘরের আর লোকজন বাবুর পিছু উঠিয়া গেল। কাশীরায় মাথা হেট করিয়া কহিল —"নমস্কার বাবু সাহেব।" হরিকিশোর কহিলেন "আরে কেও কাশী রায়! তুমি যে এখানে?"

সতর্ক হইয়া হরিকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন। কাশী রায় হাসিয়া কহিল "আজ্ঞে বায়ু আর ব্যবসায়ী একই জাতি। উভয়েরই গতি সর্ব্বত্র।"

হরিকিশোর কাশীরায়কে ভালরূপেই চিনিতেন। কাশী রায়ও হরিকিশোরকে বিশেষরূপে জানিত ও বুঝিত। হরিকিশোর দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন "কেমন এদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের আবহাওয়া কেমন বুঝিতেছ?"

কাশী রায় উত্তরে হাসিয়া কহিল "এই তো সবে নূতন খাতা খুলিয়া বসিয়াছি বাবু।"

বুঝিতেছ কেমন?"

কাশী রায় একটু বিষণ্ণভাবে কহিল—"বড় ভাল বোধ হয় না। বড় কঠিন ঠাঁই বলিয়া মনে হয়।"

হরিকিশোর হাসিয়া কহিলেন "কেন? নূতন কাপ্তেন —নরম যায়গা বলিয়াই তো মনে হয়।"

কাশীরায় কহিল "সে কেবল কানে শুনিতে। দূরের কেশে ঘন দেখায়।"

হরিকিশোর কহিলেন "দেখ কাশীরায়, তুমি পাকা বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী হইয়া এই কথাটা বলিলে?"

কাশীরায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল "কেন?"

হরিকিশোর "তোমার ও 'কেন'র কি কোন উত্তর আছে?"

কাশী। যদি না থাকে তবে আমি নিরুত্তর।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। পরে হরিকিশোর গলার সুর নরম করিয়া কহিলেন "সন্ধ্যার পর তোমার বাসায় বসিয়া সকল বুঝা পড়া করিব। এখন একটা মোটা কথা তোমায় বলিয়া রাখি। দেখ স্থান নরমে বা কঠিনে কিছু আসে যায় না। যদি হাতের গুণ থাকে, হাতিয়ারের ক্ষমতা থাকে তবে কঠিন পাথরে সোনার ফলন ফলে।"

কাশীরায় কহিলেন "সেটা কথার কথা মহাশয়। শুনিতে ভাল—বলিতে ভাল। হাতে কলমে তাহা ফলে না।"

হরিকিশোর বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া অতি কোমল স্বরে কহিলেন "সে কথা এখন থাকুক। পরে সে কথা তোমায় বৈকালে বুঝাইব। এখন তোমাকে যে জন্য পাঠাইয়াছিলাম তাহার বিশেষ সন্ধান জানিতে পারিয়াছ কি? আমি——"

ভৃত্য আসিয়া কহিল "বাবু কি গরম জলে স্নান করিবেন?"

হরিকিশোর। না, পুষ্করিণীতে যাইব।

হরিকিশোর। পোষাক ছাড়িলেন। ভৃত্য তাঁহাকে তৈলমর্দ্দন করিতে লাগিল। কাশীরায় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরদিয়ার পশ্চিম ভাগে একটা অতি সঙ্কীর্ণ গলি। গলি যে পল্লীতে, তথায় ভদ্রলোকের বাস অতি অল্প—নাই বলিলেও বলা যায়। গলির দুই ধারে অতি ইতর শ্রেণীর বারবণিতার বাস। তাহার শেষ অংশে একখানি মদের দোকান। দোকান দিবা রাত্রি ইতর শ্রেণীর নরনারীর জনতায়, চীৎকারে, হাস্তে ক্রন্দনে কলহে—গালিগালাজে এক ভীষণ জীবন্ত নরক হইয়া রহিয়াছে। এই দোকানের অনতিদূরে একখানি লম্বা খোলার ঘরে, কাশীরায় বাসা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছে।

সন্ধ্যার পর ঘরের দাওয়ায় এক খাটিয়ার উপর কাশীরায় উপবিষ্ট। নিম্নে চারি পাশে পরিচারক ও ইতর শ্রেণীর কয়টী লোক অবস্থিত। একটু পরে জনৈক ভৃত্য বাহির হইতে আসিয়া কহিল "হরিকিশোর বাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

কাশীরায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গমন করিল। হরিকিশোর বাবুকে লইয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল। ভৃত্য একখানি চেয়ার আনিয়া দিল। হরিকিশোর বাবু চেয়ারে বসিলে, কশীরায় পূর্ব্বের খাটিয়ায় বসিল।

কাশীরায় ইঙ্গিত করিলে, একটি পরিচারক ব্যতীত অপর সকলে উঠিয়া প্রস্থান করিল। কাশীরায় ভৃত্যকে তামাকু আনিতে আদেশ করিল। ভৃত্য তামাকু সাজিতে প্রস্থান করিলে কাশী কহিল "আপনি বৈকালে আসিবেন বলিয়াছিলেন। আমি সেই আপনার অপেক্ষায় বসিয়া আছি। আপনার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, আমি নিজে আপনার ওখানে যাইতে মনন করিয়াছিলাম।"

হরিকিশোর কহিলেন "আমি কার্য্যের জন্যই বিলম্ব করিতেছিলাম। তার পর তুমি যে এত দিন কালী প্রসাদের আচার ব্যবহার দেখিলে, তাহাতে কি বুঝিলে?"

কাশীরায় নিরাশ বদনে কহিল "বুঝিলাম সকল চেষ্টা বিফল। বলিয়াছি তো সে বড় কঠিন ঠাঁই। কালীপ্রসাদ বড় শক্ত ছেলে।"

হরিকিশোর কহিলেন "তবে আর তোমার আমার বুদ্ধির দৌড় কতটুকু। শক্তকে যদি নরম করিতে না পারিলাম, তবে আর বৃথা এতকাল সংসারচক্রে ঘুরিয়া মরিলাম কেন?"

কাশী। বাবু কথাটা মুখে বলিতে সহজ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা বড় কঠিন।

হরি। কঠিন বলিলে, তৃণচ্ছেদনও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

কাশীরায় হাসিয়া কহিল "সেটা আর এটা কি আপনি সমান মনে করেন।"

হরিকিশোর দম্ভের সহিত কহিলেন "তা বৈ আর কি। একটা দুধের ছেলেকে বশ করা, আর তৃণচ্ছেদন করা, একই কথা বৈ আর কি।"

উভয়ে ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। হরিকিশোর কহিলেন "যাউক, সে সব বাজে কথায় এখন কোন দরকার নাই। কাজের কথা শোন। আমি আজ সমস্ত দিন ওখানে থাকিয়া বুঝিয়াছি, কালীপ্রসাদ একটা প্রকাণ্ড মেষশাবক—অত্যন্ত স্ত্রৈণ—স্ত্রীর হাতে খেলার পুতুল। কোন রকমে স্ত্রীর প্রতি তাহার মনে ভাবান্তর জন্মাইতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধ হইবে।

কাশীরায় কহিল "আজ্ঞে বাবু, আমি বিলক্ষণ জানি, সেই টুকুই তো মহা সমস্যার কথা। স্ত্রী, কালীপ্রসাদের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। সে বিচ্ছেদ ঘটান বড় কঠিন কাজ।"

হরিকিশোর। কঠিন বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। কালীপ্রসাদ যাহাই হউক নবীন যুবক। তেমন শিক্ষিতও সে নয়। আর মনের বল—চরিত্রের শক্তিও তাহার তত দৃঢ় নয়। তাহাকে অন্য পথে আনিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। কানাইএর রাজার ছেলেটার কথা মনে আছে? সেতো এক রকম কলির প্রহ্লাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দিন রাত্রি হরিনাম লইয়া থাকিত। তাহাকে কি করিয়া দুই জনে উড়াইয়া দিয়াছিলাম বল দেখি।

কাশীরায় উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া ঈষৎ হাসিল। কহিল দেখুন, "ভগবানের ইচ্ছা।"

হরিকিশোর তীব্রস্বরে কহিলেন "সে ইচ্ছা পরের কথা। এখনকার কথা যাহা বলি তাহা শোন। সম্প্রতি কালীপ্রসাদের সম্বন্ধীর বিবাহ উপস্থিত। তাহার পত্নীকে লইতে আসিয়াছে। পত্নীর কল্যই যাইবার বিশেষ সম্ভব। আমাকেও কল্য যাইতে হইবে। ইতিমধ্যে তুমি, মাঘী পূর্ণিমায় যে পর্ব্ব এখানে হয়, তাহাতে মেলার 'ফন' তুলিয়া কলিকাতা হইতে 'বাইজি' লইয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিও। আমি সত্বরই আসিয়া জুটিব। তাহার পর যাহা করিতে হয়—তাহা বুঝিতেছ তো?"

কাশীরায় উৎসাহিত হইল। সে হরিকিশোরকে বিশেষরূপে চিনিত—এ সকল ব্যাপারে তাহার দক্ষতা বেশ বুঝিত। কাশীরায় হাসিয়া কহিল "যে আজ্ঞা।" এই বলিয়া উঠিয়া যাইয়া, কাশীরায় গৃহ হইতে সুরাপাত্রাদি বাহির করিল। উভয়ে মদ্যপান করিয়া মত্ত অবস্থায় অন্য স্থানে গমন করিল। সে স্থানের উল্লেখ বা পরিচয় প্রদান করিয়া আমরা পাঠক পাঠিকার পবিত্র প্রাণে কলুষ কালিমা ঢালিতে চাহি না।

প্রাতে উঠিয়া, হরিকিশোর, কালীপ্রসাদের অপেক্ষায় বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছে। ক্ষণপরে কালীপ্রসাদ বিষণ্ণবদনে নামিয়া আসিলেন। হরিকিশোর কহিল "দেখুন আমি বড়ই দুঃখিত যে আপনার সহিত এবারে আমার অতি অল্পক্ষণ আলাপ পরিচয় হইল। কি করিব আমি পরের চাকর, কালীপ্রসাদবাবু, নতুবা ইচ্ছা হয় আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির সহবাসে দিবারাত্রি যাপন করি।"

কালীপ্রসাদ বিনীতস্বরে কহিলেন "সে কেবল আপনার স্নেহ-অনুগ্রহের কথা। আপনার সারল্যে প্রকৃতপক্ষে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি এতই মুগ্ধ হইয়াছি, যে যেন

আপনি আমার অতি প্রাণের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে হানি না হইলে, আমি ২।৪ দিন আপনাকে কিছুতেই যাইতে দিতাম না।”

হরিকিশোর, ক্রন্দনোন্মুখ, হইয়া ভগ্নস্বরে কালীপ্রসাদের গলা ধরিয়া কহিলেন “কি আর করিব ভাই! হতভাগ্য আমি! আমাকে অদ্যই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে হইবে। নতুবা আপনাকে বলিতে হইত না। আমি নিজেই রহিয়া যাইতাম। যাহা হউক মাতা ঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইবেন।”

কালীপ্রসাদের মাতাকে, হরিকিশোর ইতিমধ্যেই মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন। এটা তাঁহার স্বভাব। পরের পিতামাতাকে স্বার্থ সিদ্ধির আশয়ে মা, বাপ’ বলিয়া, ডাকিতে হরিকিশোর বিশেষ অভ্যস্ত ও সুদক্ষ ব্যক্তি।

হরিকিশোর গমনের উদ্যোগ করিলেন। কালীপ্রসাদ তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

অদূরে হরিকিশোরের অশ্ব প্রস্তুত ছিল। অশ্বের নিকটে আসিয়া, হরিকিশোর, কালীপ্রসাদের হাত ধরিলেন। কহিলেন “বধূমাতাকে অবশ্য কল্যই পাঠাইবেন। আমি শীঘ্র আসিতেছি। উভয়ে বিবাহের সময় যাইব। আগামী পূর্ণিমার ‘পক্ষ’ পর্য্যন্ত আমি হরদিয়ায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া এবারে আসিব।”

কালীপ্রসাদ একটু চমকিলেন। অল্পক্ষণের আলাপের মধ্যেই হরিকিশোরের এই প্রকার গার্হস্থ্য ব্যাপারে অযাচিত উপদেশের কথায়, তাঁহার মনে এক প্রকার আশ্চর্য্যভাবের উদয় হইল। কালীপ্রসাদ ভাবিলেন ‘এাঁ! হরিকিশোর বাবু কি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক। আমার স্ত্রী পিত্রালয় যাইবে, তাহাতে তাঁহার এত মাথাব্যথা কেন?’ এ ভাবটা, সরল প্রাণ কালীপ্রসাদের শুভ্র অন্তঃকরণে কখনই উদিত হইত না। কিন্তু কুন্তলার পিতৃগৃহে গমনের প্রস্তাবে, তাঁহার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে—তাঁহার মন আজি ঠিক নাই। যে অবধি, কুন্তলাকে লইতে লোক আসিয়াছে সেই ক্ষণ হইতে কালীপ্রসাদ যেন কেমন একটু উদ্ভ্রান্ত ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। প্রাণটার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ যেন “হুহু” করিতেছে—মনটা অষ্টপ্রহর উড়ু উড়ু করিতেছে। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এমন মনোহর পাঠাগার অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। কুন্তলার ইচ্ছায় নূতন যে বাগানবাড়ী হইতেছে, তাহা যেন মরুভূমি বলিয়া আজি মনে হইতেছে। কুন্তলার তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ যে অসহনীয়! উপায় কি? কুন্তলাকে এ সময়ে না পাঠাইলে; কুন্তলার পিতা মাতার প্রাণে আঘাত লাগিবে—কুন্তলার মনে বড় বাজিবে—কুন্তলার ভ্রাতার বিবাহ—উৎসব পণ্ড হইবে। তাহা হইলে লোকেই বা বলিবে কি—মাতাই বা কি মনে করিবেন। ইহা জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবী জননীর ইচ্ছা ও আদেশ কি করিয়াই বা উল্লঙ্ঘন করা যায়?

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী।

পদ্মা।

যে দেখেছে তোরে পদ্মা কবি ও অকবি
মুগ্ধ সবে; তোর সেই প্রণয়ের ছবি,
উচ্ছল চঞ্চল বেগ, আবর্ত্ত ভীষণ
যে দেখেছে তারি নাকি মুগ্ধ প্রাণমন।
হেথা-হোথা সেথা কত জেগে আছে চর
বুকে তোর; তবু নাকি ক্ষুধিত অন্তর,—
অগাধতা সেথা; তাই দৃঢ় আলিঙ্গনে
স্থল, গৃহ, বৃক্ষরাজি নিয়ে এস টেনে
ভরাতে হৃদয়। তোর এই সর্ব্বগ্রাস
এরো মাঝে আছে নাকি প্রণয় উচ্ছ্বাস।
বর্ষার চুম্বনে যবে পরিপূর্ণ প্রাণ
কি কল্লোল, কি হিল্লোল, কি ভীষণ টান,
সেও নাকি প্রণয়ের দারুণ সন্তাষ,
উদার হৃদয়ে নাকি আকুল উচ্ছ্বাস।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি।

(২)

১। নরহরি সরকার ঠাকুর

গতবারে সরকার ঠাকুর সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা হয় নাই, এবারে আমরা সে ত্রুটী সংশোধন করিব।

গতবারে আমরা দেখাইয়াছি যে, নরহরি লোচনদাসের চরিত্র গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্তু আর একজনের জীবনের উপরও তাঁহার প্রভাব অসাধারণ ছিল—তিনি আর কেহ নহেন শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর—এবার আমরা সেই কথাই বলিব।

একদিন নরহরি ঠাকুর গঙ্গাস্নানে কাটোয়া যাইতেছিলেন, যাজীগ্রাম শ্রীখণ্ড হইতে ৪ মাইল মাত্র, পথিমধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, শ্রীনিবাস তখন পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক মাত্র। শ্রীনিবাস সাক্ষাৎ মাত্র সরকার ঠাকুরকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে সরকার ঠাকুর তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। এবং;—

“শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচন।
তোমারে দেখিয়া জুড়াইল নেত্র মন॥
বড় সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে।
এত কহি পদ্মহস্ত বুলায় অঙ্গেতে॥”

ভক্তিরত্নাকর।

এই ঘটনাটী “প্রেমবিলাস” গ্রন্থে অল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে;—

পথিমধ্যে সরকার ঠাকুরের সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ হইবামাত্র, শ্রীনিবাস যে মহাপ্রভুর শক্তি লইয়া অবতীর্ণ, ইহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন;—

“তোমার নিমিত্ত নিত্যানন্দ যে চিন্তিত।
সাধ ছিল দেখা হৈল তোমার সহিত॥
নাহি শুনি কারো মুখে নহে দরশন।
না বুঝি ইহাতে আছে কত গূঢ় ধন॥”

সরকার ঠাকুর আরও বলিলেন যে, বীরচন্দ্র প্রভু ও জাহ্নবী দেবী তোমাকে বৃন্দাবন পাঠাইবার জন্য আমাকে বলিয়াছেন। প্রভু তোমার দ্বারা অনেক লীলা প্রকাশ করিবেন। অনন্তর উভয়ে শ্রীখণ্ডে গমন করিলেন—পরে শ্রীনিবাস গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাহার পর হইতেই শ্রীনিবাস গৃহে প্রত্যাগত হইয়া নিরন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবিলাস শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রেমবিলাসের মতে গৃহে যাইয়া অকস্মাৎ শ্রীনিবাসের প্রেমোন্মাদ হইল;—

“ঘরে যাইয়া বালক অস্থির হইল প্রেমে।
হাসে কান্দে নাচে গায় ঘন পড়ে ভুমে॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে অতি উচ্চস্বরে।
রোদন উঠিল বড় আচার্য্যের ঘরে॥”

জনতার মধ্যে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বলিলেনঃ—

“খণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুর মহাশয়।
স্নানকালে বালক সনে পথে দেখা হয়॥
তাঁর দর্শনে বালকের এই দশা হইল।
চিন্তা নাহি ধৈর্য্য ধর স্বরূপে কহিল॥”

শ্রীনিবাস তাহার পর পিতার নিকট হইতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত চৈতন্যলীলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে প্রেমরাশিও সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। ইহার পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল, নীলাচলে তিনি শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভের জন্য যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীখণ্ড গ্রামে সরকার ঠাকুরের ভবনে আগমন করিয়া সরকার ঠাকুর ও খণ্ডবাসী ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া নীলাচলে যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। সরকার ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, “ও কার্য্যে বিলম্ব করিও না, শান্তিপুর হইতে আচার্য্য প্রভু মহাপ্রভুকে যে তর্জা পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রাপ্তির পর মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করিবেন বলিয়া সমস্ত ভক্তবৃন্দই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, অতএব তুমি অবিলম্বে নীলাচলে গমন কর।” বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নকমল অশ্রুনীরে ভরিয়া উঠিল। “প্রেমবিলাস” গ্রন্থে এ ঘটনাও কিছু পরিবর্ত্তিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একদিন রাত্রে শ্রীনিবাস স্বপ্ন দেখিলেন যেন মহাপ্রভু তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন যে, “তুমি বৃন্দাবনে গমন কর।” নিদ্রাভঙ্গে শ্রীনিবাস চিন্তা করিতে লাগিলেন “মাতাকে ছাড়িয়া কি করিয়া যাইব? বিশেষতঃ এখনও আমার দীক্ষা হয় নাই, দীক্ষা গ্রহণ না করিলে ত বৃন্দাবন গমনের অধিকার নাই। যাহা হউক সরকার ঠাকুর যে যুক্তি দিবেন তাহাই করিব।” এই ভাবিয়া তিনি শ্রীখণ্ড যাত্রা করিলেন, বৃক্ষমূলে রঘুনন্দন

ঠাকুর উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার প্রশান্ত প্রেমোজ্জল মূর্ত্তি দেখিয়া রঘুনন্দন ঠাকুর তাঁহার পরিচয় লইলেন। শ্রীনিবাস নাম শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ;—

"ঠাকুরের শ্রীমুখেতে শুনিয়াছি সব।
দর্শন মাত্রেতে তোমার গেল সব ক্ষোভ॥
চল চল ওহে ভাই ঠাকুরের কাছে।
ইষ্ট গোষ্ঠী পশ্চাৎ করিব দুঁহে পাছে॥"

রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীনিবাসের হস্ত ধারণ করিয়া সরকার ঠাকুরের নিকট লইয়া গেলেন। সরকার ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বৃন্দাবন যাওয়া সম্বন্ধে তিনি কি স্থির করিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসিলে, তিনি বলিলেন "ঠাকুর অদ্যাপি আমার দীক্ষা হয় নাই, আমি বৃন্দাবন যাইব কিরূপে ?"

"রোদন করিয়া তিঁহ করে নিবেদন।
বঞ্চনা করিয়া কেনে পাঠাও বৃন্দাবন॥
চাকন্দী হইতে আসি পাইল দরশন।
সেইকালে করিয়াছি আত্মসমর্পণ॥"

(প্রেমবিলাস)

সরকার ঠাকুর বলিলেন, "মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী তোমাকে দীক্ষিত করিবেন, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া কিছু দিন অবস্থিতি কর, পরে 'হরিনাম মহামন্ত্র' গ্রহণ করিবে।" নানাপ্রকার চিন্তায় সমস্তদিন কাটিল, অবশেষে রজনীশেষে স্বপ্ন দেখিলেন—মহাপ্রভু বলিতেছেন ;—

"শুন শুন শ্রীনিবাস কেন ভাব মনে।
প্রেমরূপ জন্ম তোমার মোর প্রয়োজনে॥
বৃন্দাবন যাও তুমি বিলম্ব না কর।
গোপালভট্টের পদ আশ্রয় যে কর॥
*　　*　　*　　*
যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন রূপ সনাতন।
তুমি গেলে তোমারে করিবেন সমর্পণ॥
তোমার বিলম্বে তাঁরা আছেন চিন্তিত।
কার্য্য সিদ্ধ হইল তুমি চলহ ত্বরিত॥"

প্রেমবিলাস।

শ্রীনিবাস স্বপ্নবৃত্তান্ত সরকার ঠাকুরকে জানাইলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মহাপ্রভু তোমাকে কৃপা করিয়াছেন, ব্রজধামও তোমার প্রতি কৃপা করুন। যে পর্য্যন্ত বীরচন্দ্র প্রভুর নিকট হইতে পত্র না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর।" শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, নরহরি ঠাকুর একদল বৈষ্ণবকে শ্রীনিবাসের সঙ্গে যাইতে আদেশ করেন ও গদাধর পণ্ডিতকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন।

শ্রীনিবাস নীলাচল পরিভ্রমণ করিলেন কিন্তু তখন গৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর তিরোভাব ঘটিয়াছে, চারিদিকে ভক্তমণ্ডলী প্রভুর অদর্শনে হাহাকার করিতেছেন, তিনি উৎকল ত্যাগ করিয়া ক্রমে গৌড়াভিমুখে আগমন করিলেন। শ্রীখণ্ডে উপনীত হইয়া সরকার ঠাকুর প্রভৃতির চরণে প্রণিপাত করিয়া পথের সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন।

"দণ্ডবৎ করিয়া কহিল বিবরণ।
হাহাকার করি অনেক করিলা রোদন॥
সে বিরহ বিলাপ কে বর্ণিবারে পারে।
গুরুবৈষ্ণববিচ্ছেদদুঃখ যাহার অন্তরে॥

প্রেমবিলাস (চতুর্থ বিলাস)।

তাহার পর শ্রীনিবাস আচার্য্য কিছুদিন শ্রীখণ্ডে বাস করেন। পরে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া আবার শ্রীখণ্ডে আসিয়া তিনি সরকার ঠাকুরকে তাঁহার সমস্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিলেন। ইহার পর তিনি যাজীগ্রামে কিছুদিন বসবাস করিলেন, মাসে মাসে শ্রীখণ্ডে আসিয়া ধর্ম্মালোচনা ও সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন।

তৎপরে বৃন্দাবন ধাম পরিভ্রমণ করিয়া যখন শ্রীনিবাস নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বৈষ্ণবগগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কবৃন্দ প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে, সরকার ঠাকুর মৃতপ্রায়—নির্জ্জন ভজনগৃহে তিনি বাস করিতেছেন, শ্রীগৌরবিগ্রহ আরাধনা ও গৌরগুণ গান করেন এবং অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যায়। ইহা শুনিয়া পরদিনই তিনি সরকার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে শ্রীখণ্ডে উপনীত হইলেন। প্রথমেই সরকার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া প্রণিপাত করিলেন। রঘুনন্দন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সরকার ঠাকুরের নিকট লইয়া গেলেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই সরকার ঠাকুরের তিরোভাব ঘটে, কিন্তু "ভক্তিরত্নাকর" ও "অনুরাগবল্লী" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সরকার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের ঐতিহাসিকতা অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম ;—

শ্রীনিবাস ভক্তিভরে প্রণাম করিলে সরকার ঠাকুর—

"আইস বাপ বলি কোলে কৈল শ্রীনিবাসে॥
শ্রীনিবাসে কোলে লইয়া হইল বিহ্বল।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল॥
প্রেমজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে।
করে ধরি বসাইলা আপনার পাশে॥
পরম বাৎসল্যে হস্ত বুলায়েন গায়।
দেখি সে অদ্ভুত রীত কে না সুখ পায়॥"

"পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে সস্নেহ বচনে।
নরোত্তমে দেখি শীঘ্র সাধ বড় মনে॥
বুঝি নরোত্তম এথা আসিবে ত্বরায়।
বহু কার্য্য সিদ্ধ হবে তাহার দ্বারায়॥
তাঁর সহ তুমি সংকীর্ত্তনে মত্ত হ'বা।
দারুণ বিচ্ছেদ জ্বালা হৈতে জুড়াইবা॥
আহে বাপ হৈল ভাল আইলা শীঘ্র করি।
এসময়ে তোমারে দেখিনু নেত্র ভরি॥
চিরায়ু হইয়া কর ভক্তি উপার্জ্জন।
ভক্তিগ্রন্থ সর্ব্বত্র করহ বিতরণ॥
হইবে স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম।
না বুঝিবে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মর্ম্ম॥
এ সব পাষণ্ডে উদ্ধারিব ভক্তিবলে।
গাইব তোমার যশ বৈষ্ণব সকলে॥"

তার পরে অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে পুনরায় সরকার ঠাকুর বলিলেন "পরম বৈষ্ণবী মাতার চিরদিন সেবা করিও—এবং দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর।" সরকার ঠাকুরের আদেশে তিনি দারপরিগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন। তাহার পর শ্রীখণ্ডের নাটমন্দিরে খণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণের সহিত ইষ্টালাপ করিয়া তিনি যাজীগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তৎপরে আর সরকার ঠাকুরের সহিত শ্রীনিবাসাচার্য্যের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই। তাঁহার সেই আশীর্ব্বাদই শেষ আশীর্ব্বাদ হইয়াছিল। শ্রীনিবাসাচার্য্য সম্বন্ধে এত কথা লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দেখাইলাম নরহরি ঠাকুরের পুত্রবৎ স্নেহ, তাঁহার উপদেশ, মহৎ চরিত্রের অতুল প্রভাব তাঁহাকে সাধনপথে কতটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। আচার্য্য ঠাকুরের জীবনচরিত প্রণেতা সুলেখক শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন "বলিতে কি শ্রীনিবাস সরকার ঠাকুরের হস্তেই গঠিত হইয়াছিলেন।"

২। লোচন দাস।

জীবনী।

লোচনদাস বর্দ্ধমানের দশ ক্রোশ উত্তরে কোগ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ; ইঁহার তিনটী নাম ত্রিলোচন, লোচনানন্দ ও লোচন ; "চৈতন্যমঙ্গল" নামক তাঁহার রচিত গ্রন্থে এই তিনটী নামই পাওয়া যায়। শেষোক্ত লোচন নামেই তিনি বিখ্যাত।

"চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থের শেষাংশে এবং "দুর্ল্লভসার" গ্রন্থের আদিতে লোচন যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম কমলাকর দাস এবং মাতার নাম সদানন্দী, মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহীর নাম অভয়া দেবী, কোগ্রামে তাঁহার বাস এবং বৈদ্যকুলে তাঁহার জন্ম। যথা ঃ—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস।
মাতা শুদ্ধমতী সদানন্দী তাঁর নাম॥
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম।
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে পাই গোরাগুণগাঁথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে॥
মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্ব তীর্থে পূত তেঁহো তপস্যায় তৃপ্ত॥

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেম ভক্তি দাতা॥"

চৈতন্য-মঙ্গল।

তাঁহার পিতার অবস্থা মন্দ ছিল না। আজিও তাঁহাদের ভূসম্পত্তির চিহ্নস্বরূপ লোচনের ডাঙ্গায় ও অন্যান্য স্থানে বিস্তর ব্রাহ্মণ বৈদ্য বসবাস করিতেছেন।—সে সমস্ত সম্পত্তি এক কালে লোচনদাসের ছিল, এবং তাঁহার কুলগুরুবংশীয় খুড়ুরার অধিকারীরা আজিও তাঁহার প্রদত্ত বিষয় সম্পত্তি ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন।

বাল্যকালে পিতামাতার একমাত্র প্রিয়তম পুত্র বলিয়া লেখাপড়ায় তাঁহার ততটা আগ্রহ ছিল না।

যথা:—

"যথা যাই তথাই ডুলিল করে মোরে।
ডুল্লিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥"

অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়, বিবাহের পরেই তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য নরহরি ঠাকুরের নিকট আগমন করেন। কৈশোরে তিনি শ্রীখণ্ডে বিদ্যাভ্যাস করেন, যৌবনে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আদর্শে তাঁহার চরিত্র গঠিত হয়।

যথা:—

"প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরি দাস।
তাঁর পদপ্রসাদে এ পথের প্রতি আশ॥"

এবং জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি শ্রীখণ্ডে যাপন করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে শ্রীখণ্ডের কবি বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সেই নিমিত্তই বোধ হয় "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে লিখিত হইয়া থাকিবে:—

"বৈদ্য বংশোদ্ভব হয় শ্রীলোচন দাস।
শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস॥"

নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের একজন পার্ষদ ভক্ত, গৌর-প্রেমে তাঁহার হৃদয় তখন অভিষিক্ত, লোচনও তাঁহার সঙ্গ ও শিক্ষা গুণে গৌরপ্রেমামৃত সাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাহারই ফলে "শ্রীচৈতন্য মঙ্গল" ও তাঁহার রচিত পদাবলী। নরহরি ঠাকুরের আদেশে ১৪৫৯ শকে তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভেই আছে:—

"শ্রীনরহরি দাস যে দয়াময় দেহ।
পাতকী দেখিয়া দয়া বাঢ়াল স্নেহ॥
দুরন্ত পাতকী অঙ্গ আমি দুরাচার।
অনাথ দেখিয়া দয়া কৈল অপার॥
তাঁর দয়া বলে আর বৈষ্ণবপ্রসাদে।
এই ভরসায় পুঁথি হইবে অবাদে॥"

"চৈতন্যমঙ্গল" আদি, মধ্যম, অন্ত এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে সংক্ষেপে প্রায় সমস্ত চৈতন্যলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে পাঁচালীরূপে ইহার গান হইয়া থাকে; মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত "চৈতন্যচরিত" অবলম্বনে সম্ভবতঃ এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়া থাকিবে। ইহাতে ইতিহাসের শুষ্ক অস্থিপঞ্জর কবিত্ব-কল্পনার অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

"চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে নিত্যানন্দ ঠাকুরের আদেশে শ্রীবৃন্দাবন দাস "চৈতন্যমঙ্গল" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্ব রাত্রে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন লোচন সাধন-প্রভাবে তাহা জানিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বর্ণনা করেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার যাথার্থ্য লইয়া বৃন্দাবন দাস ও লোচনদাসে মহা বচসা হয়। অবশেষে বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণী ঠাকুরাণী লোচনদাস বর্ণিত বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং বৃন্দাবন দাসের পুস্তকের নাম সেই হইতে "চৈতন্যভাগবৎ" রাখিয়া দিলেন। এই প্রবাদের মূলে কতটা সত্য আছে—বলা যায় না।

লোচনদাস যে প্রস্তরের উপর বসিয়া "চৈতন্যমঙ্গল" রচনা করিতেন আজিও তাহা শোভা পাইতেছে।

"চৈতন্যমঙ্গল" ব্যতীত "দুর্ল্লভসার" "রাগলহরী" "বস্তুতত্ত্বসার" "আনন্দলতিকা" "প্রার্থনা" "শ্রীচৈতন্য-প্রেমবিলাস" "দেহ নিরূপণ" নামক তাহার আরো সাতখানি গ্রন্থ আছে। "দুর্ল্লভসার" গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায়ই প্রসিদ্ধ; ইহাতে চৈতন্যমঙ্গলের নাম ও বিবরণ আছে বলিয়া অনুমান করা যায় ইহা সম্ভবতঃ চৈতন্যমঙ্গলের পরে রচিত হইয়া থাকিবে।

"রাগলহরী" "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" গ্রন্থের অধ্যায়বিশেষের কাব্যানুবাদ। ইহাতে আচার্য্য প্রভুর নাম থাকাতে ইহা তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ ও বৃদ্ধ বয়সে রচিত বলিয়া বোধ হয়।

"কাঁদড়া"-নিবাসী বিখ্যাত "চৈতন্যমঙ্গল"-গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে আজিও তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পুঁথি সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে। তবে ভক্তির আতিশয্য বশতঃ চন্দনলিপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে অপাঠ্য হইয়া আসিতেছে। লেখা দেখিয়া তাঁহার সুন্দর হস্তলিপির পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ "জগন্নাথ বল্লভ" নাটকের ইনিই অনুবাদক। ইহা ছাড়া তাঁহার বিস্তর পদ আছে, ঐ পদাবলীর জন্য তাঁহার নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

আজন্ম ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় পরম ভাগবৎ নরহরি ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাঁহারও সংসারবৈরাগ্য ঘটিল। তিনি স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীখণ্ডেই রহিয়া গেলেন, অথচ তাঁহার শ্বশুরালয় আমোদপুর কাকুট গ্রামে তাঁহার উদ্ভিন্নযৌবনা স্ত্রী দিন দিন শিশিরমথিতা পদ্মিনীর মত বিরহে ম্লান হইতেছিলেন। বহু নির্ব্বন্ধে তিনি একদিন পদব্রজে শ্বশুরালয়-অভিমুখে চলিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়া পথিপার্শ্বে একটী যুবতীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ কোন পথে যাইব?" পরে জানা গেল সেই যুবতীই তাঁহার স্ত্রী। লোচন স্থির করিলেন ইহা বিধাতারই ইচ্ছা, বিষাদে ফল নাই। ভগবদ্ভক্ত স্বামী-স্ত্রী সেই দিন হইতে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের দাম্পত্য প্রেমের পুষ্পাঞ্জলী তিনি প্রাণের দেবতার পদে অর্পণ করিলেন, ক্ষুদ্র দাম্পত্য প্রেম বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হইল। অথচ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরাগের পরিচয় চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়াই রচনা করেন।

চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমেই এই পদটী আছে:—

"প্রাণের ভার্য্যে নিবেদোঁ নিবেদোঁ নিজ কথা।
আশীর্ব্বাদ মাগে আগে
যতযত মহাভাগে
তবে গাব গোরাগুণগাথা॥"

এই যতিপুরুষ গৌরপ্রেমযজ্ঞে কামের আহুতি দিয়া যে অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কত যে তাপিত তৃষিত জন সঞ্জীবিত, সরস ও সুন্দর হইয়াছে তাহার আর সীমা নাই।

১৫৮৯ খ্রীঃ ২৯শে পৌষ ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব ঘটে। ঐ উপলক্ষে অজয় নদীতীরে লোচন ডাঙ্গায় তিন দিবসব্যাপী বহু জনাকীর্ণ এক মেলা বসিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন উক্ত মেলার প্রবর্ত্তক স্বয়ং লোচনদাস। কোগ্রামের পূর্ব্ব নাম অনুসরণ করিয়াই বোধ হয় উহা উজানীর মেলা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কুনুর নদীর তীরে আজিও কোগ্রামে লোচনের সমাধি রহিয়াছে। প্রতিদিন সেই সমাধি মোহান্তগণ ও বহুদূর-সমাগত বৈষ্ণবগণ কর্তৃক পূজিত হয়। উহা কবির সমাধির উপযুক্ত স্থানই বটে, উপরে আকাশের নীলচন্দ্রাতপ—চারিদিকে হরিৎ তৃণক্ষেত্র, সমাধিপ্রদেশ কুসুমিত মাধবী লতাদামপরিবেষ্টিত; মাধবী কুসুম যেন প্রকৃতির পুষ্পাঞ্জলির মত দিবানিশি বর্ষিত হইতেছে।

কবিত্ব।

"চৈতন্যমঙ্গল" কাব্যে কবি ইতিহাসের নীরস অস্থি পঞ্জর ভাবপ্রবাহে সরস ও কল্পনার অপরূপলাবণ্যে ভূষিত করিয়াছেন, এবং অনুর্ব্বর ইতিহাসের যেখানে একটু অবকাশ পাইয়াছেন, সেখানেই কবিতার শ্যামনিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সুলিখিত বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছেন। তাঁহার কবিত্বের "সোণার কাঠি" স্পর্শে যেন নির্জ্জীব কঠোর সত্যও চকিতে সরস ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে। এবং "চৈতন্য-মঙ্গল" কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্যের জীবন চরিত না হইয়া যেন তাঁহার সুখদুঃখ, বিরহমিলন, মান-অভিমান, জয়পরাজয়, ধ্যানধারণা, সাধ্যসাধনা, প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস, কঠোরবৈরাগ্য, অতুল করুণা, ও সর্ব্বোপরি তাঁহার বিরাট মহিমার মহান্ চিত্রগুলি লোচন দাসের অপূর্ব্ব তুলিকাস্পর্শে, অতুল চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায়, এবং কবিত্ব ও কল্পনার সুন্দর বর্ণাভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও তাঁহার রচিত ধামালী ও পদাবলীতেই তাঁহার কবিত্ব ও প্রেমাভিষিক্ত হৃদয়ের সমধিক

পরিচয় পাওয়া যায়। কবি যেন ভাবে ও প্রেমে তন্ময় হইয়া আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহার মনে হইয়াছে যে লীলাময়ের বিশ্বরূপ লীলামণ্ডপে যেন কেবলমাত্র তিনি ও তাঁহার প্রাণেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ দেব। তিনি যেন চিরদাসী হইয়া তাঁহারই চরণে মন প্রাণ সমর্পন করিয়া আছেন। তাই কখনও প্রিয়তমের রূপে মুগ্ধ, বিরহে আকুল, মিলনে আত্মহারা, আবেগে উন্মত্ত, অভিমানে অধীর, ভক্তিতে আর্দ্র, প্রেমে তন্ময় হইয়াছেন। মন-বৃন্দাবনে এই মধুর রসধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সে কবিত্ব কি সুন্দর! এই প্রেমপ্রবাহে, এই ভাবধারায়, কবিতার উৎস বলিয়া তাহা এত মধুর। প্রেমের ভিতর দিয়া অসীমের ভাব তাঁহার মনে ফুটিয়াছে বলিয়াই তাহা বিশ্ববিজয়িনী। বহু দিনের সাধনার ধন বলিয়াই তাহা আমাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে!

লোচন দাসের কবিতা অত্যন্ত সরল খাঁটী বাঙ্গালা ভাষায় রচিত; তাহাতে অলঙ্কারের ঘনঘটা বা কল্পনার ছটা নাই। অলৌকিক শাব্দিকতা এবং ছন্দের ঝঙ্কারও তাহাতে বিরল। প্রেমের ভাষা, ভাবসর্ব্বস্ব হৃদয়ের ভাষা বলিয়াই বোধ হয় তাহার কৃত্রিম বেশভূষার প্রয়োজন হয় নাই। ভাষা বড় স্বচ্ছ, বড় সরল, কিন্তু ভাব বড় গভীর অতলস্পর্শ! ভাবস্রোতে ডুবিলে কূলকিনারা পাইবার যো নাই।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর রূপ বর্ণনা উপলক্ষে কবি বলিতেছেন :—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

"প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর" এই একটী মাত্র ছত্রে ক্ষমতাশালী কবি যে গভীর ভাব, বিরহের তীব্রতা, আকুল মিলনলালসা, অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা অন্য কবির কাব্যে দুর্ল্লভ, অথচ হা হুতাশ নাই, বৃথা আড়ম্বর কিম্বা বিশাল বাক্‌জালের রচনা কুহেলি নাই, বিরহের বৃশ্চিকদংশন কিম্বা জ্বালাময়ী লালসার তীব্র শিখা নাই। ইহাই লোচন দাসের বিশেষত্ব। একস্থলে কবি বলিতেছেন :—

"আমার নয়ন বলে ও রূপ দেখে আসি।
আমার মন বলে তার হইগে দাসী॥
করে নয়নপথে আনা গোনা।
আমার পাঁজর কেটে কল্লে থানা॥"

গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা উপলক্ষে কবি বলিতেছেন :—

"ওবা কে, রসের দে, রূপের সীমা নাই।
কোন বিধি, রসের নিধি কৈল একঠাঁই॥
যুগ্মভুরু, কামের গুরু, ছাড়্‌ছে ফুলের বাণ।
কেমন কলি ধরে তুলি ক'রেছে নির্ম্মাণ॥
আঁখির তল, নিরমল, নীল কমলের দল।
অরুণতা, দুটীপাতা, কর্‌ছে ছল ছল॥
তিলফুল, কিসে তুল এমনি নাসার শোভা।
কুঁদেকাটী, পরিপাটি, কিবা দন্তের আভা॥
হিঙ্গুলভালে, হরিতালে, নবনী দিল ভেঁজে।
কাঁচা সোনা, চাঁদখানা, রসান দিল মেজে॥
আল্‌তা তুলি, দুধে গুলি, কর দিয়াছে ছেনে।
চাঁদকে আনি, ছানি ছানি, তায় বসাল জেনে॥
গলে হার, শোভে তার, কিবা বাহুর ভাতি।
গগন হ'তে, জল তুলিতে, নাম্‌ল সোণার হাতী॥
রূপের নাগর, রসের সাগর, উদয় হ'লো এসে।
নাগরী লোচনের মন তাইতে গেল ভেসে॥"

স্থানান্তরে :—

"চরণতলে, অরুণ খেলে, কমল শোভে তায়।
চলে চলে ঢলে ঢলে পড়্‌ছে সখার গায়॥
আমাপানে, নয়নকোণে চাইল একবার।
মনহরিণী, বাঁধা গেল, ভুরুপাশে তার॥"

রূপমুগ্ধা কোন যুবতীর মুখে কবি বলিতেছেন :—

"অঙ্গঘটা, রূপের ছটা, পথে চলে যায়।
গৌররূপের ঠমক্ দেখে চমক লাগে গায়॥
হটাৎ কারে দেখ্‌তে গেলাম, এমন কে তা জানে।
অনুরাগের ডুরি দিয়া মনকে ধৈরা টানে॥"
"আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেম-কিরণিয়া।
হেমের গাছে প্রেমের রস্, পড়্‌ছে চুয়াইয়া॥
ঠারঠম্‌কা, কাঁকাল বাঁকা, মধুর মাখা হাসি।
রূপ দেখিতে জাতিকুল হারাই হারাই বাসি॥"
"প্রতি অঙ্গ নিরুপম কি দিব তুলনা।
হিয়ার আরতি মাত্র করিয়ে যোটনা॥"

যাহাতে সুন্দরীদের চঞ্চল দৃষ্টি স্থির হইয়াছে—কবি বলিতেছেন :—

"নারীদের নেত্র যেন ভ্রমরার জাঁতি।
গৌরমুখপদ্মমধু পিও মাতি মাতি॥"

এইরূপ অতি সহজ কথায় কবি আমাদের হৃদয়ে বিরহ-মিলনের যে বিচিত্র কাহিনী ধ্বনিত করেন তাহার তুলনা নাই।

অত্যন্ত সহজ গ্রাম্য ভাষায় কবি বিরহিণীর কথায় কেমন সুন্দর হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ করিয়াছেন :—

"ছন্‌ছনানি মন লো সই ছট্‌ফটানি প্রাণ।"

স্থানান্তরে :—

"প্রাণ ছন্‌ছন্ করে আমার মন ছন্‌ছন্ করে।
আধকপালে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে॥
লোচন বলে কাঁদিস্ কেন ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ কথা কহিতেছেন, তাহাতে লোচনদাস বলিতেছেন, তাঁহার মনে হয় "চাঁদ যেন উগরায়ে সুধা।"

আর কত উদ্ধৃত করিব—সুন্দর কুসুমস্তবকের কোনটী রাখিয়া কোনটী দেখাইব? সকল পদগুলিতেই লোচন দাসের অদ্ভুত কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সকলগুলির ভিতরেই এমন একটা সরলতা, আন্তরিকতা ও হৃদয়ের ভাষা উপভোগ করা যায় যাহা চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য বৈষ্ণব কবির কাব্যে দুর্ল্লভ।

কবি এইরূপে সহজ কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করেন। রচনার কোথাও কোনও যত্ন বা বিন্দুমাত্র আয়াস উপলব্ধি হয় না, তাহা যেন আরণ্য কুসুমের মত স্বতঃ বিকশিত হইয়া সুবাসে দশদিক্ আমোদিত করে। কবি হৃদয়ে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা যেন যত্ন করিয়া পরিবেশন করেন নাই। তাহা আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাব-নির্ঝরিণী হৃদয় ছাপাইয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাহা যেন স্বতঃ উৎসারিত ভোগবতীধারা, তাহা যেন কবিকল্পনার পারিজাত-ছায়া-স্নিগ্ধ ভাব-মন্দাকিনী।

তাই ভাষা-সম্পদে ও ছন্দের ঝঙ্কারে কবিতাকে কোথাও কৃত্রিমরূপ লাবণ্যে ভূষিত করিতে হয় নাই—শব্দ ও ধ্বনি যেন স্বেচ্ছায় ভাবকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

তাঁহার প্রিয়তমের বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে ভাব-সরোবর উচ্ছ্বসিত হইয়া যেন হৃদয়ের দুই কূল ছাপাইয়া দেয় এবং তাহাতে তাঁহার চিরারাধ্য দেবতার রাতুল চরণ দু'খানি রাখিবার জন্য কি সুন্দর কবিত্বের ফুল্ল শতদল ফুটিয়া উঠে। উদাহরণের দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট করিতেছি।—

"এ হেন সুন্দর গোরা কোথা বা আছিল গো,
কে আনিল নদীয়া নগরে।
নিরখিতে গৌররূপ হৃদয়ে পশিলে গো
তনু কাঁপে পুলকের ভরে॥
ভাবের আবেশে ওলো এলায়ে পড়েছে গো
প্রেমে ছল ছল দু'টী আঁখি।
দেখিতে দেখিতে আমার হেন মনে হয় গো
পরাণপুতলি করে রাখি॥
বিধি কি আনন্দ নিধি মথি নিরমিল গো
কিবা সে গড়িল কারিকরে।
পীরিতি কুঁদের কুঁদে উহারে কুঁদিল গো
উহার নয়ন কুঁদিল কাম-সরে॥"

কিন্তু এত করিয়াও কবির রূপ বর্ণনা যেন সমাপ্ত হইল না, চিত্রাঙ্কনে বর্ণের অভাব হইল। কবে প্রেমিকের প্রিয়তমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া হৃদয়ের আশা মিটিয়াছে? পুনশ্চ তাই কবি বলিতেছেন :—

"অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গৌর-দেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিগাড়িল গো
এক কৈল সুধাই সুনহে॥
অখণ্ড পীযূষধারা কেবা আওটিয়া গো
সোণার বরণ কৈল চিনি।
সে চিনি মথিয়া কেবা এ ফেণী তুলিল গো
হেন বাসি গোরা-অঙ্গখানি॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা সে খানি মাজিল গো
অপরূপ রূপের বলনী॥"
"শারদ পূর্ণিমার চাঁদে, আকুল হইয়া কাঁদে,
করপদ পদম্নিনী গন্ধে।
কুড়িটী নখের ছটায় জগৎ করেছে আলা
আঁখি পাইল জনমের অন্ধ॥"

স্থানান্তরে :—

"অরুণ কমলআঁখি তারকা ভ্রমর পাখী
ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমার চাঁদে, ছটা হেরি প্রাণ কাঁদে
কত মধু মধুর্য্যাম্বু বন্ধে॥"

অন্তস্থানে—নিত্যানন্দের রূপ বর্ণনায় কবি বলিতেছেন।

মথিয়া লাবণ্য সিন্ধু   তাহে নিঙ্গাড়িয়া ইন্দু,
সুধা দিয়া মুখানি গড়িল।”
“নব কঞ্জদল-আঁখি   তারকা ভ্রমর পাখী
ডুবিরহু প্রেম মকরন্দে॥”

কখনও কবি অনন্তরূপ গুণ-সাগরের সীমা না পাইয়া উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন ঃ—

“শুন ও গো প্রাণসই   জগতে তুলনা কই
তবে সে তুলনা দিব কিসে।
জগতে তুলনা নাই   যার তুলনা তার ঠাঁই
অমিয়া মিশাবো কেন বিষে?
কেবা তার গুণ গায়   গুণের কে ওর পায়
কেবা করে রূপ নিরূপণ,
রূপ নিরূপিতে নারে   গুণ কে কইতে পারে,
ভাবিয়া বাউল হইল মন॥
পক্ষী যেন আকাশের,   কিছুই না পায় টের
যতদূর শক্তি উড়ে যায়।
সেইরূপ গৌরাঙ্গের,   রূপের না পায় টের
অনুসারে এ লোচন গায়॥”

কখনও কবি মহাভাব উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কল্পনা-আলোকে দেখিতেছেন যে শুধু তিনি নহেন, অণুপরমাণু হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যেন সেই মহাপুরুষের প্রেমে নৃত্য করিতেছে। সমস্ত চরাচর যেন তাঁহারই সৌন্দর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত, জগৎ বেড়িয়া যেন তাঁহারই প্রেমধারা ক্ষরিত হইতেছে তথা ঃ—

“চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে গোরা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলে গোরা গোরা॥”

কখনও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে উঠিয়া কবি বলিতেছেন, হে প্রভু তোমাতে আমাতে যে প্রেম, সে প্রেম, হে প্রেমময়! তোমারই প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গমাত্র তাহারই রূপ ও গুণের ভিতর দিয়া কবি অসীম সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন; নিজভাব মহাভাবে লয় হইয়াছে। সসীম অসীমে মিশিয়াছে। কবি বলিতেছেন ঃ—

“এমন এ বিনোদিয়া কোথাও না দেখি গো
অপরূপ প্রেম বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতিভাবে কাঁদিয়া আকুল গো
রমণী কেমনে প্রাণ বাঁধে॥   ক্রমশঃ।

শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত।

কৃষকের কথা।

(২)

অনেকে বিবেচনা করেন যে, অতিরিক্ত জন-সংখ্যাই আমাদের সামাজিক দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, এই মত এতই বিস্তৃত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে এতই বদ্ধমূল হইয়াছে, যে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সকলেই জানেন, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের লোক সংখ্যা বিপুল। আলেক্জেণ্ডার দি-গ্রেটের সহিত যে সকল গ্রীক্-লেখক আসিয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার পরেও জীবিত ছিলেন, তাঁহারা এসম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন। বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, সংহিতা প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষ বহুদিন হইতে বহুতর লোককে আশ্রয় দান করিতেছে।

মিঃ মালথাস্ বলিয়াছেন যে, হিন্দু আইনে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিত, পতিব্রতা রক্ষিত হইত, পত্নীনির্ব্বাচনে কড়াকড়ি করিত, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিতে দিত না, নীচ শ্রেণীর লোকের পত্নী লাভ দুর্ঘট ছিল, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত না, কোনো কোনো জাতির শিশু-হত্যা-প্রথা প্রশমিত হইত। কিন্তু এতৎস্বত্বেও ভারতবর্ষে বিপুল জনসংখ্যা ছিল।

নিম্নলিখিত পৃথিবীর কয়েকটী প্রধান স্থানের জনসংখ্যার পরিমাণের সহিত তুলনা করিলেই ভারতের অবস্থা বুঝা যাইবে।

দেশ	প্রতিবর্গ মাইলে লোক বসতি।	দেশ	প্রতিবর্গ মাইলে লোক বসতি।
বেলজিয়াম ...	৫৪০	আয়ারল্যাণ্ড ...	১৪৪.৪
ইংলণ্ড ...	৪৯৮	স্কট্ল্যাণ্ড ...	১৩২
হল্যাণ্ড ...	৩৬০.৯	স্পেন ...	৮৮
চীন ...	২৮৯	নরওয়ে ও সুইডেন	২৭
ইতালী ...	২৬৩.৬০	টারকিস্ সাম্রাজ্য	২৪
জর্ম্মনী ...	২৩৬.৭	যুক্তরাজ্য ...	১৭.৯৪
ভারতবর্ষ ...	২২৯	রুষিয়া (ইয়ুরোপিয়ান ও এসিয়াটিক)...	১৩
ফ্রান্স ...	১৮৭.৮	কেনেডা ...	১.৪৫

দেখা যাইতেছে যে, ভারতে লোক-সংখ্যা বিপুল হইলেও, আয়তন অনুসারে তাহাতে অধিক লোকের বাস

নাই। ফ্রান্স, আয়ারল্যাণ্ড, অথবা স্কটল্যাণ্ড, নরওয়ে সুইডেন, টারকিস্ সাম্রাজ্য, ইয়ুরোপিয়ান ও এসিয়াটিক রুশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার অপেক্ষা ভারতে প্রতি বর্গ মাইলে অধিক লোকের বাস হইলেও, ইংলণ্ড, চীন ইতালি, জর্ম্মণী, নিদারল্যাণ্ড প্রভৃতিতে এতদপেক্ষা অধিক লোক প্রতি বর্গমাইলে বাস করে

প্রথম আদম সুমারিতে (১৮৬৮—৭৬) স্থিরীকৃত হয় যে, ভারতের প্রতি বর্গমাইলে ২১০ জন লোকের বাস ছিল। গত আদম সুমারিতে ২২৯ জন হইয়াছে। পঞ্চদশ বৎসর নির্ব্বিরোধে জীবন ও সম্পত্তি লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া যে বর্গমাইলে ২০ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার এবং অপ্রত্যাশিত লোক সংখ্যা বলিয়া ঢক্কা নিনাদ করার কোন বিশেষ হেতু নাই। মিঃ বেইনস্ বলিয়াছেন যে, গত দশ বৎসরে শতকরা একজন অথবা মোট ২০ লক্ষ লোক বৃদ্ধিতে অলৌকিক কিছুই নাই।

অতিরিক্ত লোক সংখ্যার বিষয় সাধারণের যে একটী ধারণা আছে, তাহা যদিও অতিরঞ্জিত তত্রাচ একেবারে কল্পিত নহে। কারণ ভারতের কোন কোন স্থানে লোকের বসতি অত্যধিক আবার কোথায়ও অত্যল্প। কিন্তু এ কথা অনেকের মনেই স্থান পায় না। আমরা নিম্নে ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোক সংখ্যার একটী তালিকা দিলাম।

১৮৯১ সালের আদম সুমারি।

প্রদেশ	প্রতি বর্গমাইলে লোক বসতি।	প্রদেশ	প্রতি বর্গমাইলে লোক বসতি।
অযোধ্যা ...	৫২২	বেরার ..	১৬৪
বঙ্গদেশ ...	৪৭৪	বোম্বে ...	১৫০
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ...	৪১৯	আসাম ...	১১৭
মান্দ্রাজ ...	২৫৩	কুর্গ ...	১০৯
আজমীড় ...	২০০	মধ্যপ্রদেশ	৯৮
পঞ্জাব ...	১৭৪	বহ্মদেশ ...	৪৮

উল্লিখিত তালিকা হইতে সমস্তই অবগত হওয়া যাইবে। ভারতের স্থানে স্থানে জন সংখ্যা অতিরিক্ত এবং স্থানে স্থানে অতি অল্প: উত্তর বেহার হইতে বর্ম্মা পর্য্যন্ত ভূভাগে প্রতি বর্গমাইলে ৪ হইতে ৯৩০ জন লোক বাস করে। লর্ড ল্যান্সডাউন তাঁহার বিদায় কালীন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, ‘কেনেডার বৃহৎ সাম্রাজ্য অপেক্ষা পাটনা বিভাগে তিন গুণ বেশী লোক বাস করে।’ অপরপক্ষে আসাম, সিন্ধু এবং আপার বার্ম্মায় গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ২৪ জন করিয়া লোক বাস করে। প্রায় ৩৮ লক্ষ লোক গড়ে দুই একার জমি লইয়া আছে। চারিটি প্রধান স্থান ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের লোকের হার ১৮৪ জনের বেশি নহে। ২১ লক্ষ লোক কেবল গঙ্গার ধারে বাস করে, তথায় জন সংখ্যা কিছু বেশী,—প্রতি বর্গমাইলে ৮৭৭ জন।

আমাদের দুঃখের কারণ সম্বন্ধে সাধারণের আর একটী বিশ্বাস এই—ভারতবর্ষে দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক। অবশ্য আমাদের শস্যের অতিরিক্ত রপ্তানী হেতু ইহা ঘটিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। খাদ্য সামগ্রীর মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং আজকালকার ভাব গতিক দেখিয়া দেশের কৃষককুলের চক্ষু স্থির হইয়াছে। ইংলণ্ডে যদি এইরূপ অবস্থা হইত তবে এত দিন তথাকার সকল কাজ কর্ম্ম শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু ভারতবাসী নীরবে সহ্য করিতে জানে এবং সার্দ্ধ এক শতাব্দীর শিক্ষায় তাহাদের অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, ধৈর্য্য ও ক্ষমার অপেক্ষা উচ্চ আর কিছুই নাই। নাগপুর কংগ্রেসের বৈঠকে একজন প্রসিদ্ধ সদস্য বলিয়াছিলেন, “ত্রিশ বৎসরের অধিক হয় নাই, তখন টাকায় দেড়মণ গম অন্যান্য শস্য দুইমণ করিয়া বিক্রয় হইত। কারণ তৎকালে আমাদের লভ্যাংশ বিদেশে রপ্তানী হইত না। এক্ষণে তাহার মূল্য ছয়গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, কারণ আমাদের হিতৈষীরদল অবাধ বাণিজ্য প্রথা দ্বারা শস্য সমূহ বিদেশে চুষিয়া লইবার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। * * * ইহা উচ্চ economic science এর অনুমোদিত হইতে পারে কিন্তু সভ্যগণ মনে রাখিবেন, ইহা আমাদের ভ্রাতৃবর্গের উপবাস ব্রত।”

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের এক তৃতীয়াংশ লোকের প্রধান খাদ্য—চাউলের দর একটাকারও ন্যূন ছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উহার মূল্য চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। কি বিষম পরিবর্ত্তন! এ বিষয় আমরা এক বার বিস্তৃতভাবে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকিলেও সেই অনুপাতে আমাদের শ্রমজীবীদিগের বেতন কিম্বা কৃষিকার্য্যে লাভ বৃদ্ধি হয় নাই। স্যর সেমুয়েল বেকার বলেন,—হতভাগা শ্রমজীবীরাই অধিক সহ্য করে, কারণ তাহাদের খাদ্য সামগ্রীর মূল্যাধিক্য হইলেও তাহাদের পারিশ্রমিকের হার বর্দ্ধিত হয় নাই।'* হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমাদের চাষী শ্রমজীবীদিগের আয় মাসে ৫৲ টাকা বা ৫ শিলিংএর বেশী হয় না। স্যর হেনরী ক্যানিংহাম অনুমান করেন,—'শ্রমজীবীদিগের দৈনিক আয় ২ পেন্স অথবা মাসিক ৩।৪ সিলিংএর বেশি নহে।' একজন লেখক (সম্ভবতঃ ইংরেজ) পরিচয় গোপন করিয়া ১৮৭৭ সালে 'অযোধ্যা গেজেটে' লিখিয়াছিলেন,—'কেবল ভারতবর্ষেই ধৈর্য্যশীল, সুদক্ষ সুনিপুণ স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরের কারিকর এবং বহু বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহাদের হস্ত সুচতুর হইয়াছে এমন লোককে দৈনিক তিন পেন্স দিয়াই ক্রয় করা যায়।' মিঃ থোরাল্ড দেখাইয়াছেন, এইরূপ বেতনের সহিত চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইংরাজ শ্রমজীবীর আয় সম্যক্‌রূপে তুলনা করা যাইতে পারে। আবুল ফজল আইন আকবরীতে তিন শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতে প্রচলিত পারিশ্রমিকের যে হার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই হার অদ্যাপিও সঠিক আছে। অবাধ বাণিজ্যের ঐন্দ্রিজালিক ক্ষমতা সত্ত্বেও দাসত্ব শৃঙ্খলে নিগড়িত জাতি কখনও ভাল দিনের ভাল কাজের নিমিত্ত ভাল মাহিয়ানা প্রত্যাশা করিতে পারে না। এদেশের ইহাই প্রধান ভেদাভেদ এবং ইহার আলোচনাতেই আমাদের বর্ত্তমান দুঃখ দারিদ্র্যের কারণ অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। দুঃখদারিদ্র্যে গ্রাসিত হইলেও আমরা এই গভীর প্রশ্ন পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত চক্ষুরুন্মিলন করি নাই।

এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমীতে প্রজার কায়েমী স্বত্ব প্রচলিত থাকিলেও, কৃষককুল এবং ভূমি আবাদকারী অন্যান্য শ্রেণীর লোক, পূর্ব্ববর্ত্তী উর্দ্ধতন করগ্রাহী জমীদারের কঠোর নিষ্পেষণে মৃতপ্রায় হইতেছে। ইহারা গবর্ণমেণ্টের সৃষ্ট এবং তৎকর্তৃকই বর্দ্ধিত হইতেছে। রিভিউ পত্রে অল্পদিন হইল এক জন ইংরেজ লিখিয়াছেন, আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা অন্য কোন সমিতি কর্তৃক ভারতের এই জমীদার পরিবর্দ্ধনের দৃঢ়বদ্ধ মূলটুকু উৎপাটিত হইতেছে না, বা তাঁহারা পারিতেছেন না। ইহা খাঁটি সত্য এবং কর্ত্তৃপক্ষেরও সুবিদিত যে, এদেশের জমীদারগণ প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছেন এবং তাঁহাদের কলেবর যে পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতেছে, দরিদ্র প্রজাকুল সেই অনুপাতে মৃতকল্প হইতেছে।

অন্য এক শ্রেণীর লোকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কৃষককুলের দারিদ্র্যের কারণ—করভার; বর্ত্তমানে প্রচলিত অতিরিক্ত করভারে তাহারা প্রপীড়িত। এসম্বন্ধে এখন আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, পরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা থাকিল।

অপর এক শ্রেণীর বিজ্ঞলোকের অভিমত এই যে ভারতের দারিদ্র্যের কারণ—ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে বঙ্গ এবং অন্যান্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী দেশ ভিন্ন সকল স্থানে ১২।১৩ বৎসর পর ভূমির রাজস্ব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

নূতন বন্দোবস্তে রাজস্ব এতই বৃদ্ধি হয় যে, কৃষকদিগের ক্ষুদ্র থলিয়া তাহাতে প্রায় শূন্য হইয়া যায়, তাহাদের প্রশান্তভা বিনষ্ট হয়, প্রধান ব্যবসা-স্রোত রুদ্ধ হয় এবং তাহাদের অধিকৃত জমীর এতই অধোগতি হয় যে বহু বৎসরেও তাহা পূর্ব্বাবস্থায় উঠিতে পারে না। অতিরিক্ত কর বৃদ্ধিতে অপকার হয় না, যদি এইরূপ কাহারও সন্দেহ হইয়া থাকে, তিনি তবে আসাম উপত্যকার এবং কোলাবা প্রজার ইতিহাস পাঠ করুন, তাঁহার সকল সংশয় বিদূরিত হইবে। ১৮৭২ সালে স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন, ঘন ঘন রাজস্ব পরিবর্ত্তনের ফলাফল এরূপ জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন যে, যদি তাহা কোন বাঙ্গালীর লেখনীপ্রসূত হইত, তবে নিশ্চয়ই সে রাজদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর চার্লস্ এটকিন্‌সন উচ্চ রাজস্বকে dangerous policy এবং তাহা হইতে উত্থিত অপকারকে incidious বলিয়াছেন। লর্ড লরেন্স একজন বন্দোবস্ত কর্ম্মচারীকে লিখিয়াছিলেন,—'স্মরণ রাখিও, তোমার কর নির্দ্ধারণ কম যদি তাহা মনে না রাখ তবে নিশ্চয়ই আমি তোমার শত্রু হইব।" Land system of British India পুস্তকে বেডেন পাওয়েল এবং India

* Fortnightly Review, August 1888 (Reflections i India).

গ্রন্থে স্যর জন ষ্ট্রেচি স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল সাময়িক বন্দোবস্ত বহু ব্যয়সাধ্য এবং লোকের পীড়াদায়ক। মিঃ ফিন্‌লে লিখিয়াছেন, "উন্নতির গতিরোধ এবং ভূমি কর্ষণের মূলধনে হাত না দিয়া কৃষকশ্রেণীর মধ্য হইতে বিপুল কর সংগ্রহ করা সুকঠিন। রোম সাম্রাজ্যের সুন্দর সারভে বন্দোবস্ত এবং কৃষিরক্ষার্থ কর্ত্তৃপক্ষগণের সতত যত্ন সত্ত্বেও জমীর প্রত্যক্ষ কর স্থাপনে তাহা পতিত এবং জন শূন্য হইয়াছিল।"

এদেশের অযথার্থিক land policyর সহিত দেশীয় বা মুসলমানগণের রাজস্বের তুলনা কর। দেশে good government প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে যে কৃষকগণ ভূমিতে কায়েমী স্বত্ব লাভ করিয়াছে তাহা ভারত ইতিহাসে প্রমাণ হইবে। আকবরের শাসনকালে ইহার পরিবর্ত্তে দশশালা বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু তৎকালে বন্দোবস্ত বলিতে জমীর পরিমাণ এবং আবাদী জমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ভিন্ন আর কিছু বুঝাইত না। উৎপন্ন দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব নিরুপিত হইয়াছিল এবং যখন পুনঃ বন্দোবস্ত করা হইত, ম্যালিসন বলেন, তখন আকবর এই প্রথার কাঠিন্য রহিত করতঃ প্রজার দুঃখ প্রশমনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যেও ধীরে ধীরে কুনীতি প্রবেশ করে এবং তাহাদের শেষ সময়ে তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি প্রথার পূর্ণ বিকাশ হয়। ইংরেজ রাজ এই প্রথাটি উত্তরাধিকারী সূত্রে পূর্ব্বাধিকারীর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের কল্পনা প্রসূত না হইলেও তাঁহাদের দ্বারা উন্নীত হইয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, দেশের কৃষককুল পরিবার প্রতিপালনের কোন ভাল উপায় এবং তৎসঙ্গে জমী রক্ষা করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছে না।

অবসর প্রাপ্ত বোম্বাই সিভিলিয়ান মিঃ আলেক্‌জেণ্ডার রোগার ১৮৯৩ সালের ২২শে জুন তারিখে 'লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে' 'মান্দ্রাজ ও বোম্বের রায়তি বন্দোবস্ত' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—'সত্যই বর্ত্তমান সময়ে জমীর যে পরিমাণ রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইতেছে তাহা আদায় হইতেছে না এবং আদায়ের চেষ্টা করাতে লোকের বিশেষ কষ্ট হইতেছে।' আবার রাজস্ব না দেওয়ার অপরাধে ১৮৮৭-৮৮ হইতে ১৮৮৯।৯০ এই তিন বৎসরে ৮৭১১৪ একার জমী নিলামে বিক্রয় হইয়াছে তন্মধ্যে ৩৯৮১৯ একার অন্য ক্রেতা না থাকায় গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে নাম মাত্র মূল্যে ক্রীত হইয়াছে এবং ৪৭২৬৫ একার জমী বেসরকারী লোকে ক্রয় করিয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজস্ব নির্দ্ধারণের দরুণ লোকে অর্দ্ধেক জমী চাষ আবাদ করিতে সক্ষম হয় নাই। যদি ঐ সকল জমীর উপযুক্ত কর নির্দ্ধারিত হইত, তবে কৃষকগণ তাহা নিশ্চয়ই আবাদ করিত। মিঃ রোগার এগার বৎসরের হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে রাজস্ব না দিতে পারায় ৮৪০৭৩১৩ লোকের স্বনামি বেনামি সম্পত্তি ২৯৫৯৯০৬ টাকায় নিলাম হইয়াছে। (দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট (occupancy right) ১৯৬৩৩৬৪ একার জমী বিক্রীও হইয়াছে। তন্মধ্যে সরকার পক্ষে ১১৭৪৩৫৮ একার নাম মাত্র মূল্য ক্রীত হয়।) এই এগার বৎসরের শেষ বৎসর ১৮৭৯-৮০ সাল এবং ১৮৭৬-৭৭ সালে সেই মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি আমরা অনুমান করি যে, জমীর অতিরিক্ত রাজস্ব নির্দ্ধারণই দুর্ভিক্ষের কারণ, তবে তাহা যে একবারে অযৌক্তিক হইবে, তাহা কে বলিবে? পূর্ব্বোক্ত হিসাব দেখিলেই প্রকৃত বৃত্তান্ত হৃদয়ঙ্গম হইবে, ইহার উপর টীকা টিপ্পনী অনাবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত রাজস্ব প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিদিগের পরিবারে গড়ে ৪ জন করিয়া লোক ধরিলেও প্রায় ৩২৫০০০০ জন লোক অথবা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কৃষকশ্রেণীর এক অষ্টমাংশ লোক উচ্চ হারে রাজস্ব দিতে না পারায় এগার বৎসরের মধ্যে আশ্রয়শূন্য হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ রাজস্বের দরুণ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জমীর শতকরা প্রায় ১৬ খান জমী পতিত আছে।

বোম্বের অবস্থাও ভাল নহে। ১৮৭৮ সালের ডেকান রায়ত কমিশন বলেন,—আমাদের প্রাথমিক কালেক্টরগণ ডেকানের অতিরিক্ত রাজস্ব নিরূপণ করায় দেশের কৃষকদিগের আবাদের মূলধন শোষণ করিয়া লইয়াছে, তজ্জন্য কৃষকশ্রেণী এপর্য্যন্ত দুঃখ দারিদ্র্য সমুদ্রে নিমজ্জিত আছে। বোম্বে গবর্ণমেণ্টের মিনিটে সোলাপুরের কালেক্টরের ১৮৭২-৭৩ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে, মিঃ ডেকোষ্টা (Dacosta) বলিয়াছিলেন,—'অতিরিক্ত রাজস্ব নির্দ্ধারণে যে বহুতর ভূমিখণ্ড নিলামে উঠিয়াছিল তাহার অধিকাংশেরই

ক্রেতা পাওয়া যায় নাই। তৎবিষয়ে কালেক্টরের মন্তব্য গবর্ণমেণ্ট অতি সতর্কতার সহিত পাঠ করিয়াছেন।' বোম্বাই কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কথা সত্য হইলে, কৃষিকার্য্যোপযোগী প্রায় অর্দ্ধেক জমি এখনও আবাদ হয় না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ সকল দেশের কথাই একরূপ।

কাহারও অভিমত এই যে, অল্প পরিমাণ ভূমি আবাদ—কৃষকদিগের দুর্দ্দশার আর একটী কারণ। হণ্টার সাহেব বলেন,—

"Millions cling with a despairing grip, to their half-acre of earth a price under burden a rack rent and using"

ডাঃ Vocleker বলেন, ভারতীয় কৃষক শ্রেণীর শঙ্কটাবস্থার 'একটী প্রধান কারণ—কার্য্যশূন্যত'। একজন আহারের কিছু সংস্থান করিতে পারিলেই ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে। জন ব্রাইট আয়ারল্যাণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। 'আয়ারল্যাণ্ড অলস, সুতরাং আহার্য্যাভাবে মরিবে।' (Ireland is idle therefore she starves) এই উক্তির সহিত অনেকটা সত্যের সংশ্রব আছে কারণ দারিদ্র্য, খাদ্যের অভাব এবং অয়নক সূর্য্যের (Tropical Sun) দৌরাত্ম্যে মানুষ দুরূহ কার্য্যে কেবল যে অপারগ হয় তাহা নহে, তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতাও প্রভূত পরিমাণে বিনষ্ট হয়। একটী অর্দ্ধভুক্ত বঙ্গীয় প্রজার সহিত কখনও স্ফুর্ত্তিশীল ইংরেজ বা স্কচ কৃষকের প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইতে পারে না। যে অসংখ্য জীব কেবল জন্ম ও মৃত্যুর ফাঁপড়ে পড়িয়া যায় যায় হইতেছে, যাহাদের খাদ্যাভাব কোন দিনেও ঘুচিবে না, যাহাদের কুটীরে কখনও সুখ সূর্য্য উঁকি মারিবে না, তাহাদের কথাই বা কি? তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য বলিলে সামাজিক ও ব্যবচ্ছেদনীতির (anthropology) কথা তুলিতে হয়। সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে, জীবন রক্ষার আমিত্ব বজায়ের প্রধান উপাদান—একমাত্র বীজ ভারতীয় লোকের অপরিচিত নহে।

বিবাহ কিম্বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অতিরিক্ত ব্যয়—ভারতীয় প্রজার অবস্থার সহিত আলোচনা যোগ্য। বহুদিনের সংস্কার বা আচরিত কার্য্য কখনও সহজে উন্মূলিত হইতে পারে না এবং যিনি তাহা না মানিয়া কার্য্য করিতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই সুপুরুষ। এদেশের সামাজিক আচার ব্যবহারের সহিত ধর্ম্মভাব বড়ই বিচিত্রভাবে বিজড়িত এবং পরে তাহাই কুসংস্কাররূপে পরিণত হয়। এতদ্বিষয়ে বিশদ আলোচনা বারান্তরে করিব।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

পাট।

ভারতবর্ষে পাটের চাষ বাঙ্গালা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। আসামে মাত্র গোয়ালপাড়া জিলায় পাটের চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলেও পাটের চাষের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। নিতান্ত পাহাড়ে জমী এবং যে সকল জমীতে লৌহ অথবা বালুকার ভাগ অধিক সেই সকল জমী ব্যতীরেকে আর প্রায় সকল জমীতেই পাট উৎপন্ন হয়। তবে এটেল জমীতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাট জন্মে। নীচু জমীতেও পাট বেশ ভাল জন্মিতে দেখা যায় বটে কিন্তু সে সব পাট প্রায়ই মোটা রকমের। প্রথম শ্রেণীর পাট প্রায় নীচু জমীতে হয়ই না। চরা ভূমি অথবা দিয়ার ভূমিতেও গাছগুলি বেশী তেজস্বীও দীর্ঘ হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু ইহারও আঁশ অপেক্ষাকৃত মোটা; তেমন চিক্কণ হয় না। আবাদী পাট দুই শ্রেণীর, দেশী ও সিরাজগঞ্জি, দেশী পাটের পক্ষে অপেক্ষাকৃত লোনা জমীই ভাল, একটু বেশী লোনা হইলেও বড় বিশেষ আসিয়া যায় না সুতরাং কলিকাতাও দক্ষিণে সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে দেশী পাটের আবাদ বেশ চলিতে পারে কিন্তু সিরাজগঞ্জের পাটের চাষ লোনা জমীতে ভাল হয় না। অনেক কালের পতিত জমীতে পাট বেশ সুন্দর জন্মে।

কর্ষণ ঃ—নীচু জমীতে পাটের আবাদ করিতে হইলে শীত শেষ হইতে না হইতেই চাষের কার্য্য আরম্ভ করিবে। যদি উক্ত জমীতে কোন শস্য না থাকে তবে শীতের প্রারম্ভেই জমী কর্ষণ করা উচিত। যে প্রকারেই হউক নীচু জমীতে যাহাতে চৈত্র মাসেই বীজ দেওয়া যাইতে পারে সেই ভাবে

জমী তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইবে। কোন কোন স্থলে এমন ও হয় যে গাছ নিতান্ত ছোট থাকিলে জমীতে বন্যার জল আসিয়া পড়ে। এই সব জমীতে মাঘ ফাল্গুন মাসেই বীজ দেওয়া উচিত; কারণ গাছগুলি একটু বড় হইয়া উঠিলে জলে আর বিশেষ কিছু করিতে পারে না। উচ্চ জমীতে আষাঢ়মাস পর্য্যন্ত বীজ দেওয়া যাইতে পারে। যদি জমিতে কোনরূপ রবিশস্য থাকে তাহা হইলে ঐ শস্য কাটিয়া লইবার অব্যবহিত পরেই জমীতে চাষ দিবে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, জমীতে বীজ বুনিবার যত পূর্ব্ব হইতে চাষ দেওয়া যায় ততই ফসল ভাল হয়। যে হেতু পুনঃ পুনঃ কর্ষণে মৃত্তিকা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস আহরণ করে এবং এই নাইট্রোজেন উদ্ভিদ জীবনের একটী প্রধান উপাদান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্ব হইতে জমীতে চাষ দেওয়াতে প্রকারান্তরে সারেরও কাজ দেয়। দুইবার লম্বাভাবে ও দুইবার এড়োভাবে জমীতে চাষ দিয়া একবার মই দিয়া লইলেই জমী তৈয়ার হইয়া আসিবে; তৎপরে আর একবার চাষ ও আর একখানা মই দিলেই উহা ধুলিবৎ হইয়া যায়। এখন একবার বিঁদে চালাইয়া ক্ষেত্রের আবর্জ্জনা বাছিয়া লইলেই জমী বীজ গ্রহনের উপযুক্ত হইল। বীজের পরিমাণ বিঘা প্রতি একসের, সোয়া সেরের অধিক হওয়া উচিত নহে। আমাদের কৃষকগণ ইহা হইতে অনেক বেশী বীজ বপন করিয়া থাকে; তাহার ফলে গাছগুলি অত্যন্ত ঘণ হইয়া উঠে এবং তদ্দরূণ নিড়াইনের খরচ অনেক বেশী পড়িয়া যায়। বীজ ফেলিবার আর একটি অসুবিধা এই যে যদি পূর্ব্ব হইতে একটু বেশী রকম বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় তবে ক্ষেত্রের মাটি নরম থাকার দরুণ আর ক্ষেত্রে নিড়াইন যায় না। শস্য একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। কারণ ভাল পাট জন্মাইতে হইলে গাছ গুলি ও অন্ততঃ তিন চারি ইঞ্চ তফাৎ হওয়া নিতান্ত আবশ্যকীয়। পাটের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র; অতএব বপন করিবার সময় বীজের সহিত কিছু মাটি মিশাইয়া বীজ ছিটাইবে। ইহাতে বীজগুলি সমস্ত ক্ষেত্রে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে গাছগুলি যখন আধ হাত আন্দাজ উচ্চ হইয়া উঠিবে তখন উহা চারিইঞ্চি ফাঁক্ ফাঁক্ করিয়া নিড়াইয়া দিবে। আর যদি বীজ ড্রিল করিয়া বুনা যায় তবে বীজ বুনিবার সময়ই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁক দিয়া বীজ বপন করিবে। এ ক্ষেত্রে কেবল জমীর ঘাস বাছিয়া দিলেই চলে। নিড়ানির কার্য্য রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই হওয়া উচিত। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি বর্ষার জলে জমী নরম হইয়া গেলে নিড়ানির কার্য্য চলে না। ঘাস বাড়িয়া উঠিলে গাছ আর বিশেষ জোর করিতে পারে না। ক্ষেত্র বিশেষে নিড়ানি ২।৩ বার দেওয়া হয়; শেষ নিড়ান হইয়া গেলে শস্য কর্ত্তনোপযোগী না হওয়া পর্য্যন্ত আর বিশেষ কোন কাজ নাই।

সার ঃ—যে সকল জমীতে প্রতিবৎসর বর্ষার সময় পলি পড়ে উহাতে কোন সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অন্যান্য জমীতে অবশ্য সার ব্যবহার করিবে। পাটের চাষের পক্ষে বিঘা প্রতি ৫০/ মন করিয়া গোবর সার দেওয়া উচিত। সোরা প্রভৃতির সারে পাটের বড় বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায় না। উক্ত গোবর সার জমীতে চাষ দেওয়ার পূর্ব্বে ছড়াইয়া দিবে। কোন নির্দ্দিষ্ট জমিতে বিনা সারে ক্রমান্বয়ে পাটের চাষ করিলে ক্রমে উহার ফলন কমিতে দেখা যায়, কারণ একই জমীতে একই শস্যের আবাদ ৩।৪ বৎসর ধরিয়া হওয়াতে ঐ জমীর উক্ত শস্যের পোষণকারী পদার্থগুলি উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং উহার উৎপাদিকাশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। আমাদের মতে কোন নির্দ্দিষ্ট জমীতে বার বার পাটের চাষ না দিয়া পর্য্যায়ক্রমে ঐ জমীতে অন্যান্য ফসল দেওয়া উচিত। আর যদি একই জমীতে চাষ করিতে হয় তাহা হইলে ৩।৪ বৎসর পর এক বৎসর জমী পতিত রাখিয়া দেওয়া উচিত; ইহাতে জমী এক বৎসর বিশ্রাম পায় এবং সেই বিশ্রাম কালে উহাতে উদ্ভিদের পোষণকারী পদার্থগুলি পুনরায় সঞ্চিত হইয়া উহার উৎপাদিকাশক্তি আবার পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া তোলে।

কাটিবার সময় ঃ—গাছগুলিতে যখন কেবল ফল ধরিতে আরম্ভ করে তখনই পাট কাটিবার প্রশস্ত সময়। ইহার পূর্ব্বে কাটিলে পাটের আঁশ নরম হয় এবং অপেক্ষাকৃত একটু বেশী পরিষ্কার হইয়া থাকে; তবে ইহাতে ওজন ও অপেক্ষাকৃত কম হয়। আবার যদি বিলম্ব করিয়া অর্থাৎ ফল পাকিতে আরম্ভ করিলে কাটা যায় তাহা হইলে পাটের আঁশ মোটা হইয়া পড়ে এবং রং ও একটু খারাপ হয় যদিও এই অবস্থায় পাট একটু বেশী ভারী ও শক্ত হইয়া থাকে কিন্তু তদ্দরুণ দাম কোন ক্রমেই বেশী পাওয়া যায় না; কারণ পাটের পক্ষে

যেমন আঁশ শক্ত হওয়া দরকার তেমন উহা পরিষ্কারও হওয়া চাই। কৃষকগণ ঠিক্ সময় মত পাট কাটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া অনেক সময় উহাদের পাট খারাপ হইয়া যায়; কাহারও পাট খুব শক্ত হয় কিন্তু লাল হইয়া যায়; আবার কাহারও বা খুব পরিষ্কার হয় কিন্তু পাট একেবারে নরম হইয়া যায় এবং ওজন ও কম হয়।

পাট কাটা হইয়া গেলে পর মাঠের উপর ২।৩ দিন পর্য্যন্ত ছড়াইয়া রাখা হয়; এই সময় মধ্যে গাছের প্রায় সমস্ত পাতা ঝরিয়া পড়ে। তৎপর গাছগুলি একত্র করিয়া ছোট ছোট আটি বান্ধিয়া ক্ষেত্র সন্নিহিত কোন জলাশয়ে পচাইবার জন্য ডুবাইয়া রাখা হয়। এই আটি গুলির উপর ছোট ছোট গাছ, পাতা এবং মাটী ইত্যাদি চাপাইয়া দিতে হয় যেন ইহা শীঘ্রই পচিয়া উঠে। গাছগুলি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ডোবে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জলাশয়টী অগভীর না হওয়াই উচিত। জল যেমন পরিষ্কার হইবে পাটের রং ও তেমনি পরিষ্কার হইবে। লোনা বা ঘোলা জলে পাট পচাইলে উহা খারাপ হইয়া যায়। স্রোত বিশিষ্ট জলে ডুবাইলে পাট পচিতে অনেক সময় লাগে, পাটের রং ও তেমন ভাল হয় না। শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে সাধারণতঃ পাট কাটা হইয়া থাকে। এই সময়ে পাট পচিতে অনেক সময় লাগে না। ৮।১০ দিনে পাট বেশ পচিয়া উঠে; কিন্তু যদি পাট কাটিতে কাটিতে দেরি হয় এবং পাট ভিজাইতে শীত আসিয়া পড়ে তাহা হইলে মাঝে মাঝে পাট পচিতে এমন কি দুইমাস পর্য্যন্ত ও সময় লাগিয়া যায়; তা ছাড়া কতকগুলি পাট অধিক পচিয়া যায় আবার কতগুলি হয়ত পচেও না। পাট অধিক পচিয়া গেলে যে কেবল রংই খারাপ হয় তাহা নহে পাট শক্তও হয় না। এ দিকে অল্প পচাইলে ও পাটের রং খারাপ হইয়া যায়। অতএব যাহাতে উপযুক্ত সময়ে পাট কাটিয়া উপযুক্তরূপ পচাইয়া পাট বাহির করিয়া লওয়া যায় সেই বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পাট ভিজাইবার এক সপ্তাহ পর হইতেই প্রতিদিন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে থাকিবে যে উহা উপযুক্ত রূপ পচিল কি না। যখন পাট দস্তুর মত পচিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে তখন আটিগুলি এক এক করিয়া উঠাইয়া আনিয়া গাছ হইতে আঁশ ছাড়াইয়া লইবে।

পাট ছাড়াইবার ২।৩টী প্রথা প্রচলিত আছে। পূর্ব্ব বঙ্গে পচা আটিগুলি উঠাইয়া আনিয়া এক একটী গাছের গোড়ার দিক হইতে অঙ্গুলির সাহায্যে কতকটা আঁশ ছাড়াইয়া লইয়া আস্তে আস্তে টানিয়া গাছ হইতে আঁশ ছাড়াইয়া লওয়া হয়। তৎপরে পাট হাতে ও গাছটি ভিন্ন স্থানে রাখা হয়। হাতে এক মুষ্টি পরিমাণ পাট হইলেই তাহা মুঠা বাঁধিয়া রাখা হয়, তৎপরে এইরূপ কতকগুলি মুঠা একত্র হইলে তাহা পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়, পাট শুকাইলে পর গাইট বাঁধিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা পচা পাটের আটি খুলিয়া ৮।৯টী করিয়া গাছ হাতে লইয়া তাহা মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া রাখে, তৎপরে ঐ ভাঙ্গা গাছগুলি উপর দিকে ধরিয়া জলে খুব নাড়িয়া ধুইলেই পাট হইতে গোড়ার দিকের শলাগুলি পৃথক হইয়া পড়ে, এইরূপে নীচের দিকে ধরিয়া ধুইলে উপর দিকের শলাগুলি পৃথক হইয়া যায়। অতঃপর পাটগুলি আরও কতক্ষণ জলে বেশ করিয়া ধুইলে যখন ইহা শুভ্রবর্ণ হইয়া উঠে তখন শুকাতে দেওয়া হয়।

আমরা দ্বিতীয় উপায় অপেক্ষা প্রথম উপায়ই বেশী পছন্দ করি, কেন না দ্বিতীয় উপায়ে যেরূপ জোরে টানিয়া পাট বাহির করা হয় তাহাতে উহা নাল না থাকিয়া অনেক সময় এলো হইয়া পরে উহাতে পাটের দাম অনেক কমিয়া যায়, শেষোক্ত উপায়ে পাটের শলাগুলি প্রায় সবই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু প্রথম উপায়ে উহা বাজারে বিক্রি করা যায় বা নিজেদের ব্যবহারেও লাগান যাইতে পারে। প্রথম উপায়ে খরচ বেশী পড়িবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন; কিন্তু ইহা অমূলক। কারণ সাধারণতঃ গরীব স্ত্রীলোকেরা কেবল শলাগুলির বিনিময়ে পাট ছাড়াইয়া দিয়া থাকে। যেখানে এই প্রথা নাই সেখানেও ইহা তেমন ব্যয়সাধ্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না কারণ গৃহস্থের মেয়েরা নিজেরাই এই কাজ করিতে পারে। পাটের শলা দ্বারা অনেকে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে এবং গরীব লোকেরা ঘরের বেড়া এমন কি ছাউনি পর্য্যন্তও দিয়া থাকে। ইহা জালানি কাঠরূপেও ব্যবহৃত হয়। পাট ধুইবার পর খুব ভাল করিয়া শুকাইয়া লওয়া উচিত। পাট শুকাইবার জন্য খোলা জায়গায় লম্বা বাঁশ দ্বারা আড় বান্ধিয়া ঐ

আড়ের উপর খুব পাতলা পাতলা করিয়া পাটগুলি রাখিয়া দেওয়া উচিত এবং শুকাইলে গাঁইট বান্ধান হইয়া থাকে। অর্দ্ধ শুষ্ক পাট গাঁইট বাঁধিয়া রাখিয়া দিলে তাহা পচিয়া যায়।

মেস্তা পাট।

বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশে ইহার চাষ খুব বেশী। ছোটনাগপুরেও ইহার চাষ হইয়া থাকে, বেহারেও ইহার চাষ আছে। তথায় ইহা পাটুয়া নামে অভিহিত। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব এবং অযোধ্যাতেও ইহার চাষ আছে বটে, কিন্তু তেমন বেশী নহে। মেস্তা পাট ঠিক্ সাধারণ পাটের ন্যায়ই লম্বা হয়। আঁশগুলি পাটের আঁশ অপেক্ষা অনেক শক্ত এবং তদ্দরুন জাল ইত্যাদি বুনিবার জন্য ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা কাছিও তৈয়ার হয়।

জমী ঃ—কেবল নীচু জমী যাহা বর্ষায় ডুবিয়া যায় তাহা ছাড়া পাটের চাষের পক্ষে যে সকল জমী অনুপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সে সবই মেস্তার চাষের উপযোগী। মেস্তায় ফুল ধরিতে আরম্ভ করিলেই উহা কাটিবে; এই সময়ে কাটিলেই মেস্তা পাট খুব শক্ত ও উজ্জ্বল হয়। ফলন ঠিক্ পাটের ন্যায়, ইহার পাতাগুলি অনেকে শাক খাইয়া থাকেন এবং দানাগুলি গো মহিষদিগকে দেওয়া হয়।

শণ পাট।

ইহারও আঁশ খুব শক্ত এবং জাল প্রভৃতি বুননে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেশ উচু হালকা জমী ইহার চাষের বিশেষ উপযোগী। এটেল মাটী বা খুব তেজস্কর ভূমি বা নীচু সেঁতসেঁতে জমীতে ইহার চাষ ভাল হয় না। গাছগুলি অবশ্য বড় হয়, কিন্তু পাট অতি নিকৃষ্ট এবং মোটা হইয়া থাকে। ওজনেও বেশী হয় না। শণের চাষ যে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় ইহা আমাদের কৃষকগণ বিশেষ অবগত আছে এবং সেই হেতু তাহারা ইক্ষু, আলু প্রভৃতি শস্যের পূর্ব্বে একবার শণের চাষ করিয়া লয়। কখনও কখনও বা শণ গাছ ছোট থাকিতেই উহা চাষ দিয়া জমীতে পচাইয়া দেওয়া হয়।

চাষ ঃ—বেলে জমীতে বিশেষ চাষ দেওয়ার দরকার করেনা; দুইবার চাষ দিয়া একবার মই চালাইয়া লইলেই যথেষ্ট হইল। ইহার বীজ পাট অপেক্ষা একটু ঘন করিয়া লাগাইবে। বীজের হার বিঘা প্রতি ৬।৭ সের। বীজ বুনিবার সময় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস। শ্রাবণ মাসেই শণ গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে; কিন্তু দানা হইবার পূর্ব্বে শণ কখনও কাটা উচিত নহে। শণের গাছ হইতে আঁশ বাহির করিয়া লইবার নানা প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থলে গাছ গুলি কাটিয়া জলাশয়ের ধারে পাঁকের ভিতর পুরিয়া রাখা হয়। এই জল সম্বন্ধে ও দুই প্রকার মত দেখা যায়। কেহ কেহ স্রোত জলে ভিজাইয়া থাকেন, কেহ বা স্থির জলই পছন্দ করেন। যাহা হউক ভিজাইবার এক সপ্তাহ মধ্যেই গাছ গুলি পচিয়া উঠে; তখন আটি গুলি উঠাইয়া লইয়া পাটের ন্যায় আঁশ ছাড়াইয়া লইবে। পাটের ন্যায় ইহাও বেশী পচিতে দেওয়া উচিত নয়। আবার কোথাও কোথাও গাছ গুলি কাটিয়া মাঠে রাখিয়া দিয়া দস্তুর মত শুকাইলে জলে ফেলা হয় এবং ২।৩দিন পরে গাছ হইতে আঁশ ছাড়াইয়া লওয়া হয়। যে স্থানের আবহাওয়া সাধারণতঃ আর্দ্র সেখানে ঐ প্রথা বিধেয় নহে; কারণ উক্ত স্থানে ঐ রূপ করিলে আঁশ গুলি নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আবার কোথাও বা গাছ গুলি আদৌ না পচাইয়া আঁশ ছাড়াইয়া লওয়া হয়। ইহার ফলন বিঘা প্রতি সাধারণতঃ দুই মণ আড়াই মণ; কখনও কখনও পাঁচ মণ পর্য্যন্ত দেখা যায়। শণের বীজ দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়াইলে উহার দুগ্ধ বাড়ে।

রীয়া।

ইহাকে উদ্ভিদ শাস্ত্রে Boehoneria Nivea কহিয়া থাকে। ইহার পাট ঠিক রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল এবং খুব শক্ত। ইহা দ্বারা ঠিক রেশমের ন্যায় কাপড় ও তৈয়ার করা যায়। এই আঁশের মূল্য খুব বেশী বলিয়া অনেকে ইহার চাষে ধনি হইবেন বলিয়া মনে করেন এবং গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষে ইহার চাষের প্রবর্ত্তনের জন্য অনেক দিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন, শিবপুর এবং সাহারণপুর কোম্পানীর বাগানে এবং অনেক জেলে ইহার চাষের জন্য দস্তুর মত চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু কোথাও তেমন ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রধান কারণ রীয়া সকল জমিতে ভাল হয়না, আর হইলেও ইহার আঁশ ছাড়াইয়া লওয়া ও

তৎপরে উহাকে পরিষ্কার করা এত ব্যায় ও কষ্ট সাধ্য যে কলের সাহয্য বিনা হাতেপরিষ্কার করিয়া কখনও লাভবান হওয়া যায় না।

রীয়া গাছ হইতে আঁশ ছাড়াইয়া লইবার ও তাহা পরিষ্কার করিবার কল যে নাই তাহা নহে কিন্তু এ সব কলের এত দাম ও সেই সব কলের উপযুক্ত কাজ দিতে হইলে এত বেশী জমী লইয়া ইহার চাষ করা দরকার যে সাধারণ কৃষকের পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব, তবে যদি কোন ধনী লোক অথবা কোন কোম্পানি এই কাজ আরম্ভ করেন তবে অবশ্য চলিতে পারে।

আসাম, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ইহার অর্দ্ধ পরিস্কৃত আঁশ দ্বারা, জাল দড়ি প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া থাকে।

জমী ঃ—যে স্থানের মৃত্তিকা স্বভাবত আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত অথচ এমন উচ্চ যে বন্যার জল উঠে না ব বর্ষায় জল দাঁড়ায় না সে সব স্থানেই রীয়ার চাষ ভাল হয়। রীয়াবীজ হইতে উৎপন্ন হয়, ডাল কাটিয়া কলম করিয়াও লাগান হয়। ডাল কাটিয়া লাগাইলে এক এক খণ্ড আধ হাত আন্দাজ লম্বা করিয়া কাটিবে। জমী বেশ ভাল রকম চাষ করিয়া ৪।৬ অঙ্গুলি মাটীর নীচে প্রত্যেক দিগে ৮ তিন পোওয়া হাত অন্তর করিয়া লাগাইবে। রীয়া লাগাইবার প্রশস্ত সময় ভাদ্র, আশ্বিন। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসেও লাগান যাইতে পারে। একবার লাগাইলে ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত বেশ থাকে। প্রথম ফসল লাগাইবার নয় মাস মধ্যেই কাটা হয়। তার পর মাসে মাসেই কাটা যাইতে পারে। সাধারণতঃ বৎসরে ৩.৪ বার ফসল কাটা হয়। যদি জমী বেশ ছায়াযুক্ত হয় দস্তর মত সার প্রয়োগ ও জল সেচন ইত্যাদি করা হয় তবে ৫।৬ বারও কাটা হয়। ডগাগুলির গোড়া যখন বাদামী রং ধরিয়া উঠে, এবং পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে তখনই উহা কাটিয়া লইবে। এইরূপ ডগা বাছিয়া বাছিয়া কাটিতে পারিলে, সমস্ত বৎসর ভরিয়াই রীয়ার ফসল পাওয়া যায়।

বীজ হইতে গাছ করিতে হইলে চারা জন্মাইবার জমী থানা বেশ হাল্কা দোয়াশ জমী দেখিয়া ভাল করিয়া গোবর সার দিয়া চাষ করিয়া লইবে। রীয়ার বীজ কখনও মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে নাই। ক্ষেত্রে বীজ বুনিবার পরে একখানি কলাপাতা অথবা মাদুর দ্বারা বীজগুলি ঢাকিয়া রাখিবে এবং উহারই উপর জল দিয়া উহা ভিজাইয়া দিবে যেন উহার শৈত্যতায় জমী বেশ আর্দ্র থাকে। বীজ গজাইবার পূর্ব্বে কখনও জমীতে সোজাসুজি জল দিতে নাই। বীজ দস্তর মত গজাইয়া উঠিলে উপরের আবরণ খানা উঠাইয়া লইবে। এবং দরকার মত চারাতে জল দিবে। যখন চারাগুলি ৩ ইঞ্চি আন্দাজ উচ্চ হয়, তখন উহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া জমীতে লাগাইবে। রীয়ার আঁশ বিঘা প্রতি কত ফলিয়া থাকে সে সম্বন্ধে ঠিক করিয়া বলা বড় শক্ত; কারণ ইহার আঁশ বাহির করা ও পরিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া কেহই ইহার বড় একটা চাষ করে না। যাহারা করিয়া থাকে তাহারাও অতি সামান্য পরিমাণ স্থান লইয়াই করে। এবং তাহাদের মধ্যে কেহই আঁশ তেমন পরিষ্কার করিয়া বাহির করেন। এবং কেহই আঁশ তেমন পরিষ্কার করিবার জন্য যত্নও করে না। তবে মোটামোটী এই বলা যায় যে, দস্তর মত চাষ করিলে বিঘা প্রতি আঁশ ৪।৫ মণ হইবে।

রীয়া গাছ হইতে আঁশ বাহির করিবার ও তৎপরে উহা পরিষ্কার করিয়া লইবার নানারূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

১। ভাগলপুরে একবারে সদ্য গাছগুলিকে বালি মিশ্রিত জলে (বালির পরিমাণ প্রত্যেক মণ গাছের জন্য ॥৵ দশ ছটাক) আন্দাজ ২ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিয়া তৎপরে ধোপার পাটের ন্যায় পাটের উপরে আছড়াইয়া গাছ হইতে আঁশ পৃথক করিয়া লওয়া হয়, তৎপরে পুনরায় ঐ জলে আধ ঘণ্টাকাল আঁশগুলিকে সিদ্ধ করিয়া ভাল জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়।

২। বগুড়ার প্রথা অন্যরূপ। সেখানে জলের সহিত প্রথম কতকটা হলুদ অথবা কিছু চাউল সিদ্ধ করে তৎপরে ঐ জলে আঁশগুলিকে সিদ্ধ করিয়া লয়, ইহাতে আঁশের মধ্যে যে আঠা থাকে, তাহা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া যায়, এবং পরিষ্কার করিবার খুব সুবিধা হয়।

৩। আসাম অঞ্চলে প্রথমতঃ গাছগুলির উপর হইতে একখানা ভোঁতা ছুরি দিয়া চাঁছিয়া উহার উপরিভাগের ছালটি ফেলিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে গোড়ার দিগে ভাঙ্গিয়া ভিতরের কাটি হইতে সেই আঁশ বাহির করিয়া লওয়া হয়, তৎপরে সেই আঁশ উল্টাইয়া ধরিয়া ক্রমে

মাথার দিকে টানিয়া লইয়া আঁশ বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই প্রথার একটা দোষ এই যে, গাছের সঙ্গে কতকটা আঁশ থাকিয়া যায়।

পাট, মেস্তা, শণ ইত্যাদি কাটিয়া জলে ভিজাইয়া, পরে আঁশ বাহির করিয়া ধুইয়া লইলে বেশ পাট হইল। কিন্তু রীয়ার তাহা নয়, ইহার আঁশের সহিত এক রকম আঠা আছে তাহা ছাড়ান বড় শক্ত, অথচ উহা না ছাড়াইতে পারিলে ইহার আঁশও পরিস্কার হয় না।

আসামে আর এক রকম রীয়ার গাছ আছে, ইহাকে উদ্ভিদ শাস্ত্রে Villebremia Integrifolia কহিয়া থাকে, আসামে ইহার নাম বনরীহ, ইহার আঁশও বেশ সাদা হয়, এবং রীয়ার আঁশ অপেক্ষা ইহা নরমও নহে, ইহাতে রীয়ার ন্যায় কোন আঠাও নাই, সুতরাং ইহার আঁশ পরিষ্কার করিতে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। আমাদের মতে এই রীয়ার চাষই বরং অধিক বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরাজেশ্বর দাস গুপ্ত।

বাঙ্গালি-গৌরব।

এক জন কবি বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"বাজা ঢাক বাজা ডঙ্কা
মনে নাহি কর শঙ্কা
অদূরে ভাসিছে লঙ্কা
বাঙ্গালী জাতির বীরত্ব নিশান।"

আবার আর এক জন কবি গাইয়াছেন ঃ—

"যেখানে সেখানে যাই
বাঙ্গালী দেখিতে পাই
তবে কি ভয় কি ভয়
বল বাঙ্গালীর জয়।"

এই সকল কবিগণের আন্তরিক উচ্ছ্বাস একেবারে মিথ্যা নহে। পূর্ব্বকালে বঙ্গের মাটিতে বাঙ্গালীর গৌরবের অনেক বস্তু উৎপন্ন হইত। বস্তুতঃ ভারতেশ্বরীর রাজ্য গ্রহণের অগ্রবর্ত্তী সময়কে বঙ্গের পূর্ব্ব যুগ বলিয়া কথিত হয়। এসময় বঙ্গে বাঙ্গালীর গৌরবের অনেক পদার্থ ছিল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আত্মমর্য্যাদা, উৎসাহ, অতুল প্রতিভা, কার্য্যকরী শক্তি ইত্যাদিতে পূর্ব্বকালের বাঙ্গালী জীবন অলঙ্কৃত ছিল। বঙ্গভূমি প্রকৃতই পুরুষোচিত অতুলনীয় শক্তিতে শক্তিময়ী ছিল। জানি না কি শুভযোগে বাঙ্গালায় অভিনব যুগের প্রবর্ত্তন হইল—আর অমনি বাঙ্গালীর বাঙ্গালিত্ব বঙ্গসাগরে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

কোন এক সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কোন ব্যক্তিকে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমি আমার জীবনে বহুকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মোপদেষ্টা, শিক্ষক, বক্তা, প্রচারক, লেখক ও পরামর্শদাতা প্রভৃতির কার্য্য করিয়াছি—কিন্তু আমার জীবনের প্রথমাবস্থায় যে সকল সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বাঙ্গালী দেখিয়াছি, এখন আর তেমনটি প্রায়ই দেখি না। অতি পূর্ব্বকালের বাঙ্গালীর গুণপনা ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছে।"

মহাত্মা কেশব চন্দ্রের এই অভিমত আজ আমাদের নিকট একটি ধ্রুবসত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যখন এই দেশে রেল ছিল না—অথবা সংবাদ পত্র প্রচলন হয় নাই, অর্থাৎ অভিনব যুগের আবির্ভাব হয় নাই, তখন যে সকল সর্ব্বগুণশালী অভিজ্ঞ বাঙ্গালী ছিলেন, এখন আর তাহা আদৌ দেখিতে পাই না। প্রকৃত পক্ষে এই দেশে যে সকল উর্ব্বর মস্তিষ্ক বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

ক্ষীণ প্রাণ অসম্বন্ধ ভারতেতিহাসে অনেক বাঙ্গালীর খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং অতুল প্রতিভা ও অসীম শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, বস্তুতঃ মনুষ্যত্বের যে দিক ধরিয়া লওয়া হউক না কেন, প্রত্যেক অংশেই পূর্ব্বকালের বাঙ্গালীর প্রতিভা শতমুখী গতিতে পরিচালিত হইত।

বীরত্বে—প্রতাপাদিত্য, শঙ্কর, সূর্য্যকুমার, উদয়াদিত্য কালিদাস, সীতারাম, প্রভৃতি অনেকানেক স্মরণীয় বাঙ্গালীর উল্লেখ করা যায়। ধর্ম্মে—শ্রীচৈতন্য হইতে লালা বাবু, কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয়। দয়া ও পাণ্ডিত্যে—রঘুনন্দন হইতে আরম্ভ করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ ভট্ট, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অগ্রগণ্য। ইঁহারা বঙ্গের আকাশে ধ্রুব তারার ন্যায় জ্যোতিষ্মান। কবিত্বে—চণ্ডিদাস হইতে ধারাবাহিক রূপে বৈষ্ণব কবিগণকে

লইয়া ভারতচন্দ্র, ঘনরাম, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি স্মরণীয়। বাঙ্গালী বঙ্গের কৃতিপুত্র। সাহসে, বলে এবং উদ্যমে—ডুলেবাগদি বিশ্বনাথ হইতে ধরিয়া ভবানী পাঠক, রসিদ-মামুদ, ক্ষেমিবাট পাড়নী, দেবী চৌধুরাণী, আশানন্দ, মনোহর প্রভৃতি চিহ্নিত বঙ্গ রত্নগুলি এই বর্ত্তমান নিজ্জীব বঙ্গের স্মরণীয়। কার্য্যদক্ষতা এবং শ্রমশীলতাযুক্ত ধনোপার্জ্জনে মহারাজ নন্দকুমার হইতে আরম্ভ করিয়া শেঠবংশ, রাজারাজবল্লভ, দয়ারাম, রঘুনন্দন, কাশি-শঙ্কর, দুলাল সরকার প্রভৃতি বাঙ্গালী চির নমস্য। ইহারা বঙ্গের অন্ধকার-গৃহের উজ্জ্বল রত্ন। রমণী জীবনের মাহাত্ম্যে—রাণী ভবাণী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্ণময়ী, ভগবতী দেবী, তারামণি প্রভৃতি নারীরত্ন সমূহ বর্ত্তমান যুগের বিলাসিনী-গণের চির পূজিতা। আবশ্যক হইলে এরূপ উদাহরণ যথেষ্ট দেখান যায়। যাঁহারা বঙ্গ দেশকে চির দিনই ভীরু, অলস, প্রতিভাশূন্য অকর্ম্মণ্য ও আত্মমর্য্যাদাহীন জাতির দেশ বলিয়া ঘৃণা করেন—তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী। জাতীয় গৌরব বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা এই দেশের অধিবাসীদিগের যথেষ্ট ছিল এবং আবার হইতে আরম্ভ হইতেছে।

সময় এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে আজ কাল এক অভিনব যুগ উপস্থিত হইয়া ভারতের গৌরবশালী বাঙ্গালী জাতীকে এক নবীন অবস্থায় আনিয়া উপনীত করিয়াছে। জানি না এই পূর্ণ পরিবর্ত্তন কোন কুহকময় অনুকরণ শক্তি সঞ্জাত কি না। অসত্য ব্যবহার, অযথা অনুকরণ, এবং বাক্পটুতা আর বিলাসিতাপূর্ণ অলসতা বর্ত্তমান বঙ্গের অস্থিমজ্জায় অন্তঃ প্রবিষ্ট।

পূর্ব্বকালের এক একটী বাঙ্গালীর কার্য্য এবং শক্তি আলোচনা করিলে আমাদের এই পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মস্তিষ্ক অবশ হইয়া পড়ে। পাঠক! শুনিলে, জানিলে এবং দেখিলে বিস্মিত হইবে। এই ভীরু বাঙ্গালির একজন মুণ্ডিত মস্তক নামাবলিধারী ব্রাহ্মণ সুদূর রাজপুতনা রাজ্যে ঐশ্বর্য্যের নিকেতন, গৌরবের শীর্ষস্থানীয় "জয়পুর" নগরের প্রতিষ্ঠাতা, ইহা বিশ্বাস হয় কি?

রাজপুতনা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাঙ্গালীর প্রতিভার বিকাশ-উদাহরণ দুর্লভ নহে। পঞ্জাবের গোলকনাথ—ত্রিপতীর ভুবন মোহন—বোম্বের সুরেশ মিত্র বৃন্দাবনে লালা বাবু—মধ্য ভারতে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—ব্রজের দুর্লভগোস্বামী ইহার অন্যতর উদাহরণ। অদ্য রাজপুতনার মহাপুরুষ বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্যের কাহিনী আলোচনা করিব।

যখন মহারাজ মানসিংহ বঙ্গের শেষ স্বাধীন-শোণিত শোষণ করিতে দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিতে যশোহর প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কৃতকার্য্যের ফল স্বরূপ প্রায় ৩০০ শত বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ বন্দী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে ঐ সঙ্গে যশোহরের অধিষ্ঠাত্রী "যশোরেশ্বরী মাতাও" বন্দিনী হইয়াছিলেন।

(মানসিংহ বিজয়-মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া দেবী প্রতিমার সহিত স্বীয়প্রভু দিল্লীশ্বরকে সমস্ত বন্দী-প্রাণ উপহার প্রদান করেন। বিধর্ম্মী বাদশাহ বন্দিগণকে আবদ্ধ এবং দেবীকে যমুনায় নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলে পরে হিন্দু মহারাজ মানসিংহ ভিক্ষা স্বরূপ দেবীর সহ বন্দিগণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর এই নবনির্ব্বাসন যাত্রায় মানসিংহের উক্ত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি, রাজপুতনায় প্রেরিত হয়। তাঁহার পিতামহ জয়চন্দ্র বা জয়সিংহ তখন অম্বর দুর্গের অধিপতি। তিনি কালী প্রতিমাখানিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া বন্দিপ্রধান বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্যের প্রতি উহার পূজার ভার অর্পণ করেন। এই স্থান হইতেই বাঙ্গালীর গৌরব চিহ্ন দেশময় রাষ্ট্র হইতে থাকে।)

রাজপুতনায় ঐ দেবীর নাম "সল্লাদেবী" অর্থাৎ পরামর্শ দায়িনী। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেবীর পূজক ব্রাহ্মণ যে কোন বিষয়েই হউক, রাজপুত জাতির একজন মহাপরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। ক্রমে ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা জয়সিংহের একজন নমস্য মন্ত্রী মধ্যে গণ্য হইয়া-ছিলেন। তিনি সমগ্র রাজপুতনাকে নিজের অতুল প্রতিভা-গুণে নখদর্পণবৎ করিয়া লইয়াছিলেন।

একদিন ঘটনা প্রসঙ্গে রাজা এবং বিদ্যাধর অম্বরের নিকটস্থ "গঙ্গানীরে" উপস্থিত হন। জয়সিংহ গঙ্গানীর নগরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"আহা যেন ইন্দ্র-ভবন"। রাজার এই সৌন্দর্য্য-পিপাসু-বাক্য শুনিয়া ভট্টাচার্য্য কহিয়াছিলেন, "অনুমতি হইলে আমি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরী নির্ম্মাণ করিতে পারি"। সেই হইতে জয়পুর নগর

নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়।

শুভযোগে শুভলগ্নে বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার ভট্টাচার্য্যের দ্বারা জয়পুর নগর নির্ম্মিত হয়। অনেকানেক পৃথ্বী ভ্রমণকারী ইউরোপীয় বলিয়াছেন—জয়পুরের ন্যায় সুন্দর নগর জগতে অতি অল্পই আছে। এই মহানগরী সম্বন্ধে প্রবীণ কবি রঙ্গলাল বাবু লিখিয়াছেন:—

"জয়সিংহ পুরী জয়পুর চারু দেশ
যার শোভা মনো লোভা বৈকুণ্ঠ বিশেষ।"

বস্তুতঃ সৌন্দর্য্যে জয়পুর নগর ভারতের বৈকুণ্ঠই বটে। বড় সুখের এবং বড় গৌরবের কথা যে, এই পার্থিব বৈকুণ্ঠের সৃষ্টি কর্ত্তা একজন বাঙ্গালী শিখাধারী ব্রাহ্মণ।

বিদ্যাধর এই নগর নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গানীরে অপর বাঙ্গালিগণের সঙ্গে মুক্তভাবে মহা শান্তিতে বাস করিতেন। এদিকে তিনি আর একজন ভট্টাচার্য্যকে দেবীর পূজক নির্ব্বাচন করিয়া কঠিন হৃদয় রাজপুত জাতির হৃদয়ে এক মহা কোমলতার বীজ বপন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। রাজপুতনার সমাজ-দেহে যে সকল পাশবিক শক্তি ছিল, উহা বিনাশ করিবার আশায় বিদ্যাধর সমগ্র হিন্দুর দীর্ঘ অনুষ্ঠেয় "সতীদাহ প্রথা" নিবারণ করিতে সর্ব্বাগ্রে উদ্যম-শীলতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

তিনি নিজে ব্রাহ্মণ, তাহাতে দেবীর পূজক, বিশেষতঃ হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত কঠোর রাজপুত জাতীর হিন্দু নৃপতি জয়সিংহের মন্ত্রী এবং সম্পূর্ণ হিন্দু নীতির অনুগত পুরুষ, তথাপি তাঁহার মনে নব ভাবের সংস্করণ জন্য প্রকৃতিজাত মনস্বীতা এবং সহৃদয়তা জাগিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ সৎসাহস উদ্দীপ্ত না হইলে কেহ কখনও সার্ব্বজনীন মঙ্গলকার্য্য করিতে পারে না। মার্টিন লুথার ও ম্যাটসিনী তাহার অন্যতর উদাহরণ।

বলিতে কি, যখন রাজা রামমোহনের কিম্বা লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রপিতামহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই তখন এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ (যেমন তেমন স্থানে নয়) সেই অর্দ্ধ শিক্ষিত কঠোর রাজপুত নীতির শাসনে শাসিত রাজপুতনায় দীর্ঘ প্রবহমান "সতীদাহ প্রথা" দূর করিতে কৃতসংকল্প। ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় আর কি আছে।

এই ভারত-মঙ্গলকর কার্য্য বিদ্যাধরের হৃদয়ে উদ্বোধিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যদিও ভট্টাচার্য্যের অধ্যব-সায় গুণে রাজা জয়সিংহ বুঝিয়াছিলেন যে, **সতীদাহ** নিতান্ত অশাস্ত্রীয়, এবং মানব হৃদয়ের ঘৃণ্য, তথাপি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই; কেন না বিশাল বিরাট হিন্দুসমাজের নিকট জয়সিংহের রাজশক্তি অতি হীন অতি নগণ্য। বিদ্যাধর আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী অখণ্ড হিন্দু ভারতের একটী অতি ক্ষুদ্র বালুকাকণা মাত্র। কাজেই তাঁহাদের এই মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ হইল না কিন্তু এই ভারতরমণী-হিতকর মহাকার্য্য শেষে বিদ্যাধরের স্বদেশী স্বজাতী দ্বারাই প্রবল রাজশক্তির আনুকুল্যে নিবারিত হইয়াছে।

এই **সতীদাহ** নিবারণ ক্রিয়া বাঙ্গালীর মহা গৌরবের কার্য্য। তৎকালের রাজপুত শক্তি বাঙ্গালী শক্তির প্রবলতা দেখিয়া মহা ভক্তি করিতে লাগিল। তাহারই উদাহরণ স্বরূপ রাজপুতগণ জয়পুর নগরের সদর রাস্তাটিকে "বিদ্যাধরকা সড়ক" নাম দিয়া অভিহিত করিতেছে। অদ্যাপিও উক্ত নামে উহা পরিচিত আছে।

বিদ্যাধর যখন জয়পুরের অধিবাসীগণের হৃদয় অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণ্য আচার ব্যতীত অপর গুণে তাহাদের প্রাতঃনমস্য হইয়া উঠিলেন—তখন এক দিন এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইল। ইহাতে বাঙ্গালী গৌরব আরও ফুটিয়া উঠিল। জয়পুরের নিকটস্থ দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাদ্বয় এক সময় বাদশাহের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। সমর নীতি বিশারদ বাঙ্গালী বীরের বীর সেনাপতি বিদ্যাধর, রাজা জয়সিংহকে পরামর্শ দিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে উত্তেজিত করিয়া বলিয়াছিলেন:—"ব্রাহ্মণ ভিন্ন অত্যাচারী রাজাকে দণ্ড আর কে করিতে পারে?" আহা সময়ের কি বিষম পরিবর্ত্তন!

আজ বঙ্গের ব্রাহ্মণ জাতির সর্ব্ববিধ অবনতি ঘটিয়াছে। যাঁহাদের একজন বন্দী, বিদেশবাসী ব্যক্তি উক্ত রূপ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত, আমরাই কি সেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ? মনে করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ধন্য বিদ্যাধর! তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তুমিই প্রকৃত বঙ্গ গৌরব।

জয়সিংহ বিদ্যাধরকে সেই রাজাদ্বয়ের বিরুদ্ধে সেনাপত্যে বরণ করিলে পর, অতি অল্প রক্তপাতেই তাঁহারা পরাস্ত হইয়া বাদশাহের আনুগত্য সহ রাজা জয়সিংহের সামন্তরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভট্টাচার্য্য বাদশাহের

নিকট এবং রাজপুত শক্তির নিকট একজন রাজনীতিকুশল বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

এই প্রকার মহাশক্তিশালী বাঙ্গালী পূর্ব্বকালে এদেশে যথেষ্ট ছিলেন। এখনও জয়পুর অঞ্চলে বিদ্যাধরের নাম আবালবৃদ্ধবনিতার সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। বস্তুতঃ বঙ্গের বাহিরে এখনও অনেক বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য, বীরত্ব, কার্য্যদক্ষতা ও সাধুতা প্রফুল্ল বাসন্তি মল্লিকা ফুলের ন্যায় পরিস্ফূট রহিয়াছে। পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, এই শতাব্দীতে ও সুদূর ব্রাজিলে বাঙ্গালীর বীরত্বে জগত স্তম্ভিত।

পূর্ব্বকালের বাঙ্গালীর খ্যাতি প্রতিপত্তি যথেষ্ঠ হইলেও শত শত প্রমাণ অন্যত্র রাখিয়া এক যশোহর প্রদেশ হইতেই যথেষ্ট উল্লেখ করা যায়। যদি বিধাতার কুহকময় কৌশলে মানসিংহের প্রতাপাদিত্য-সমরে বিজয় লাভ না হইত, অথবা বঙ্গের কুপুত্রগুলির চক্রান্তে বাঙ্গালীর ভবিষ্য-দাকাশ ঘোর অন্ধকারে আবৃত না হইত, কিম্বা আর দুই দশ বৎসর পরেও যশোহর বিজয় সংঘটিত হইত, তাহা হইলে মুসলমান কখনই বঙ্গের একাধিপত্য লাভ করিতে পারিত না। বলিতে কি, হয় তো তাহা হইলে বৃটিশশক্তিও অগ্রে বঙ্গদেশে কেন্দ্রস্থল করিয়া লইতে পারিত না।

বিধাতার এই দুর্জ্ঞেয় কুহকচক্রে আজ আমরা (প্রকৃত না হইলেও) "সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করে" অথবা "পলাশীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মাত্র ৬০ জন শ্বেত সৈনিক হতাহত হয়" ইত্যাদি ঘৃণিত ঐতিহাসিক ইঙ্গিত মানিতে বাধ্য। হায় যে দেশে মহাবল সেনবংশ, প্রতাপ, সীতারাম, শঙ্কর, সূর্য্যকুমার এবং বঙ্গের-অভিমন্যু উদয়াদিত্যের জন্মভূমি—যে দেশ কালিদাস, কেদার ও চাঁদরায় সুন্দর মল্ল—দনুজ মর্দ্দন্ সন্ন্যাসীদল, শোভা সিংহ প্রভৃতির বিহারক্ষেত্র—সেই দেশ কি না আজ কুৎসিত ঘৃণিত, ইঙ্গিত বাক্যশুনিতে নিশ্চল। সেই জাতি কি না আজ শ্বেতাঙ্গের গুলি ও ঘুঁষিতে মৃত।

ভগবান তোমার লীলা অনন্ত এবং অজ্ঞেয়। জানি না কি অবোধ্য শক্তি সঞ্চালিত করিয়া, আজ আবার বহুদিনের পর সুপ্ত বাঙ্গালী হৃদয়ে এই সকল পূর্ব্ব গৌরব-স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছ। তোমার কুহকী চক্রের আবর্ত্তনে আজ আবার বাঙ্গালীর প্রাণে মর্ম্মদাহের অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছে। ভাই বঙ্গবাসী! আমরা অসার অকৃতী অকর্ম্মণ্য দীন জাতির রক্তে জন্ম গ্রহণ করি নাই, জাতীয় গৌরবে প্রমত্ত বীর জাতির শাসন রূপ ঊষার কিরণে জাতীয় গৌরব, জাতীয় মহত্ব, জাতীয় কর্ত্তব্য উদ্দীপ্ত কর। আলো ফুটিবে। নবদ্বীপ, মালদহ, যশোহর মহম্মদপুর রংপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান, বিক্রমপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতিকে তীর্থস্থান বলিয়া দর্শন কর—আর বঙ্গের পূর্ব্ব গৌরবকে ধ্যান কর, সুবর্ণ কিরণ দেখিতে পাইবে। কুলাঙ্গারগণের জন্যই শিবজী, প্রতাপ এবং সীতারামের জীবন মাতৃযজ্ঞে আহুতি পাইয়াছে। নতুবা আজ আমরা সূর্য্যকিরণে মুখোজ্জ্বল করিতে পারিতাম। জগতের নিকট বাঙ্গালী গৌরব উন্নত মস্তকে ঘোষণা করিতে পারিতাম।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

প্রত্যাখ্যাতা।

সাধিনু এত করে চরণে ধেরে;
ধরা ত দিল না সে নয়ন-লোরে।
তোরা ত বলেছিলি, খেলিতে চতুরালী,
বসিতে গরবেতে নিকুঞ্জবনে;
হেরিতে ঠারে ঠোরে, বিজনে মনচোরে,
ফিরাতে পিছু পিছু নয়ন কোণে।
বাঁশরী কেড়ে নিতে, ভোলনি বলে দিতে,
কালিন্দী কাল জলে ফেলিতে তারে;
সকলি ছিল মনে, সে শ্যাম দরশনে,
এত যে বোঝা পড়া অলীকান্তরে।
বচন মৃদু মৃদু, কহিনু প্রেমে সুধু,
সাধিনু এত করে চরণ ধোরে;
ধরা ত দিল না সে নয়ন লোরে।
একেলা নিকুঞ্জে বসায়ে রেখে;
তোরা ত দেখেছিস্ গোপনে থেকে।
কালার কালো বাঁশী, অধরে গেছে মিশি,
বদনে মৃদু হাসি চুমিছে তারে;
রাধা আয় রাধা আয়, যামিনী বয়ে যায়,
ডাকিছে মুরলী ব্যাকুল স্বরে।

রাখাল একে একে, ফিরেছে গোঠ থেকে,
গোধূলি নেমেছে গো-রেণু মেখে;
রাধিকা আয় আয়, নিকুঞ্জবন ছায়,
হাসিবে চাঁদিমা তুঁহারে দেখে;
তোরা ত শুনেছিস্ গোপনে থেকে।
কেমনে কেড়ে লই শ্যামের বাঁশী;
নিভায়ে সোহাগের সুচারু হাসি।
আপনা গিয়ে ভুলে, লুটানু পাদমূলে,
যতনে নেয় যদি হৃদয়ে তুলে;
কে জানে কালাচাঁদ, বাঁশীতে পেতে ফাঁদ,
এসেছে মজাইতে অবলাকুলে!
কালিন্দী জল কালো, হৃদয় তো বেশ ভালো,
জুড়াতে গার জ্বালা ক্ষণেকে পারে;
দেখেছি দিবা শেষে উহার জলে এসে,
শীতল তনু নিয়ে ফিরিতে ঘরে।
কালার সব কালো, কিছু ত নয় ভালো,
বিফল হেথা আসা, মরমে মরা;
প্রাণের জ্বালা আগে, ওঠেনি এত জেগে,
সোহাগ দিতে আসে উপেক্ষা ভরা?
নারী ত তোরা সবে, শুনেছিস্ কোথা কবে,
বলনা বল, সখি, মাথার কিরে;
দু পায়ে যায় দলি, তাহারে কাছে পেলি,
কেবলি যার তরে কাননে ফিরে।
তোহারে ডাকে যদি, বাঁশরী নিরবধি,
হৃদয়ে আয়লো রমণি রূপসি;
তখন (ঐ) গুণ করা, বাঁশরি মনহরা,
পারিস্ কি কেড়ে নিতে সুচারু হাসি;
লওয়া কি যায় কেড়ে শ্যামের বাঁশী?
সাধিনু এত করে চরণ ধোরে;
ধরা ত দিলনা সে নয়ন-লোরে।
তোরা ত বলেছিলি, খেলিতে চতুরালী,
সে শঠ বনমালী রহিল কই;
হেরিতে ঠারে ঠোরে, বিজনে মনচোরে.
ফিরাতে পিছু পিছু দিলনা সই।
বচন মৃদু মৃদু, কহিনু প্রেম সুধু,
সাধিনু এত করে চরণ ধোরে;
ধরা ত দিলনা সে নয়ন-লোরে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধার।

৩। লক্ষ্মী দেবীর পাঁচালী।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি রঞ্জিত (রণজিত) রামদাস নামক জনৈক কবির রচিত। গ্রন্থে কোথাও তাঁহার কোন পরিচয় নাই। পুঁথিখানা চট্টগ্রাম পরৈকোড়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থের ভাষাতেও চট্টগ্রাম প্রচলিত কয়েকটি শব্দ ও বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং ইহা হইতে কবিকে চট্টগ্রামবাসী অনুমান করিলে বোধ হয় বড় অসঙ্গত হয় না।

পুঁথিখানি একবারে জীর্ণশীর্ণ; লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। ইহা 'বসু যুগ সিন্ধু শশী' শকে অর্থাৎ ১৭২৮ শকাব্দায় বা ৯৮ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে।

ইহাতে রচনা-চাতুর্য্য বা সৌন্দর্য্য বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না। ভাষা সর্ব্বত্রই সহজ ও অনাড়ম্বর।

এরূপ ব্রত কথায় রচনার পারিপাট্য বিধানের চেষ্টা বড় একটা থাকে না। কবিত্ব প্রদর্শন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে! আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল দেশে সকল কবিই একই রকম উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই শ্রেণীর গ্রন্থ-রাজি রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে কালের বঙ্গীয় কবিগণ চর্ব্বিত চর্ব্বনে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন; প্রাচীন সাহিত্যে তাহার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান আছে। যাহাহউক এরূপ গ্রন্থাদির দ্বারা বাঙ্গালীর মনোবৃত্তির অনুধাবন-কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। সমালোচ্য পুঁথিখানি এই :—

ওঁ নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ

বন্দম যে গণপতি মূষিক-বাহন।
চারিভুজ এক দন্ত গজেন্দ্র বদন॥
গরুড় বাহনে বন্দম দেব নারায়ণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কস্তুভ ভূষণ॥
বৃষ আরোহণে বন্দম দেব পঞ্চানন।
ত্রিশূল ডমরু হস্তে ভুজঙ্গ ভূষণ॥
হংস পিষ্ঠে (পৃষ্ঠে) আরোহণ দেব প্রজাপতি।
সিংহ পিষ্ঠে আরোহণ দেবী ভগবতী॥
বন্দম যে সরস্বতী করিআ ভকতি।
অনুগ্রহ কর মাতা অধমের প্রতি॥

কুবের বরুণ বন্দম আর-হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র আদি বন্দম পবন॥
বন্দম যে ভগবতী করিয়া প্রণতি।
যার হৈতে পঞ্চম পুরুষ হইছে উৎপতি॥
পিতামহ পিতামহী আর মাতাপিতা।
প্রণতি করিয়া বন্দম শ্রীগুরু দেবতা॥
সর্ব্ব দেব মুনিগণের বন্দিলুম চরণ।
লক্ষ্মীর পাঞ্চালী কহি শুন বিবরণ॥
পদ্ম আরোহণ মাতা বিষ্ণু বক্ষে স্থিত্।
তাহান চরণ বন্দম পড়িয়া ভূমিৎ॥
কিঙ্করের অধিষ্ঠান হও সিন্ধু সুতা।
সর্ব্ব দুঃখ দূর কর জগতের মাতা॥
ভাগীরথী দেশে রাজা বিক্রম কেশরী।
ভার্য্যা তান ভূষণামতী পরম সুন্দরী॥
লক্ষ্মী অবতার সেই বড় ধর্ম্মশীলা।
রাজবাড়ী কাষ্ঠ দিত এক কাঠিয়ালা॥
সূচীমুখী নাম হএ তাহার যে নারী।
সর্ব্বাঙ্গ অলক্ষ্মী তাইর (১) বড় দুরাচারী॥
কত দূর ভোম (২) রাজা দিছেন নালাকার। (৩)
দিনে অপ্সর (অবসর) না পাএ ভোম রুপিবার॥
আর দিন কাঠিয়াল ভাবিয়া রাত্রিতে।
ভার্য্যার তরে বলিলেক উজাল (৪) ধরিতে॥
স্বামীর বচনে রামা উজাল লইয়া করে।
যথায় জমিন তথা চলিলা সত্বরে॥
পিছে পিছে কাঠিয়াল করিল গমন।
জমিনেতে গিয়া জালা (৫) করএ রোপণ॥
হেন কালে রাজা যাইতে দরবার হইতে
দেখে কাঠিয়াল স্ত্রী উজাল লইছে হাতে॥
কাঠিয়াল ভূমিতে জালা রোপণ যে করে।
আশ্চর্য্য ভাবিয়া রাজা আসিলেক পুরে॥

মহাদেবী স্থানে কহে এসব কাহিনী।
বরহি চতুর কাঠিয়ালের রমণী॥
এ বলিয়া নরপতি করে প্রশংসন।
ভূষণাবতী বলে সেই অলক্ষ্মী লক্ষণ॥
ক্রোধ হইয়া রাজা বলেন দেবীরে।
তুমি বুঝি ভাগ্যবতী সংসার ভিতরে॥
কাঠিয়াল স্ত্রীকে মন্দ বল অকারণ।
কালুকা যাইও তুমি তাহার ভুবন॥
কাঠিয়াল স্ত্রী আমি অবশ্য আনিব।
তুমি কেমন লক্ষ্মীরূপা তবে সে বুঝিব॥
এত শুনি মহাদেবী বলে ভালো ভাল।
নিশাপতি অস্ত গেল হৈল প্রাতঃকাল॥
সভাতে বসিলা রাজা করিয়া দেয়ান।
হেনকালে কাঠিয়াল আইল বিদ্যমান॥
কাষ্ঠ এড়ি ভূপতির বন্দিলা চরণ।
কাঠিয়াল সম্বোধিয়া বোল এ রাজন॥
তোমার রমনী আমি আনিবাম এথা।
মহাদেবীকে তুমি লই যাও সর্ব্বথা॥
রাজমুখে শুনি তবে বলে কাঠিয়াল।
অসম্ভব কথা কেনে বল মহীপাল॥
প্রজার জননী দেবী তোমার ঘরিণী।
আমার মন্দিরে যাইতে কেনে বল বাণী॥
রাজা বলে কঠিয়াল শুন ২ বচন।
মহাদেবী লইয়া যাও তোমার ভুবন॥
কাঠিয়াল নিঃশব্দ হৈল রাজার বচনে।
মহাদেবীরে রাজা বলিলা বচন।
কাঠিয়াল ঘরে তুমি করহ গমন॥
সূচমুখীর ভরে দোলা পাঠা এ রাজনে॥
মহাদেবী একখান সূতা হস্তে করি।
দোলা এ চড়িয়া গেলা কাঠিয়াল বাড়ী॥
দোলা হইতে লামি (৭) দেবী প্রবেশিলা ঘরে।
দুই গর্ত্ত দেখি কেনে তোমার যে ঘরে॥
কাঠিয়াল বলে মাগো করি দিবেদন।
দুই গর্ত্তে দুই জন করিতাম ভোজন॥

(১) তাইর—তাহার। (চট্টগ্রামী প্রাকৃত প্রয়োগ।)

(২) ভোম—ভূমি। (৩) নালাকার—দাস দাসীকে যে ভূমি নিষ্কর দেওয়া যায়।

(৪) উজাল—মশাল। (৫) জালা—ধান্যের গাছ একটু বড় হইলে তাহাকে 'জালা' বলে। এই জালা তুলিয়া পুনরায় রোপণ করিতে হয়।

৬। কালুকা—কল্য।

(৭) লামি—নামি।

এথ শুনি মহাদেবী লাগিলা হাসিতে।
কাঠিয়ালকে বলে তুমি যাও ত হাটেতে॥
সাগৈগ্ (সামগ্রী) আনিবা সব চাউল আদি করি।
লবণ মরিচ জঙ্গি আনিবা লাকরি॥
বস্ত্র আনিবা পৈরনের (৮) তরে।
ধেনু এক আনিবা যে কহিলাম তোমারে॥
কাঠিয়াল বোলে মাও নিবেদন করি।
কি দিআ আনিব সব খরিদ যে করি॥
মহাদেবী বলিলেক একথা শুনিআ।
সূতাখান দিলাম হাঠে যাও ত চলিআ॥
কঠিয়াল বলে মাও করি নিবেদন।
এহার যে মূল্য আমি না জানি কখন॥
মহাদেবী বলে সূতা বলিঅ আমূল।
তোলাইতে(৯) কোন জনে নহি দিবা তুল॥
এথ শুনি কাঠিয়াল করিলে গমন।
সূতাখান লৈআ হাটে দিলা দরশন॥
সূতা দেখি হাটে লোক চমকিত মন।
কাঠিয়াল স্থানে কহে মূল্যের কথন॥
কাঠিয়াল বোলে সুতা হএ ত আমূল।
যেই জনে নিবা সূতা টাকা দেঅ বহুল॥
লক্ষ্মীর হাতের সূতা জানিবা কারণ।
বহু ধন দিয়া সূতা নিল একজন॥
টাকা পাইয়া কাঠিয়াল হাট সব করি।
শীঘ্র করি মিলিলেক আপনার বাড়ী॥
হাট সব দেখি দেবী হরসিত হৈলা।
রন্ধন করিতে দেবী স্নান যে করিলা॥
স্নান করিয়া দেবী হরসিত মন।
পাকশালা ঘরে গেলা করিতে রন্ধন॥
কঠিয়াল সম্বোধিয়া বলিলা বচন।
কথ মুষ্টি চাউল দিতাম কহ ত কারণ॥
তাহার জন্যে কত মুষ্টি কহ বিবরণ।
কত মুষ্টি দিত চাউল তোমার কারণ॥
কাঠিয়াল বলে মাতা শুন মোর বাণী।
মোর জন্যে সপ্ত মুষ্টি দিত মাত্র জানি॥

তাহার লাগিয়া চাউল দিত নয় মুঠ।
সত্য কহিল মাতা ন' কহিল ঝুট॥
এত শুনি ভূষণাবতী লাগিলা হাসিতে।
সপ্ত মুঠ চাউল দিলা তাহার নিবৃর্ত্তে (১০)॥
আর পঞ্চ মুঠ দিলা খাইতে আপন।
রন্ধন করি দুই জন করিলা ভোজন॥
সর্ব্বদুঃখ দূবে গেল সম্পদ অপার।
দেবীর প্রসাদে ধন হইল তাহার॥
তাহার বিবাহ দেবী করাইল পুনি।
কাঠিয়ালে জানে তানে যেহেন জননী।
ভূষণবতী রহিলেক কাঠিয়াল ঘর।
সূচমুখী লইআ কিছু শুনহ উত্তর॥
নীচমুখী গেল যদি রাজঅন্তস্পুরী।
সেই দিন লক্ষ্মীদেবী গেলা দেশ ছাড়ি॥
সূচমুখীর চরিত্র শুন করি অধান।
কেশ মধ্যে নিজ মারে সন্ধ্যা যে বেহান॥ ?)
হস্ত পদের নখ কাটে চাকু হস্তে করি।
আর কত অমঙ্গল কহিতে না পারি॥
মন দুঃখে আছে রাজা সদা এ ভাবিৎ।
আশ্বিনের পূর্ণমাসী হইল উপস্থিত॥
এই যে লক্ষ্মীর ব্রত করে নারীগণ।
সূচমুখী এই ব্রত না জানে কারণ॥
এই কথা শুনি রাজা কোটুলেরে বলে।
এই ব্রতে নিষেধ কর গ্রামী সকলেরে॥
রাজ আজ্ঞাএ কোটয়ালে ঢোলে কাটি দিল।
নিষেধ শুনিআ কেহ ব্রত না করিল॥
ঐখানে ভূষণাবতী কাঠিয়াল ঘরে।
নানা উপচার দিআ লক্ষ্মীর ব্রত করে॥
ষোড়শ উপচারে পূজে বেদের বিধানে।
ভক্তি জ্ঞানে ভূষণাবতী ভাবে রাত্রিদিনে॥
তবে লক্ষ্মী দেবী রাজপুরে প্রবেশিলা
কেহ ব্রত নাহি করে প্রতি ঘরে চাহিলা॥
রাজ্য ভ্রমি গেলা দেবী কাঠিয়াল ঘরে।
তাথাতে দেখিলা বিধিমতে পূজা করে॥

(৮) পৈরানের—পরিধানের।

(৯) তোলাইতে—তৌলাইতে, পরিমাণ করিতে।

(১০) নিবৃর্ত্তে—নিমিত্ত।

তথাএ আগমন দেবী হইলা আপনি।
কাঠিয়ালকে বর তবে দিলা নারায়ণী ॥
অপার সম্পদ তোর থাকিব চিরকাল।
রাজা আদি প্রজাগণের আর নাহি ভাল।
এ বলিয়া মহামায়া হইলা অন্তধ্যান (অন্তর্দ্ধান)।
রাজার বৃত্তান্ত কিছু কর অবধান ॥
দিনে দিনে অলক্ষ্মী যে হইল প্রবেশ।
দাস দাসীগণ রাজার গেল নানা দেশ ॥
গোলার ধান্য রাজার যে চোবা (১১) হই উঠে।
বল বীর্য রাজার যে দিনে দিনে টুটে ॥
তামা কাসা আদি যত তৈজসের বাসন।
চার (১২) প্রায় হৈয়া উঠে কি কৈব কথন ॥
আসরবি টাকা সব সিসা হই রৈল।
দিনে দিনে রাজার যে অমঙ্গল হৈল ॥
রাজার যে পাত্র মিত্র গেল নানা স্থানে।
অন্ন বস্ত্র নাহি মিলে হারাইল জ্ঞান ॥
ভূষণাবতীকে রাজার নাহিক স্মরণ।
অতি দুঃখ পায়ে রাজা কি কৈব কথন ॥ ৮০ ॥
ওথাতে ভূষণাবতী সন্তোষিত মন।
কতুকে আছয়ে কাঠি আলের ভুবন ॥
অপার সম্পদ হৈল লক্ষ্মীর কারণ।
প্রভব না করএ রাজার এ সব লক্ষণ ॥
কাঠিয়াল স্থানে দেবী বলিলা বচন।
পুষ্করণী দিতে আমার ইচ্ছা হইল মন ॥
এত শুনি কাঠিয়াল হস্তযুগ্ম হইআ।
মহাদেবী স্থানে কহে বিনয় করিআ।
সর্ব্বধন মাও তোমার শুন নিবেদন।
যেই মতে ইচ্ছা তোমার কর বিতরণ ॥
কাঠিয়াল বাক্যে দেবী বলে আরবার।
পুষ্করণী দিব আমি মনে কৈল সার ॥
যেবা এক পেরুআ (১৩) মাটি করএ কাটন।
তারে এক পেরুআ কড়ি দিবাম এখন ॥
এগ মত কহি দেয় (দেও) নগরে খবর।
মাটি কাটিতে লোক আনহ সত্বর ॥
দেবীর আজ্ঞায় পাইয়া ঢোলে কাঠি দিল।
মাটি কাটিতে লোক সত্বরে আসিল ॥
ঐখানে যে সুচমুখী রাজার ঠাই বলে।
ঘরে বসি রৈলা রাজা অন্ন নাহি মিলে ॥ ৯০
কাঠিয়ালে পুষ্করণী দেহি শুনিলাম আমি।
সেই পুষ্করণীতে রাজা না যাও কেনে তুমি ॥
যেবা এক পেরুআ মাটি করএ কাটন।
তারে এক পেরুআ কড়ি দিবেক তখন ॥
এক দিন কট যদি পাইয়া বহু কড়ি।
তুমি আমি কত দিন বঞ্চিবারে পারি ॥
এই কথা শুমি রাজা করিলা গমন।
কাঠিয়াল পুরে গিয়া দিলা দরশন ॥
পুষ্করণী উদ্দেশে যাএ মাটি কাটিবারে।
মহাদেবী উঠি বলে অনুচর ওরে ॥
শুন শুন অনুচর আমার বচন।
পুরীর ভিতরে আন এই মহাজন ॥
দেবীবাক্যে অনুচর সত্বরে চলিল।
রাজারে সঙ্গেতে করি পুরীতে আনিল ॥
খেউর (১৪) কর্ম্ম করাউতে বলে পাটেশ্বরী।
তৈল অঙ্গে দিআ স্নান করাও শীঘ্র করি ॥
নাপিত ডাকিআ তান খেউর করাইল।
নারায়ণ বিষ্ণু তৈল অঙ্গেতে মাখাইল ॥
স্নান করিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
নয়া (১৫) পুষ্করণীতে বলি দিবেক এখন ॥ ১০০
কি কর্ম্ম করিল আমি আসিআ এথাতে।
জীবন হারাইলুম মুই না গেলুম দেশেতে ॥
এ বলিয়া মহারাজা ভাবে সর্ব্বদাএ।
ভোজন করিতে রাজা দেবীএ বোলএ।
সুবর্ণ থালাতে অন্ন দেবী দিলা আনি।
ভোজন করিতে তবে বৈসে নৃপমণি ॥
কুশল জিজ্ঞাসে দেবী রাজার গোচরে।
কেমত আছএ রাজা বলহ আমারে ॥

(১১) চোবা—অন্তঃ সার বিহীন।
(১২) চায়—ভগ্ন মৃৎপাত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে 'চার' বলে।
(১৩) পেরুয়া—যাহাতে করিয়া মাটীয়ালেরা মাটী উঠায়।
(১৪) খেউর—ক্ষৌর।
(১৫) নয়া—নূতন।

কেবা জিজ্ঞাসিল কথা রাজা নাহি চিনে।
উত্তর না দিল রাজা ভাবে মনে মনে ॥
উত্তর না পাই দেবী বলেন সত্বর।
তোমা দাসী ভূষণাবতী নাম হয়ে মোর ॥
কাঠিয়াল স্থানে আমা করিলা সমর্পণ।
সুচমুখী সনে তুমি আছএ কেমন ॥
মহাদেবীর বাক্যে রাজাএ শুনিআ।
বলিবারে লাগে রাজা সকরুণ হইআ ॥ ১০৮

লাচারি—করুণ।

কান্দে রাজা হইআ সকরুণ।

তুমি আইলা যেই দিনে, কাঠিয়াল ভুবনে,
অলক্ষ্মী যে প্রবেশ তখন ॥

সুচমুখী আইল যবে, অমঙ্গল হৈল তবে,
কি কহিমু তাহার কথন।
অতি সে দুরাচার, সর্ব্ব অঙ্গে অনাচার,
অমঙ্গল দেখি সর্ব্বক্ষণ ॥

মৎস্য ধুই জল পেলে, সর্ব্বক্ষণ চুল মেলে,
সন্ধ্যাকালে বৈসে ঘর দ্বার।
দাস দাসী দূরে গেল, ধান্য সব চোবা হইল,
পাত্র মিত্র ছাড়িল সকল ॥

শুনিলাম বড় নাম, কড়ি দেয় (দেও) অবিশ্রাম,
আসিআছি কড়ি নিবার তরে।
এথ মোর বিঘঠন, হৈল দেবের অকারণ,
সর্ব্ব দোষ ক্ষেমহ আমারে ॥

আমা অনুগ্রহ করি, চলহ আপনা পুরি,
তুমি দেবী লক্ষ্মী অবতার।
রাজার বচন শুনি, মহাদেবী বলে পুনি,
অবধান করম্ সত্বর ॥

সুচমুখী থাকিতে, না যাইমু দেশেতে,
এই কথা কহিলুম নিশ্চয়ে।
দেবী বোলে মহারাজ, কর গিয়া এই কাজ,
তবে আমি যাইব আলয়ে ॥

শীঘ্র করি যাও পুরী, গর্ত্ত কর গম্ভীর করি,
নীচে কণ্টক করিআ পেক্ষন (ক্ষেপন ?)।
বলিও ওহার (১৬) তরে, ধন পাইয়াছি বহুতর,
থুইতে গর্ত্ত খুন্দিছে (১৭) এখন ॥

গর্ত্তের পারে গেলে তাই (১৮), ঢেকা মারি পেলাই (১৯),
মাটি দিআ রাখিব সর্ব্বথা।
একথা শুনিব যবে, আমিহ চালব তবে,
তোমার ঠাই বলি সব কথা ॥

হিত উপদেশ বাণী, কহিলাম নৃপমণি,
দেশে চল না করিঅ ব্যাজ।
মহাদেবীর বাক্য শুনি, দেশে চলে নৃপমণি,
উপস্থিত হইল পুরীর মাজ ॥

সুচমুখী নাহি জানে, গর্ত্ত খোন্দাএ নির্জ্জনে,
গম্ভীর করি কণ্টন তিল তাতে।
তবে ওহার তরে, বলিলেক নৃপবরে,
ধন রত্ন পাইছি এথাতে ॥

রাজার বচন শুনি, হরসিত হৈয়া পুনি,
গর্ত্তের কাছে চলিলা ত্বরিতে।
দাড়াইল গর্ত্তের পারে, ঢেকা মারি নরেশ্বরে
পেলিলেক গর্ত্তের ভিতরে ॥

মাটি দিয়া বহুতর, হরসিত নৃপবর,
পুনি চলে কাঠিয়াল পুরে।
দেবীর স্থানে আদিঅন্ত, কৈলা সব বৃত্তান্ত,
শুনি দেবী সন্তোষ অপার ॥ ১২০

দোলা কৈলা সাজন, যাইতে দেবী ভুবন,
কাঠিয়াল লাগে কান্দিবারে।
দেবীর চরণে ধরি, কান্দএ বিলাপ করি,
আমা ছাড়ি যাও কথাকারে (২০) ॥

(১৬) ওহার—উহার। (১৭) খুন্দিছে—খনন করিছে।
(১৮) তাই সে। (১৯) পেলাই—ফেলাই।
(২০) কথাকারে—কোথায়।

পাতকী দেখিয়া মরে (মোরে) ছাড়ি যাও নিজ পুরে,
কিরূপে আমি থাকিমু যে ঘরে।

অপরাধ ক্ষেমা করি, থাকহ আমার পুরি,
তুমি বিনে তেজিমু জীবন।
মাও তুমি বিনে আর, কেবা আছে আমার,
দাস রাখ আপনা চরণ॥

কি করিব রাজ্য ধন, স্ত্রীপুত্র পৌর জন,
তুমি বিনে সব বিষজ্ঞান।
তুমি মাও বিনে আর, কি গতি হইবে আমার,
কেবা আছে তোমার সমান॥

তোমা অদর্শনে ঘরে, থাকিমু যে কি প্রকারে,
কেনে মাতা হইলা নিষ্ঠুর।
মহাদেবী বলে বাপ, কেনে ভাব মনস্তাপ,
ধন রত্ন হইছে প্রচুর॥

ক্ষেমা কর ক্রন্দন, থাক আপনা ভুবন,
স্ত্রীপুত্র লইয়া থাক সুখে।
নাহি কোন ভয় ত্রাস, কর তুমি বসবাস,
তোমা প্রশংসিব সর্ব্বলোকে॥

কাঠিয়াল শান্তাইয়া, সর্ব্বজন প্রবোধিয়া,
দেশে দেবী করিলা গমন॥
লক্ষ্মীদেবীর চরণে, রঞ্জিত রামদাস ভণে,
সর্ব্ব দুঃখ কর বিমোচন॥ ১২৭

পয়ার।

দোলাএ চড়িয়া দেবী করিলা গমন।
তুরগে উঠিয়া রাজা চলিলা তখন॥
যখনে ভূষণাবতী রাজ্যে প্রবেশিল।
তখন অলক্ষ্মী ছাড়ি দেশান্তরে গেলে॥
অন্তপুরী গেলা দেবী কতুক যে মন।
সিন্ধুসুতা রাজ ঘরে হৈলা আগমন॥
ভক্তি অনুসারে দেবী পূজয়ে লক্ষ্মীরে।
অধিষ্টান হৈলা মাতা নৃপতি মন্দিরে॥
কমলা গমন দেখি রাজার ভুবন।
পুনর্ব্বার আসিলেক দাস দাসীগণ॥
রাজার যে পাত্র মিত্র সকল আসিল।
পূর্ব্বে যেই মত ছিল সেই মত হইল॥
ভূষণাবতী সঙ্গে রাজা কতুক যে মন।
রাজ কাজ করে রাজা লৈইআ প্রজাগণ॥
লক্ষ্মীর প্রসাদে রাজার দুঃখ যে মোচন।
ষোড়শ উপচারে পূজে ভক্তি কৈরি মন॥ ১৩৫
এই যে লক্ষ্মীর ব্রত করে যেই জন।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়ে দিনে দিন॥
লক্ষ্মী দেবীর ব্রত করে নারীগণ।
অবশ্য যে সিন্ধুসুতা হইবে অধিষ্ঠান॥
ভক্তি করি লক্ষ্মীদেবী পূজে যেই নারী।
অবশ্য লক্ষ্মীএ তার নাহি ছাড়ে বাড়ী॥
পাঞ্চালী শুনএ যেবা ভক্তি করি মন।
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যাএ লক্ষ্মীর কারণ॥
পাঞ্চালী শুনিতে যেবা মনে করে সাধ।
মনস্কাম সিদ্ধি হএ খণ্ডে বিসম্বাদ॥
ভক্তি করি এই পুস্তক পঠে যেই জন।
অন্তকালে যাএ সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
লক্ষ্মীর পাঞ্চালী ভণে রঞ্জিত রামদাস।
চরণে শরণ দেয় (দেও) বলি তব পাশ॥
বসু যুগ সিন্ধু শশী শক পরিমাণ।
কমলার চরিত্র কথা হইল সমাধান॥ ১৪৩

"ইতি লক্ষ্মীদেবীর পাঞ্চালী সমাপ্ত। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মনঃ স্বাক্ষর।"

শ্রীআব্দুল করিম।

"ন'টে গাছটী।"

(আদর্শ গল্প)

সে দিন প্রত্যুষে উঠিয়াই শব্দায়মান বায়সকুলের মধ্যে শঙ্খচিল দেখিয়াছিলাম অথবা গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় ময়লা-ফেলা গাড়ীর বৃদ্ধ বলীবর্দ্দটা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্ব ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক স্মরণ নাই—তবে এ রকম একটা ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকিবে—নহিলে প্রায় দীর্ঘ দ্বাদশ

বর্ষের পর সেদিন সহসা হৃদয় মনোহারী "নিমন্ত্রণ" জুটিল কেন?

দ্বাদশ বৎসর কি সাধারণ সময়! প্রনষ্টভর্ত্তৃকা রমনীর ন্যায় নিমন্ত্রণবঞ্চিত আমি "হার বাজু বালা কেয়ূর কঙ্কণ" দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলাম—সুতরাং বহুকাল পরে প্রিয়, সমাগম লাভ করিয়া এ সকল পুনশ্চ সংগ্রহ করিতে আমায় যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বিষম বিপাকে না পড়িলে কাহাকেও বোধ হয় তাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না।

যাহা হউক আতপতাপিত নিবিড় মধ্যাহ্নে অভিসার-যাত্রা করিয়া যখন বহুবাঞ্ছিত প্রিয়তমের শশধরলাঞ্ছন রূপ-জ্যোতি নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু হায় বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে জানিত!

নাসিকারঞ্জন, জিহ্বাসিক্তকারী আহার্য্যসম্মুখে উপ-বেশন করিয়াই প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল চনকসংযুক্ত সুকোমল শাকের উপর। পার্শ্বস্থ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি শাক" "ন'টে"। ন'টে!! সেই ন'টে যাহার করুণ মুণ্ডনকাহিনী সেকালের—সেই পিতামহীদের কালের সকল সম্ভব অসম্ভব উপকথা—রাজপুত্র রাজকন্যা, সোণার কাঠি রূপার কাঠি বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর সঙ্গে চিরদিনের জন্য বিজড়িত হইয়া গেছে!

আমার দৃষ্টির সম্মুখে অপূর্ব্ব ছায়ালোক উদ্ভাসিত হইল কত রাজা কত রাজপুত্র কত রাজকন্যা কত সুয়োরাণী দুয়োরাণী কত শুক কত সারিকা কত ঘনশ্যাম বরষার উদ্বেলিত সৌন্দর্য্যোৎসব কত তরুরাজিসমাকীর্ণ কাননমধ্যে অপূর্ব্ব মৃগয়া—কত পরীলোক কত সৌরকরপরিম্লানকারিণী যুবতীর নবীন যৌবন ছটা—কত নক্ষত্রলোকবিহারী "পক্ষী-রাজ" তুরগের অপূর্ব্ব বিমানগতি—কত স্ফটিক ভবন, রত্ন-প্রদীপ, মুক্তামালিকা আমার অন্ধপ্রায় নয়নকে চকিত ঝল-সিত করিয়া একে একে মানস-নাট্যশালায় উদ্দামভাবে মায়া অভিনয় করিয়া ফিরিতে লাগিল।

কোথাও দেখিলাম স্ফটিক গঠিত অপূর্ব্ব অট্টালিকা—মধ্যে মধ্যে প্রাচীরগাত্রে সুসজ্জিত সুগ্রথিত বিচিত্র-বর্ণ-রঞ্জিত সমুজ্জ্বল মণিমালিকা—তাহারই নিভৃত সুবাসিত মধুর কক্ষে হীরকখচিত পালঙ্কোপরে—মানবের সুখস্বপ্নের ন্যায়, বিধাতার সৌন্দর্য্য কল্পনার শরীরিণী প্রতিমার ন্যায় সুখশয়ানা অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি—নারীহৃদয়ের সমস্ত প্রেম সমস্ত কোমলতা একত্র ধারণ করিয়া উপযুক্ত গ্রহীতার অভাবে সৃষ্টির আদি হইতে যেন অপেক্ষা করিয়া আছে—কুণ্ডলীকৃত চূর্ণ কুন্তলে প্রেম ক্রীড়া করিতেছে, বিশালায়ত সমুজ্জ্বল নয়নসাগরে অবগাহন করি-তেছে—সমুন্নত হৃদয়ের মোহন মন্দিরে সিংহাসন পাতি-তেছে—কিন্তু হায়; সে লীলা দেখিবার কেহ নাই সে মন্দিরে আত্মসমর্পণ করিবার উপযুক্ত একাগ্র ভক্তের একান্ত অভাব। কোথাও নবীন যৌবনের প্রথম প্রভাতে সহসা জাগ্রত রাজকুমার বায়ুগামী তুরগ ও ক্ষুরধার অসি মাত্র সম্বল করিয়া স্বপ্নদৃষ্টা জীবন-দেবতার অন্বেষণে কম্পিত হৃদয়ে প্রেমের কনককিরণালোকিত পথে দীর্ঘ যাত্রায় বাহির হই-য়াছে—বরষার অবিরল জলধারা তাহার কুঞ্চিত কেশকলাপ ও আলোহিত গণ্ডযুগ বাহিয়া প্রবাহিত হইতেছে—মস্তকের কনক কিরীট সৌদামিনীর নয়নান্ধকারী কিরণছটা হীরক-খচিত বলিয়া বোধ হইতেছে—কোথাও ভীষণ রাক্ষস বীভৎস মুখভঙ্গীতে অরণ্যানী ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে—কোথাও বিদ্যাধরীবধূ মধুর কলগানে মুনিমন মোহিত করিতেছে—রাজপুত্রের কোন দিকে দৃষ্টি নাই—রাজপুত্র সেইখানে চলিয়াছেন যেখানে সুনীল সাগরবক্ষে তাঁহার নলিনীদল-মধ্যগতা প্রিয়তমা অনন্ত বিভায় বিরাজিতা রহিয়াছেন—সূর্য্য যাঁহার জ্যোতিকণা হরণ করিয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠি-তেছে—শুক্তি যাঁহার অশ্রুকণা পান করিয়া গর্ব্বে মুক্তাবলী ধারণ করিতেছে!

কোথাও একাকিনী মলিন সুন্দরী দিবাবসানে দৈত্যের আগমন-আশঙ্কায় পাণ্ডুরাধরা হইয়া উঠিতেছেন—ভীষণ দৈত্য সৌন্দর্য্যের চরণতলে প্রাণটুকু রাখিয়া গিয়াছে—কিন্তু সেই স্ফটিকান্তর্গত প্রাণ হরণ করিয়া কে তাঁহাকে দৈত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করিবে?

কোথাও নিষ্ঠুর দৈত্য রূপসীর প্রণয়লাভে হতাশ হইয়া যুবতীর প্রতি অঙ্গে কঠোর হিংসার ন্যায় লৌহসুচী বিদ্ধ করিয়াছে—তবু রমণীর অপরূপ লাবণ্য-জ্যোতি ম্লান হয় নাই, মৃণাল কণ্টকিত নলিনীর ন্যায় সে এই সুভীষণ দৈত্য-মন্দিরেও আপনার অনুরক্ত ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে। যুবক একটী একটী করিয়া সূচী তুলিয়া দিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুজলে ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া তথায় চুম্বনের কোমল প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছে—কিন্তু

যুবক সাবধান, ওই গভীর তরঙ্গ কল্লোলের ন্যায় অদূরে দৈত্য গর্জ্জন শুনা যাইতেছে।

রাজা মৃগয়ায় নির্গত হইয়াছেন—সুন্দর গ্রীবাভঙ্গীতে রাজার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লঘুপদে শোভনমূর্ত্তি হরিণশিশু কদম্বকানন অতিক্রম করিয়া পলাশবনে প্রবেশ করিতেছে বিততকার্ম্মুক দৃঢ়লক্ষ্য রাজা বায়ুবেগে পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন—কিন্তু এ কি হইল? সমাকৃষ্ট বিশাল কার্ম্মুক দৃঢ়হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল কেন? রাজার রোষ-প্রদীপ্ত কুঞ্চিত নেত্র বিস্ময়বিস্ফারিত হইয়া উঠিল কেন? সুরভিত বকুলকুঞ্জ রূপালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাজার দৃষ্টি-পথ অবরোধ করতঃ মুকুলিত মাধবীলতাবিতানে অন্ধযষ্টি স্থাপন করিয়া কে ওই রমণী? বনদেবী কি?

রাজা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রূপসীর সুলোহিত চরণতলে প্রেমাক্ত হৃদয় উপহার দিলেন। দেবী সস্মিত মুখে ভক্তের সাদর উপহার গ্রহণ করিয়া ভক্তকে চরিতার্থ করিলেন।

কিন্তু এ কি হইল? নবীনা মহিষী অন্তঃপুরে শুভাগমন করার পর হইতে হস্তীশালে হস্তী মরে কেন? অশ্বশালে অশ্ব লীলাসম্বরণ করে কেন? আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য! মৃত হস্তী মৃত অশ্বের কয় খণ্ড অস্থি মাত্র থাকে কেন? মাংস তাহার কোথায় যায়?

জ্যোৎস্নাপুলকিত ফুল্ল যামিনী! মধুর মলয় সঞ্চালিত বকুলসুরভি নীলাকাশ পূর্ণ করিয়া ভক্ত হৃদয়ের প্রার্থনার ন্যায় ভগবানের চরণতলে সমুত্থিত হইতেছে। অপূর্ব্ব মুখবেদনায় সচকিত রাজা শয্যাতলে উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু কই তাঁহার জীবনের আলোক প্রিয়তমা মহিষী কই?

মন্দুরা হইতে শঙ্কিত অশ্বের তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি শান্ত রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করে কেন? পলায়মান হস্তীযুথের গভীর পদশব্দে হস্তিশালা কম্পিত হয় কেন?

ফুল্ল জ্যোৎস্নালোকে সমুত্থিত রাজা কি দেখিলেন? সর্ব্বনাশ! এই আমার মহিষী!!

নবীন বসন্তের স্নিগ্ধ অরুণালোকে সুরভিত বকুলের সুচিক্কণ ফুলমালা করে উদ্যানদ্বারে দাঁড়াইয়া কে তুমি কিশোরি? মধুর বদনে চিন্তার কুটিল রেখা, বিশাললোচনে আশঙ্কার ঘনান্ধ ছায়া, কোমল হৃদয়ে দ্রুত স্পন্দন কাহার আশায় জীবনের সকল বাসনা সব সুখদুঃখ সমস্ত নারী-হৃদয়ের উদ্বেলিত প্রেম একে একে মালায় গাঁথিয়া নীরব-বেদনার অপেক্ষা করিয়া আছে? সময়ে উপযুক্ত পাত্র জুটে নাই—বিষম অপরাধ!—রাজা আদেশ করিয়াছেন যাহাকে সম্মুখে দেখিবে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবে।

ম্লানমুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল কি? উদ্বেলিত হৃদয় বেগী করিয়া কাঁপিয়া উঠিল কি? উদ্যানদুয়ারে আনত-মুখে কে প্রবেশ করিতেছে? সুগৌর স্নিগ্ধকান্তি—বিশাল ললাটে মহত্ত্বের উদার শোভা প্রশান্তনেত্রে প্রতিভার প্রদীপ্ত জ্যোতি—এবং সংযত প্রেমের মোহন বিভা—রাজকুমারি, তোমার পতিভাগ্য শোচনীয় নহে। কিন্তু এ কি হইল, রাজকুমারি? মাল্যে কি কণ্টক ছিল? তোমার হীরকখচিত অঙ্গুরীয়ে কি প্রাণঘাতী হলাহল ছিল? ব্রহ্মচারীর প্রদীপ্ত বদনশোভা এমন ম্লান হইল কেন? সুগৌর বদনতলে নীলিমা সঞ্চারিত হইল কেন? হায় রাজকুমারি! মাল্যমধ্যে অতি সূক্ষ্ম সর্পশিশু তোমার মূর্ত্তিমান দুরদৃষ্টের ন্যায় অদৃশ্যে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু কি কর কি কর কুমারি, তোমার ওই ফুলসম সুকুমার তনু হুতাশনে সমর্পণ করিও না—না না এ দৃশ্য আমি দেখিতে পারিব না—তোমার জীবন রক্ষা করিবই!

কিন্তু এ কি? বিপুল জনতা আমার চারিদিক ঘিরিয়া জাগ্রত কৌতুকে আমার মুখের দিকে বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া আছে। আমি বন্ধুবরের গলদেশ প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়াছি—বন্ধুবর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আপনাকে আমার কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছেন না—যাতনায় তাঁহার মুখ নীলিম হইয়া উঠিতেছে! শয্যাতলে রসনাতর্পণ সুমধুর খাদ্যরাশি পদদলিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ডাক্তার বাবু stethoscope হস্তে ত্রস্তভাবে আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং কোথায় stethoscope বসাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া উঠিতেছেন।

সংজ্ঞালাভ করিয়াই আমি পরিক্লিশ্যমান বন্ধুবরকে মুক্তি দান করিলাম এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য সকৌতুকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ডাক্তার বাবু এতক্ষণে একটু সুযোগ পাইয়া ব্যস্তভাবে আমার চারিদিক হইতে ভীড় সরাইয়া দিলেন। এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন "উহাকে শোয়াইয়া দাও—শোয়াইয়া দাও—এতক্ষণে fit টা গিয়াছে।" আমি আপত্তি

করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আমার ক্ষীণ আপত্তিতে কেহই কর্ণপাত করিল না—ধরাধরি করিয়া আমায় শয্যাশায়ী করিল। তখন ডাক্তার বাবু বীরদর্পে আমার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বহু গবেষণা ও বহু পরীক্ষায় স্থির হইল যে, উদরে অতিরিক্ত কৃমি সঞ্চয় জন্য উৎকৃষ্ট আহার্য্যদর্শনে এইরূপ আক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন "যাহা হউক আর কোন চিন্তা নাই—santonine দিয়া একটা castor oil emulsion তৈরি করিয়া দিতেছি, তাহা খাইলেই সব উপসর্গ সারিয়া যাইবে। যাহা হউক আমি যতক্ষণ না ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসি ততক্ষণ ইহাকে উঠিতে দিও না। নহিলে আবার fit হইবার সম্ভাবনা। আমি প্রমাদ গণিলাম। হা অদৃষ্ট! castor oil emulsion কোথায় লুচি মিষ্টান্ন কোথায় castor oil! বিধাতার নির্ব্বন্ধ!

আমি বিষম আপত্তি উপস্থিত করিলাম। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। "আবার fit হইল! fit হইল বলিয়া সকলে আমায় প্রাণপণে চাপিয়া ধরিল। আমি হতাশ হইলাম। এমন সময় ডাক্তার বাবু ত্রস্তপদে উপস্থিত হইয়া সবলে আমার মুখব্যাদান করিয়া গলমধ্যে ounce খানেক castor oil emulsion সজোরে ঢালিয়া দিলেন।

* * * * *

যাহা হউক ডাক্তার বাবুকে ধন্যবাদ। castor oil সেবনে কৃমিবংশের বিনাশ সাধিত হউক বা না হউক—অসংযত ভাবোচ্ছ্বাস বহু পরিমাণে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

শ্রীঅপ্রকট চন্দ্র ভাস্কর—অমরাবতী।

মধ্য এসিয়ার ইতিবৃত্ত।

কুতেবার আগমনে মধ্য এসিয়ায় মুসলমানবিজয়ের ইতিহাসে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মার্ভনগরে রাজধানি প্রতিষ্ঠিত করিয়া আরবেরা খোরাসান প্রদেশ বহুকাল যাবৎ শাসন করিতেছিলেন বটে কিন্তু অক্সু নদীর পরপারস্থিত প্রদেশ সমূহে তাঁহাদের ক্ষমতা কিছুই ছিল না। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা বোখারা এবং ট্রান্স্অক্সিয়ানা (অর্থাৎ অক্সু নদীর পরপারস্থিত ভূভাগ) প্রদেশে যে কয়েকবার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য লুণ্ঠন ব্যতিরেকে আর কিছুই ছিল না এবং তাঁহাদের সৈন্য সকল চলিয়া আসিলে তাঁহাদের ক্ষমতার চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান থাকিত না। আরব সেনাপতিদিগের মধ্যে কুতেবাই অক্সু ও জাক্জারটিস্ নদীদ্বয়ের প্রদেশবাসীদিগকে কালিফের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়া ইস্লাম ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন করেন। তখন এই স্থানে জোরোওয়েস্টার ধর্ম্মের প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল।

খৃঃ ৭০৫ অব্দে কালিফ আব্দেল সেলিফ স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার পুত্র উলিদ কালিফ-পদ প্রাপ্ত হন। এই বৎসরে কুতেবাইবন মুস্লিম্ খোরাসানের শাসনকর্ত্তা হইয়া মার্ভনগরে মহাসমারোহের সহিত গমন করেন। মার্ভনগরে উপস্থিত হইয়া কুতেবা তদ্দেশবাসিগণকে সমবেত করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারার্থ ধর্ম্মযুদ্ধে নিযুক্ত হইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। সমরাকাঙ্ক্ষী আরবগণ এইরূপে উৎসাহিত হইয়া দলে দলে যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং কুতেবা অতি শীঘ্র এক বিপুল সেনাদলের কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। যোদ্ধ বর্গের পরিবারগণের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রদান করা হইল। বিশ্বাসী প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কুতেবা মরুভূমির মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মরুভূমি অতিক্রম করিয়া কুতেবা টালিকান্ নগরে উপনীত হইলে তথাকার নগরাধিপতি (ডিহাকান) এবং বাল্খ্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অক্সুনদী পার হন। নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলে সাগানিয়ান্ প্রদেশের রাজা বহু উপঢৌকন সমেত কুতেবার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজধানীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কুতেবা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কালিফের অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারূপে দেশশাসন করিতে অনুমতি দেন। তৎপরে কুতেবা আখ্রুন ও সুমান্ অভিমুখে গমন করেন। তথায় রাজস্ব ও উপঢৌকনাদি আদায় করিয়া পুনরায় মার্ভ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, কুতেবা অক্সু নদী পার হইয়া, বাল্খ্ নগরে গমন করেন এবং তথাকার যে সকল নগরবাসিগণ তাঁহাকে ক্ষমতাহীন করিবার জন্য বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদিগকে দমন করেন। খৃঃ ৭০৫ অব্দে কুতেবা বাদ্ঘিস্ প্রদেশের কর্ত্তা (টারখুন) নিজেকের

সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন এবং পরবর্ষে ট্রান্স অক্সিয়ানা আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করেন। তথায় যাইবার পথে তিনি মার্ভএররুদ্, আমুল এবং জামিন্ নগরত্রয় অতিক্রম করিয়া যান এবং অক্ষুনদী পার হইয়া বেকাণ্ড নগরে শিবি সন্নিবেশিত করেন। ঐতিহাসিক তবরির মতে, এইস্থান (বেকাণ্ড) বোখারা রাজ্যের প্রধান নগর এবং অক্ষু নদীর অতি নিকটবর্ত্তী ও মরুভূমির সীমান্তে অবস্থিত থাকায় ব্যবসাবাণিজ্যের একরূপ কেন্দ্র ছিল। চতুর্দ্দিকে এই নগরকে সকলে সওদাগরের নগর (city of merchant) বলিয়া জানিত। কুতেবার আগমনসংবাদে নগরবাসীরা আত্মরক্ষণের জন্য প্রস্তুত হইয়া সখ্দিয়ানা রাজ্যে সাহায্য প্রাপ্ত হইবার জন্য দূত প্রেরণ করে। সাহায্য যথাসময়ে আসিলে কুতেবারের সেনা চতুর্দ্দিকে এক প্রকার অবরুদ্ধ হয়। দুইমাস কাল কুতেবা এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন যে তিনি হাজ্জাজের নিকট কোনরূপ সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন নাই। হাজ্জাজও বিশেষরূপে চিন্তিত হইয়া কুতেবা ও তাঁহার সেনাবর্গের মঙ্গলার্থে সকল মসজিদে প্রার্থনা করিবার জন্য আদেশ দেন। ঐতিহাসিক তবরি বলেন যে কুতেবার গুপ্তচর তণ্ডরকে অর্থলোভে বশীভূত করিবার জন্য বোখারাবাসী চেষ্টা পায় এবং তাহার দ্বারা তাহার প্রভুকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুরোধ করাইতে প্রয়াসী হয়। তণ্ডর অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া এই প্রস্তাব তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত করিলে কুতেবা তাঁহার সিয়া নামক একজন ক্রীতদাসকে তণ্ডরের মস্তক ছেদন করিবার জন্য আজ্ঞা দেন। তণ্ডর এইরূপে নিহত হইলে কুতেবা তাঁহার সহচর পিরার ইবন হসন্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তণ্ডরের হত্যার বিষয় আপনি ও আমি ব্যতীত কেহ জানে না। যদ্যপি এই সংবাদ কোনরূপে প্রকাশ পায় তাহা হইলে অবশ্য লোকে আপনাকে দোষ দিবে, অতএব এ বিষয় যাহাতে গোপন থাকে তাহা করুন; যদ্যপি লোকেরা এ বিষয় অবগত হয় তাহা হইলে তাহাদিগের অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইবার সম্ভাবনা", তৎপরে কুতেবা তাঁহার অনুচরবর্গকে তাঁহার সমীপে আহ্বান করিলেন। তণ্ডরের মৃত দেহ পতিত দেখিয়া তাহারা বিহ্বলচিত্ত হইল এবং ভূলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কুতেবা তাহাদিগকে এতাদৃশ ভীত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে তণ্ডর একজন প্রকৃত মুসলমান। কুতেবা প্রত্যুত্তরে বলিলেন "না সে একজন বিশ্বাসঘাতক। ঈশ্বর তাহার পাপের যথোচিত শাস্তি বিধান করিয়াছেন এবং সে তাহার নিজ কর্ম্মের ফল ভাগী হইয়াছে।" এইরূপ বাক্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া কুতেবা পরদিন তাহাদিগকে ঘোরতর যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ দেন।

পরদিন আরবগণ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত রণরঙ্গে মাতিল। কুতেবা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যোদ্ধৃবর্গকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ হয় এবং পরিশেষে বোখারাবাসিগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। আরবগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বহু সহস্র লোককে হত এবং বন্দী করে। সামান্য কয়েকজন মাত্র বেয়াস্ত নগরে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল। কুতেবা ত্বরিত পদে আসিয়া বেকাণ্ড অবরোধ করিলেন, নারাখী ঐতিহাসিকের মতে মুসলমান সৈন্যগণ ৫০ দিন নগর অবরোধ করিয়াও জয় লাভ করিতে পারে নাই। বরং তাঁহাদের বহুসংখ্যক অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া যায়। কিন্তু পরিশেষে সংগ্রামে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহারা কৌশলে নগর অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা পায়। নগরপ্রাচীরের সন্নিকটে এবং দুর্গের নিম্নে তাহারা একটি পরিখা খনন করিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে একটি পশুশালার সহিত সংযোগ স্থাপন করিলে পর কতকগুলি সৈন্য এই পথ দিয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে। দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া মুসলমান সৈন্যগণ দুর্গের প্রাচীরের কতক অংশ ধ্বংশ করিলে অবরোধকারিগণ তদ্দ্বারা প্রবেশ লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হয় এবং তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। যিনি প্রথম দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবেন তাহাকে এবং তাহার পরিবারগণকে যাবজ্জীবন অর্থ সাহায্য করিবেন কুতেবা এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলে সৈন্যেরা দলে দলে দুর্গ আক্রমণ করে এবং পরিশেষে দুর্গ অধিকার করে। বেকাণ্ডনগরবাসীগণ বশ্যতা স্বীকার করিলে পর কুতেবা তথায় একজন প্রতিনিধি এবং একদল সৈন্য রাখিয়া নগর ত্যাগ করেন। বেকাণ্ড হইতে খুনবুনে উপস্থিত হইলে কুতেবা তথাকার অধিবাসীগণের বিদ্রোহের সংবাদ পান এবং পুনরায় বেকাণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হন। নগর পুনরায় অবরুদ্ধ হইল এবং একমাসকাল

অবরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া বেকাণ্ডবাসীরা বশ্যতা স্বীকার করিবার প্রস্তাব করে কিন্তু কুতেবা সদলে দুর্গ আক্রমণ করেন। নগর অধিকার করিয়া কুতেবা যোদ্ধৃপুরুষগণকে নিহত করেন অবশিষ্ট নগরবাসিগণকে ক্রীতদাসরূপে মার্ভনগরে প্রেরণ করেন এবং নগরটিকে সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠন করিয়া মার্ভ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বেকাণ্ড নগর কেবলমাত্র ধ্বংশাবশিষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। তবরি বলেন যে বেকাণ্ড নগর লুণ্ঠন করিয়া কুতেবা যে সামগ্রী মার্ভে লইয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা খোরাসান লুণ্ঠন দ্রব্য অপেক্ষাও অত্যধিক।

পূর্ণ ধ্বংসাবশেষ বেকাণ্ড নগরের কিরূপে পুনরায় উদ্ধার সাধন হয় তাহার ইতিহাস অতি মনোরম। যৎকালে কুতেবা নগর অবরুদ্ধ করেন তৎকালে বেকাণ্ডের বহু ব্যবসায়ী চীন এবং অন্যান্য অধিবাসী দূরবর্ত্তী প্রদেশে অনুপস্থিত ছিল। পুনরায় স্বদেশে আসিয়া তাহারা আপন স্ত্রীপুত্রপরিবারগণকে মুসলমানদিগের নিকট হইতে পুনঃ প্রাপ্ত হয় এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুনরায় বেকাণ্ড নগরকে উদ্ধার করে। ঐতিহাসিক নরসখির মতে বেকাণ্ডের পুনঃসৃষ্টির ন্যায় অপর একটি দৃষ্টান্ত আর নাই। এ যুগের মধ্যেই বেকাণ্ড পুনরায় তাহার পূর্ব্ব শ্রীলাভ করিতে সক্ষম হয়। কুতেবাকে বাৎসরিক কর দিতে স্বীকৃত হইলে বেকাণ্ডবাসীরা পুনরায় শান্তিসম্ভোগে আদেশ প্রাপ্ত হয়।

খৃঃ ৭০৫ অব্দে কুতেবা বেকাণ্ড জয় করিয়া মার্ভ নগরে প্রত্যাগমন করেন। পরবৎসর তিনি পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করেন কিন্তু দুইবৎসর কাল যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়াও তিনি খালিফের রাজত্ব মধ্য এসিয়ায় অধিক দূর বিস্তার করিতে পারেন নাই। মার্ভের পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাগণ বোখারা নগর পর্য্যন্ত বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু কুতেবার সময় কালিফের রাজ্য বোখারার সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় নাই।

যাহা হউক বেকাণ্ড ধ্বংস করিয়া কুতেবা ট্রান্স অকসিয়ানায় গমনের পথ বিশেষরূপে প্রশস্ত করিয়া দেন এবং ভবিষ্যতে মধ্য এসিয়া জয় করিবার বহুল সুবিধা করেন। খৃঃ ৭০৬ অব্দে যুদ্ধযাত্রা করিয়া কুতেবা নুমুসকাট এবং রামটিলা জয় করেন। এই দুই প্রদেশ বাৎসরিক কর প্রদানে স্বীকৃত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলে তথায় পুনরায় শান্তি বিরাজ করে। ইত্যবসরে বোখারা মোখ্দিয়ানা এবং উহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশবাসিগণ একত্রিত হইয়া আরবদিগের গতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। সমবেত সৈন্যগণের সংখ্যা ৪০০০০ হাজার এবং মোগদিয়ানা, খুলুক-খুদাং, ভরদান খুদাং এবং চীনসম্রাটের ভাগিনেয় রাজপুত্র কুর মঘানুন্ প্রভৃতির সেনানী দ্বারা পরিপুষ্ট ছিল। যৎকালে কুতেবা মার্ভনগরে ফিরিয়া আসিবার জন্য যাত্রা করেন তৎকালে টার্কসৈন্য আসিয়া তাঁহার সেনানীর পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করে। মুসলমান সৈন্যগণ ভীত হইয়া পলাইবার উপক্রম করিলে কুতেবা তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া উৎসাহিত করেন। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইলে পর টার্কগণ রণে ভঙ্গ দেয়। কুতেবা বাল্খ্ অভিমুখে প্রবাহিত পথ দিয়া এবং টিরমিজ নামক নগরের সন্নিকটে অক্ষুনদী অতিক্রম করিয়া মার্ভনগরে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ফারিয়ার নগরে পৌঁছিলে তিনি হাজ্জাজ কর্ত্তৃক বোখারার রাজা ভারদান্ খুদাতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য আজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। কাজেই তাঁহাকে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। জামিন্ নগরের নিকট অক্ষু নদী পার হইয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার সময় তাঁহার কতকগুলি মোখ্দিয়ান কেস্ ও নমকের (নক্ষত্র) সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বোখারায় প্রবেশ করেন এবং ভারদনের দক্ষিণে নিম্ন খারকানায় শিবির স্থাপন করেন। এখানে আসিয়া টার্করা তাঁহাকে আক্রমণ করে। দুই দিবস এবং দুই রাত্রি যুদ্ধের পর আরো সৈন্য জয়লাভ করে কিন্তু কুতেবা বোখারার রাজা ভারদান খুদাতের সম্মুখীন হইলে পরাজিত হন এবং মার্ভ নগরে পলায়ন করেন। মার্ভে পৌঁছিলে কুতেবা তাঁহার প্রভুকে বোখারার একখানি মানচিত্র পাঠাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত করান। মানচিত্র নিরীক্ষণ করিয়া হাজ্জাজ এই ভাবে কুতেবাকে পত্র লিখিয়াছিলেন; "পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া যাও এবং উহা ত্যাগ করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট শোক প্রকাশ কর; শত্রুদলকে পুনরায় আক্রমণ কর, বেস্, নন্‌ক্ ও ভরদানকে ধ্বংস কর। দেখ যেন তোমাকে শত্রুদলে না ঘিরিয়া ফেলে; পথের বিপদের জন্য আমি দায়ী" এই পত্র পাইয়া কুতেবা পুনরায় খৃঃ ৭০৮ অব্দের

প্রারন্তে বোখারা রাজ্য জয় করিবার জন্য যাত্রা করেন। ভরদান্ খুদাৎ কুতেবার পুনরাগমনের বিষয় শুনিয়া সোখদিয়ানার সাহায্য পাইবার জন্য দূত পাঠান। সাহাবং আসিবার পূর্ব্বেই কুতেবা ভারদানে উপস্থিত হইয়া উহা অবরোধ করেন। সাহায্য উপস্থিত হইলে টার্কেরা সদলে কেল্লা হইতে বহির্গত হইয়া আরবদিগকে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তবরি এবং নরসখি উভয়ের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু তবরির বিবরণ সমধিক মনোহর।

শ্রীসঞ্জীব চন্দ্র সান্যাল।

কবিতাগুচ্ছ।

আমিত্ব লয়।

যামিনী পোহায়ে গেল, ভাঙ্গিল স্বপন,
নিভিল আলেয়া-আলো—গেল মরীচিকা।
পতঙ্গ ঝাঁপায় যথা হেরি অগ্নিশিখা,
হে শিব সুন্দর দেব, করি' দরশন
তোমার ও রূপ-বহ্নি, আমিও তেমন
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম আপনা পাসরি!
হে মোহন, না জানি ত আগুন কেমন
চন্দন লেপন হলো সর্ব্বাঙ্গে আ মরি।
অঙ্গার হইল হীরা, হে পরশমণি,
তোমার ও হিরণ্ময় লাবণ্য পাশে
দেহ কর্ম্মনাশা নদী করি কুলু ধ্বনি
পশিল, পশিল দেব, বিহ্বল হরষে
ক্ষীর জলধির গর্ভে! নীর হল ক্ষীর,
তীব্র রৌদ্রে ডুবে গেল আমিত্ব তিমির!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

গোগা চোহান।

"To every man upon this earth
Death cometh soon or late,
And how can man die better,
Than facing fearful odds,
For the ashes of his fathers,
And the temples of his gods?"

Macaulay.

[গজনীর সুলতান মামুদ যখন ভারত আক্রমণ করিবার জন্য শতদ্রুর তীরে উপস্থিত হন, সেই সময়ে গোগা চোহান নামক জনৈক রাজপুত বীর স্বীয় পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র সহ অশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া পুত্রগণ সহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই কবিতা সেই ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।]

ঘন ঘোর ঘটাচ্ছন্ন নিশীথ গগন,
স্তব্ধ বনস্থলী মাঝে অস্ফুট আরাব;
ধরেছে প্রকৃতি দেবী ভয়ঙ্করী বেশ,
দেখাইতে আপনার যতেক প্রভাব।
শতদ্রুর তীর আজি অন্ধকারময়,
একটি পল্লব তথা নাহি নড়ে আর;
বহে কি না বহে স্রোত বুঝা নাহি যায়,
ব্যাপ্ত ধরাতলে শুধু ঘোর অন্ধকার।
ভীমবেগে প্রভঞ্জন বহিল এবার,
খেলিল দামিনী হাসি, আকাশের কোলে,
নাচি নীরদমালা প্রভঞ্জন সাথে
উজ্জ্বল বিদ্যুৎমালা পরি যেন গলে!
চকিত বিদ্যুতালোকে ক্ষণে দেখা যায়
পঞ্চ চত্বারিংশৎ বীর যোদ্ধা দলে;
অস্ত্র শস্ত্র দৃঢ় চর্ম্মে আচ্ছাদিয়া কায়
চোহান দাঁড়ায়ে আছে তটিনীর কূলে।
বরষিছে বারিধারা আকাশ ভাঙ্গিয়া,
তারি সাথে ক্ষণে ক্ষণে অশনি পতন।
অবিশ্রান্ত বারিধারা ঢালিয়া ঢালিয়া
পথ, ঘাট, মাঠ আদি করেছে মগন।
দূর,—বহুদূর হ'তে সৈন্য কোলাহল
নীরদের গরজন সহিত মিশিয়া,
ক্ষণে ক্ষণে মহাসিন্ধু কলধ্বনি সম
উন্মত্ত সে বায়ুসনে আসিছে ভাসিয়া।
শুনিল যুবকবৃন্দ সেই কোলাহল,
নাচিল সে আর্য্য রক্ত ধমনী ভিতরে;—
সদর্পেতে কোষমুক্ত করি তরবার
দেখাবে ভারতবীর্য্য অবনী মাঝারে!
নিষ্কোষিত তরবার ধরি দৃঢ় ভাবে
উল্কাপ্রায় যুবাগণ ধাইল সকলে,—
হানিতে লাগিল সবে প্রচণ্ড আঘাত,
পড়িল যবন তাহে কত দলে দলে।
মুহূর্ত্তেকে আরম্ভিল তুমুল সংগ্রাম,
অস্ত্রের ঝঞ্জনা রবে পূরিল মেদিনী,—
বরষার বারিধারা সহিত মিলিয়া
বহিল রক্তের নদী রঞ্জিয়া অবনী!
পিশাচের মত যুঝি শতেক যবন
ঘেরিল যুবকবৃন্দে বিকট উল্লাসে;
নিশ্চয় মরণ জানি যুঝি হিন্দুগণ
একে একে মৃত্যুমুখে পড়ে অবশেষে।
স্বদেশ রক্ষার তরে করি প্রাণপণ
নারিলে রক্ষিতে তায় তোমরা হে বীর,
চিরদুঃখী ভারতের নিয়তি লিখন,—
কে কবে খণ্ডন করে লিখন বিধির।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মিত্র।

৭ম ভাগ। ফাল্গুন, ১৩১১। ১১শ সংখ্যা।

কুন্তলা।

দশম পরিচ্ছেদ।

কালীপ্রসাদের বৃহৎ বৈঠকখানার পার্শ্বে এক অতি সুন্দর প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠ অতি সুন্দর সাজে সজ্জিত। সে সাজ সজ্জা কুন্তলা নিজে করিয়াছে। কুন্তলা বিলাসী শ্রেষ্ঠীর কন্যা। কুন্তলার পিতা সৌখীন—কুন্তলা স্বয়ং সৌন্দর্য্যের অনুরাগিনী। কুন্তলা নিজের ব্যয়ে সজ্জার সামগ্রী আনাইয়া, স্বামীর কক্ষ সাজাইয়া দিয়াছে। কক্ষের দেয়ালে বড় বড় ভাল ভাল আয়না—নীচে কার্পেটের উপর ভেলভেটমণ্ডিত বিবিধ প্রকারের চেয়ার, সোফা। মধ্যে এক সুন্দর টেবিল। চারি কোণে কর্ণার টেবিল। এক পার্শ্বে চারিটি বৃহৎ কাচের আলমায়রা। আলমায়রাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বহু গ্রন্থ সংগৃহীত। এই ঘরে বসিয়া কালীপ্রসাদ কুন্তলার সহিত একত্রে অধ্যয়ন করেন অথবা অধ্যয়নের ছলে প্রেম আলাপনে বিভোর হইয়া, দ্রুতগামী সুখ-রজনী অতিবাহিত করেন।

কালীপ্রসাদ এই কক্ষে একাকী চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত। সম্মুখস্থ টেবিলের উপর একখানি খোলা পুস্তক আশা করিয়া কালীপ্রসাদের মুখ চাহিয়া আছে। কালীপ্রসাদ অনেক ক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া, পুস্তকের পত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন। একটু পরে তাঁহার চক্ষু পুস্তকের পত্র ছাড়িয়া বাহিরে যাইল। কালীপ্রসাদ উঠিলেন। বাহিরে যাইয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। বাহির ভাল লাগিল না। গৃহের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। চেয়ারে বসিলেন—পুনরায় পুস্তক হাতে লইয়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুস্তকের প্রতি পত্রে—প্রতি ছত্রে বিষের বায়ু বহিতে লাগিল।

আবার উঠিলেন—আবার বাহির হইলেন। একটু দ্রুতপদে বেড়াইতে লাগিলেন। আবার শোকভরে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। টেবিলের উপর মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল নীরবে রহিয়া, আপন মনে কহিয়া উঠিলেন "আমি যাইতে না দিলে, কাহার সাধ্য কুন্তলাকে পাঠায়? কাহার ক্ষমতা কুন্তলাকে লইয়া যায়?"

কুন্তলা অতি ধীরে অতি নীরবে আসিয়া কালীপ্রসাদের পৃষ্ঠে হাত দিয়া দাঁড়াইল।

কালীপ্রসাদ চমকিত হইয়া চাহিলেন। দেখিলেন পার্শ্বে দেবী মূর্ত্তি কঠোর ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। একি কুন্তলা! কুন্তলার আজি এ মূর্ত্তি—এ ভাব কেন? সে হাস্যময়ী, আনন্দময়ী, মনমোহিনী মূর্ত্তি আজি কোথায় লুকাইল?

কালীপ্রসাদের মনে পৌরাণিক কাহিনী জাগিয়া উঠিল। দক্ষালয়ে গমনের জন্য সতীর শিব-সম্মুখে সমাগমের কথা মনে পড়িল। কালীপ্রসাদের প্রাণটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল।

কুন্তলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "উঠ; বাড়ীর ভিতর চল।"

কালীপ্রসাদ কম্পিত স্বরে কহিলেন "কিছু দিন আর বাড়ীর মধ্যে যাইব না—ক্ষণকাল পরে আবার ভগ্নস্বরে কহিলেন "যত দিন আবার তুমি না ফিরিয়া আইস।"

কুন্তলা মৃদু হাসি হাসিয়া কহিল "আমি আর ফিরিব না। আমি মরিতে যাইতেছি।"

কালীপ্রসাদ দাঁড়াইয়া কুন্তলার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কুন্তলা পতির হস্ত স্বীয় বক্ষে টানিয়া ধরিয়া কহিল "দেখ, আর ছেলেমি করিয়া লোক চলাচলি করিও না। এক্ষণে মা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন। আমি এ সময়ে না যাইলে বাড়ীতে বাপ মার কত কষ্ট হইবে। তুমি আর বারবার বাধা দিও না। তোমার স্পর্শ করিয়া বলিয়া যাইতেছি, আমি অতি সত্বরই ফিরিয়া আসিব। কোন বাধা বিঘ্ন মানিব না।"

কুন্তলার বদন এত গম্ভীর কালীপ্রসাদ পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। কুন্তলার মুখের কথা এত কঠোর—তাহার কণ্ঠের স্বর এত দৃঢ়—তাহা কালীপ্রসাদ—অগ্রে জানিতে পারেন নাই।

কালীপ্রসাদ দেখিলেন আর পীড়াপীড়ি করিলে হিতে বিপরীত ঘটিবে। কুন্তলা তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার কথা ঠেলিয়া যাইবে না সত্য; কিন্তু তাহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিবে—তাঁহাকে অতি অসার অপদার্থ মনে করিবে। কালীপ্রসাদ হতাশ নয়নে চাহিয়া কহিলেন "তবে যাও। যদি আমি না যাইতে পারি, তবে শীঘ্র আসিও।"

কুন্তলা তাঁহাকে যাইতে অনুরোধ করিল না। কুন্তলা দেখিতে চায়—বুঝিতে চায়—প্রণয়ী পতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার অনুসন্ধান করেন কি না।

কুন্তলা আর কিছু কহিল না। কালীপ্রসাদের শেষ কথা কয়টির মধ্যে 'যদি আমি না যাইতে পারি' শব্দগুলি বিষকণ্টকের ন্যায় তাহার কর্ণে বাজিতে লাগিল। পতি-সোহাগিনী কুন্তলার মনে হইল—'আমি যাইতেছি' তাহাতে কথা হইল 'যদি আমি না যাইতে পারি' এই কি প্রাণের কথা! কুন্তলা বালিকা—কুন্তলা বুদ্ধিমতী হইলেও সংসারের ব্যবহারে, মনুষ্যের মানসিক ব্যাপারে তাহার অভিজ্ঞতা অতি অল্প। বালিকা অতি মানিনী—বালিকা মান ভরে, উড্ডীয়মান গভীর মেঘখণ্ডের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। আর বেশী কথা কিছু কহিল না কহিতে পারিল না।

কালীপ্রসাদ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। কুন্তলা যে তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া, তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিল ইহাতে কালীপ্রসাদ অবাক হইলেন। কালীপ্রসাদের প্রাণেও ঘোর অভিমান-উচ্ছ্বাস উত্থিত হইল।

অভিমানের অতিবাদানলে কালীপ্রসাদ বুঝিলেন—কুন্তলা ধীরা নহে—চঞ্চলা কুন্তলা তাঁহা অপেক্ষা তাহার পিত্রালয় অধিক ভালবাসে। হায় রে প্রণয়! তোমার মহিমার মোহে বিজ্ঞ বুদ্ধিমান অন্ধ হয়—বৃদ্ধ বালক হইয়া পড়ে! কালীপ্রসাদ কোন ছার!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে আঘাত—সকল আঘাত অপেক্ষা প্রাণঘাতী। সে আঘাতের উপর ঈর্ষাজনিত অভিমান বড় মারাত্মক সামগ্রী।

কালীপ্রসাদ কুন্তলার গমনের প্রথম দিনে শয্যাগত হইলেন। পরদিন অভিমানজনিত ক্রোধভরে উঠিয়া বসিলেন। তৃতীয় দিন কলের পুতুলের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেন কি জন্য তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এখন দুর্জ্জয় অভিমানের স্থানে, কালীপ্রসাদের প্রাণে দারুণ ক্রোধাবেগ উপস্থিত হইয়াছে।

এইরূপে কয়েক দিন কাটিলে শ্বশুরালয় হইতে বিবাহ উপলক্ষে কালীপ্রসাদকে লইতে আসিল। কালীপ্রসাদ শ্বশুরের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠ করিলেন। কৈ আর পত্র কৈ?

কুন্তলা একখানি পত্র লিখিতেও সময় পাই নাই? ছি ছি কুন্তলা কেমন করিয়া একবারে সমুদয় ভুলিয়াছে! অন্ধ-প্রণয়ী যুবক সত্যই পাগল। মহাকবি সেক্ষপীয় সত্যই বলিয়াছেন:—

"Lovers and madmen have such seething brains,
Such shaping fantasies, that apprehend
More than cool reason ever comprehends."

কালীপ্রসাদকে শ্বশুরালয়ের পত্র পাঠ করিতে দেখিয়া তাঁহার মাতা আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন। মাতা কহিলেন "কালীপ্রসাদ! বেহাই বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন তোমাকে সকল দেখিতে শুনিতে হইবে। আর বিলম্ব করিও না। অদ্যই চলিয়া যাও।"

কালীপ্রসাদ গম্ভীর স্বরে কহিলেন "আমি যাইতে পারিব না, মা! আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাতার উত্তর অপেক্ষা না করিয়া কালী-প্রসাদ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মাতা জানিতেন শান্ত-শিষ্ট কালীপ্রসাদ সহজে রাগিবার নহে, টলিবার নহে। কিন্তু যদি কোন কারণে একবার বিচলিত হয়, তবে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করা অতি কঠিন, প্রায় অসাধ্য কার্য্য!

মাতা আর কথা না কহিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণ বদনে প্রস্থান করিলেন।

কালীপ্রসাদ আসিয়া বাহিরের কক্ষে বসিলেন। বসিয়া দেখিলেন প্রাণের মধ্যে সেই মুখখানি—সেই ছবিটুকু—সেই কুন্তলা। দেখিলেন সেই কুন্তলা যেন এই কুন্তলা নহে। এ ছবি আর সে ছবিতে যেন অনেক প্রভেদ। কালীপ্রসাদ মনের দর্পণে দেখিতে দেখিতে মনে মনে কহিলেন—এই তো কুন্তলা—এই তো কুন্তলার প্রণয়—এই তো কুন্তলার আমার প্রতি মমতা! হায়রে ভ্রম—মোহ! তোমার ছলনার তীব্র শর কি জগতের কোন পদার্থই অতিক্রম করিতে পারে না।

কালীপ্রসাদ এখানে যাহা ভাবিতেছেন, কুন্তলা পিত্রালয়ে একাকিনী কক্ষে বসিয়া—স্বামীর আশায় নিরাশ হইয়া সেই একই ভাব ভাবিতেছিল—কুন্তলাও ভাবিতেছিল—'এই তো পতির প্রণয়! পতির আমার আদর আবদারের এই তো মূল্য!' বিবাহবন্ধন কুন্তলার পক্ষে এখন বিষ-শয্যায় পরিণত হইয়াছে। পাখী হইলে পাখা পাইলে, কুন্তলা এই মুহূর্ত্তেই হরদিয়ার সেই লাইব্রেরী-গৃহে উড়িয়া আসিতে প্রস্তুত। কুন্তলা কি ইচ্ছা করিলে—চেষ্টা করিলে সত্বর আসিতে পারে না? পারে বৈ কি! কিন্তু চক্ষুলজ্জা—প্রাণের অভিমান তাহার প্রত্যাগমন-পথে তীক্ষ্ণ কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হায়রে অভিমান! তোর পরাক্রমে নিমেষে সুধায় গরল উত্থিত হয়।

তরুণমতি কালীপ্রসাদ মনের আবেগে কহিলেন "প্রকৃত প্রণয় সংসারে ভোজের বাজী। এই তো তাহার পরিণাম! এ কোন্ সুখ-আশা করিয়া আগুনের মালা গলায় পরা! এখন উপায় কি? কি করিয়া এ জীবন কাটাই—কি করিয়া প্রাণের বোঝা বহন করি?"

এই বলিয়া কালীপ্রসাদ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

বাহিরে কাশী রায় আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। কাশী-রায়, কালী প্রসাদের অসুখ-কথা শুনিল। কাশী রায়, তাঁহার অবস্থা ব্যবস্থা, ভাবভঙ্গী চালচলন—তাঁহার বাটীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তন্ন তন্ন করিয়া, তীক্ষ্ণ চক্ষে দেখিতেছিল। কাশীরায়, কালীপ্রসাদের বর্ত্তমান বিরক্তির ভাব বুঝিয়া লইল। বুঝিয়া ভাবিল, এই উপযুক্ত অবসর—সুযোগ। এই সুযোগের সূত্র ধরিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে।

কাশীরায়, কালীপ্রসাদের সম্মুখে যাইয়া করযোড়ে দাঁড়াইল। কাশীরায়কে দেখিয়া কালীপ্রসাদ একটু বিরক্ত হইলেন। কালীপ্রসাদ স্বভাবতঃ সুশীল বিনীত। তাঁহার মনের বিরক্তির ভাব মুখে কিছুমাত্র প্রকাশিত হইল না।

কালীপ্রসাদ কাশী রায়কে বসিতে কহিলেন। কাশী রায় বসিয়া কহিল "বাবু সাহেব! মাঘী পূর্ণিমা তো আসিয়া পড়িল। এই সময় হরদিয়ায় 'পরব' হয়; এবার একটু সমারোহ করিলে পরবটা জাঁকিয়া উঠে। সামান্য ব্যয়ে পরবটা বেশ আয়ের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়; আর দেশের লোকেরও মনে বিশেষ আনন্দ উৎসাহ জন্মায়।"

কালীপ্রসাদের মনে কথাটা লাগিল। তিনি একটা কিছু সময় কাটাইবার ব্যাপার খুঁজিতেছিলেন। এমন সময়ে কাশী রায়ের এই প্রস্তাব অতি উপাদেয় বলিয়া তাঁহার মনে ধরিল। কালীপ্রসাদ কহিলেন তাহাতে

আমার সম্পূর্ণ মত আছে। হরিকিশোর বাবুকে আনাইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ যুক্তি করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে ভাল হয়।"

কাশী। এ সামান্য কার্য্যের জন্য তাঁহাকে এখন না আনাইয়া, চিঠি পত্রে তাঁহার পরামর্শ লইলে যথেষ্ট হইতে পারে। আর তিনি বাহির হইতে সকল ব্যাপারে সাহায্য ও সকল দ্রব্যের সরবরাহ অনায়াসে করিতে পারিবেন। তাঁহাকে পর্ব্বের সময় আনাইলেই চলিবে।

কালীপ্রসাদের আঁধার-প্রাণে একটু জ্যোৎস্নার আলোক ফুটিল। তিনি কহিলেন "কিরূপভাবে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়?"

কাশীরায়। একটা মেলার আয়োজন করিয়া নাচ গানের বন্দোবস্ত করিলেই চলিতে পারে।

মেলার উল্লেখে কালীপ্রসাদের নবীন জীবন উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "তুমি সকল বিষয়ের ভার লইতে পারিবে?"

কাশীরায় গম্ভীরভাবে কহিল "আপনি মাথার উপর থাকিলে সকল ভার বহিতে পারিব।"

কালীপ্রসাদ সরলভাবে কহিলেন "অর্থ যাহা ব্যয় হইবে, তাহার জন্য কিছুমাত্র ভাবিতে হইবে না। তবে প্রথম আরম্ভে যেন কোনরূপ ত্রুটী না ঘটে।"

কাশী রায় উৎসাহের আনন্দে কহিল "আজ্ঞে, তাহার জন্য কিছুমাত্র ভাবিতে হইবে না। আমি নিজে যাইয়া কলিকাতা হইতে নাচ গানের বাছাই করিয়া বন্দোবস্ত করিব।"

কালীপ্রসাদের বৈরাগ্যগ্রস্ত প্রাণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। উৎসাহভরে কালীপ্রসাদ কহিলেন "তবে সত্বরই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দাও। দিন আর বেশী নাই।"

এই বলিয়া কালীপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাশী রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া কহিল "আহারান্তেই আমিও আসিয়া বন্দোবস্তের পরামর্শ করিব। কাশীনগরের মেলায় আমি যে সার্টিফিকেট পাইয়াছিলাম তাহা দেখিবেন তখন।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরদিয়ায় খুব ধূমধাম পড়িয়া গেল। বিশেষ সমারোহে মাঘী পূর্ণিমার পরবের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। কাশী রায়, আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া, সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

হরিকিশোর পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথার টনক নড়িল। হরিকিশোর এক মাসের ছুটী লইয়া হরদিয়ায় আসিরা উপস্থিত হইলেন; আগুনের সহিত ঝড় মিশিল।

হরিকিশোর কহিলেন "যাহা এদেশে কখন হয় নাই; তাহাই করিতে হইবে। জেলা হইতে জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। যাহাতে একটা উচ্চ উপাধি লাভ ঘটে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।"

হরদিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে বড় বড় আটচালা উঠিল। দেশ বিদেশে সংবাদ প্রেরিত হইল। থরে থরে ভারে ভারে জিনিসপত্র আমদানি হইতে লাগিল। হরদিয়ায় তিল ধারণের স্থান রহিল না। খাবারের দোকান, মণিহারীর দোকান, পোষাকের দোকান, বাসনের দোকান, খেলানার দোকান, কত শত আসিতে লাগিল। যাদুকর, বাজীকর, ভাঁড় কত আসিয়া জুটিল। হরদিয়া টলমল করিতে লাগিল।

মধ্যভাগে এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল। আশে পাশে নহবত বাদ্য বাজিতে লাগিল।

কালীপ্রসাদ অকাতরে হরিকিশোরের হাতে নোটের কেতা দিতে লাগিলেন। হরিকিশোর কাশী রায়কে ঝম ঝম শব্দে টাকা গণিয়া দিতে লাগিলেন। কাশী রায় টাকা ভাঙ্গাইয়া পয়সা বৃষ্টি করিতে লাগিল।

হরিকিশোর 'নাচওয়ালী' 'গানওয়ালা' আনিতে নিজে সাজিলেন। রাত্রির ট্রেণে কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন। নিজে দেখিয়া শুনিয়া বাছিয়া গুছিয়া নর্ত্তকীদল নিজ সঙ্গে লইয়া মহা সমারোহে মেলা বসিবার কয়েক দিন পূর্ব্বেই হরদিয়ায় আসিয়া পৌছিলেন। যাত্রাওয়ালার বায়না দিয়া আসিলেন। স্থানে স্থানে নানাজাতীয় সামান্য সামান্য গ্রাম্য নাচ গান চলিতে লাগিল।

কলিকাতার নর্ত্তকীদল দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইলে, হরিকিশোর কালীপ্রসাদের নিকট যাইয়া কহিলেন "নর্ত্তকীদলকে আর মিছা বসাইয়া রাখিয়া ফল কি? তাহাদের মজুরা আরম্ভ হউক।"

উদাসভাবে কালীপ্রসাদ কহিলেন "হউক" হরিকিশোর কহিলেন 'কোথায় হইবে?"

কালীপ্রসাদ "কেন? প্রতিমার সম্মুখের আটচালায়।"

হরিকিশোর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তাহা হইলে উহাদিগকে 'খেলো' করা হয়। মেলার তিন দিন, সাহেবেরা ও বাবুরা আসিবে সেই সময় সেইখানে উহাদের মজুরা হইবে। এখন কোন গোপনীয় স্থানে যেখানে সাধারণের দৃষ্টি না যায়—এমন স্থানে উহাদের মজুরা হওয়াই উচিত। নতুবা মেলায় জাঁক থাকিবে না।"

কালীপ্রসাদ একটু ভাবিয়া কহিলেন,—"এমন স্থান কোথায়?" হরিকিশোর একটু নীরবে রহিয়া কহিলেন,—"নূতন বাগান বাড়ীতে হয় না?"

কালীপ্রসাদের প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। যে বাগান বাড়ী হৃদয়ের দেবী কুন্তলার ইচ্ছায়-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত—তথায়—সেই প্রাণের পূজার পবিত্র মন্দিরে—সামান্য অপবিত্রা নর্ত্তকীদলের কুৎসিৎ কদর্য্য নর্ত্তন! এও কি সহ্য হয়!

কালীপ্রসাদ মুখ ফিরাইলেন। হরিকিশোর কাশীরায়ের নিকট কুন্তলার গমনের কথা, কালীপ্রসাদের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার কথা সকল শুনিয়াছিলেন।

হরিকিশোর খুব 'তুখোর' লোক। যে তাঁহাকে চিনে, সে ভালরূপেই চিনে। হরিকিশোরের আশীর্ব্বাদ ও পদধূলির গুণে অনেক জেলার অনেক বড় মানুষের সন্তান সত্বরই সম্পদ-সম্ভ্রমের হাত হইতে জন্মের মত মুক্তি লাভ করিয়া, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কালীপ্রসাদ হরিকিশোরকে অগ্রে কখনও জানিতেন না—চিনিতেন না; এখনও জানেন না—চিনেন না। হরিকিশোরের গুণগ্রাম পূর্ব্বেও তিনি জানিতেন না—এখনও জানেন না। তাঁহাকে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়াই—তিনি এখন জানেন।

হরিকিশোর শিক্ষা-আলোকের আড়ম্বর করিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন "তাহাতে আপত্তির কারণ কিছুই দেখি না। নূতন বাগান বাড়ীতে অনায়াসেই এখন নাচ গান চলিতে পারে।" এই বলিয়া একটু অস্ফুট অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষে অথচ কালীপ্রসাদের শ্রুতিগোচর হয়—এমন ভাবে কহিলেন "হায় রে ভ্রম! রমণীর প্রণয়-ছলনা—তাহাদের প্রেমের অসারত্ব জগতে যে জানে, সেই কেবল জানে। জীবনে যে তাহার সাদ পাইয়াছে, সে ভালরূপেই ভুগিয়াছে।"

কালীপ্রসাদের প্রজ্জ্বলিত প্রাণে ঘৃতাহুতি পড়িল। কালীপ্রসাদ একটু বিচলিত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন "আপত্তি কি? তাহাই হউক। বাগান বাড়ীতেই আজি হইতে নাচ গান চলিতে থাকুক।"

হরিকিশোর উঠিয়া, বাগান বাড়ী সাজাইবার আয়োজন করিতে উদ্যত হইলেন। কালীপ্রসাদ বিষণ্ণবদনে ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে কালীপ্রসাদ, বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় কুন্তলার সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে এই বাগানের কত ফুল তুলিয়াছিলেন উভয়ে পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া সেই ফুলের মালা গাঁথিয়া ছিলেন। নিজে মালা গাঁথিয়া কুন্তলার গলে পরাইয়া দিয়াছিলেন। কুন্তলা যে মালা গাঁথিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, সে মালা ছিঁড়িয়া পড়িয়াছিল। কুন্তলা তাহাতে বড় অধীরা হইয়া আবার সেই মালা গাঁথিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়াছিল। সে বারেও মালা ছিঁড়িয়াছিল। কুন্তলার চক্ষে তাহাতে জল আসিয়াছিল। এই সকল স্মৃতি সান্ধ্য নক্ষত্রের ন্যায় তাঁহার আঁধার-প্রাণে একে একে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। বোধ হইল যেন কুন্তলার মালা জন্মের মত ছিঁড়িয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

কালীপ্রসাদের চক্ষু হইতে অজ্ঞাতসারে ঝড় ঝড় করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

সেই কুন্তলা তাঁহাকে ফেলিয়া তাঁহার অনুরোধ—তাঁহার যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া, অনায়াসে হাসিতে হাসিতে আমোদ করিতে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। এ অভিমান রাখিবার স্থান কোথায়? হায়রে রমণীর ক্ষণভঙ্গুর অসার অস্থায়ী প্রেম! পাঠিকা মনে মনে বলিতেছেন—'হায়রে যুবকের প্রণয়-উপলব্ধির বুদ্ধি সামর্থ্য।

যিনি যাহাই বলুন—ওকালতি উভয় পক্ষেই চলে। আমরা কাহারও 'ব্রিফ' লইতে বসি নাই। সত্য কথা যাহা, তাহাই বলিতে বসিয়াছি—অকপটে তাহাই বলিব।

কালীপ্রসাদ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন—দেখিলেন কুন্তলার সেই মালা ছেঁড়ার দিনের বিষাদভরা বদনখানি। সেই বদনখানি সতৃষ্ণ নয়নে বিষাদে অভিমানে তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

কালীপ্রসাদ তদপেক্ষা অধিকতর অভিমানভরে বদনমণ্ডল অবনত করিলেন। যে সময় কুন্তলা তাঁহার কথা উপেক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে বাপের বাড়ী চলিয়া যায়—সেই দিনের সেই সময়ের তাহার সেই হাসিভরা মুখখানি কালীপ্রসাদের প্রাণের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল।

অন্ধ কালীপ্রসাদ ভ্রান্ত মুগ্ধ চক্ষে দেখিলেন 'কুন্তলা তাঁহা অপেক্ষা জগতের আরও কিছু চায়, আরও কিছু ভালবাসে। কালীপ্রসাদ মনে স্থির করিলেন 'তেমন ভালবাসা—তেমন ওজন করা ভালবাসার ফল কি? তাহাতে জীবনের আশ্রয় অবলম্বন কোথায়? সে ভালবাসা লইয়া বাস করা অপেক্ষা, এ জীবন যেখানে সেখানে যে-সে রূপে অতিবাহিত করায় লাভ লোকসান কিছুই নাই।

ভাবিয়া ভাবিয়া কালীপ্রসাদ অটল অচল ভাবে স্থির হইয়া বসিলেন—পরিষ্কাররূপে মনকে বুঝাইলেন—দৃঢ় ভাবে প্রাণকে বাঁধিলেন। হায়রে উদ্‌ভ্রান্ত যুবক! এ যে অতি শিথিল বালির বাঁধ! প্রেমের বন্যায় যে হিমালয় ভাসিয়া যায়।

কালীপ্রসাদ অতি স্থির ধীরভাবে উঠিয়া গম্ভীর বদনে, দৃঢ় হৃদয়ে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আঁধার-আচ্ছন্ন সংসার, তাঁহার দেহ-প্রাণ দুইই নিবিড় আঁধারে ডুবাইয়া ফেলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরদিয়ার আশে পাশে নানা রকমের বাজী তামাসা নাচ গান চলিতেছে। হরদিয়ার বাগান-বাড়ীতে কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নর্ত্তকী গায়িকাগণের নৃত্য গীত প্রতিদিন সন্ধ্যায় চলিতেছে।

এ নাচ গানের মজলিসে শ্রোতা-দর্শকের সংখ্যা অতি অল্প। প্রকাণ্ড হল ঘরের মধ্যে বৃহৎ গালিচা। গালিচার অর্দ্ধাংশের উপরিভাগ অতি সুন্দর কারুকার্য্যে খচিত জাজিমমণ্ডিত। জাজিমের আশে পাশে মধ্যে তাকিয়া। তাকিয়ার আশে পাশে তামাক চড়ান আলবোলা। আলবোলার কাছে কাছে আতরদান, গোলাবদান, বড় বড় রূপার থালায় রাশি রাশি পানের খিলি। ঊর্দ্ধে ঝাড় দেয়ালগিরির আলোকে প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ রবিকর উদ্ভাসিত সমুজ্জ্বল। গৃহের দেওয়ালের গায়ে নানা রকমের আধুনিক 'সুরুচিসঙ্গত'—যাহার মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য কেবল মনেই বোধগম্য—মুখে অপ্রকাশ্য সেইরূপ সুরুচিসঙ্গত বহু আয়না বাঁধান ছবি।

এ সকল দ্রব্য সামগ্রী সম্প্রতি হরদিয়ার উৎসব উপলক্ষে হরিকিশোর বাবু স্বয়ং কলিকাতার সাহেব কোম্পানীর দোকান হইতে আনিয়াছেন।

এইরূপ দুই তিন দিন নৃত্যগীত চলিতে লাগিল। কালীপ্রসাদ হরিকিশোর বাবুর নিতান্ত অনুরোধে—অন্যান্য নিমন্ত্রিত বাবুদিগের খাতিরে আসিয়া প্রস্তর-পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকেন; উদাসীন নয়নে শিথিল শ্রবণে, কি দেখেন, কি শুনেন কিছুই বুঝিতে পারেন না। কেবল কে আসিল কে যাইল তাহাই তদন্ত করেন। সমাগত লোকজনকে সমাদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

উদাসীন নেত্রে দেখিতে দেখিতে একটি তরুণী নর্ত্তকীর প্রতি কালীপ্রসাদের করুণ দৃষ্টি নিপতিত হইল। নর্ত্তকীর মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয়,কে যেন সরোবর হইতে পবিত্র কমল তুলিয়া আনিয়া অতি অলক্ষণ আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিয়াছে। এখনও তাহা শুকায় নাই—এখনও তাহাতে পুতিগন্ধ ধরে নাই। কালীপ্রসাদ যতই তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন ততই তাঁহার প্রাণে তাহার পরিণামের পাপতাপের চিন্তা প্রবল হইয়া উঠে; ততই তাঁহার প্রাণে যেন একটি অতি অজ্ঞাত অপরিচিত হস্তের কঠোর আঘাত আসিয়া লাগে।

হরিকিশোর, কাশীরায়, তাহা লক্ষ্য করিলেন। আর লক্ষ্য করিল—হতভাগিনী নর্ত্তকীদলের প্রৌঢ়া পরিচালিকা নেত্রীকর্ত্রী। ত্র্যহস্পর্শ ঘটিল।

আবার সোনায় সোহাগা পড়িল কালীপ্রসাদ যতই নিরীক্ষণ করিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তরুণী নর্ত্তকীকে দেখিতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে, কুন্তলার

মুখের কিছু কিছু ভাব ভঙ্গি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন সেই ভাবভঙ্গি সেই আকৃতি প্রকৃতি আরও প্রস্ফুটিত আকারে প্রকটিত হইয়া পড়িল। শেষে কালীপ্রসাদ বিহ্বল বিস্ময় নয়নে দেখিতে লাগিলেন কুন্তলায় ও তাহাতে পার্থক্য অতি অল্প। সে 'অল্পও' ক্রমে লুকাইল। তরুণী নর্ত্তকী, কুন্তলার সম্পূর্ণ আকৃতি ধরিয়া বসিল। কালীপ্রসাদ বিস্ময়ে বিহ্বলে দেখিলেন একি মোহ! একি ভোজের বাজী—একি মায়া মরীচিকার ভ্রম! কোথায় বৈকুণ্ঠের কমলা আর কোথায় পাপীয়সী পিশাচিনী নর্ত্তকী! কালীপ্রসাদ মনে মনে একটু হাসিলেন ঘৃণায় আপনাকে একটু ধিক্কার দিলেন। স্তম্ভিত হইয়া, আপনাকে বাহির হইতে সজোরে ধরিয়া আনিয়া হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে পূরিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হত বিধির বিড়ম্বনা প্রাণ বুঝিয়াও বুঝে না—মন মানিয়াও মানিতে চায় না। অন্তরের আশ পাশ হইতে রহিয়া রহিয়া সেই 'আধ পবিত্রতা মাখা আধ পাপভরা মুখখানির ছায়া উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগিল।

এক দিন বৈকালে হরিকিশোর বাবু আসিয়া অন্তঃপুরস্থ কক্ষে খাটের উপর কালীপ্রসাদের পার্শ্বে বসিলেন। কালীপ্রসাদ তখন উষ্ণ মস্তকে গোলাপ জল দিয়া পাখার হাওয়া খাইতেছিলেন। শীতকাল—মাঘ মাস—এত গরম কিসের?

কালীপ্রসাদ ক্ষিপ্রহস্তে ব্যজন করিতেছেন—আর ভাবিতেছেন "কুন্তলা! তুমি কোথায়? একবার আসিয়া এ সময়ে শ্মশান-হৃদয়ের সংগ্রাম-যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিলে না! এই কি তোমার দাম্পত্য প্রণয়! এই কি পতিগতপ্রাণা সতী রমণীর পতিভক্তি!"

হরিকিশোর বাবু কালীপ্রসাদের মুখের ভাব, তাঁহার মনের গভীর বিষাদের কথা বুঝিলেন। বুঝিলেন প্রাণের অন্তস্তলে এক ভীষণ দারুণ ব্যাধির বিষবীজ রোপিত হইয়াছে। এই সঙ্কটে, তিনি বৈদ্য হইয়া সুচিকিৎসার সফলতা লাভ করিতে পারিলে, কালীপ্রসাদ তাঁহারই হাতের খেলার পুতুল হইয়া পড়িবেন।

হরিকিশোর বাবু কালীপ্রসাদের হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার দুঃখে পূর্ণ সহানুভূতির উচ্ছ্বাস ভাণে ভগ্নকণ্ঠে, ছল ছল নেত্রে কহিলেন "আসুন, আর একা বসিয়া মন খারাপ করিবেন না। এ সংসারে আপনার অভাব কি? ভাবনা কিসের?" এই বলিয়া সবলে কালীপ্রসাদকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া, হরিকিশোর বাবু প্রস্থান করিলেন।

উভয়ে আসিয়া, উদ্যান বাটিকার প্রান্তকক্ষে বসিলেন। এই ঘরটি হরিকিশোর বাবুরই জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। উভয়ে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ একথা সে কথা চলিতে লাগিল। পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরিকিশোর বাবু কহিলেন "দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি। তবে কি জানেন সংস্কারটা আমাদের দেশে বড় প্রবল পদার্থ। তাহার হাত, অতি বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তিও সহজে এড়াইতে পারে না। সংস্কারের ফলেই আমাদের জাতি, সমাজ, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই আজি প্রবল বেগে ধ্বংশের পথে অগ্রসর হইতেছে। যত দিন আমাদের মধ্যে এই সংস্কারের প্রাবল্য প্রাধান্য রহিবে, তত দিন আমাদের উন্নতি অভ্যুদয়ের আশা আদৌ নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।"

হরিকিশোরের এইরূপ লম্বা চওড়া বিশেষণবিশিষ্ট, অলঙ্কারবিভূষিত, বর্ণবিচিত্র-বাক্যচ্ছটায়, অনেক সময় তরুণমতি কালীপ্রসাদের সরল সহৃদয় অন্তঃকরণে একটু মোহের আবেশ উপস্থিত হইত।

কালীপ্রসাদ বিষণ্ণ বদনে মৃদু হাসিয়া কহিলেন "কি সংস্কারের কথা কহিতেছেন আপনি?"

হরিকিশোর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন "একটা বিশেষ কোন সংস্কারের কথা আমি বলিতেছি না। আমাদের সংস্কার-দোষ বহু। এই দেখুন পান-আহারের সংস্কারের কথাটা একবার তলাইয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি। কি ভীষণ দৌরাত্ম্য অত্যাচার তাহার দ্বারা আমাদের জাতীয় দেহে, সামাজিক প্রাণে সংঘটিত হইতেছে।

কালীপ্রসাদ বিনীতস্বরে কহিলেন "তবে কি হরিকিশোর বাবু, আপনার মতে আহার-ব্যবহারে বিচার ব্যবধান থাকা, অমঙ্গল অনর্থের হেতু?"

হরিকিশোর সদর্পে কহিলেন "শত বার সহস্র বার। মাপ করিবেন—আপনার ন্যায় বিবেচক চিন্তাশীল ব্যক্তির সঙ্গে যুক্তিতর্কের বিচারে লাভ আছে—আনন্দ আছে, তাই বলিতেছি। এই দেখুন 'ড্রিংকিং' টা কি মন্দ প্রথা!

অবশ্য অপরিমিততায় অপব্যবহারে সুধাও হলাহলে পরিণত হয়। তাই বলিয়া সুধা কি পরিত্যজ্য। অগ্নিতে গৃহদাহ হয় বলিয়া, যে অগ্নিকে ত্যজ্য বলে সে কি উন্মাদ নয়? 'ওয়াইন' আমার মতে—আর আমার সে মত অতি পরীক্ষিত সত্য—সে সত্য সভ্য জগতে সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলেই সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য শিরোধার্য্য—আমার মতে 'ওয়াইন' সময় ও অবস্থা অনুসারে সর্ব্বব্যাধিবিনাশী—সংসন্তাপহারী স্বর্গসুধা।" 'সময়' ও 'অবস্থা' দুইটা শব্দ কালীপ্রসাদের প্রাণে বাজিয়া হৃদয়ের তন্ত্রীতে আঘাত করিল।

কালীপ্রসাদ অস্ফুট অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষে কহিলেন "'সময়' আর 'অবস্থা' অনুসারে। তাহা ঠিক।" নীরবে মনে মনে ভাবিলেন আমার যে সময় যে অবস্থা তাহাতে তাহা মন্দ কি! জীবন ভ্রষ্ট হইবে উন্নতি ও কল্যাণকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে হইবে। তাহাতে ক্ষতি কি? এ জীবনের ভ্রংশে অপকার কি? তাহার অধোগতি অকল্যাণে অপচয় কি?

হরিকিশোর বাবু ট্রাঙ্ক খুলিলেন। বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া ব্রাণ্ডি ঢালিলেন। আপনি খাইলেন। সংসাহসসম্পন্ন দৃষ্টান্ত দেখাইবার ছলে অগ্রে আপনি পান করিলেন। আর এক গ্লাস ঢালিয়া, কালীপ্রসাদের সম্মুখে ধরিলেন। কালীপ্রসাদ চমকিয়া স্তম্ভিত হইলেন। 'সুরা' শব্দ শ্রবণে যে কালীপ্রসাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, শরীর শিহরিয়া উঠে, তাঁহারই সম্মুখে পূর্ণপাত্র সুরা। কালীপ্রসাদ ভীতভাবে, হরিকিশোর বাবুর মুখপানে চাহিলেন। কিন্তু ভদ্রতা এটিকেটের খাতিরে কোন আপত্তির কঠিন কথা বলাও, তাঁহার শিষ্ট বিনীত স্বভাবের একান্তই বিরুদ্ধ। ভীত চকিত ভাবে, হরিকিশোরের মুখের পানে চাহিলেন। হরিকিশোর গ্লাস স্বহস্তে ধরিয়া, তাঁহার হস্তের উপর রাখিয়া কহিলেন "আমার অনুরোধ আপনি অন্ততঃ আজিকার জন্য পান করিয়া দেখুন। যদি দেহের বল, স্বাস্থ্য, মনে শান্তি আনন্দ না পান, তবে আর কখন এ দ্রব্য স্পর্শ করিবেন না। আর কিছু হউক না হউক জীবনে একটা অভিজ্ঞতাও তো জন্মিতে পারে।" এই সময়ের মধ্যে হরিকিশোরের মনে একটু প্রমোদের হিল্লোল বহিতে সুরু করিয়াছিল। আনন্দ ভরে হরিকিশোর কহিলেন "পরকালে পাপের জন্য দায়ী আমি রহিলাম।"

পরকালের পাপ পুণ্যে বা হিন্দুয়ানীতে কালীপ্রসাদের হৃদয়ে বড় আস্থা ছিল না। আধুনিক পূর্ণ শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবকবর্গের আলোকিত চিত্ত-বিশ্বাস সাধারণতঃ যে ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়, কালীপ্রসাদের মন তদ্ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ তো নহে। কুসংস্কারবর্জ্জিত কালীপ্রসাদ 'পরকালে' 'হিন্দুয়ানীতে' তেমন বিশ্বাসবান আস্থাবান হইবেন কেন?

কালীপ্রসাদ ভাবিলেন "মন্দ কি! মরিয়া তো অবশ্য যাইব। একদিনে ডুবিয়াও যাইব না। দেখা যাউক না কেন ব্যাপার কি। জীবনে একটা অভিজ্ঞতাও তো জন্মিবে।" এই বলিয়া একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া কম্পিত হস্তে সুরাপাত্র ধরিলেন। হরিকিশোর 'কেল্লা ফতে' হইল ভাবিয়া, আহ্লাদে উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন "তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিবেন না। কিছুমাত্র ভাবিবেন না। আপনি দেখুন দুনিয়ায় কি সুন্দর সামগ্রী সুরা। সুরা নয় সত্যই সুধা। সত্যই "Wine is heaven."

কালীপ্রসাদ হস্তে সুরাপাত্র ধরিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। হরিকিশোর তাঁহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া উত্তোলন করিলেন। কালীপ্রসাদের সমুদয় মানসিক দৈহিক শক্তি প্রলোভন-স্রোতে নিপতিত হইল। কালীপ্রসাদের জীবন-তৃণ সে স্রোতে প্রবলবেগে ভাসিয়া চলিল। একপাত্র পান করিয়া, তাঁহার পিপাসিত প্রাণে একটু স্ফূর্ত্তির উদয় হইল। পুনরায় দ্বিতীয় পাত্র—ক্ষণপরে তৃতীয় পাত্র পান করিয়া কালীপ্রসাদ এক নূতন জীবনের নূতন পন্থায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন, এ কি সুন্দর দৃশ্য! কালীপ্রসাদ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। ভাঙা ভাষে কহিলেন হরিকিশোরবাবু! এ তো অতি উত্তম জিনিস! তাই তো এত দিন মাতৃগর্ভে ছিলাম। সত্যই এত কাল জগতের আলোক দেখি নাই।"

হরিকিশোর বাবু কহিলেন "আমি কি আপনাকে মিথ্যা বলিয়াছি?" এই বলিয়া নিজে প্রচুর পান করিয়া, আর এক পূর্ণ পাত্র কালীপ্রসাদকে প্রদান করিলেন। কালীপ্রসাদ পান করিয়া কহিলেন "হরি দাদা! এই সময়ে সেই বালিকা নর্ত্তকীর নৃত্যগীত এই খানে আরম্ভ করিলে হয় না?"

হরিকিশোর তাহা পূর্ব্বেই জানিতেন। পূর্ব্ব হইতেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিত মাত্র কাশীরায় সেই নর্ত্তকী ও জনেক বাদক সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। নৃত্যগীত চলিতে লাগিল। সুরার স্রোত বহিল। তার পর কি হইল? যাহা হইবার তাহাই হইল। যাহা দুর্ব্বলচিত্ত ধর্ম্মবলবিহীন ধনী সন্তানের পক্ষে কুসঙ্গে ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিল। যাহা অপেক্ষা আর ভয়ঙ্কর মৃত্যু মনুষ্যের পক্ষে নাই, সেই আধ্যাত্মিক মৃত্যু কালীপ্রসাদের ঘটিল।

মেলা কোথা হইতে আসিল, কোথা দিয়া চলিয়া গেল, চৈতন্যহীন কালীপ্রসাদ তাহা দেখিলেন না।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী।

গম।

গমের চাষের তুলনা করিতে গেলে পৃথিবীতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পরই ভারতবর্ষকে স্থান দিতে হয়। গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়রলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষে তিন গুণের অধিক গম হয়। গম প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নরম ও শক্ত। নরম গমেতে ভাল ময়দা হয় আর যে গম শক্ত তাহা হইতে অতি সুন্দর সুজি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার রংবিশেষেও গম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা—

(১) দুধিয়া গম—ইহা হইতে অতি সুন্দর ময়দা প্রস্তুত হয়। ইহার দানা শ্বেতবর্ণ পুষ্ট এবং নরম। অন্যান্য জাতি হইতে ইহার পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত চওড়া, ইহাতে কাল শূঙ্গ আছে।

(২) জামালী গম—দানা বেশ বড় ও নরম। দানার রং পাটল বর্ণ, পাতাগুলি সরু। এক শ্রেণীর জামালী মাঘ মাসে পাকে বলিয়া উহাকে মাঘীয়া বলে।

(৩) গঙ্গাজলী গম—দানা বড়, রং ধূসর, অপেক্ষাকৃত কঠিন, পাতা চওড়া। ঐ গম সুজি এবং আটা প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী।

(৪) খেরী গম—রং—ধূসর বর্ণ, দানাগুলি মাঝারি, গাছের পাতা সরু।

(৫) পুইছা গম—দানাগুলি খুব ছোট ও নরম, রং—ধূসরবর্ণ, পাতা সরু।

(৬) নানবিয়া গম—দানা খুব ছোট ও শক্ত, রং লাল আভাযুক্ত, পাতাগুলি খুব সরু।

মৃত্তিকা—এঁটেল জমী গমের চাষের পক্ষে প্রশস্ত। গমের চাষ সুচারুরূপে করিতে গেলে, জল সিঞ্চন ইহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং ক্ষেত্রনির্ব্বাচনের পূর্ব্বে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, ঐ জমীতে জলসিঞ্চনের সুবিধা আছে কি না।

বেলে মাটিতেও গমের চাষ অনেকে করিয়া থাকে কিন্তু উক্ত জমীতে ফসল যে বড় একটা বেশী হয় এমত বিশ্বাস হয় না। চরা ভূমিতে যাহাতে বর্ষার সময় বেশ দস্তর মত পলি পরে, তথায় অবশ্য গমের চাষ ভালই হইয়া থাকে। নিখাত জল সিঞ্চনে প্রথম প্রথম গমের চাষে খুব ফল পাওয়া যায় কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, যে স্থানে উপর্য্যুপরি নিখাত বারি সিঞ্চনের নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে হঠাৎ তাহার ফসল একেবারেই কমিয়া যায়। মিঃ মুখোপাধ্যায় ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন (১) অতিরিক্ত জল সিঞ্চন দ্বারা মৃত্তিকার মূল্যবান উপাদানগুলি ধৌত হইয়া যায় এবং উদ্ভিজ্জীবনের অনুপকারী কতকগুলি পদার্থ মৃত্তিকাতে আনীত হয়। (২) ক্রমান্বয়ে কতক বৎসর অধিক পরিমাণে ফল দিতে দিতে পুনরায় সার প্রয়োগ না করার দরুণ জমীর উর্ব্বরতার হ্রাস হইয়া আসে।

চাষ—গমের জন্য গভীর চাষ বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে কতকগুলি কৃষক আছে যাহারা দুই তিন খানা চাষ ও সেই সংখ্যক মই দিয়াই জমীতে বীজ ফেলিয়া দেয়। ইহারা কি পরিমাণ শস্য পায় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে কিন্তু ভাল ভাল কৃষকগণকে জমী গভীররূপে কর্ষণ করিবার জন্য এমন কি ১২।১৪ খানা চাষ ও তৎসংখ্যক মইও দিতে দেখা যায়। এই প্রকার চাষে যে ফলন অধিক হয় ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এত বহুসংখ্যক চাষের পরিবর্ত্তে এক খানা শিবপুরী লাঙ্গলে অথবা তদভাবে একখানা ভাল দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে একবার লম্বা ও একবার এঁড়ো চাষ দিয়া তাহার পর কেবল "গ্রাবার" যন্ত্র ব্যবহার করিলে

জমীর চাষও গভীর করা যায় খরচও অপেক্ষাকৃত কম পড়ে। অবশ্য প্রত্যেক বার "গ্রাবার" চালানের সঙ্গে সঙ্গে মই দিতে হইবে যেন জমীর আর্দ্রতা প্রখর সূর্য্যোত্তাপে নষ্ট হইয়া না যায়।

বীজ ছিটাইয়া বুনা অপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট অন্তরে বুনাই ভাল. ইহাতে জলসিঞ্চনের সুবিধা হয়। নির্দ্দিষ্ট অন্তরে বীজ লাগাইবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আছে ইহাকে "সিড্‌ড্রিল্" কহে। এই যন্ত্রের বিবরণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেও বীজ নির্দ্দিষ্ট অন্তরে লাগান যাইতে পারে যথা ক্ষেত্রে জুলী কাটিয়া ঐ জুলীর মধ্যে বীজ মাটিচাপা দেওয়া, তবে ইহাতে খরচ কিছু বেশী পড়ে। দস্তর মত শীত আরম্ভ না হইলে বীজ বপন করা উচিত নহে। সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১৫।১৬ সের বীজ লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু আমাদের মতে ইহা অতিশয় বেশী বলিয়া বোধ হয়; বিঘা প্রতি ৮।৯ সের বীজই যথেষ্ট বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বীজ দেওয়ার পূর্ব্বে জমী শুষ্ক বলিয়া বোধ হইলে পূর্ব্বেই জল সিঞ্চন করিয়া লওয়া উচিত। গমের চাষে দুই বারের বেশী জল সিঞ্চনের দরকার হয় না যদি জমী স্বভাবতঃই আর্দ্র থাকে তবে জল সিঞ্চন না করিলেও চলে। এমনও হইতে পারে যে বীজ বপনের সময় জমী বেশ আর্দ্র থাকে এবং তাহার পরে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ যখন জল সিঞ্চনের দরকার তখন হয়ত বেশ ২।৩ ফসলা বৃষ্টি হইয়া গেল এমতাবস্থায় জল সিঞ্চনের কোনই দরকার নাই। গাছগুলি একটু বড় হইয়া উঠিলে ২।১ বার নিড়াইয়া দিলেই গাছ বেশ সতেজ ও সুপুষ্ট হইয়া উঠে। যদি জলসিঞ্চন করা হয় তবে প্রথম জলসিঞ্চনের ৮।১০ দিন পরেই একবার নিড়াইয়া দেওয়া উচিত।

সার—বিঘা প্রতি ॥ মণ করিয়া সোরা গমের পক্ষে প্রশস্ত সার। যদি জমী স্বভাবতঃ নিস্তেজ থাকে তাহা হইলে বিঘা প্রতি ॥০ মণ হারে অস্থিচূর্ণও ৫/ মণ খোল চাষের সময় জমীতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু সোরাই গমের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সার। যে সব ভূমিতে বন্যায় পলি পড়ে তাহাতে সারের কোন আবশ্যক নাই।

শস্য কর্ত্তন—গম সুপক হইলে ও তাহার খড় সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইলে উহা কাটা উচিত। গমের গাছ উত্তমরূপে না শুকাইতে মলাই করা উচিত নহে কেন না তাহা হইলে গমের গাছ ও শীষ ভাঙ্গে না এবং গম ছাড়াইয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হয়।

ফলন—সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ৩।৪ মণ দানা ও তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে খড় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বিঘা প্রতি ৭।৮ মণও ফলন দেখা গিয়া থাকে।

গমের চাষের পর্য্যায় সম্বন্ধে কৃষিতত্ত্ববিৎ মুখার্জি সাহেবের মত, কতক নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। জুয়ার অথবা মিলেট এবং গম সাধারণতঃ পর্য্যায়ক্রমে এক জমীতে দেওয়া হয়। জুয়ার এবং যব গমের জমীতে দেওয়া যাইতে পারে কেন না জুয়ার এবং যব উভয়েই জমীর উপরিস্তর হইতে তাহাদের আহারীয় গ্রহণ করে, এ দিকে গম নিম্ন স্তরস্থিত মৃত্তিকা হইতে তাহার আহার খুজিয়া লয়। কিন্তু আমার মতে কুত্তি অথবা ভাদই মুগ অথবা ভাদই কলাই গমের পূর্ব্বে জমীতে দিলে বিশেষ ভাল ফল পাইবার সম্ভাবনা।

শ্রীরাজেশ্বর দাস গুপ্ত।

আঁখির ভাষা।

সুচারু হর্ম্ম্য   পড়িতেছে ভাঙ্গি
গেছে চূণ বালি খসি,
লতিকাগুল্ম   ঢেকেছে আঙ্গিনা
দিবসেতে অমানিশি।
এক পাশে তার   আধভাঙ্গা গৃহে
আছে দুঃখী এক প্রাণী,
শেষ হেমন্ত   সেফালি গুচ্ছে
মলিন কুসুমখানি
শ্মশান ভূমির   শূন্য কলসী
তারে যবে আমি দেখি,
রসনা সে ব্যথা   প্রকাশিতে নারে
প্রকাশে সজল আঁখি।

বিষাদ জড়িত   বদন ইন্দু
পাণ্ডু কপোলতল
চারু সীমন্ত   সিন্দূরহীন
পৌষের শতদল,
আভরণ হারা   বর তনু খানি
বদনে নাহিক কথা,
সদ্য ছেদিত   প্রণয় বৃন্ত
ললিত মাধবী লতা,
শরৎ ঊষার   ম্লান শুকতারা
তারে যবে আমি দেখি
রসনা সে ব্যথা   প্রকাশিতে নারে
প্রকাশে সজল আঁখি।

লাবণ্য রাশি   গিয়াছে শুকায়ে
তবু রেখা আছে তার
বৈশাখী দিনে   সিকতা মগ্ন
তটিনীর জলধার,
পশিয়াছে প্রাণে   ব্যাধি-কীট হায়
শুকাইছে ফুলকলি,
দ্বাদশীর শশী   পড়িতেছে যেন
অমা নিশি কোলে ঢলি
ভুজগ দষ্ট   বিহগের মত
তারে যবে আমি দেখি,
রসনা সে ব্যথা   প্রকাশিতে নারে
প্রকাশে সজল আঁখি।

উৎসব শেষে   ধীরে ধীরে আসে
যবে বিজয়ার নিশি,
মহাকাল আসি   ফুকারে বিষাণ
কাঁপাইয়া দশদিশি,
তৈল বিহীন   দেওয়ালী প্রদীপ
একে একে নিভে আসে,
বিদায় বাদ্য   বেজে উঠে তার
আপনার প্রিয় বাসে
জীবন বর্ষ   ব্যাপি বিচ্ছেদ
দাঁড়ায়ে যখন দেখি,
রসনা সে ব্যথা   প্রকাশিতে নারে
প্রকাশে সজল আঁখি

ব্যথিত হিয়ার   করুণ কাহিনী
সুললিত মধুগান
দগ্ধ ধূপের   গন্ধ মধুর
জুড়ায় তাপিত প্রাণ
তপ্ত বুকের   পূত সলিল
সীতা কুণ্ডের জল,
বিষাদ মধুর   সঙ্গীত যবে
পরশে মরম তল
কত দূর স্মৃতি   কত সান্ত্বনা
তাহারা যে আনে ডাকি
রসনা সে সব   প্রকাশিতে নারে
প্রকাশে সজল আঁখি।

যৌবন শেষে   শান্ত স্বচ্ছ
কূলে কূলে ভরা নদী
শশীর সুহাস   ভরি দেয় যবে
তাহার বিমল হৃদি
নিশিথ তরীর   দূর সারি গান
সমীরণ আনে লুটি

বিরহবাহিনী বহে মাঝখানে
কাঁদে চক চকী দুটী।
প্রবাসী নয়নে যত চেনা মুখ
দেয়গো তাহারা আঁকি
রসনা সে সব প্রকাশিতে নারে
প্রকাশে সজল আঁখি।

সচকিত চারি আঁখির মিলন
অধরে বিজলি হাসি,
চল অপাঙ্গে সরমের খেলা
বলে যে কাহিনী রাশি
প্রবাসে যা বলে বাঞ্ছিত মুখ
যা বলে তারকাগুলি
যত কথা রাখে রঙেতে মিশায়ে
চিত্রকরের তুলি,
গাহি গান কবি জীবন ব্যাপিয়া
যত কথা রাখে বাকি
রসনা সে সব প্রকাশিতে নারে
প্রকাশে সজল আঁখি।

মুরতি যাঁহার চির পরিচিত
তবুও চিনিতে নারি,
তাপিত পরাণ করে সুশীতল
যাঁহার করুণা বারি
বিপদ মন্দ ঃ তাঁহার গন্ধ
কভু বহে আনে প্রাণে,
কভু পাই যাঁর বাঁশরীর স্বর
বৈষ্ণব কবি গানে,
আমি যত কথা প্রাণাধিকে মোর
বলিবারে চাই ডাকি,
রসনা সে সব প্রকাশিতে নারে
প্রকাশে সজল আঁখি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রকৃতিবাদ তত্ত্ব।

পুণ্যময় পবিত্র ভারতক্ষেত্রে বৈদিক তত্ত্বের সমালোচনার পরেই দার্শনিকগণ শিষ্যের মত শ্রুতির আদেশ মস্তকে বহন করিয়া আপনাদের মত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আর কেহ না হউক সাংখ্যদর্শনকার শ্রুতিকে মাঝে মাঝে আপনার প্রতিকূলবাদী বলিয়া একটু একটু মত প্রকাশ করিয়াছেন। মহামুনি কপিলের শিষ্য সাংখ্য-কারিকায় সপ্ততি শ্লোকময় স্বকীয় গ্রন্থে কৈবল্যপন্থা নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রুতির বিধেয়বিশেষকে রক্ষা-কবচাদি মন্ত্রের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। স্বয়ং কারিকাকার লিখিয়াছেন—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ"

এই কথাটী বুঝিয়া লইতে হইলে অগ্রে আমাদের ইহার প্রকরণ নির্ণয় করিতে হইবে।

সাংখ্যদর্শনের "অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি রত্যন্ত পুরুষার্থঃ" এই মৌলিকসূত্র লইয়া এই কারিকাগ্রন্থের অবতারণা, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত বিনাশে দৃষ্টহেতুর শক্তির অভাবের ন্যায় "আনুশ্রবিক"ও গৃহীত হইয়াছে। কারিকার ভাষ্যকার স্বয়ং গৌড়পাদ আনুশ্রবিক শব্দে বেদোক্ত ক্রিয়াবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আনুশ্রবতীত্যনুশ্রবঃ তত্রভব আনুশ্রবিকঃ স চ আগমাৎ সিদ্ধঃ। এই কথায় সায় দিয়া সাংখ্যদর্শনের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও আনুশ্রবিক শব্দে বেদোক্ত ক্রিয়াবিশেষ স্বীকার করিয়াছেন তিনিও বলিয়াছেন "গুরোরনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবঃ বেদঃ তদ্‌বিহিতযাগাদি রানুশ্রবিকঃ।" কারিকার ভাষ্যকার বৈদিক প্রসঙ্গের উল্লেখে বলিয়াছেন। সকলে বিচার করিল আমরা কেমন করিয়া অমর হইব, কেমন করিয়া পরম জ্যোতিঃ পাইব, কেমন করিয়া দিব্য যাহা তাহা জানিতে পারিব, কেমন করিয়া শত্রুর হাত এড়াইব,কেমন করিয়া ব্যাধি ও হিংসার হস্ত হইতে মুক্ত হইব। অমনি পথ নির্ণয় হইল—

অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিন্নূনমস্মান কৃণবদরাতিঃ কিমুধূর্ত্তিরমৃতমর্ত্তস্য ॥

সোমপান করা হইল বটে কিন্তু ফলশ্রুতি রক্ষা হইল

না কারণ কেহই অমর হইতে পারিলেন না সকলেই ক্ষয়োন্মুখ, যথা—

বহূনীন্দ্র সহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে।
কালেন সমতীতানি কালোহি দুরতিক্রমঃ॥

শ্রুতি আবার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলশ্রুতিকে বর্ত্তমান সময়ের ঔষধের বিজ্ঞাপনের মত ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "সর্ব্বাল্লোঁকান্ জয়তি মৃত্যুং তরতি পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং তরতি যো যোঽশ্বমেধেন যজতে।"

সাংখ্যদর্শন কিন্তু এমতকেও আপনার মতের সহচর করেন নাই। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু, "বৈধহিংসার অতিরিক্ত হিংসাই পাপ" এই সঙ্কোচে প্রমাণাভাব উল্লেখ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদির বৈধ জ্ঞাতিবধে প্রায়শ্চিত্তের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার আপনার মত বজায় রাখিবার জন্য মার্কণ্ডেয়কে সহযোগী করিয়া তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ত্রয়ীধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্মকে হিংসা প্রকরণে মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন।—

তস্মাদ্ যাস্যাম্যহং তাত। দৃষ্ট্বেমং দুঃখসন্নিধিং ত্রয়ীধর্ম্মমধর্ম্মাঢ্যং কিম্পাকফলসন্নিভং॥

শুক্রাচার্য্যও বুঝি এই মতের পোষকতায় বলিয়াছেন—

যুপংকৃত্বা পশূন কীর্ত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমং।
যদি নরঃ স্বর্গং যাতি নরকং কেন গম্যতে॥

যুপ করিয়া পশু কাটিয়া রুধিরের কাদা করিয়া মানুষ যদি স্বর্গে যায় তবে নরক কাহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। বুঝি ভারতকে বৈদিক যজ্ঞীয় ধূমাচ্ছন্ন দেখিয়াই শাক্যসিংহ "মাহিংসন্ সর্ব্বভূতানি" এই বলিয়া পৃথকভাবে সম্প্রদায় দাঁড় করিলেন। ভারতীয় মনস্বী কবি ভারবি হিংসাকে মুক্তিপথের প্রতিকূল বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন। তিনি "কিরাতার্জ্জুনীয়ে" অর্জ্জুন-ইন্দ্র সংবাদে ইন্দ্রমুখে বলিয়াছেন—

যঃ করোতি বধোদর্কাঃ নিশ্রেয়সকরীঃ ক্রিয়াঃ।
গ্লানিদোষচ্ছিদঃ স্বচ্ছাঃ সমূঢ়ঃ পঙ্কয়ত্যপঃ॥

আমরা সাঙ্খ্যদর্শনের প্রতিকূল মতের উল্লেখ করিতে যাইয়া আরও কতকগুলি প্রতিকূল মত সমর্থন করিয়াছি, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ইহার কোন কোন মত সাংখ্যদর্শনের মতপ্রসূত।

আবার কিন্তু সাংখ্যদর্শনকার শিষ্যের মত শ্রুতির অনুশাসন মস্তকে বহন করিয়া আপনার মতগুলিকে দৃঢ়-ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন। প্রথম সূত্রের "অথ" শব্দটীর মঙ্গলার্থ প্রমাণে শ্রুতির অনুশাসন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বলিয়াছেন "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি।" বাস্তবিক পক্ষে সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহার ভিত্তি শ্রুতিকে লইয়াই গঠিত। দর্শনকার যে প্রকৃতি পুরুষের ছবি আঁকিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড় করিয়া কোন্‌টী কোন্ রঙ্গে চিত্রিত তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহার মৌলিক রঙ্‌গুলি শ্রুতির কারখানা হইতে সংগৃহীত। আত্মার অর্থাৎ পুরুষের সাক্ষাৎ-কারই মুক্তি। এই আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলেই আত্মেতর অথচ আত্মার সহিত যাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গ দেখিতে গেলে প্রকৃতির সহিত পুরুষ একটা দুশ্ছেদ্য বন্ধন আমাদের উপলব্ধি হইবে। পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত এই বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায়স্বরূপ কে প্রকৃতি, কে পুরুষ, এই বিবেকের নামই মুক্তি। এই কথাই সাংখ্যকার নিজ ভাষায় বলিয়াছেন "প্রকৃতিপুরুষয়োর্বিবেকাগ্রহণাৎ সংসারঃ, বিবেকগ্রহণাৎ মুক্তিঃ" আমরা এই দর্শনের পারিভাষিক "বিবেক" শব্দটীর যাথার্থ্য শক্তি লোপ করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছি। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম—দর্শনকার প্রাকৃতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে মোক্ষকে কৈন্দ্রিক বিন্দু করিয়া "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ" ইহাদের প্রত্যেকটী লইয়া অঙ্গুরীয়ক বৃত্ত আঁকিয়া নিজ প্রচলিত মতগুলিকে সাংখ্য নাম দিয়াছেন। সংখ্যাশব্দ হইতে সাংখ্যশব্দের উৎপত্তি। কে কে ইহার সঙ্খের গ্রন্থনাম নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।—

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানিচ চতুর্বিংশৎ যেন সাংখ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

এখন আমাদের দেখিয়া লওয়া আবশ্যক যে শ্রুতির কোন্ উপদেশকে সাংখ্যদর্শনকার আপনার গন্তব্য পথ নির্ণয়ের ধ্রুব নক্ষত্র করিয়াছিলেন। শ্রুতি গাহিয়াছেন "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এ সম্বন্ধে প্রমাণও উক্ত হইয়াছে। শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ মন্তব্য শ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বাচ সততং ধ্যেয়

এতে দর্শনহেতবঃ॥ শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রবণ উপপত্তি হইতে মনন তদনন্তর যোগশাস্ত্র প্রকারে ধ্যান করিতে হইবে তবেই আত্মসাক্ষাৎকারে পঁহুছিতে পারা যাইবে অতএব এখন আমরা দেখিতে পাইলাম দর্শনকারের সুদৃঢ় ভিত্তি শ্রুতিকে লইয়াই গঠিত এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন—"শ্রুত্যবিরোধিনীরূপপত্তীঃ ষড়ধ্যায়ীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্ত্তির্ভগবান্ উপদিদেশ।"

ইহাদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ভাষ্যকার ষড়ধ্যায়ীরূপী বেদশাস্ত্রের অবিরোধী বলিয়া সাংখ্যদর্শনকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথচ কিন্তু আমরা দেখিয়াছি স্থলবিশেষে শ্রুতির বিরোধী মতও ভাষ্যকার অনুমোদন করিয়াছেন। একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, এই বিরোধী স্থলে গৌণমুখ্য ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ যে মতটী দর্শনের বিরোধী, শ্রুতির সেটীই গৌণ-মন্তব্য অপরগুলি মুখ্য। কেহ কেহ বলেন ভাষ্যকার শ্রুতির অবিরোধী দর্শন এই কথা প্রমাণ করিতে গিয়া যে "উপপত্তি" শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহা শ্রুতির যুক্তিযুক্ত তাহাই দর্শনের গ্রাহ্য। আমরাও এই কথায় সায় দিয়া বলিতে পারি দর্শনকার স্বাধীনভাবে আপনার গন্তব্যপথে নৌকা চালাইতে গিয়া অনুকূলে পাল টানিয়াছেন, প্রতিকূলে গুণরজ্জু ধরিয়াছেন।

দর্শনকার প্রমাণ্যবাদে জৈমিনীকেও প্রতিকূলমুখে রাখিয়াছেন। জৈমিনী যে ছয়টী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিতে গিয়াছেন, সাংখ্য সে ছয়টী প্রমাণের অর্দ্ধ বন্দোবস্ত করিয়া প্রমাণ বাহুল্যে নিরাবশ্যকতা ঘোষণা করিয়াছেন, জৈমিনীর অর্থাপত্তিকে অনুমানের ভিতরে এবং বাদবাকী সম্ভব, অভাব, প্রতিভা, ঐতিহ্য উপমা, এই পাঁচটীকে আপ্তবচনের ভিতর নির্দ্দেশ করিয়া দর্শনকার প্রত্যক্ষ বলিয়া আরও একটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অন্তর্ভাবের কারণ নির্দ্দেশ সম্ভব নহে বলিয়া আপাততঃ ইহা হইতে আমরা ক্ষান্ত রহিলাম। সাংখ্যদর্শনকে আমরা চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায় চারিটী ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন রোগ, আরোগ্য, রোগনিদান ও ঔষধ এই কয়টী লইয়াই গঠিত, দর্শনশাস্ত্রও সেইরূপ হেয়, হাণ, হেয়হেতু, হাণোপায় এই চতুষ্টয়ের অভিব্যক্তি। ব্যাধি হইলে যেমন তাহার দূরীকরণ আবশ্যক এবং এই দূরীকরণের নামই আরোগ্য, সেই আরোগ্য করিতে হইলে নিদান,পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি, এই পঞ্চাবয়বাত্মক নিদান নির্দ্দেশ আবশ্যক ও তদনুযায়ী ঔষধ প্রযুজ্য। দর্শনেরও চতুষ্টয় ব্যূহ এইরূপ। এই কথাটা পরিস্কাররূপে বুঝিতে হইলে দর্শনের পারিভাষিক ব্যূহচতুষ্টয় কি বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। হেয় বলিয়া যাহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই "ত্রিবিধদুঃখ"। ইহার ব্যাধির সাদৃশ্যে বোধ হয় সকলেই একমত হইবেন। "হাণ" ইহার নামান্তর মোক্ষ ইহার সহিত আরোগ্যের তুলনা করা হইয়াছে, এই তুলনায় একটু সামঞ্জস্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আরোগ্য হইলে পুনরায় ব্যাধির উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু মোক্ষের পুনরাবর্ত্তন অসম্ভব। এইরূপ স্থলে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে অনুপমেয় মোক্ষের সহিত একটী উপমা দিতে যাওয়া কথঞ্চিদ্রূপে বুঝিবার ব্যবস্থা মাত্র। এইরূপভাবে অবিবেকরূপী হেয়হেতু এবং বিবেকখ্যাতিরূপী হাণোপায় ইহাদের সহিত যথাক্রমে রোগনিদান ও ঔষধের দৃষ্টান্তের নিকাশ বুঝিয়া লইয়া যাইতে পারে।

দর্শনকার এইরূপ চারিটী ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া আপনার স্বাধীন মত বজায় রাখিয়া অনেকের সহিত এইরূপ খটকা বাজাইয়াছেন, বিজ্ঞানভিক্ষু সালিশ সাজিয়া কোন কোন স্থলে মীমাংসা করিয়াছেন। আমরা বারান্তরে সেই মত গুলি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ।

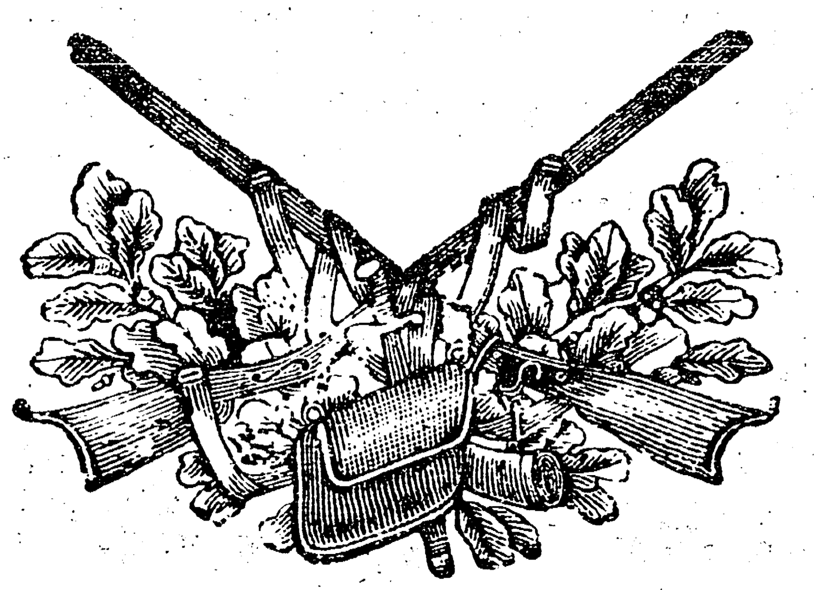

অনন্ত রামায়ণ।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় সংখ্যা প্রদীপে "ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রাচীন কবি" শীর্ষক প্রবন্ধে কবি অনন্ত কন্দলির বিষয়ে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সুতরাং ঐ কথাগুলির পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি কবি অনন্ত কন্দলির রামায়ণের "কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড" সংগ্রহ করিয়াছি। এই কবির বিষয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ১১২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অবলম্বন শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত পুঁথি। উক্ত পুঁথিতে বা করুণা বাবুর বক্তব্যে কবির বিষয় কিছু না থাকায় দীনেশ বাবুকে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয় তাঁহার অনুমান অনেকাংশে সত্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। যথাঃ—"আমরা ইহা ন্যূন পক্ষে ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত * * * অনুমান করি।" * * * আমরা এই পুস্তকের প্রণেতাকে বঙ্গের পূর্ব্বোত্তর * * * কোন পল্লীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।" আমরাও তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" পরবর্ত্তী সংস্করণে তাঁহার অনুমান সত্যসিদ্ধ করিয়া লইবেন। এ বিষয়ে আর কিছুই বলিবার নাই। নিম্নে পুঁথি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠকবর্গ কবির কবিত্ব ভাষা প্রভৃতির যথাবিহিত বিচার করিবেন।

সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা।

* * *

দিব্য ধনু ধরিবক্ৰোঁ, ঘোর শর প্রহারিবো
পৃথিবী পাতাল বিদারিবো।
অনন্তক যুজিবোহো, ত্রিভুবন কপাবোহো
ত্রিদশর ভয়ক জন্মাইবো॥
শরে শরে বিদারিবো, সমুদ্রক শুখাইবো
রাক্ষস কুলক লাগ পাইবো।
রাবণক লাগ পাইবো, দশশির কুটীবো
রিপুকুল সমস্তে দহিবো॥ ৫০॥
অলৌকিক উদ্ধারিবো, নিজ বীর্য্য প্রকাশিবো
মিত্রর হরিষ দরশিবো।

* * *

তারার শাপ।

"তারা বোলে প্রভুরাম করিলাহা কিক।
নিদারুণ ব্যাধ যেন বধিলা বালীক॥
দেখা মহাশান্তি মোর শোকে তনু কম্পে।
তোমাকো দহিবো পারো পতিব্রতা শাপে॥
তোমাক দহিলে কিন্তু নির্জীবন্ত স্বামী।
তাতে সে তোমাক ভৎসনা করিলো আমি॥
হেন জানিয়া ন জানা ন করা পাপ।
তোমাক দিবোহো গোসাই অনুরূপ শাপ॥
মোক যেন স্বামী সহে রহে বঞ্চিলাহা।
তুমিয়ো সীতার সঙ্গে রহ না পাইবাহা॥"

* * *

শুনিয়োক সভাসদ পদ রামায়ণ।
ভাই ভাই দেখা কেনে মিলে মহারণ॥
বিষয় সুখর মদে নছাড়ে অন্যাই।

* * *

মই কেনে মূঢ়মতি দেখিয়ো সভাসদ।
মহামূর্খ হুয়া করো রামায়ণ পদ॥
হেন জানি তেজিয়োক বিষয় আক্রোশ।
কৃষ্ণে জেন দেন্ত হুই তাহাত সন্তোষ॥
সুখে দুখে না চারিব * হরির চরণ।
হতো ঘোর সংসারত হরিশে তারণ॥

* * *

অনন্ত কন্দলি কহে এহি মূল কাম।
গুচোক আপদ বোলা রাম রাম॥

* * *

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি।

৩। বলরাম দাস

প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠে একাধিক বলরাম দাসের পরিচয় পাওয়া যায়—সকলেই কিছু স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন :—

বৈষ্ণববন্দনায় তিন জন বলরামের নাম উল্লেখ আছে।

(১) "সঙ্গীত কারক বন্দ্যো বলরাম দাস!
নিত্যানন্দ ধর্ম্মে যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস॥"

(২) কানাই খুটিয়া বন্দো বিশ্বের প্রচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥

(৩) বন্দো উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম বশ যার হয়॥

(৪) মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, এক বলরাম দাস তাঁহাকে সিঙ্গা বাজাইয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

"রাম সিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত।
বলরাম দাস আসে হ'য়ে পুলকিত॥"

গোবিন্দ দাসের করচা।

(৫) অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল।

(৬) "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য কবিপতি বলরাম নামধেয় আর এক জন বলরাম দাসকে পাওয়া যায়।

(৭) শ্রীনিবাস শাখায় আর এক জন বলরাম দাস ছিলেন।

(৮) "নরোত্তম বিলাসে" পূজারি বলরাম বলিয়া নরোত্তম ঠাকুরের এক শিষ্যের নাম দেখা যায়।

(৯) গোয়াড়ী নিবাসী বলরাম দাস নামক জনৈক হাড়ী দারবান বলরামভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, ঐ সম্প্রদায় আজিও নদীয়া, বর্দ্ধমান, পাবনা, প্রভৃতির স্থানে স্থানে বসবাস করিয়া থাকে।

(১০) কবিকঙ্কণ উপাধিধারী জনৈক বলরাম মুকুন্দ রামের পূর্ব্বে চণ্ডী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, মেদিনীপুর অঞ্চলে ঐ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল।

(১১) বৈষ্ণব বন্দনায় বলরাম মহোতির নাম পাওয়া যায়।

পদকর্ত্তা বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ইঁহাদের ছিল না; নিম্নে দুই জনের কবি বলিয়া খ্যাতি ছিল :—

১। কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছী গ্রামনিবাসী নিত্যানন্দশিষ্য বলরাম দাস। কবিরাজ গোস্বামীর স্বরূপ বর্ণন নামক গ্রন্থে দেখা যায় :—

"মন্দির মার্জ্জনা করে সুমন্দিরা সখী।
এবে তাঁর বলরাম দাস খ্যাতি লিখি॥"

"ভাবামৃত মঙ্গল" গ্রন্থে যথা :—

"জয় প্রভুপ্রিয় বলরাম দাস।
সঙ্গীতপ্রবীণ দোগাছিয়া যার বাস॥"
"জয় দ্বিজ বলরাম দোগাছিয়াবাসী।
গৌরগুণগানে যেই মত্ত দিবানিশি॥"

২। কিন্তু আর এক জন উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন কবি ও পদকর্ত্তা চৈতন্যের সমসাময়িক, শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহারই জীবনী ও কবিত্বের পরিচয় লইতে আমরা আসিয়াছি। ইনিই বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপরিচিত "প্রেমবিলাস" গ্রন্থপ্রণেতা—সেই গ্রন্থে তিনি এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।

"মাতা সৌদামিনী, পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক।
পিতা মাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোনও চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাই॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈলা আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিল।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা।

ইহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম দাস; পিতামাতার এক সন্তান, শৈশবেই দুই জনে

তাঁহাকে অনাথ করিয়া গেলেন। জাতিতে বৈদ্য ও নিবাস শ্রীখণ্ড গ্রামে। এবং ইহাও বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বপ্ন অনুযায়ী তিনি জাহ্নবী ঈশ্বরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক উভর উন্নতিই সাধন করিয়াছিলেন। নিম্নে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

মোর দীক্ষা গুরু হয় জাহ্নবী ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি॥

তাঁহার পূর্ব্বনাম বলরাম দাস ছিল, দীক্ষার পর গুরুদত্ত নিত্যানন্দ দাস নাম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা আত্মারাম দাস সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র জানিতে পারি যে, তিনি এক জন নিত্যানন্দভক্ত ও গৌরাঙ্গ দেবের সামসময়িক ছিলেন। ইনিও একজন পদকর্ত্তা, ইহার কয়টীমাত্র পদ আমরা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি, কয়টী "পদকল্পতরু"তে আছে একটী পাঠকগণকে উপহার দিতেছি :—

"অঞ্জন গঞ্জন, লোচনরঞ্জন, গতি অতি ললিত সুঠান।
চলত খলত পুন, পুন উঠি গরজন, চাহনি বঙ্ক নয়ান॥
গৌর গৌর বলি, ঘন দেই করতালি, কঞ্জনয়ানে বহে লোর।
প্রেমেতে অবশ হইয়া, পতিতেরে নিরখিয়া,
আইস আইস বলিয়া দেই কোর॥
হুহুঙ্কার গরজন, মালসাট্ পুন পুন, কত কত ভাববিথার।
কদম্ব কেশর জনু, পুলকে পূরিল তনু,
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার॥
আগম নিগম পর, বেদ বিধি অগোচর,
তাহা কৈল পতিতের দান।
কহে আত্মারাম দাস, না পাইয়া কৃপা লেশ,
রহি গেল পাষাণ সমান॥"

এই বলরাম দাস সম্বন্ধে উল্লেখ বহু গ্রন্থে পড়িয়া যায়—তাহা হইতে ইনি যে কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন তাহা অনুমান করা যায়। "পদকল্পতরু"র ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে "কবিনৃপবংশজ, ভুবনবিদিত যশ, জয় ঘনশ্যাম বলরাম।" এই বলরাম কবিরাজের বিষয় "নরোত্তম বিলাস" গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব বন্দনায় ইনিই যে সঙ্গীতকারক ও নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ইনি এক জন ভক্তপ্রবর ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি ভক্তি অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। সেই প্রেমিক, ভক্ত, কবি সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবৎ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

"প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ পায় নাশ॥"

চৈতন্য ভাগবৎ, অন্ত্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়। "চৈতন্য-চরিতামৃতে" :—

"বলরাম দাস কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদী॥"
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥"

সেতুরীর প্রসিদ্ধ মেলাস্থলে জাহ্নবী দেবী ও অন্যান্য নিত্যানন্দভক্তগণ সঙ্গে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ ও বিজ্ঞবর বলিয়া পরিচিত। যথা "ভক্তি রত্নাকরে" :—

"মুরারী চৈতন্য জ্ঞানদাস মহীধর।
পরমেশ্বর দাস বলরাম বিজ্ঞবর॥"

তাঁহার "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে ঐতিহাসিক অংশ অত্যন্ত অল্প, তাহা প্রধানতঃ কবিকল্পনায় পূর্ণ। বিষয়বর্ণন প্রভৃতিতে গ্রন্থকারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি প্রধানতঃ শ্রীনিবাস প্রভুর ও শ্যামানন্দের বিষয় লইয়া রচিত, ইহা বিংশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। "প্রেমবিলাস ছাড়া "গৌরাঙ্গাষ্টক," "বীরচন্দ্রচরিত," "রসকল্পসার" "কৃষ্ণলীলামৃত" ও "হাটবন্দনা" নামক আরও পাঁচখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন।

"তৃতীয় সময় কালে, বন্দন সে হাতে গলে
পুত্র কলত্র গৃহবাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে,
হরি পদে না করিনু আশ॥"

এই পদাংশ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, যে তিনি পুত্রকলত্র লইয়া বোধ হয় সংসারী হইয়া ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বংশাবলীর কোনও সন্ধান আমরা পাই নাই। সম্ভবতঃ ১৫৩৭খৃঃ তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে।

কবিত্ব।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের পরেই বৈষ্ণব কবি ও পদকর্ত্তাগণের মধ্যে বলরাম দাসের নাম উল্লেখ-যোগ্য সন্দেহ নাই।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর মত বলরাম দাসেরও কবিতা

কবিহৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত ভাবধারা! চণ্ডীদাসের মত তাহাতে ভাবের গভীরতা নাই সত্য, এবং বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবিতাসুলভ অসাধারণ শাব্দিকতা, ছন্দের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার, চরিত্রচিত্রণের সুন্দর বর্ণচ্ছটা বিরল বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার সরল বর্ণনা, মধুর ভাবাবেশ প্রেম ও আবেগে ভাবোচ্ছ্বাস হৃদয় হরণ করে।

গোবিন্দদাসের এই স্থলে বিদ্যাপতির অনুকরণের ছায়া পড়িয়াছে কিন্তু বলরাম দাসের কবিতা সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না; ভাল হউক, মন্দ হউক, সমস্ত কবিতার ভাবগুলিই তাঁহার নিজস্ব। দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইতেছি :—

শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনমুগ্ধা রাধিকা বলিতেছেন :—

"কি বা সে নয়নবাণ হিয়ায় হানিল গো,
গরল ভরিয়া রৈল বুকে॥"

"কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালরূপখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥"

"ভাবেতে বিভোর তনু গদ্‌গদ বাণী।
ধরিতে ধরণ না চায় দু'টী আঁখির পানী॥
ও চন্দ্র মুখের হাসি আধ আধ বোলে।
হিয়ার ভিতরে প্রাণ নিরবধি দোলে॥"

শ্রীরাধিকাকে যাইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—এমন মোহিনী রূপরাশি লইয়া চরণকমল দলিত করিয়া হে সুন্দরী তুমি কোথায় চলিয়াছ? আমার ভয় হয় পাছে—

"চাঁচর চিকুরে বেণী দোলিছে কোমরে।
ফণির ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে॥
করি কুম্ভ জিনি তার কুচ যুগ গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥
সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়।
রবি শশী বলি পাছে রাহু পরসয়॥
নীল উড়নির মাঝে মুখ শোভা করে।
কমল ভরমে পাছে দংশিবে ভ্রমরে॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভালে শোভে।
নিধিবেক ব্যাধে হেম হরিণীর লোভে॥
মণিময় আভরণ অঙ্গে ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি॥"

তাহার অপেক্ষা তুমি এই তরুতলে উপবেশন কর আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় একবার দেখি। কতবার কতরূপে তোমায় দেখিয়াছি কিন্তু তৃপ্তি পাইলাম কই? কেননা :—

"তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি॥
কোটী কল্প যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥"

প্রভাত বর্ণনার দু' একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতেও বর্ণনার ঘটা নাই,—কল্পনার বিপুল ছটা নাই,—অথচ বিনা আয়াসে সুন্দর চিত্রগুলি কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

ঝামর দীপ, সুধাকর ধূসর,
দিশি ভরু অরুণীম কাঁতি।
কুমুদিনী ছোড়ি নলিনীগণে ধায়ই
আকুল মধুকর পাঁতি॥"

স্থানান্তরে,

"মধুর সময় রজনী শেষে
শোহই মধুকর কানন দেশে
গগনে উয়ল মধুর মধুর
বিধু নিরস কাঁতিয়া।
মধুর মাধুরী কেলি নিকুঞ্জ।
ফুটল মধুর কুসুম পুঞ্জ।
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী,
মধুর মধুহি মাতিয়া॥
মধুর পবন বহই মন্দ,
কুজয়ে কোকিল মধুর ছন্দ,
মধুর বিহসি শরদ সুভগ,
নদহ বিহগ পাঁতিয়া।
মধুর মিলন খেলন হাস,
মধুর মধুর রস বিলাস,
মদন হেরই ধরণী লুটই
বেদন ফুটত ছাতিয়া!"

আর এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বিকসিত কুসুম ঝরই মকরন্দ।
সব বন পবন পসারল গন্ধ॥
মধু পিবি ধাবই মধুকরপুঞ্জ।
গায়ই ভ্রমি ভ্রমি কেলি নিকুঞ্জ॥"

শ্রীরাধিকার রূপবর্ণন উপলক্ষে কবি বলিতেছেন—

"যাকর মাঝ হেরি মৃগরাজ।
ভয়ে পৈঠল গিরিকন্দর মাঝ॥
শুনইতে সচকিত সবহুঁ মতঙ্গ।
চরণহি সোঁপল নিজ গতি ভঙ্গ॥
আনি দেই নিজ লোচন ভঙ্গী।
বন পর বেশল সবহুঁ কুরঙ্গী॥"

তাঁহার মাজা দেখিয়া মৃগরাজ ভয়ে গিরিকন্দরে প্রবেশ করিল। হস্তীগণ সচকিত হইয়া আপন আপন গমন ভঙ্গী তাঁহার পদতলে সমর্পণ করিল। সমস্ত কুরঙ্গী আপন আপন নয়ন ভঙ্গী তাঁহাকে প্রদান করিয়া বনে প্রবেশ করিল।"

নায়িকার পূর্ব্বরাগে কবি সযত্ন। তাঁহার তুলিকায় চিত্রে প্রতি রেখাটুকু পর্য্যন্ত কি সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—রাধিকা বলিতেছেন "সে অমরবাঞ্ছিত রূপ কেন দেখিলাম?"

তাহার,

'প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়নকোণে জাতিকুল নাশে॥
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কিকহিব কায়॥'

যদি দেখিলাম ত পাইলাম না কেন? কেন মজিলাম কেন মরিলাম?"

তাহার পর সেই প্রেমে তন্ময়, বিরহে ম্লান, মিলনাশায় অধীর, রূপে মুগ্ধা, রাধিকার চিত্রটী আমরা সমস্ত উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহা হইতে বলরাম দাসের বর্ণনা কেমন সরল আন্তরিকতাপূর্ণ, কেমন হৃদয়গ্রাহী তাহা বুঝা যাইবে :—

"শুনইতে কানহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদ্‌গদ্ উতর না নিকয়ই,
কহইতে সজল নয়ান॥
সখীহে কি ভেল এ বরনারী।
করহুঁ কপোল থকিত রহুঁ ঝামরী
জনু ধনহারী জুয়ারি॥ ধ্রু।
বিদুরল হাম রভস রস চাতুরী,
বাউরী জনু ভেলি নাগরি।
খনে খনে দীঘ নিশথি তনু মোড়ই
সঘন ভরম ভেলি ভোরি॥
কাতর কাতর নয়ানে নেহারই,
কাতর কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন,
ঝর ঝর এ দুই নয়ানী॥
ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহি কাঁপ।
বলরাম দাস কহে, জানলুঁ জগমাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥"

প্রেমের চিত্র উপরে দেখাইয়াছি তাহাতে মধুর রসধারা ক্ষরিত হইয়াছে—নিম্নে গোষ্ঠলীলার দু'একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে সখ্য বাৎসল্য রসের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে :—

শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সখাগণ সঙ্গে গোচারণে চলিয়াছেন :—

কবি বলিতেছেন রামকৃষ্ণ একসঙ্গে চলিয়াছেন, তাই যেন :—

"ঘনাঞা ঘনঞা কাছে, আনন্দে ময়ূরী নাচে,
চাঁদে মেঘে দেখি এক সঙ্গ।"

স্থানান্তরে, নটবর নব কিশোর রায়,
রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে,
ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে,
হৈ হৈ হৈ ঘনয়ে বোলত,
মধুর মুরলী বায় গো।

নীল কমল বদন চান্দ,
ভাওর ভঙ্গিম মদন ফান্দ,
কুটিল অলকা তিলকা ভাল,
ফলিত ললিত তায় গো॥
চূড়ে বরিহা গোকুলচন্দ,
কিবা পবন বায় মন্দ মন্দ,
মধুকর মন হ'য়ে বিভোর,
নিরখি নিরখি ধায় গো॥
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি,
হেরি হেরি পালটি পালটি,
নাগোরী নগোরী থোরি থোরি,
আন নাহিক ভায় গো॥
বলরাম দাস করতহিঁ আশ,
রাখাল সঙ্গে সদাই বাস,
বেত্র মুরলী লইয়ে খুরলি,
সঙ্গে সঙ্গে যায় গো॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিতে নন্দরাণীর হৃদয় আকুল হইয়া উঠিতেছে—তিনি বলিতেছেন—তাহাতে স্নেহাকুল মার হৃদয়খানি কি সুন্দর বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে ঃ—

"শ্রীদাম সুদাম দাম, শুনরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বনকত অতি দূর, নব তৃণ কুশাঙ্কুর,
গোপাল লৈইয়া না যাইহ দূরে॥
সমাপন আগে পাছে, গোপাল করিয়া মাঝে,
ধীরে ধীরে করিছ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে, রাঙ্গা পায় জানি লাগে,
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখো, মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিধি কৈল গোপজাতি গোধন পালনবৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব।"

এবার গৌরলীলাত্মক দু' একটী পদ তুলিয়া আমাদের এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি—

কবি বলিলেন ঃ—
"প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে, অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে,
চৈতন্য বাতাসে উথলিল।
আকাশে লেগেছে ঢেউ, স্বর্গে নাহি বাঁচে কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল॥"

শ্রীগৌরচন্দ্রের রূপ বর্ণনা উপলক্ষে কবি বলিতেছেন ঃ—
"বিহরে আজু রসিকরাজ,
গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ,
কুঞ্জকেশর পুঞ্জ উজোর,
কনক রুচির কাতিয়া।
কোটি কামরূপ ধাম,
ভূবনমোহন লাবণি ঠাম,
হেরত জগত যুবতী উমতি,
ধৈরজ ধরম তেজিয়া॥
অসীম পূর্ণিম শরদচন্দ,
কিরণ মদন-বদন ছন্দ,
কুন্দ কুসুম নিন্দি সুষম
মঞ্জু মদন পাঁতিয়া।
বিম্ব অধরে মধুর হাসি,
বমই যতইহ অমিয়া রাশি,
সুধই সিধু নিকর নিঝর
বচন ঐছন ভাঁতিয়া।
আবেশে অবলা অলস ধন্দ
চলত চলত খলত মন্দ,
পতিত কোর জড়ত ভোর
নিবিড় আনন্দে মাতিয়া।
অরুণ নয়ানে করুণ চাই,
সঘনে জপয়ে রাই রাই,
নটত উমত লুঠত ভ্রমত,
ফুটত মরম ছাতিয়া।"

স্থানান্তরে ঃ—

"গৌর মনোহর নাগর শেখর।
হেরইতে মুরুছই অসীম কুসুমশর॥
কাঞ্চন রুচিভর রচিত কলেবর।
মুখ হেরি রোয়ত শরদ সুধাকর॥
জিনি মত্ত কুঞ্জর গতি অতি মন্থর।
অধর সুধার সে মধুর হসিত ঝর॥

* * * *

অতিরসে গর গর না চিনে আপন পর।
রোয়ত করে ধরি পতিত নীচতর॥
ও রস সাগরে মগন সুরাসুর।
বিন্দু না পরশন বলরাম দাস পর॥"

পরিশেষে প্রেমোন্মত্ত গৌরাঙ্গ দেবের মধুময় মূরতি-বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম, ইহা হইতেই পাঠক বলরাম দাসের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইবেন সন্দেহ নাই ঃ—

"নাচত গৌর সুনাগর মনিয়া।
খঞ্জন গঞ্জন, পদযুগ রঞ্জন,
রণ রণি মঞ্জীর মঞ্জুল ধনিয়া॥
সহজই কাঞ্চন, কাঁতি কলেবর,
হেরইতে জগজন মনমোহনীয়া।
তহিঁ কত কোটি, মদনমন মুরুছল,
অরুণকিরণ অম্বর বলিয়া॥
ডগমগ দেহ, সেহ নাহি বান্ধই
দুহুঁ দিঠি সেহ সঘনে বরি খলিয়া॥
প্রেমক সায়রে, ভুবনে মজায়ই,
লোচনকোণে করুণ নির খনিয়া॥
ও রসে ভোর ওর নাহি পাওই
পতিত করে ধরি ভুবন বিরাজি।
কহ বলরাম লম্ফ ঘন হুঙ্কৃতি,
হেরি পাষণ্ড হৃদয় অতি কাঁপি॥

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

সিংহল দ্বীপ।

লঙ্কার কথা।

লঙ্কা ভারত ছাড়া বিশেষতঃ এদেশে বড় কেহ আসে না। সকলেই বোধ হয় মনে করে লঙ্কায় গেলে জাত যায়; তার একটা কথা আছে, সাধারণতঃ কলিকাতা হইতে জাহাজে চড়িয়াই লঙ্কায় যায় তাই আমাদের এ ভ্রান্ত ধারণা হইবে আশ্চর্য্য কি? স্থূল কথা, লঙ্কায় গেলে জাত যায় না। রেলে মাদুরা পর্য্যন্ত গিয়া পরে গো-রথে যাওয়া যায়। তার পর রামনদ হইতে এক পথ পামবেন্ পর্য্যন্ত গিয়াছে, তথা হইতে বাষ্পীয় জলযানে উঠ, তার পর ক্রমে কতকগুলি দ্বীপ ইহাদেরই নাম সেতুবন্ধ। মহারাজ রামচন্দ্র লঙ্কাবিজয়ী হইয়া ফেরত হইবার সময় তাঁহার পূর্ব্বকৃত সেতুবন্ধ ভগ্ন করিয়া আইলেন। তাই মাঝে মাঝে সেতুবন্ধ ভগ্ন। দুই চারি দণ্ড জাহাজে চড়িলেই এক একটী দ্বীপ পাওয়া যায় এ দ্বীপে মানুষ, হাট, বাজার, কাছারী সবই আছে। এক একটা দেশ আর কি? ইহার একটীর নাম জাফনা পট্টম, ও একটীর নাম মান্নার আর গুলির নাম মনে নাই। এই সকল দ্বীপে এক দিন বিশ্রাম করিয়া গেলে আর জাত যাওয়ার ভয় নাই। লঙ্কায় যাইবার অনেকগুলি পথই গিয়াছে। টুটিকরিন, ট্রিভানড্রাম, গোয়া, মেঙ্গালোর, পাম্বিম, নেগাপট্টম, পণ্ডিচারী প্রভৃতি অনেক স্থান হইতেই বাষ্পীয় রথে জল-পথে যাওয়ার সুবিধা আছে। যাহারা ওয়েষ্ট কোষ্ট হইতে আসেন তাহারা একবারে কলম্বো নামেন, আর যাহারা ইষ্ট কোষ্ট হইতে যান তাহারা বাটী কালোরা, পায়ন্টডি—গেলি, মাতোরা, অথবা কলম্বোতে অবতরণ করিয়া থাকেন। কলম্বো নামিয়া কাণ্ডি যাওয়াই সুবিধা। লঙ্কা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া অনেকে জল বায়ু পরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যে আমাদের দেশ হইতেও এখানে আসিয়া থাকেন।

লঙ্কার মানুষ আমাদের মানুষের মতই। আমরা দিনের বেলায় কলম্বো নগরীতে অবতরণ করিলাম। নবম দেখিলাম—যে ট্রেণখানা জাহাজের যাত্রী লইয়া

যায়, জাহাজের বিলম্ব দেখিয়া তাহা চলিয়া গিয়াছে ; পুনরায় জাহাজে আসিয়াই শুইয়া পড়িলাম, কলম্বোতে রেলও জাহাজের ষ্টেসন দুইই আছে, ষ্টেশনটী ভারি সুন্দর, এমন বুঝি আর নাই। রেল গাড়ী জাহাজের এত নিকট আসিয়া দাঁড়ায় যে, জাহাজ হইতে জোরে ফেলিয়া দিলে জিনিষ পত্র গিয়া ট্রেণে পড়ে আর কি, সমুদ্র-বাত্যায় আমার কোন ব্যারাম বা অসুখ বিসুখই হয় নাই। লঙ্কায় খাদ্য দ্রব্য ভারত অপেক্ষা অনেক সস্তা। এখানকার লোকেরা ভাতই বেশী খায়। এখানে কয়েকটী বাঙ্গালী কার্য্য উপলক্ষে আছেন, অনেকে স্ত্রী পরিবার লইয়াই আছেন। এখানকার বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনা। ইহার কথা এই যে, এখানে ত আর বাঙ্গালী নাই তাই তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ স্বাধীনা হইয়া বসিয়াছেন। সমুদ্রতীরে হাওয়া খাওয়া ইহাদের অভ্যাস। এখানে যে কয়টী বাঙ্গালী হিন্দু আছেন তাহাদের হিন্দুয়ানীর লেশমাত্র আছে বুঝিলাম না। স্বাধীনা রমণীরাও তেমনই। লঙ্কায় চিরকাল বসন্ত বিরাজ করিতেছে কথাটা ঠিক্ কিন্তু সোনার লঙ্কা কথাটা কেন হইয়াছিল তা বুঝিতে পারি নাই। তবে আমাদের "সোনার ভারত" এইরূপ যদি হইয়া থাকে।

রাম-রাবণের কথা লঙ্কাবাসীরা আদপেই জানে না বাস্তবিক ইহারা যে লঙ্কার প্রকৃত ইতিহাস জানে তাহাও বিশ্বাস হইল না। লঙ্কায় বৌদ্ধ মানুষই বেশী। মুসলমান খৃষ্টান হিন্দুও আছে। এখানে পালি ভাষার চলন তবে তাহারা হিন্দি কথাবার্ত্তা বুঝে ও কহিতেও কিছু কিছু পারে তাই রক্ষা, যেমন আমাদের দেশে হিন্দি চল, এখানেও তেমনই। হিন্দুস্থানীরা এখানে বাণিজ্য করিতে বাস করে। রাজ পুতনার লোকেরা এখানে মণি, মুক্তা ও ঝিণুকের ব্যবসায় করে। আর বাঙ্গালীরা চাকরী বাকরী করে। এখানকার সন্মানী বৌদ্ধেরা মাথায় চিরুণী বাঁধে। তা এক জনের মাথায় দুই চারিটী চিরুণীও আছে। যে লোক একখানি চিরুণী মাথায় বাঁধিবার উপযুক্ত সে যদি দুই খানি বাঁধে তবেই গোল, তখন তাহার উপর নানারকম শাসন উপস্থিত হয়। যার মাথায় যত বেশী চিরুণী তিনি তত বেশী সন্মানী। চিরুণী থাকাটা সন্মানের লক্ষণ, সিংহলীরা আমাদের মত কাপড় পরে না। সে আর এক রকম নীচে একটা কৌপিনের মত আর গায় চায়না কোটের মত জামা। এখানকার লোকের মধ্যে যাহারা ইংরেজের চাকরী করে তাহারা প্রায় সকলেই খৃষ্টান হয়। খৃষ্টান হইলে ভাল চাকরী পাওয়া যাইবে আর সাহেবেরা ভাল বাসিবে এই বিশ্বাস। আর যেই চাকরী গেল তখনই যেই বৌদ্ধ সেই। একটী পরিবারের মধ্যে এক জন হয়ত খৃষ্টান আর সব বৌদ্ধ, কেহ কাহাকে কোন বিষয়ে ঘৃণা করে না। কেবল উপাসনার সময় পৃথক ঘরে—খাওয়া দাওয়া সবই একত্রে। এই সিংহলীরা বড় আমোদী। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন কলিকাতার কয়েকটী বাবু তথায় স্বাস্থ্য-উন্নতির জন্য গিয়াছিলেন।

সিংহলে বেশ মসল্লা পাওয়া যায়। এলাচ দারুচিনি লবঙ্গ প্রভৃতি এখানে প্রচুর ও অতি সুলভ। সিংহল, যাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি হইতেই এই সকল আসিয়া ভারতে আমদানী হয়। সিংহলে এই ব্যবসা প্রধান, তা ছাড়া মণি, মুক্তা ঝিনুকের ব্যবসাটাও বেশী। এখানে আদত এলাচ প্রভৃতির দাম খুব সুলভ। আমরা ভারতে আদত এলাচ পাই না। এই সকলের আরক ছাড়াইয়া আসল মাল বাহির করিয়া রাখিয়া দেয় পরে আমরা পাই। সিংহলে মণি, মুক্তার কারবার যথেষ্ট আছে এই সকল কারবারে মাড়োয়ারীগণই যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে।

সিংহলে বার মাস বসন্ত তাই ইহার স্বাস্থ্য ভাল। তাই ভারতের লোকেরা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সে দেশে যায়। এখানে মাছ বড় প্রচুর ও সস্তা। নানারকম সামুদ্রিক মাছ আছে, কত রকম মাছ দেখিয়াছি তা আগে জানিতামও না দেখিও নাই। সামুদ্রিক টেপা মাছ খাইতে বড় স্বাদু। সামুদ্রিক ইলিশ, রুই প্রভৃতি খাইতে তেমনই। এখানে উড্ডীয়মান মৎস্য পাওয়া যায়। এই মাছেরা জলের উপর উড়িয়া যায়। মাছের যে ডানা থাকে, ইহাদের ডানাগুলি অপেক্ষাকৃত বড়, তাহাতেই পাখার কাজ করে আর উড়িতে পারে। তাহাও বাজারে বিক্রয় হয়। এ মৎস্যের প্রতি আমাদের পূর্ব্ব হইতেই ঘৃণা ছিল তাই আমরা খাই নাই।

কত আশাই যে করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছিলাম সোনার লঙ্কা, সোনার রাবণের পুরী দেখিব, সজীব বিভীষণ পাইব। কই তাত কিছুই নাই। কেবলই মাটি আর

পাথর। রাক্ষসও নাই, সে রাম, রাবণ কিছুরই চিহ্ন লঙ্কায় পাইলাম না, আমার বড় আশায় ছাই পড়িল। আর এক কথা, এখানে কাণ্ডি সহরের কাছে একটা জঙ্গলের ভিতর অতিশয় বৃহৎ প্রস্তরের প্রাচীর পাওয়া যায়। আমরা অনুমানের সাহায্যে তাহাকেই রাবণের বাড়ী ধরিয়া লইলাম। এখানে এক প্রকার অসভ্য মানুষ আছে, তাহারা অর্দ্ধ উলঙ্গ, অসভ্য, সভ্য সিংহলীদের ভাষা হইতে ইহাদের ভাষা পৃথক। সিংহলে সামান্য রকম পাহাড় আছে। এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশেই অসভ্যেরা বাস করে। অনুমানের বলে তাহারই আমাদের নিকট রাক্ষস। লঙ্কায় অনেক বাঁনর আছে ইহারা দিন রাত মানুষকে বড় উপদ্রব করে। মানুষেরা তাদের জ্বালায় অস্থির ও জ্বালাতন হয়।

লঙ্কাটা এখন ষোল আনাই ইংরেজের। ইংরেজদের এখানকার বিচার আচার উত্তম। আমাদের আইন কানুনের মতই তবে একটু পৃথক। এদেশটা বড় উর্ব্বর, সেই জন্য ফসল জন্মে প্রচুর। এ দেশীয়েরা বড় অমায়িক ও পরোপকারী, স্থিরচিত্ত। এখানে বাড়ী ভাড়া বড় পাওয়া যায় না। বাস করিবার বাড়ী বিনা ভাড়ায়ই মিলে। ভদ্রলোকেরা বিনা ভাড়ায় অপর ভদ্রলোকের বাসের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া দেয়। আমাদের দেশের মত অতিথি সৎকারও আছে। অতিথি ফিরিয়া গেলে পাপ হয় মনে করে আর গৃহকর্ত্তার নিন্দা হয়। ফসলের মধ্যে এখানে ধান্য ও ইক্ষু প্রচুর হয়। নারিকেল এদেশে অপর্য্যাপ্ত। নারিকেল আপনিই হয়, যত্ন করিয়া বড় তোলে না। বড় বড় বৃহৎ আয়তনের নারিকেল এখানে খুব পাওয়া যায়। আমাদের দেশের নারিকেল ৩ বা ৪টার সমান এক একটা হয়। লঙ্কায় মুসলমান ও বৌদ্ধই বেশী, হিন্দু ও খৃষ্টান সংখ্যায় কম।

এখানে সমুদ্রের শোভা বড় চমৎকার। ভূগোলে যে ভারত মহাসাগরের কথা মুখস্থ করিয়াছি ইহা তাহাই। সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া নীল জলের শোভা চমৎকার দৃশ্য! তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তীরে আঘাত করিতেছে আর অমনিই প্রতিঘাতে অভিমানে ফিরিয়া যাইতেছে কি চমৎকার দৃশ্য। আমি অনেক দিন এই কাণ্ড দেখিতে যাইতাম, দেখিয়া তৃপ্তি পাইতাম। হায়, পয়সায় কি এমন দৃশ্য মিলে? সমুদ্রে সূর্য্যের উদয়াস্ত দর্শনও চমৎকার দৃশ্য। সূর্য্য জলে ঝাঁপ দিল, ডুবিল, একটু একটু করিয়া ডুবিল বেশ চমৎকার ব্যাপার। যেমন সূর্য্যকে নীচ হইতে কে যেন টানিয়া লইয়া গেল, এই যে যায়, ঐ নীচে নামে, এই বেশ দেখা যায়। কি অতুলনীয় দৃশ্য! উদয় দর্শনও ঐরূপ চমৎকার ব্যাপার। সূর্য্যদেব পূর্ব্ব প্রান্তে সমুদ্রজলে দেখা দিলেন, ও উঠিতেছেন, যেন জলটা লাল হইয়া উঠিল, তার পর ক্রমে জলের ভিতর হইতে একখানি গোলাকার থালা যেন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভাবে, কি যাদুকরী মহা মন্ত্রে জলের ভিতর হইতে একটু একটু করিয়া ভাসিতেছে। এ দৃশ্য দেখিতে কি কে কেহ পয়সা বিলাইয়া পাইয়াছে! আমরা এ আনন্দের অধিকারী।

লঙ্কার প্রায় প্রতিদিনই মধ্যাহ্নে বৃষ্টি হয়। প্রবাদ কথা শুনিয়াছি রাবণের আহারের সময় বৃষ্টি হইত। কি জানি, বলিতে পারি না আকাশের সঙ্গে লঙ্কার জল বায়ুর কি সম্বন্ধ যে প্রত্যহ মধ্যাহ্নেই বৃষ্টি হইবে। লঙ্কায় বার মাসই আম পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্রবাদ যে লঙ্কা হইতে হনুমান আম এদেশে আমদানী করিয়াছিল। শীতকালে আম তত সুখাদ্য নয়, একটু টক ধরে।

পয়েণ্ট ডি গেলিতে একটা লাইট্ হাউস আছে, জাহাজ রাত্রিকালে এই লাইট দেখিয়া চলিয়া থাকে। আমি এই লাইট হাউসে এক দিন এক জন সিংহলী বন্ধুর সাহায্যে উঠিয়াছিলাম, গিয়া দেখি উপরে উঠিলে সবই জলাকার দেখায়। উপর নীচ সবই জল যেন চার দিকেই জল মাঝখানেই আমি আছি। আকাশও নীলবর্ণ, জলও নীলবর্ণ, জলে আর আকাশে মিলিয়াছে ভাল, সবই জলাকার। আর সমুদ্রজলের মধ্যে মোচার খেলার মত ছোট ছোট এক একটা কি ডোঙ্গা ভাসিতেছে। দুরবীক্ষণ সাহায্যে দেখি, প্রকাণ্ড এক এক জাহাজ আমাদের দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। কি চমৎকার নয়ন-মনঃতৃপ্তিদায়ক দৃশ্য!

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

হাঁচি।

বড় সর্দ্দি লাগিয়াছে। সে দিন মুক্ত ছাদের উপর চাঁদের কিরণে কবিত্ব ফলাইতে গিয়া আজ এককালীন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ। গায়ে ফ্লানেলের জামা, গলায় কমফর্টার, পায়ে ষ্টকিং; চারিদিকের জানালা দরজা সব বন্ধ। যেন হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী বুদ্ধি পালাইবার ভয়ে নাক কানের ছিদ্র তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন! হাঁচির পর হাঁচি—ঠাকুরমারও বিরাম নাই! মালার থলি লইয়া তিনি ঘরের এক কোণে বসিয়া আছেন, আর আমার প্রতি হাঁচিতে বলিতেছেন—"জীব সহস্রং, জীব সহস্রং!" শেষে বিরক্ত হইয়া আমি বলিলাম —"এত সহস্র বৎসর আমি বাঁচিতে চাই না; তুমি এখন থাম।" ঠাকুর মা বলিলেন—"আহা, বাঁচিবে না কেন? হাঁচিলে যে 'জীব সহস্রং' বলিতে হয়; কেন—শুনিবে কি?" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ঠাকুর মা গল্প আরম্ভ করিলেন।

"এক রাজার একটিমাত্র পুত্র ছিল। রাজা গণিয়া পড়িয়া দেখিলেন, আঠারো বৎসর উত্তীর্ণ হইবা মাত্র পুত্রটির মৃত্যু হইবে। তাই রাজা তাহাকে যত্ন কি আদর কিছুই করিতেন না। রাজপুত্র পিতার এই অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইয়া একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা সব খুলিয়া বলিলেন। রাজপুত্র সমস্ত শুনিয়া পিতার রাজ্য ত্যাগ করিয়া আর এক রাজ্যে চলিয়া গেলেন। যে দিন তিনি সে রাজ্যে পৌঁছিলেন, সে দিন তথাকার রাজকন্যার বিবাহ। এদিকে যাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইবে সে দেখিতে বড়ই কুৎসিৎ। কিন্তু বরের পিতা বড়ই চতুর; তিনি এক সুন্দর যুবকের অন্বেষণে বাহির হইলেন। রাজপুত্র তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িলে, তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"ভালই, তুমি আমার পুত্রের হইয়া বিবাহ কর; রাত্রে দরজা খুলিয়া রাখিও, তুমি বাহির হইলে আমার পুত্র ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবে। ইহাতে তোমার আর আপত্তিই বা কি? তোমার ত' পরদিনই মৃত্যু হইবে।" রাজপুত্র বর সাজিয়া বিবাহ করিলেন। কিন্তু যখন তিনি প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে চাহিলেন, তখন রাজকন্যা কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন 'তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে তোমাকেই আমি স্বামী বলিয়া জানি। আমি আর কাহাকেও এ গৃহে প্রবেশ করিতে দিব না। তুমি যদি যাও, এই প্রদীপ থাকিবে। যদি সত্য সত্যই তোমার মৃত্যু হয় তবে এ প্রদীপ নিভিয়া যাইবে এবং আমিও সেই হইতে বিধবার আচরণ পালিতে থাকিব।' রাত্রি ভোর না হইতেই রাজপুত্র গৃহ হইতে বাহির হইলেন। আকাশ কালমেঘে ঢাকা, ঘোর অন্ধকার, গাছের একটী পাতাও নড়ে না, মাঝে মাঝে বিজুলী চমক দিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। হাঁটিতে হাঁটিতে রাজপুত্র এক অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। অন্যমনস্কভাবে কুশের অগ্রভাগ দিয়া একবার হাঁচিলেন। ঐ অরণ্যে জৈমিনি মুনি তপস্যা করিতেন। মনুষ্যের আগমন জানিতে পারিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—"জীব সহস্রং" রাজপুত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া মুনিবরকে দেখিতে পাইলেন এবং ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন—"হে দেব, আপনার আশীর্ব্বাদ যে মিথ্যা হইতেছে, কারণ এই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হইবে।" জৈমিনি বলিলেন—"আমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হইবার নহে। তুমি আমার ক্রোড়ে বসিয়া থাক।" প্রলয় উপস্থিত হইল; এত বজ্র পড়িল, একটিও রাজপুত্রের গাত্রস্পর্শ করিল না। শেষে বিধির লিখন লঙ্ঘন হয় দেখিয়া, স্বয়ং ইন্দ্র জৈমিনির নিকট আসিয়া নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন। বুঝাইবার ফলে রাজপুত্রের মৃত্যু হইল বটে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তাঁহাকে পুনর্জীবিত করা হইল। সেই হইতে হাঁচির শব্দ শুনিলে লোকে জীবসহস্রং; বলিয়া থাকে; আর মেঘের ডাক শুনিলে জৈমিনির নাম উচ্চারণ করে।"

ঠাকুর মার গল্প শেষ হইল। আমি বলিলাম "তোমার মতে হাঁচি একটী সুলক্ষণ, কারণ হাঁচিয়াই রাজপুত্র এক প্রকার পুনর্জীবন লাভ করিলেন। কিন্তু আবার হাঁচিলে বা টিকটিকির শব্দ হইলে কোন স্থানে আমাদের যাত্রা করা হয় না। তাহার কারণটা কি বলিতে পার?" ঠাকুর মা উত্তর করিলেন—"কি জানি ভাই? সেগুণের

সাহেব। কি দিয়াছ—আবার বল।

রামচন্দ্র। সকাল বেলায়।

সাহেব। তখন কয়টা বাজিয়াছিল?

রামচন্দ্র। আমি ঘড়ি দেখিনি, সুতরাং তা বল্‌তে পার্‌বো না।

সাহেব। আচ্ছা, কত সকাল?

রামচন্দ্র। খুব সকাল।

সাহেব। সে দিন রাত্রিকালে তুমি কোথায় শয়ন করিয়াছিলে?

রামচন্দ্র। সে দিন রাত্রে আমি আদৌ শয়ন করিনি।

সাহেব। তবে কোথায় ছিলে?

রামচন্দ্র। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিলুম।

সাহেব। কি উদ্দেশ্যে?

সাহেব। পাহাড়ী বাবার অনুসন্ধানে।

সে কথায় দুর্গাদাস ও ঘোষাল মহাশয় একবারে বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"কি পাহাড়ী বাবার অনুসন্ধানে!"

সাহেব তখন একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"আপনারা চুপ করুন।" তার পর রামচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"পাহাড়ী বাবা সেদিন রাত্রে কোথায় ছিল?"

রামচন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া কহিল—"সমস্ত রাত্রির সংবাদ আমি জানি না। তবে সে দিন সন্ধ্যার সময় পাহাড়ী বাবাকে এ বাড়ীর দিকে আস্‌তে দেখেছি, আর রাত্রি দেড়টার সময় এ বাড়ীর পিছনের বাগান দিয়ে বেড়িয়ে যেতেও দেখেছি।"

সাহেব তখন আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সঙ্গে আরো কেহ ছিল?"

রামচন্দ্র। আস্‌বার সময় ত দেখ্‌লুম একা, কিন্তু যাবার সময় দেখ্‌লুম সঙ্গে লোহিয়া আর একটা মড়া।

সাহেব। দেখ সব সত্য কথা বলিবে—কোন কথা গোপন করিবে না।

রামচন্দ্র। রামচন্দ্র কখন মিথ্যে কথা বলে না। তবে যা জিজ্ঞেস্ কর্‌বেন—কেবল সেই কথারই উত্তর দেবো।

সাহেব। পাহাড়ী বাবা আর লোহিয়াতে একটা মৃত দেহ বহিয়া লইয়া যাইতেছিল কি?

রামচন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ।

সাহেব। সে মৃত দেহ কাহার তুমি বলিতে পার?

রামচন্দ্র। তা কেমন করে পার্‌বো? আমি দূর থেকে দেখেছি।

সাহেব। আচ্ছা, সে মৃত দেহ অতুলচন্দ্রের কি না—সে কথা তুমি বলিতে পার?

রামচন্দ্র। তাই বা কেমন করে বলবো? তবে হলেও হতে পারে।

সাহেব। তোমার মনে যদি সে সন্দেহ হইয়াছিল—তবে এত দিন সে কথা গোপন রাখিয়াছ কেন?

রামচন্দ্র। আমার মনে ত কোন সন্দেহ হয়নি।

সাহেব তখন আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"কি! দেড়টার সময় দুই জনে একটা খুনী লাশ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়াও তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহ হইল না?"

রামচন্দ্র। সাহেব, অন্য কেউ হলে হতো, কিন্তু পাহাড়ী বাবাকে দেখে আমার সে সন্দেহ হয়নি।

সাহেব। কেন—পাহাড়ী বাবা কি এত বড় সাধু?

রামচন্দ্র। সাধু কি অসাধু—তা আমি জানিনে। তবে শব না হলে পাহাড়ী বাবার সাধনাই হয় না—একথা আমি জানি, আর রাত্রিকালই যখন সে সাধনার উপযুক্ত সময়, তখন সে সময় পাহাড়ীবাবাকে সে অবস্থায় দেখে আমার মনে অন্য সন্দেহ হবে কেন?

সাহেব। একথা এত দিন প্রকাশ কর নাই কেন?

রামচন্দ্র এবার যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"জিজ্ঞেস না কর্‌লেও প্রকাশ করবো! কই এ কথা ত এত দিন কেউ আমায় একবারও জিজ্ঞেস করেনি।"

সাহেব কিছুক্ষণ মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর পকেট হইতে দেশালাই ও চুরুট বাহির করিয়া ধূম পান আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ ধূম পানের পর কহিলেন—"সে মৃতদেহ লইয়া তাহারা কোথায় গেল?"

রামচন্দ্র উত্তর করিল—"তা আমি জানিনি—দূর থেকে দেখেছিলুম। তার পর গলির মোড়টা ফিরে

দেখি—আর কেউ কোথাও নেই। সেই সন্ধানেইত সমস্ত রাত্রি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি।”

সাহেব। এ লাশ চুরি সম্বন্ধে আর কোন কথা তুমি জান?

রামচন্দ্র। আজ্ঞে—না।

সাহেব তখন দুর্গাদাস বাবুকে কহিলেন “বাবু, আমি আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করিতে পারি না। লোহিয়াকেও এখনই গেরেপ্তার করিতে হইবে। আর এই রামচন্দ্র আপনার হেপাজতেই থাকিল।”

এই কথা বলিয়া দ্রুতগতিতে সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। সাহেব চলিয়া গেলে পর, ঘোষাল মহাশয় একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—“কি ভয়ঙ্কর কথা বাবা!”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

“যথার্থ ই ভয়ঙ্কর কথা ঠাকুরদাদা।”—বলিতে বলিতে সেই গৃহের মধ্যে অনুকূলচন্দ্র প্রবেশ করিল। দুর্গাদাস বাবু ও ঘোষাল মহাশয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে মুখে বিস্ময় যেন মাখান রহিয়াছে। অনুকূল তারপর কহিল “আপনারা কি প্রমাণে পাহাড়ী বাবাকে খুনের আসামী কর্‌লেন?”

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। দুর্গাদাস বাবু কি ঘোষাল মহাশয় কাহার মুখে কোন কথা নাই। অনুকূলচন্দ্র পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—“পাহাড়ীবাবা এ খুন করে নাই। এক জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অন্যায়রূপে কষ্ট দেওয়া কখনই উচিত হয় না। যে লোক সংসারী নয় একবারে শ্মশানবাসী, তার উপর কি ভয়ঙ্কর দোষারোপ! পাহাড়ীবাবা এ খুন কর্‌বে কেন?”

দুর্গাদাসের মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে গম্ভীরভাব ধারণ করিল। ঝটিকার পূর্ব্বে আকাশ যে মূর্ত্তি ধারণ করে, এ মূর্ত্তি তাহার সহিত তুলনীয়। তার পর বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন—তবে এ খুন কে করেছে অনুকূল?”

সে প্রশ্ন শুনিয়া অনুকূলচন্দ্রের সেই বিস্ময়বিস্ফারিত মুখখানি একবারে শুষ্ক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ অনুকূল সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। তার পর সেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তে অতি মৃদুকণ্ঠে অনুকূল কহিল—“যেই করুক, কিন্তু পাহাড়ীবাবা নয়।”

তখন পুনরায় প্রশ্ন হইল—“তুমি এ কথা কেমন করে জান্‌লে?”

অনুকূল এবার অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল—“আমি এ কথা ভালরূপই জানি। না জান্‌লে আপনার সাম্‌নে এত জোর করে কি এ কথা বল্‌তে পারি জ্যেঠা মহাশয়?

দুর্গাদাস তখন এক ভীষণ বজ্র নাদ করিলেন—“তবে কে খুন করেছে তুমি নিশ্চয়ই জান। না জান্‌লে এ কথা তুমি এত জোর করে কি করেই বা বল্‌বে। আর কেবল ত খুন নয়—মৃত্যুবাণ চুরি—খুন—আর লাস চুরি—এই তিনটা অপরাধেরই প্রধান আসামী পাহাড়ীবাবা।”

অনুকূলচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে কহিল—“অন্য অপরাধ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু জ্যেঠা মহাশয় আপনার পা ছুঁয়ে আমি দিব্য করে বল্‌ছি পাহাড়ীবাবা অতুলকে খুন করে নি।”

দুর্গাদাস বাবু তখন ক্রোধভরে কহিলেন—“তবে কে করেছে বল।”

অনুকূলচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে উত্তর করিল—“এ প্রাণ থাকৃতে সে কথা বল্‌তে পার্‌বো না।

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া দুর্গাদাস একবার অনুকূলচন্দ্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—“অতুল যে তোর সহোদর ভেয়ের মতন ছিল রে। তাকে কে খুন করেছে জেনেও তুই তার নাম প্রকাশ কর্‌বি নি—এ কথা আমার সম্মুখে বল্‌তে সাহস কর্‌লি?—তুই এত নীচ—এমন নরাধম—এমন কুলাঙ্গার?”

অনুকূল উত্তর করিল—“জ্যেঠা মহাশয়, আমায় আপ্‌নি নীচ, নরাধম ও কুলাঙ্গার যা ইচ্ছে বলুন—আমি সকল কথা অম্লান বদনে সহ্য কর্‌বো। এমন কি ঝাটা জুতা মার্‌লেও পিট পেতে দেবো, কিন্তু তবুও সে কথা বল্‌তে পার্‌বো না—সে প্রস্তাব আমার কাছে আর কখন আপ্‌নি উত্থাপনও কর্‌বেন না।”

তখন ক্রোধভরে দুর্গাদাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ’।”

এত বীচি গুণিলে আর চলে না।” আমি দেখিলাম মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত।

তবেই দেখা যাইতেছে আমাদিগের মধ্যে হাঁচি সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন সংস্কার বর্ত্তমান আছে। এক সংস্কার অনুসারে হাঁচি শুভ লক্ষণ, অন্য সংস্কার অনুসারে তাহার বিপরীত। এ স্থলে কোন্ সংস্কারের উপর অস্থা স্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ডাক্তার জোনাথান হাচিনসনের (Dr. Jonathan Hutchinson) মতে হাঁচি একটী শুভ লক্ষণ; কারণ মানুষ যখন মনের সাধে হাঁচিতে পারে, তখন বুঝিতে হইবে তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা উত্তম; ভগ্ন স্বাস্থ্যের লোককে হাঁচিতে দেখা যায় না। আবার অন্য দিকে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কোন ডাক্তার মত দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে হাঁচি অশুভ সূচনা করে, এবং সেই জন্য হাঁচিলেই শুভাকাঙ্ক্ষীরা আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জর্ম্মানীতে চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দে এক ‘প্লেগ’ উপস্থিত হয়। তাহার পূর্ব্বলক্ষণ হাঁচি—প্রথম এক দুইবার, তাহার পর অনবরত। এখন পর্য্যন্ত হাঁচির শব্দ শুনিলে সে দেশের লোক ভীত হইয়া আশীর্ব্বাদ বাক্য উচ্চারণ করে। ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত; কাহার মত প্রকৃত তাহা ঠিক করা দুষ্কর।

যাহা হউক যতদূর জানা গেল তাহাতে বুঝা যায় হাঁচি শুভ ও অশুভ দুইই। কিন্তু একই জিনিষ একই সময়ে দুই বিরোধভাবাপন্ন হইতে পারে না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হাঁচি এক সময় শুভ, অন্য সময় অশুভ। কোন্ সময় শুভ এবং কোন্ সময় অশুভ তাহা প্রাচীন গ্রীক ও রোমক পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কন্যা, তুলা, কর্কট অথবা বৃশ্চিক রাশির মধ্যে চন্দ্র না থাকিলে, বেলা দ্বিপ্রহর ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে যত হাঁচি আসিবে সমুদয়ই শুভ; আর হাঁচিবার সময় মাথা দক্ষিণ দিকে ফিরিলে তাহাও শুভ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ঘুমের পর বিছানা হইতে উঠিবার কালে অথবা আহার করিবার সময় হাঁচি আসিলে তাহা অমঙ্গলসূচক। এই শেষোক্ত সংস্কারটি আমাদেব সংস্কারের সহিত মিলে। ঘুম হইতে উঠিবার সময় হাঁচিলে পুনরায় শুইতে হয়, এবং কোন কোন স্থানে আহারের সময় হাঁচিলে থালার তল হইতে মাটি খুঁড়িয়া নাভিতে তাহা তিনবার দিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে জন্মস্থানের নাম করিয়া বলিতে হয়—“গোপালপুরের মাটি জন্মমাটি।”

সর্দ্দি লাগিয়াছে! হাঁচির পর হাঁচি আসিতেছে। সুতরাং এ বিষয় লইয়া আর আলোচনা করা উচিত নহে। তবে হাঁচির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এ গল্প ঠাকুরমার নহে—ফাদার ফেমিনষ্ট্রাডার (Father Famien Strada)। তিনি বলেন—“প্রমিথিউস (Prometheus) মনুষ্য-সমাজে প্রথম হাঁচি আনয়ন করেন। তিনি একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা যে মূর্ত্তিটীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। এ জন্য তাঁহাকে সূর্য্যরশ্মির কিয়দংশ অপহরণ করিতে হয়। কিন্তু তাহা কোথায় লুকাইয়া রাখিবেন? নস্যদানী ব্যতীত আর কোন স্থান পাইলেন না। কিছুক্ষণ পর নস্যদানী হইতে এক চিম্‌টি নস্য লইতে গেলেন; কিন্তু নস্য না লইয়া অন্যমনস্কভাবে ঐ সূর্য রশ্মিটুকু নাগিকার ভিতর গ্রহণ করিলেন। আর যাইবেন কোথায়?—হাঁচিতে হাঁচিতে প্রমিথিউস মরেন আর কি! সেই হইতে এ জগতে হাঁচির আবির্ভাব হইল।”

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চৌধুরী।

কমলা ও কবি।

কবির বিমাতা লক্ষ্মী, তবু তার প্রতি
সতত কবির কিবা অচলা ভকতি;
তাঁহারি করুণা কণা পাইবার আশে
হইয়া সে দেশান্তরী এসেছে প্রবাসে!
দারুণ দাসত্ব বেড়ী পরিয়াছে পায়;
তথাপি বিমাতা যদি মুখ তুলি চায়!
কিন্তু কি পাষাণে গড়া ইন্দিরার হিয়া,
সপত্নী-নন্দন পানে চাহে না ফিরিয়া।
সামান্য মানব কবি, তবু তার প্রাণ
দেবতা হইতে কত উন্নত মহান্!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

পাহাড়ী বাবা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর পুলিশ সাহেব দুর্গাদাস বাবুকে কহিলেন—"সে রুমালের অনুসন্ধান হইয়াছে, সে রুমাল অন্য কাহার নহে, সে রুমাল মহামায়াদের বাড়ীর। ধোবার দাগ দেখিয়া এ অনুসন্ধান ঠিক্ করা হইয়াছে।"

সে সময় দুর্গাদাস বাবুর নিকট কেবল ঘোষাল মহাশয় ছিলেন। ঘোষাল মহাশয় কহিলেন—"সে বাড়ীতে কেউ ত পুরুষ নাই—এই রুমাল ও বাড়ীর কি করে হবে? আমাদের দেশের মেয়েরা ত আর রুমাল ব্যবহার করে না সাহেব।"

সাহেব তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"আপনাদিগের মেয়েদেরও আচার ব্যবহার আমার ভালরূপ জানা আছে। এ সন্দেহ প্রথমে আমার মনেও উদয় হইয়াছিল, কিন্তু ধোবাকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে, মহামায়া রুমাল ব্যবহার করিয়া থাকে। তার চাল-চলন সম্পূর্ণ এদেশের মেয়েদের মত নহে।"

সাহেবের উত্তর শুনিয়া ঘোষাল মহাশয় নিরুত্তর হইলেন। তখন দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—"সাহেবের কথা মিথ্যা নয়—সে রুমাল মহামায়ার, এ কথা আমি অবিশ্বাস করি না। তা হলে লোহিয়াই আমার এ সর্ব্বনাশ করেছে। লোহিয়াই মৃত্যু-বাণ চুরি করেছে—সেই আমার অতুলকেও খুন করেছে—আবার পাছে ধরা পড়ে সেই ভয়েই সে রাত্রে বামুন ঠাকুরকে অজ্ঞান করে লাশ চুরি করে নিয়ে গেছে।"

তার পর শ্যামাচরণের মুখে আরো অন্যান্য যে সকল কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, সে সমস্তই সাহেবের নিকট প্রকাশ করিলেন। সে কথা শুনিয়া সাহেব এই সময় কহিলেন—"আপনি কি মনে করেন লোহিয়া একাকী লাশ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে?"

দুর্গাদাস। আজ্ঞে না মহাশয়—আমি তা কখনই সম্ভব মনে করি না। লোহিয়ার সঙ্গে পাহাড়ী বাবা নিশ্চয়ই ছিল কারণ এরা দুজনেই অতুলের সঙ্গে মহামায়ার যাতে বিয়ে না হয়, সেই চেষ্টা প্রাণপণে কর্‌ছিলো। পাহাড়ী বাবা এক জন ভয়ঙ্কর তান্ত্রিক—তার নিজের কু অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার জন্যই এত দিন মহামায়াকে কুমারী করে রেখেছে। তার ভয়েই মহামায়ার মা মেয়েটিকে নিয়ে আমার কাছে পালিয়ে এসেছে। এখন এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। পাহাড়ী বাবা পালিয়ে যাওয়া সম্ভব, সে পালালে তাকে ধরা বড় মুস্কিল হবে, আপনি এখনই তার উপায় করুন।

সাহেব। সে উপায় আমি পূর্ব্বাহ্নে করিয়াছি। পাহাড়ী বাবা পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। লোহিয়া এখন পুলিশের নজরবন্দীতেই আছে। পাহাড়ী বাবাই মূল আসামী, লোহিয়া তাহার সাহায্যকারী। তবে লোহিয়াকে আসামী শ্রেণীভুক্ত না করিয়া সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছি। এখন সেই রামচন্দ্র কোথায়?

দুর্গাদাস বাবু সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন—"সে আমার বাড়ীতেই আছে। কিন্তু সাহেব, আপনাকে আর একটি কথা বলা আমি আবশ্যক বোধ কর্‌ছি। যে বিষে এ খুন হয়েছে, আমার বিশ্বাস সে বিষ লোহিয়া ভিন্ন আর কেহই প্রস্তুত কর্‌তে জানে না—পাহাড়ী বাবা পর্য্যন্ত নয়। সুতরাং লোহিয়াকে আসামী করা উচিত কি না—আপনি এখন সে বিচার করুন। আমার মতে এরা দুজনেই আসামী, তবে প্রধান আসামী সেই পাহাড়ী বাবা।"

সাহেব তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"সে সম্বন্ধে আমি পরে বিবেচনা করিব। এখন আপনি সেই রামচন্দ্রকে একবার হাজির করুন।"

দুর্গাদাস বাবু এক জন ভৃত্যকে অনুমতি করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রকে সেই গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল। সাহেব সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"তুমি এ মৃত্যুবাণ কোন্ সময় পাইয়াছিলে?"

রামচন্দ্র একবার সাহেবের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিল,—তার পর মস্তক অবনত করিল। সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিল না। সাহেব এবার ধমক দিয়া কহিলেন—"আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

রামচন্দ্র তখন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল—"আমি সে কথার উত্তর ত পূর্ব্বেই দিয়াছি।"

সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে। তাই বলি
বিদায়ের বেলা,—আমারে যেয়োনা ছলি
নিদয়ের মত। প্রস্তুত হইত মোরে
দিও অবসর। দেখ ভব মায়া ঘোরে
জড়িত হৃদয় মম। আঁখি ঝরে তাই,
সুধু দু দিনের বেশী যারে দেখি নাই
তারেও বিদায় দিতে। তুমি বন্ধু, তুমি
সখা, তুমি প্রিয়তম এই বিশ্বভূমি
মাঝে, আমার সকলি তুমি একাধারে।
বারেক ভাবিয়া দেখ, কি বজ্র প্রহারে
ব্যথিত হইব আমি—তব অদর্শনে!
তাই পুনঃ বলি,—একদা শুভ লগনে
ত্যজিও আমায় ধীরে ধীরে। তমোময়ী
রজনীর অন্ধ অন্তঃপুরে নাহি লই
যেন বিদায় চুম্বন। একদা পূরবে
যবে প্রকাশিবে দিবা--সোহাগে স্বরবে
গাহিয়া উঠিবে পাখী, তখন হে তুমি—
বিদায় লইও মম পাণ্ডু গ্রীবা চুমি।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

অনুরোধ।

সখা যদি যেতে হয় চলে যেয়ো তুমি
বারেক মাড়িয়া যেয়ো মোর বাসভূমি,
তোমার চরণ ধূলি শিরেতে লইব তুলি
বারেক চরণখানি নিতে দিয়ো চুমি
সখা যদি যেতে হয় চলে যেয়ো তুমি।
যদি সাধ নাহি থাকে রেখে যেয়ো খুলি
মোর দত্ত মাল্যখানি, আমি লব তুলি
সযতনে মোর গলে তোমার পরশ বলে'
আনন্দে উঠিবে মোর পরাণ আকুলি
মাল্যে সাধ নাহি থাকে রেখে যেয়ো খুলি।
নাহি যদি নিতে হয় রেখে যেয়ো ফুল
বারেক পরশ ক'রো করিওনা ভুল
সোনা হতে শ্রেষ্ঠ মানি' কানেতে পরিব আনি
দোলাইব সযতনে সোহাগের দুল
[illegible]
সখা যদি যেতে হয় চলে যেয়ো পরে
বারেক বসিয়ে যেও শয়ন উপরে;
তোমা করি' অনুভব পরশ করিব সব
শয়ন করিব তাহে আকুল অন্তরে
সখা যদি যেতে হয় চলে যেয়ো পরে।

শ্রীনিশিকান্ত সেন।

দ্বৈত নিয়ম।

হাসে ঊষা নিশি অন্তে পূর্ব্বাশার অরুণ শিখরে,
অস্ত রবি দেখা দেয় ফুল্ল জ্যোতিঃ সুহাসি অধরে।
অমা অন্তে আকাশের চির স্নিগ্ধ নীলিমার পটে,
হাসে পুনঃ চারুচন্দ্র শুভ্র টীকা প্রকৃতি ললাটে।
বসুধার অঙ্গ হ'তে কুসুমের আভরণ খুলি,
বসন্ত চলিয়া গেলে পুনরায় আসে হেলি দুলি'।
নীরব হলেও নাথ! বাসন্তী বীণার নব তান,
আবার বসন্ত সহ জেগে উঠে কোকিলের গান।
তোমার এ বিশ্ব হতে যখন যা যায় গো সরিয়া
কোথা হ'তে পুনরায় প্রভু তাহা আসে গো ফিরিয়া।
আমাদের গৃহ হ'তে যখন যা যায় হারাইয়া,
আমরা তো কোন দিন পুনঃ তাহা পাইনা ফিরিয়া
আমাদের যাহা যায়—যায় তাহা জীবনের তরে,
কেন নাথ! হারা নিধি পুনরায় নাহি আসে ঘরে।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থের প্রাপ্তিস্বীকার এবং সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রবাহ—ইহা একখানি কবিতা পুস্তক, রচয়িতার নাম কিম্বা মূল্যের উল্লেখ নাই। চেরিপ্রেসে সুচারুরূপে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—বৃহৎ আকার। "উৎসর্গ" "প্রভাত" "মধ্যাহ্ন" এবং "সন্ধ্যা" এই চারিখণ্ডে প্রবাহ বিভক্ত। প্রবাহ-রচয়িতা যিনিই হউন তিনি কবিখ্যাতি লাভের অযোগ্য নহেন। স্বর্গীয় জননীর পবিত্র চরণোদ্দেশে প্রবাহ উৎসৃষ্ট হইয়াছে। "উৎসর্গ", "মায়ের ছবি", "যে তোমার কথা বলে", "ভিক্ষা" প্রভৃতি কবিতায় স্বর্গগতা জননীর প্রতি কবিহৃদয়ের গভীর ভক্তি ও প্রীতির পূর্ণ

মহোজ্জ্বল। প্রবাহের সকল কবিতাই সুন্দর নির্দ্দোষ এমন কথা বলা যায় না তবে অনেক কবিতাই সুন্দর মনোহর এবং যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির যোগ্য ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "জীবন", "বঙ্গবালা" প্রভৃতি বহু কবিতার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবাহ রচয়িতা সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া মাতৃভাষার সেবায় রত থাকুন ইহাই প্রার্থনা করি।

কপালিনী—সামাজিক নাটক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ শর্ম্মা প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা—বঙ্গ সাহিত্য জগতে প্রথিতনামা সুলেখক স্বর্গীয় কালীময় ঘটক মহাশয়ের "ছিন্নমস্তা" নামক উপন্যাসখানি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া "কপালিনী" নামে তৎপুত্র কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। কপালিনীর লেখা সরল সুন্দর ও স্থানে স্থানে বেশ মধুর। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে এবং ঘটনার বৈচিত্র্য সাধনে কৃষ্ণানন্দ শর্ম্মা মহাশয় তাদৃশ নৈপুণ্য দেখাইতে না পারিলেও যাহা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায় নূতন লেখকের পক্ষে প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই। কপালিনীর প্রায় আদ্যোপান্ত পদ্যে রচিত কিন্তু গদ্যাকারে লিখিত। পুস্তকের আকার ক্ষুদ্র এবং মূল্য সুলভ করাই ইহার উদ্দেশ্য কিন্তু ইহাতে পাঠকের সুবিধা অসুবিধার কথা গ্রন্থকার ভাবিয়া দেখেন নাই।

মায়াবিনী—দৃশ্য কাব্য—শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। উৎকৃষ্ট বাঁধাই ও সুন্দর ছাপা। এ খানিও প্রায় আদ্যোপান্ত পদ্য ছন্দে রচিত। ঘটনার অদ্ভুত ঘাতপ্রতিঘাতে এবং চরিত্রের বিচিত্র চিত্রণে ইহা নাটক নামের অযোগ্য হয় নাই। ভাষার সৌন্দর্য্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাবের বৈচিত্র্যে পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। স্থানেস্থানে অতি দীর্ঘ বর্ণনায় পাঠকের চিত্তকে ক্লান্ত করে। যদি এই দীর্ঘ বর্ণনার বাহুল্য না থাকিত তাহা হইলে এই সুন্দর পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা যাইত। পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় চিত্রিত করাই গ্রন্থকার মহাশয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সফল হইয়াছে। মানবী জ্যোতির্ম্ময়ীকে তিনি পুণ্যের প্রোজ্জ্বল মহিমায় বিমণ্ডিত করিয়া দেবীত্ব দান করিয়াছেন। এই দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী পার্শ্বে পিশাচী ... চিত্র কি ভয়ঙ্কর। নাট্য ... আমোদী পাঠক পাঠিকাগণ এই নির্দ্দোষ সুন্দর পুস্তকখানি পাঠে আমোদিত হইবেন।

যোগ ও বিয়োগ—"বরণ ও মরণ কবিতা"—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা। বিভিন্ন বিষয়ের ২৯ উনত্রিশটি ক্ষুদ্র কবিতায় "যোগ ও বিয়োগ" রচিত। অতি সরল সহজ ভাব ও ভাষায় কবিতাগুলি বিরচিত।

বোধন—"প্রীতি ও গীতি কবিতা"—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। মূল্য ৷৵০ আনা, এই পুস্তকে বিভিন্ন বিষয়ের ৭৯টি কবিতা রহিয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখে হাসিকান্না মান-অভিমান উৎসব-ব্যসনই অধিকাংশ কবিতার বিষয়, মহেশবাবুর দুইখানি পুস্তকেরই ইহাই বিশেষত্ব। নির্ম্মল জলের মত সহজ ও সরলভাবে তাঁহার কবিতা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। পাঠে তৃপ্তি হয়।

গুপ্ততত্ত্ব—অর্থাৎ আমি কি প্রকারে জগতে আসিয়াছি—এ, জুশন সাহেব প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। জুশন সাহেব মহোদয় বঙ্গীয় খৃষ্টীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি এবম্বিধ আরও বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সরল বাঙ্গালায় প্রধানতঃ বালকদিগের জন্য কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে পত্রচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসংঙ্গক্রমে বাইবেলোক্ত আদি মানব সৃষ্টি বৃত্তান্তও উল্লিখিত হইয়াছে। জুশন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার শক্তি আছে। তাঁহার পুস্তকপাঠে অনেক সময় বাঙ্গালী লেখকের লেখা প... রিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়।

পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত—প্রথম ভাগ। মূল্য ॥০ আট আনা। মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ বোম্বে, ইয়াকোহমা, চিকাগো, দারজিলিং, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার প্রিয় শিষ্য এবং বন্ধুগণকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১১ খানি পত্র এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলিতে প্রসঙ্গক্রমে সমাজ ধর্ম্ম শিল্প বাণিজ্যাদি বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কয়েকখানি পত্র ইংরাজি হইতে অনুবাদিত কয়েকখানি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃতে লিখিত। সকলগুলিই বিবিধ জ্ঞাতব্য শিক্ষণীয় বিষয়ে পূর্ণ। ভাষা সরল। পাঠে পাঠক মাত্রেই ... হইবেন। আমরা সত্বরেই ইহার পরবর্ত্তী খণ্ডের ... খার উত্তর ত পূর্ব্বে। করি।